

॥ ৪ ॥

‘আপনি ত দিক্ষা ইশাই একটি বাঘছাল বাগাবেন বসে মনে
হচ্ছে। আর আমি?’

একটু যেন মনমন্ত্র হয়েই কথাটা বললেন লালমোহনবাবু।
আমাদের খাওয়াদোওরা হয়েছে প্রায় ছক্টাখানেক হল। তারপর নিচে
বৈঠকখানায় বসে মহীতোববাবুর কাছে নানা রুক্ম লোমহর্ষক
শিকারের গল্প শুনে এই কিছুক্ষণ হল নিজেদের ঘরে এসেছি।
লালমোহনবাবুর কথায় ফেল্দুদা বলল, ‘কেন? হে-ই স্থাধান করবে
সংকেতটায় সে-ই বাঘছাল পাবে। অন্তত পাওয়া উঁচিত। কাজেই
আপনিও তাল টুকে লেগে পড়তে পারেন। আপনি ত সাহিত্যিক
মানুষ, ভাষার উপর বেশ দুর্খল আছে।’

‘আরে ইশাই, ভাষার উপর দুর্খল মানে কি আর সংকেতের উপর
দুর্খল? মহীতোববাবুও ত সাহিত্যিক। উনি হাল ছেড়ে দিলেন
কেন? না ইশাই, ওসব মুড়ো বুড়ো গাছ মাছ, তাল ফাঁক ছুই ফাঁক
—ওসব আমার স্মার্তা হবে না। আপনার ভাগোই বুলছে বাঘছাল।
এই এইটে দেবে নাকি?’

লালমোহনবাবু মেঝেয় রাখা বাঘছালটির দিকে আঙুল দেখা-
লেন। ফেল্দুদা বলল, ‘ভদ্রলোক বড় বাধের কথা বললেন শুনলেন
না? ওসব চিত্তাটিতায় আমার কোনো ইন্টারেন্স নেই।’

ফেল্দুদা এর মধোই ছাঁচাটা খাতায় লিখে নিয়েছে, আর খাটে
বসে সেটায় দিকে একদল্টে দেখছে।

‘কিছু এগোলেন?’ লালমোহনবাবু জিগ্যেস করলেন।

ফেল্দুদা খাতার পাতা থেকে চোখ না ঢুলেই বলল, ‘গুণ্ঠনের
সংকেত সে বিষয় কোনো সম্মেহ নেই।’

‘কী করে বুঝলেন? ওই মুড়ো-বুড়োর ব্যাপারটা কী?’

‘সেটা এখনো জানি না, তবে একটা গাছের কথা যে বলা হচ্ছে
তাতে ত কোনো সম্মেহ নেই। মুড়ো হয়ে বুড়ো গাছ। তারপর বলছে
হাত গোন ভাত পাঁচ। এখানে হাতটা ইন্পট্যান্ট। সাধারণত এসব
সংকেত প্রথমে একটা বিশেষ জ্ঞানগাল কথা বলে, তারপর সেখান

থেকে কোনীদিকে কতদুরে গেলে গুপ্তধন পাওয়া থাবে সেজা বলে। রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন পড়েননি? তেজুল বটের কোলে দাক্ষিণ্য যাও চলে, ইশান কোণে ইশান বলে দিলাম নিশানি? তেমনি এখানেও হাত কথাটা পাঁচ্ছ, দিক কথাটা পাঁচ্ছ। এই জনোই বলছি—'

ফেলুনোর কথাটা শেষ হল না, কারণ ঘরে আবেকজন লোক ঢুকে পড়েছে।

দেবতোষ সিংহরাম।

সকালের সেই বেগনী জ্যোৎিং গাউনটা শুধু পরা, আর চোখে সেই অশ্বুত চাহনি, যেন মনে রঞ্জ সকলকেই সম্মেহ করছেন। দেবতোষবাবু সোজা লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কি ভোটরাজার লোক?'

লালমোহনবাবু ফাকাশে হরে ঢোক গিলে বললেন, 'ভ.-ভোট মনে কি আপনি ভ.-ভোটিং—আনে, ই-ইলেকশনের—?'

'না, উনি বোধহস্ত ভূটান রাজের কথা বলছেন।'

ফেলুনোর কথাটা বলার দেবতোষবাবুর দ্রষ্টব্য ফেলুনোর দিকে ঘৰে গেল, আর তার ফলে লালমোহনবাবু একটা বিশ্বি অবস্থা থেকে উপর পেয়ে গেলেন।

'শুনেছিলাম ভোটেরা নাকি আবার আসছে?' দেবতোষবাবু প্রশ্নটা ফেলুনাকেই করলেন। ফেলুনো খৰ স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিল, 'সেরকম ত শুনিনি। তবে আজকাল ইচ্ছে করলে ভূটান যাওয়া যায়।'

'ও, তাই বুঝি।'

মনে হল দেবতোষবাবু এই প্রথম খবরটা শুনলেন।

'তা বেশ। উপেন্দ্রকে ভোটেরাজ অনেক হেল্প করেছিল। ওরা ছিল বলেই নবাবের সেনা কিছু করতে পারেনি। ওরা যুক্তি জানে। সবাই জানে কি?' দেবতোষবাবু একটা নৌকানিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'হাতিয়ার কি আর সবাইরের হাতে বাজ মানে? সবাই কি আর আলিতানারায়ণ হয়?'

কথাটা বলে দেবতোষবাবু দরজার দিকে ঘৰে দু'পা এগিয়ে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর ঘুর্ঘ ঘুরিয়ে মেঝের খাটোর দিকে চেয়ে একটা অশ্বুত কথা বললেন।

'ঘুঁধিষ্ঠিরের রহের চাকা মাটি ছুঁত না। তা ও শেষটায় ছুঁল।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বলে রইলাম। তারপর ফেলুনো বিড়াবিড় করে বলল, 'খড়ম পরেছে। তাতে

বন্ধারের সাইলেন্সার সাগানো।'

এর পর মান্ত্রের পর পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটল। সেগুলো ঠিক মতো জেখার চেষ্টা করছি। বাইরে বারবুদার সিঁড়ির প্রবর্তনের পাশে একটা প্যান্ডফাদার কেক খাকার মরুন ঘটনার সময়গুলো আল্মাজ করতে অস্বিধা হয়ন।

প্রথমেই বলে রাখি দে গান্ধি বালিশ ঢোকারে দিক থেকে শোবার ব্যবস্থা ভালো হলেও, একটা ব্যাপ্তারে গুড়গোল হয়ে যাওয়াতে প্রথম মান্ত্রের ঘটনা একদম হাটি হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ আমাদের তিনজনের মশারিতেই ছিল ফ্লট। মশারি ফেল্দার দশ মিনিটের মধ্যে তেতুরে মশা ঢুকে কামড় আর বিনিবিন্দুনির জৰুরী আবাদের ঘৰের বারোটা বাজিয়ে দিল। ফেল্দার সঙ্গে ওড়োঅস থাকে, শেষটায় তাই যেখে কিছুটা আরাম পাওয়া গেল। বাইরের ঘড়িতে তখন দং দং করে এগায়োটা বেজেছে। দিনের বেলা মেঘলা থাকলেও এখন জানালা দিয়ে চাঁদের আগো আসছিল। সবেমাত্র চোখের পাতাটা ঘূজে এসেছে এমন সময় একটা চেনা গলার ধমকের সূর্যে কথা এল।

‘আমি শৈববারের মতো বলছি—এর ফল ভালো হবে না।’

গলাটা অহীতোষব্যবুর। উকুরে কে বে কৌ বলল তা বোঝা গেল না। তারপরে সব চূপচাপ। আমার বাঁ দিকে লালমোহনবাবুর মশারির ভিতর থেকে নাক ডাকার শব্দ শুন্দ হয়েছে। আমি ডান পাশে ফেল্দার খাটের দিকে ফিরে চাপা গলায় বললাম, ‘শুনলে?’

গম্ভীর ফিসফিসে গলায় উত্তর এল, ‘শুনোছি। ঘূঘো।’

আমি চূপ করে গেলাম।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বোধহয় ঘূঘো পড়েছি। ঘূঘো যখন ভাঙল তখনো যেরে চাঁদের আগো রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একটা শব্দ দৃঢ়গুড়ালি থামলে পর আরেকটা শব্দ কানে এল। ঘূঘূ ঘূঘূ...ঘূঘূ ঘূঘূ...ঘূঘূ ঘূঘূ...। তামে তালে একটানা শব্দ নয়। মাঝে মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে মেঘের গর্জনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। শব্দটা হচ্ছে বেশ কাছ থেকেই। আমাদের ঘরের ভিতরেই। ফেল্দার খাটের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কান পাততেই ওর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ পেলাম। ও ঘূঘোছে।

কিন্তু লালমোহনবাবুর নাক ডাকা ব্যথ কেন? ওর খাটের দিকে চেয়ে ডবল মশারির ভিতর দিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু

একটা শুরু শব্দ যেন আসছে খাটের দিক থেকে। এটা আমার চেনা শব্দ। বাজ-রহস্যের বাপারে সিমলার বরফের মধ্যে একটা পিস্তলের গুলি লালমোহনবাবুর পায়ের কাছে এসে পড়ার তার দাঁতে দাঁত লেগে ঠিক এই শব্দটাই হোর্ছে।

সেই সঙ্গে আবার সেই শব্দটা কানে এল। ঘুট ঘুট...ঘুট ঘুট...ঘুট

আমি বাড়ি কাত করে মেঝের দিকে চাইলাম। ফলে মশারিটা একটু সড়ে উঠতে বোধহয় লালমোহনবাবু বুরলেন আমার ঘূর্ম কেড়ে গেছে। একটা বিকট চাপা ঘড়ঘড় স্বরে তিনি বলে উঠলেন, ‘ত-তপেশ—বা-বাঘ !’

বাব শব্দেই আমার চোখ মেঝের বাঘচালটার দিকে চলে গেল, আর ঘেড়েই বা দেখলাম তাতে আমার ইন্ত জল হয়ে গেল।

জোখস্বার আসো বাবের মাথাটার উপর পড়েছে, আর স্পষ্ট দেখতে পাওয়া মাথাটা মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক নড়ে উঠছে, আর তার ফলেই ঘুট ঘুট শব্দ হচ্ছে।

আর ধাকতে না পেরে যা থাকে কপালে করে ফেলুন্দার নাম ধরে একটা চাপা চিকির দিয়ে উঠলাম। ফেলুন্দার ঘূর ঘতই গাঢ় হোকে না কেল, ও সব সময় এক ডাকে উঠে পড়ে, আরে ওঠামাত্র ওর মধ্যে আর ঘূরের লেশমাত্র থাকে না।

‘কী বাপার ? চাঁচাঁচস কেন ?’

আমারও প্রায় লালমোহনবাবুর মশা। কোনো রকমে ঢোক গিলে বলে ফেললাম, ‘মেঝে...বাঘ !’

ফেলুন্দা মশারিয়র ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বাঘটার নড়ন্ত মাথাটার দিকে একদম্প্রে থানিকক্ষণ দেখে নিল। তারপর দিবা নিশ্চিন্তভাবে এগিয়ে গিয়ে বাবের ঘুতনিটা ধরে উপরে তুলতেই তার নিচ থেকে একটা গুবরে পোকা বেরিয়ে পড়ল। ফেলুন্দা অচ্ছানন্দনে সেটাকে দু’ আঙুলের চাপে তুলে নিয়ে বলল, ‘গুবরের আসুরিক শক্তির কথাটা কি জেনের জানা নেই ? একটা কীসার জামবাটি চাপা দিয়ে গায়েসে সেটাকে স্থান টেনে নিয়ে সারা বাড়ি চকর দিতে পারে !’

ভয়ের কানগটা এত সামান্য জানলে অবিশ্বাস ঘামটায় আপনা থেকেই শুকিয়ে যায়। আমার আর লালমোহনবাবুরও তাই হল। এদিকে ফেলুন্দা গুবরেটাকে নিয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে দেখি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এই গভীর রাতিরে ফেলুন্দা কী দেখছে সেটা ভাবাই, এমন সময় ও ডাক দিল, ‘জোপদে, দেখে যা !’

আমি আর শালমোহনবাবু ফেলুদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আসেই বলোছি পশ্চিম দিকটা বাড়ির পিছন দিক, আর এদিক দিয়েই কালুনির জগল দেখা যায়। এই ক'র্মনিটের মধ্যেই কালো মেঘে চাঁদ দেকে ফেলেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইছে বটে, কিন্তু তা ছাড়াও আরেকটা আলো দেখে অবাক লাগল। আলোটা মনে হল জগলের ডিতর ঘোরাফেরা করছে। টেরের আলো।

'হাইলি সার্সিপশাস', ফিস্ফিস করে বললেন শালমোহনবাবু।

আলোটা এবার নিবে গেল।

এবার একটা চোখ ধীরানো বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে একটা কানকাটা বাজের আওয়াজ, আর তার পরম্পরাতেই বড় বড় বৃষ্টির ফৌটা শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম দিক থেকেই ছাঁট, তাই প্রটো জানালারই শার্সি বন্ধ করে দিতে হল। ফেলুদা বলল, 'একটা বেজে গেছে, শুরু পড়।' কাল স্কালে আবার জগলের পিন্ডের দেখতে যাবার কথা আছে।'

আবরা তিনজনেই আবার শার্সির ডিতর ঢুকলাম।

জানালায় রঞ্জীন কাচ থাকার ফলে বিদ্যুৎ চমকালেই ঘরে গ্রাম-ধনুর রঙ খেলাইল। সেই রঙ দেখতে দেখতেই আবার কখন যে দুঃখের পড়লাম তা টেরেই পাইনি।

॥ ৫ ॥

পরীদল সকালে দৃশ্য গাঁও থায় সাতটায়। ফেলুদা অবিশ্ব তার আগেই উঠে যোগব্যাহুম, দাঁড় কামলো-টামলো সব সেরে ফেলেছে। কথা আছে, তাঁড়িবাবু আটটায় এসে আবাদের নিয়ে জাপেশ্বরের মন্দির দেখিয়ে আনকেন। হহীতোষব্যাবুর তিনজন চাকরের মধ্যে যত্ন নাম কানাই, সে আবাদের চা দিয়ে গেল সাড়ে সাতটায় কিছু পরে। ফেলুদা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কোলের উপর রাখা খোলা থাতটায় দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রায় আপন মনেই বলে উঠল, 'ধৰ্না আদিতানারায়ণ। তুখোড় বৃক্ষ বলতে হবে।'

জালমোহনব্যাবু চকাঁ শব্দ করে চারে একটি চুম্বক দিয়ে বললেন, 'বাঃ, ফাস্ট ক্লাস চা!—আরো এগোলৈনে বৃক্ষি?'

ফেলুদা সেইভাবেই বিড়বিড় করে বলল, 'হাত শোন ভাত পাঁচ। ভাত হল অশ আর পাঁচ হল পঞ্চ। দুটোকে উলটিয়ে নিয়ে সাঁধ করে হল পঞ্চাশ। অর্থাৎ পঞ্চাশ হাত। বাঃ!...কিন্তু কিসের খেকে। পঞ্চাশ হাত? বৃক্ষে গাছ কি? তাই হবে...তাই হবে...'

'ফেলুদার গোলা মিলিয়ে এল। আমার মন বলছে, ও দ্বিদলের শংশোই সংকেতের স্মাধান করে ফেলবে, আর বায়চালাটা পেয়ে যাবে।

বারাম্বার ঘড়িতে কিছুক্ষণ আগেই আটটা বেজে গেছে, কিন্তু তাঁড়িবাবু এখনো আসছেন না কেন? ফেলুদার কিন্তু সেদিকে ভ্রকেপই নেই। সে এক মনে সংকেত নিয়ে তেবে চলেছে, আর যাবে যাবে বিড় বিড় করে উঠেছে।

'ঠিক ঠিক অবাবে...ঠিক ঠিক অবাবে...। কিসের জবাব? প্রশ্নটা কই বৈ তার জবাব হবে? দিক পাও ঠিক ঠিক অবাবে...ঠিক ঠিক অবাবে...'

এবাবে ফেলুদার বিড়বিড়ানি বশ্ব হ্বাব আগেই দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে একজন সোক চুকে পড়ল। তাঁড়িবাবু নন। শশাঙ্কব্যাবু।

'আপনারা—ইয়ে—চা থাক্কেন? ও...'

ভদ্রলোকের চেহারা দেখেই মনে হল কিছু একটা হয়েছে। ফেলুদা থাতা রেখে উঠে পড়ল।

‘কী ব্যাপার বলুন ত ?’

শশাঙ্কবাবু গলা থাকারিয়ে কেমন যেন অনামনস্কভাবে বললেন—
‘একটা দৃঃসংবাদ আছে। তাঁর, মানে শহীতোবের সেক্সেটারি, মারা গোছে।’

‘সে কী ? কী হয়েছিল ? কাল রাতেও ত...’

কথাটা বলল ফেল্দুদা, কিন্তু আবরা তিনজনেই সমান হতভর্ম।
শশাঙ্কবাবু বললেন, ‘কাল রাতে কালবন্নির দিকে গিয়েছিল—কেন
জানি না—এই একটুকু আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গোছে। এক
কাঠুরে দেখতে পায়, আর দেখেই এসে খবর দেয়।’

‘কী ভাবে মারা গোলেন ?’

‘কাঁধের অনেকখানি খাস নার্ক খেয়ে গোছে। বাব বলেই ত মনে
হচ্ছে।’

য্যানস্টোর ! আবার হাত-পা আবার ঠাপ্ডা হবে আসছে। লাল-
মোহনবাবু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি পা পিছিরে গিয়ে
টেবিলে ভর করে দাঁড়ালেন। ফেল্দুদার মূখের ভাব অস্তুত রকম
গম্ভীর।

শশাঙ্কবাবু বললেন, ‘আপনারা এলেন, আর তার মধ্যে এই
দৃঃস্টিনা। বুঝতেই পারছেন, আমাদের এখন এই নিয়ে একটু ব্যস্ত
থাকতে হবে। এবছই, মানে, একবার থেতে হবে আর কি।’

‘আমরাও যেতে পারি কি ?’

শশাঙ্কবাবু প্রশ্নটা শুনে ফেল্দুদার দিকে একবার দেখে তারপর
আমাদের দৃঃজনের দিকে এক বলক দৃঃষ্টি দিয়ে বললেন, ‘আর্মান ত
গোয়েন্দা মানুষ, আপনার এসব অভ্যস আছে, কিন্তু এ’রা...’

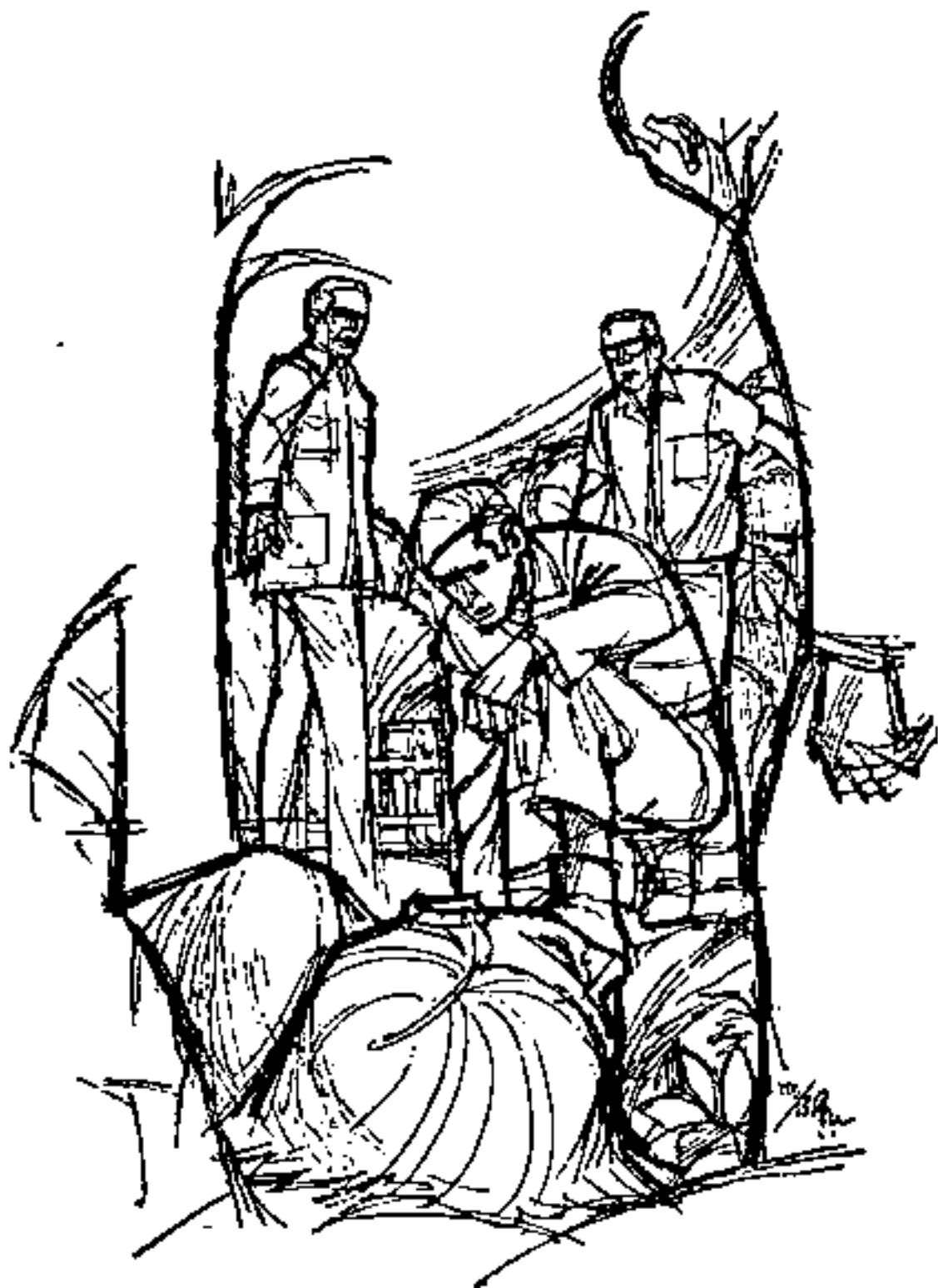
‘ওরা গাড়িতেই থাকবে।’

ভদ্রলোক রাজী হয়ে গোলেন। বললেন, ‘তাজে আপনারা তৈরি
থাকলে চলে আসুন। দুটো জীপ আছে, একটাতে না হয় আপনারা
তিনজন যাবেন।’

‘বল্দুক থাকবে কি সঙ্গে ?’

প্রশ্নটা আঘিও করতে পারতাম, কিন্তু করলেন লালমোহনবাবু।
অন্য সময় এ ধরনের প্রশ্ন শুনলে হয়ত শশাঙ্কবাবু হেসে ফেলতেন,
কিন্তু এখন গম্ভীর ভাবেই বললেন, ‘থাকবে। দিনের বেলা এমনিতে
জর নেই, তবু থাকবে।’

জীপে করে অঙ্গলের দিকে দেতে যেতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটোর



কথা জ্ঞানিশ্চাপ। কালই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে এত কথা বললেন,
আর রাতারাতি তাকে বাখে রেখে ? এত রাতিখরে কী কর্মাছলেন ডেনি
জগলের প্রয়ো ? তাহলে কি কাল রাতিখরে যে আলোটা দেখেছলাম
সেটা উড়িবাবুরই টেচের আলো ?

আমাদের জীপের সামনে আরেকটা জীপ ছড়েছে। তাড়ে রয়েছেন মহীতোষবাবু, শাশাক্ষিযাবু, এখানকার বন্দিভাগের একজন বর্ষচারী মিষ্টার দত্ত, শিকারী মাধবলাল, আর ত্বে লোকটা তাড়িৎবাবুর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিল সেই কাঠুরে। মহীতোষবাবুকে কাল রান্তেই ছৈ ছৈ করে শিকারের সল্প বলতে শুনেছিলাম, আর আজ দেখে মনে হল এক রাস্তারে তার মশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। সেটা শুন্দি সেকেটারির মৃত্যুর জন্য, না ম্যানস্টার আছে এটা প্রমাণ হবার জন্য, তা অবশ্য ব্যক্তে পারলাম না।

জগলের তিতরে খুব বেশি দ্রুতে হল না। বড় রাম্ভা থেকে ঘুরে মিনিট পাঁচক যাবার পর আমাদের সামনের জীপটা থামল। রাম্ভার দ্বিতীয় শাল আর সেগুন গাছ, আর তা ছড়া আমার চেনার খাঁড়ে শিম্বু, নিম, একটা প্রকাণ্ড কাঠালগাছ আর কয়েকটা বাঁশকাড়। কাল রান্তে যে বৃক্ষটি হয়েছে তার ছাপ রয়েছে চারপিকে। এখানে এখানে হোট হোট গর্ত আর থানাখন্দের খাঁড়ে জল ঝর্মে রয়েছে।

জীপ থামার সঙ্গে সঙ্গেই ফেল্দা বলল, 'ওই দাখ !'

ও যেদিকে আঙ্গুল দেখাল সেদিকে বেশ খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর দ্বিতীয় একটা বাঁশকাড়ের ধারে একটা কোপের পিছনে হাল্কা সবুজ রঙের যে জিনিসটা চোখে পড়ল সেটা আমার চেনা। ওটা তাড়িৎবাবুর শাটে। কাল রান্তে তদুলোক ওই শাটটাই পরেছিলেন।

সামনের জীপ থেকে সবাই নেমেছে। কাঠুরে লোকটা এগিয়ে গেল। তার পিছনে চললেন মহীতোষবাবু ও বাঁকি তিনজন। ফেল্দা ও জীপ থেকে নেমে বলল, 'তোরা গাড়িতে থাক। এ দুশা তোদের ভালো কাগবে না।'

যেখানে তাড়িৎবাবুর মৃতদেহ পড়ে আছে সে জ্বরগাটা আমাদের জীপ থেকে প্রায় চাঁমিশ-পঞ্চাশ হাত দ্বারে। কিন্তু জগল এত নিন্তুর বলেই বোধহৱ সকলের কথাবার্তা স্পষ্ট শব্দতে পাওয়াযাব। আর মুখে যা শনেলাম তা পর পর লিখে রাখিছি।

বাঁশকাড়টার ধারে পৌছে প্রথম কথা বললেন মহীতোষবাবু। শুধু দ্বিতীয় কথা—'মাই গড় !'—আর সেই সঙ্গে জাঁক ডান হাতের তেলোটা মিয়ে কপালে একটা আঘাত করলেন।

এবার মিষ্টার দত্ত মৃতদেহটার দিকে এগিয়ে গেলেন, আর তার-পরেই তাঁর কথা শোনা গেল।

'এই বৃক্ষটিতে বায়ের পায়ের ছাপ খৈজ্জার চেষ্টা বৃংখ। কিন্তু

বাধ্য বলেই ত মনে হচ্ছে। তাই নয় কি ?'

মহীতোষবাবু—'নিঃসন্দেহে !'

মিস্টার দত্ত—'কাল বৃষ্টি থেমেছে দ্বিতোর পর। যেভাবে রাত্তি ধ্যে
গেছে তাতে মনে হয়, খাওয়ার ব্যাপারটা বৃষ্টির আগেই সেবে
ফেলেছে !'

ফেলদু—'ম্যানগাইটার কি যেখানে মানুষ মারে, সেখানেই খাওয়ার
কাজটা সারে ? অনেক সময় ওরা শিকার মুখে করে এক আঁচাগা থেকে
আরেক আঁচাগায় নিয়ে যাব না ?'

মহীতোষবাবু—'তা তো বটেই। তবে আপনি বাদি আশা করেন
যে, মাটিতে বসটে টেনে আনার দাগ থাকবে, নেটার বিশেষ সম্ভাবনা
নেই। এমনিতেই বৃষ্টিতে দাগ যাচ্ছে যাবে। তাছাড়া একটা মানুষের
মেহ বাধ মুখে করে এমনভাবে নিয়ে যেতে পারে যে, সে দেহ মাটি
ঢেক করবে না। সুতরাং তাঁড়কে কোথায় ধরেছিল বাবে সেটা বোধ-
হীন জানা যাবে না !'

ফেলদু—'তাঁড়বাবুর চশমাটা কোথার পড়েছে সেটা জানতে
পারলে হব্বত...'

এরপর কিছুক্ষণ কার্ত্তুর মুখেই কোনো কথা নেই। শশাঙ্কবাবু
বোধহ্য বাবের পায়ের ছাপ খৈজার জন্য এদিক ওদিক দেখছেন।
ফেলদু এখনো মৃতদেহের কাছেই রয়েছে। মিস্টার দত্ত মাথবলালকে
কী যেন বলতে বাচ্ছেন, এমন সময় আবার ফেলদুর গলা পাওয়া
গেল।

ফেলদু—'বাব কি কেবল একটামাত্র নথের সাহায্যে একটা গভীর
আঁচড় দিতে পারে ?'

মহীতোষবাবু—'হঠাতে এ প্রশ্ন কেন ?'

ফেলদু—'আপনারা বোধহ্য লক্ষ্য করেননি—তাঁড়বাবুর বৃক্কের
কাছে একটা গভীর ক্ষতিচ্ছ রয়েছে। শার্ট তেল করে একটা ধারালো
জিনিস তার শরীরের ঘর্থে ঢুকেছে। আপনারা এইখানে এলেই
দেখতে পাবেন !'

কথাটা বলা মাত্র সকলে বাস্তবাবে তাঁড়বাবুর মৃতদেহের দিকে
এগিয়ে গেল। তারপর মহীতোষবাবুর গলা পেলাম।

মহীতোষবাবু—'সর্বনাশ ! এ বে খুন ! এ ত বাষের আঁচড় নর।
তাঁড়কে খুন করা হয়েছিল। তারপর তার মৃতদেহ বাবে টেনে নিয়ে
আসে। কী তয়শ্কর ব্যাপার !'

ফেলদু—'খুন বা খুনের চেষ্টা। ছাঁরির আঘাতেই তাঁড়বাবুর

মন্ত্র হয়েছিল কিনা সেটা এখনো বলা শক্ত। হয়ত তাকে জখম করে আতঙ্গার্হী পালাব। জখম অবস্থাতে স্বভাবতই বাহের কাজটা আরো সহজ হয়ে গিয়েছিল। যে অস্ত দিয়ে এই বুকার্টটা করা হয়েছে, সেটা খৈজনক চেষ্টা করা দরকার।'

মহাত্মাবাবু—'শাশাঙ্ক, তুমি এক্সেন প্রলিশে খবর দাও।'

বন্দুক হাতে মাধবলালকে তাড়িবাবুর ঘৃতদেহের পাশে পাহারা দেখে আজ সবাই জীপে ফিরে এল। ফেলুদাকে এত গম্ভীর অনেকদিন দেখিনি। কেবার পথে ও একটাও কথা বলল না। আমাদেরও কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না। বনের মধ্যে একপাশ হারিগকে ছুটতে দেখেও মনটা নেচে উঠল না। লালমোহনবাবু এর আগেও আমাদের সঙ্গে গায়ে কাটা দেওয়া অবস্থায় পড়েছেন, কিন্তু ওকে এমন ফাকাসে হয়ে বেতে দেখিনি কখনো। কোনো জীবিতে বেড়াতে এসে আঘেকা বহসের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা ফেলুদার জীবনে এর আগেও ঘটেছে, কিন্তু এভাবে নয়। এখানে ত শুধু খুন নয় বা তহসা নয়, তার উপরে আবার মানবখেকো।

॥ ৬ ॥

শশাঙ্কবাবু খবর দেওয়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই জলপাইগুড়ি
থেকে পুলিশের লোক এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এখন বিকেল
পাঁচটা। আজ আকাশ পরিষ্কার। আমরা মহীতোষবাবুর নিজের
বাসনের অঙ্গুত্ত ভালো চা খেয়ে ঘরে বসে আছি। ফেলুদা কুচু
কুচকে পারচারি করছে, মাঝে মাঝে আঙুল ঘটকাছে, আর মাঝে
মাঝে একটা চারমিনার ধৰিয়ে দু' চারটে টান দিয়েই টেবিলের উপর
রাখা পিতলের ছাইদানিটার ফেলে দিচ্ছে। লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে
বার তিনেক মাটিতে শোয়ানো বাঘের ঘাথাটা পরীক্ষা করেছেন;
বিশেষ করে সাতগুলো।

‘ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আরেকটা আলাপ করার সুযোগ হত।’

ফেলুদা এ কথাটা আপন মনে আরো করেক্ষণের বলেছে। সত্তা,
তড়িৎবাবুকে ভালো করে চেনার আগেই তিনি খুন হয়ে গেলেন।
খুলের কারণ কী হতে পায়ে, তড়িৎবাবুর সঙ্গে কারূর শত্রু ছিল
কি না, এই সব না জানলে পরে ফেলুদার পক্ষে রহস্যের কিনারা
কর্য অনুশীলন হবে নিশ্চয়ই।

বারান্দার ঘাঁড়তে পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট পরেই মহীতোষ-
বাবুর একজন চাকর—যার নাম জানি না—এসে খবর দিল, নিচের
বৈঠকখানায় আমাদের ডাক পড়েছে।

আমরা তিনজনে বেশ বাস্তবাবেই নিচে গিয়ে হাজির হলাম।
মহীতোষবাবু আর শশাঙ্কবাবু ছাড়াও আরেকটি ভদ্রলোক সোফার
বাসে আছেন। পোশাক দেখে বুঝলাম ইনি পুলিশের লোক।
মহীতোষবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—

‘ইনি ইনস্পেক্টর বিশ্বাস। আপনিই প্রথম ক্ষতিচ্ছটা দেখে খুনের
কথাটা বলেছেন জেনে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন।’

ফেলুদা নমস্কার করে মিস্টার বিশ্বাসের উলটো দিকে সোফাটায়
বসল, আমরা দুজন একটু দূরে আবেক্ষণ্য সোফায় বসলাম।

মিস্টার বিশ্বাসের গালের দুই রীতিমতো কালো, ঘাথায় চকচকে
টাক, যাদিও বয়স বোধহয় চালিশ-টালিশের বেশ নয়। সরু একটা

গোঁফও আছে, তার দ্রুটো দিক আবার কোথায় সমান নয়। ছাঁটিবার সময় বোধহয় একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক তাঁকু-দ্রষ্টিতে ফেলন্দুর দিকে দেখে বললেন, 'আপনি শুনেলাম শখের ভিটেকটিভ।'

ফেলন্দু একটু হেসে বুঝিয়ে দিল, কথাটা ঠিক।

বিশ্বাস বললেন, 'আপনাদের আর আমাদের মধ্যে উফাতটা কোথায় আনেন ত? আপনারা কোথাও গেলে পরে সেখনে খন হয়, আর আমরা কোথাও খন হলে পরে সেখানে যাই।' কথাটা বলে নিজের রসিকতাহ নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন ইনস্পেক্টর বিশ্বাস।

ফেলন্দু আর কথা না বাড়িয়ে একেবারে কাজের কথায় চলে গেল। বলল, 'খনের অস্তো পাওয়া হচ্ছে কি?'

বিশ্বাস হাসি ধান্তিরে ধাধা নেড়ে বললেন, 'না। তবে খৌজা হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে খানাতলাসৌর ব্যাপারটা কিরকম কঠিন সে ত বুঝতেই পারছেন। তার উপর আবার ম্যানগ্রিটাৰ। প্রাণিশরাও জো মানুষ—মানে, ম্যান—বুঝলেন ত? হোঁ হেঁ হ্যাঁ।'

বিশ্বাস ঘণাই এত হাসছেন দেখে ফেলন্দুও ঘেন জোৱ করেই একটু হেসে আবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'ছুরির আঘাতেই মর্যাদিলেন কি তাঁড়িবাবু?'

বিশ্বাস বললেন, 'সেটা ত আজ এখন বোৰবাৰ উপায় নেই। শাসেন্দু বা অবস্থা, এমনিতেই বাবে খেঁজে গেছে অনেকটা। তার উপর এই সরঞ্জ; পোষ্ট মটোরে কোনো যন্ত হবে বলে মনে হয় না। আমজ কথা হচ্ছে—কোনো বাড়ি তাঁড়িবাবুকে কোনো ধারালো অস্তুর সাহাবো খন করেছিল, বা খন কৰার চেষ্টা করেছিল। তারপর বাবে কী করেছে না করেছে সেটা আমাদের কনসাল' না। তাক জন্য যা স্টেপ মেবাৰ সেটা নেবেন যিষ্টার সিৱহোৱ।'

মহীজোববাবু, গম্ভীরভাবে হেবেৰে কাপোঁটৈয়ে দিকে ডাকিয়ে বললেন, 'এয় হয়েই আশেপাশের গ্রামে প্যানিক আৱশ্যক হয়ে গেছে। আমাৰ জোকও ত জলালে কাঠ কাটাই কাজ কৰে। আৱো দ' মাস কাজ রায়েছে, তারপৰ বৰ্ষা নামলে থক। অবস্থা গুৱাতুৰ সেটা বুঝতে পাৰাইছ। কিন্তু তাঁড়িবকে এভাৱে আতঙ্গ কৰল কে এবং কেন, সেটা না আনা অবধি আমি অন্য কিছু ভাবতেই পাৰাই না। অবিশ্বা আৰিহৈ ত আৱে একমাত্ শিকারী নই এ অফুলে। বনবিভাগ তেকে দীক্ষিত কৰা কৰা কঠিন হবে না।'

মিস্টার বিশ্বাস গলা খার্কারিয়ে একটু মড়ে বললেন, 'আমার কাছে রহস্য একটোই—এত রাত করে জগলে গেলেন কেন আপনাদের তড়িৎবাবু। খনের একটা খূব সহজ কারণ থাকতে পারে। তাঁড়ি-বাবুর পকেটে কোনো মালিয়াগ বা টাকা-পয়সা পাওয়া থার্ন। তার ঘর খুঁজে সেখানেও পাওয়া যায়ন। এ অঞ্চলে গুৰু বদমাইসের ত অভাব নেই। এ অঞ্চলে কেন বলছি—সাবা দেশেই নেই—হোঁ হোঁ হোঁ। তাদেরই কেউ এ কুকীঁতিটা করে থাকতে পারে। ক্ষেত্র রাহাজানি আৱ কি।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধাইয়ে শাস্তভাবে বলল, 'মাঝ হাঁতিয়ে জগলের হৃধো তড়িৎবাবুর মতো একজন নিরবীহ লোকের কাছ থেকে টোকা বাঁচ করে নিতে কি ছুরি মাঝার দুরকার হয়? মাধায় একটা লাঠির বাড়ি মেরেই কাষসিংক্ষ হয় না কি?'

বিশ্বাস কাষ্টহাসি হেসে বললেন, 'তা হৰত হয়। কিন্তু তড়িৎ-বাবুকে খুন কুচার অনা কী কারণ থাকতে পারে বলুন। মেটিভটা কোথায়? তড়িৎবাবু ছিসেন মিস্টার সিহুরায়ের সেক্রেটারি, সেখা-পড়া নিয়ে থাকতেন, পাঁচ বছর হল এখানে এসেছেন, কারূৰ সঙ্গে যেলামেশা নেই, এ বাড়ির লোকের বাইরে কারূৰ সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও নেই। গুৰু বদমাইস ছাড়া তার উপর এ ধৰনের আত্মপূজ কৰবে কৈ? এবং কেন কৰবে?'

ফেলুদা ভুৱ ভুঁচকে চুপ করে রইল। বিশ্বাস বললেন, 'সাদা-সিধে রাহাজানির ব্যাপারটা আপনাদের মতো শব্দের ডিটেকটিভদের আ্যাপোল কৰবে না জ্যানি। তা বেশ ত, আপনি রহস্য চান, রহস্যও ত রয়েছে। বাঁচ কুচার ত দোখ, তড়িৎবাবুর মতো লোক মাঝৰাজিৰে জগলে যাব কেন।'

শাস্তিকবাবু চুপচাপ একটা আলাদা সোফায় বসেছিল। ফেলুদা যে কেন মাঝে ধাকে আড়তোখে শুন দিকে চাইছিল সেটা বুঝলাগ না। মহীভোগবাবুর চেহারায় এখনো সেই ফাকাসে ত্বরিত ভাবটা রয়েছে। বাঁচ বাঁচ মাঝা নাজছেন আৱ বলছেন, 'কিছুই বুঝতে পাৰ্নাছ না...। কিছুই বুঝতে পাৰ্নাছ না...।'

আৱো মিলিটারীনেক বসে থেকে আমৰা তিনজনে উঠে পড়লাম। মিস্টার বিশ্বাস বললেন, 'আপনি নিজের খুশি মতো তদন্ত চালিয়ে কৰতে পাৱেন মিস্টার মিস্টিৰ। তাতে আমি কিছু মাইন্ড কৰব না। হাজাৰ হোক—কত চিহ্নটা ত আপনিই প্ৰথম দেখেছিলেন।'

বৈঠকখনা থেকে বেৰিয়ে ফেলুদা দোতলায় গেল না। গাড়ি-

বারামদা দিয়ে বাঁড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ডান দিকে ঘূরে পুরোন অন্তর্বল আৰু হাতিশালৈৰ পাশ দিয়ে একেবাবে বাঁড়িৰ পিছন দিকে গিয়ে হাঁজিৰ হলাম আমৰা। পিছন ফিরে উপৰ দিকে চাইতেই দোতলার একসারি জনালার মধ্যে একটা খেকে দেখলাম লালগোছন-বাবুৰ তোয়ালেটো বৃক্ষছে। এটা না হলে কোনটা যে আমাদেৱ ঘৰ মেটো চেনা মুশকিল হত। আমাদেৱ ঘৰেৱ ঠিক নিচেই একতলার একটা মৱজা রয়েছে। এটাকে ধিড়িক মৱজা বলা যেতে পাৰে। এটা দিয়েই নিচয় কাল রাতে বেৰিয়ে তড়িৎবাবু জগলেৱ দিকে গিয়েছিলেন।

সামনে বিশ-পাঁচশ হাত দৰে একটা খোলার চালওয়ালা ছোটু একতলা বাঁড়ি রয়েছে। তাৰ সামনে আট-মশজিন লোক জটলা কৰছে। তাৰ মধ্যে একজনকে আমৰা আগে দেখেছি। এ হল মহীতোষবাবুৰ দারোয়ান। বাঁড়িটোও সম্ভবত দারোয়ানেৱই। ফেলুদাৰ পিছন পিছন আমৰা অগিয়ে গেলাম বাঁড়িটোৰ দিকে। দৰে কালৰ্বনিৰ জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, তাৰ শাল গাছেৱ মাথাগুলো অন্য গাছেৱ উপৰ উঁচুয়ে রয়েছে। জগলেৱ পিছনে দেখা যাচ্ছে ধৌয়াটে নীল ঢেউ খেলানো পাহাড়েৱ সারি।

বাঁড়িটোৰ কাছাকাছি পৌছতে দারোয়ান আমাদেৱ সেলাম কৰল। ফেলুদা জিগোস কৰল, 'তোমাৰ নাম কী ?'

'চন্দন মিসিৰ, হুজুৰ।'

হুড়ো লোক, মাথার চুলে কদম ছাটি, পিছনে টীকি, চোখেৱ পাশেৱ চামড়া কুঁচকে গেছে। কথা বলার চে দেখেই বোৰা থায় ঈনি থায়।

'কন্দন কাজ কৰছ এখানে ?'

'প'চাশ বারিস ইইয়ে গোলো হুজুৰ।'

চন্দন মিসিৰেৱ কথায় বুঝলাম, তড়িৎবাবুৰ মৃত্তাৰ তৈৰ মানুষ-খেকেৰ বাব নিয়ে এখানকাৰ মোকেৱা অনেক বেশি বাস্ত হয়ে পড়েছে। পাগলা হাতি নাকি প্রায়ই বেগোৱ, কিম্বু মানুষখেকেৰ বাব গত তিশ বছৰেৱ মধ্যে এই প্ৰথম। চন্দনেৱ মতে এখানে কিছু লোক কেআইনিভাৱে চোৱা শিকাব কৰে, তাদেৱ কাৰুৰ গুলিতে হয়ত বাঘটা জন্ম হয়েছিল, আৱ সেই খেকেই ওটা মানষিটাৰ হয়ে গেছে। অনেক সময় বেশি বয়সে বাঘেৰ দাঁত থয়ে গোলোও ওৱা মানষিটাৰ হয়ে যাব। আবাৰ মাঝে মাঝে দেখা যাব যে সজাৰ খৰে খেতে গিয়ে তাৰ কঠী এগনভাৱে চোখে মুখে ঢুকে গেছে বৈ। তাৰ ফলে কাৰু হয়ে বাঘ জানোয়াৰ হেড়ে আৱো সহজ শিকাব মানুষেৱ দিকে গেছে।



ফেল্দা বলল, 'এখনকার লোকেরা কি চাইছে যে মহীতোষ-
বাবু বাঘটাকে মরিন ?'

চন্দন পিসিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'সে ত চাইবে,
লেকিন বাবু ত এ জগলে শিকার করেননি কখনো। আসামে
করিয়েছেন, ওড়শায় করিয়েছেন—এ জগলে করেননি।'

থবণ্টা শুনে আমরা সকলেই অবাক হলাম। ফেল্দা বলল, 'কেন,
এখনে করেননি কেন ?'

চন্দন বলল, 'এই জগলে বাবুর দাদাজী (ঠাকুরদাদা) বায়ের

হাতে মরলেন, বাবুর বাবা তি বাবের হাতে মরলেন, তাই বাবু এখানে না করে দুসরা জালগা দুসরা জগলে চলে গেলেন।'

মহীতোষবাবুর বাবাও যে বাবের হাতে মরেছিলেন সেটা এই প্রথম শূন্যলাঘু। ফেলুদা জিগোস করাতে চল্দন বলল যে, মহীতোষ-বাবুর বাবা নাকি মাচা থেকে বাবকে গুলি করেছিলেন, আর দেখে মনে হয়েছিল বাঘটা মরে গেছে। মিনিট পশেক পরে মাচা থেকে বাবের দিকে যেতেই সেটা নাকি ভদ্রলোককে আক্রমণ করে সাংঘাতিক-ভাবে জখম করে। ক্ষত সেপটিক ইয়ে কলেক লিলের মধেই নাকি ভদ্রলোক মরা থান।

বৰুৱা শূনে ফেলুদা কিছুক্ষণ ভুঁতু কুঁচকে ঘাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খোঙার বাড়িটার দিকে দোখিয়ে বলল, 'তুমি ওই বাড়িতে থাক ?'

'হী, হুজুর !'

'বাস্তির দ্বিমোয় কখন ?'

চল্দন প্রশ্নটা শূনে একটু ধূত থেকে ফেলুদার দিকে চাইল। ফেলুদা এবার আসল প্রশ্নে চলে গেল।

'কাল বাস্তিরে বে বাবু খুন হলেন—'

'তোড়িতবাবু ?'

'হ্যাঁ। উনি বেশ বৈশ বাস্তিরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে জগলের দিকে গিয়েছিলেন। তুমি তাকে যেতে দেখেছিলে কি ?'

চল্দন মিসির বলল, গতবাল না দেখলেও তোড়িতবাবুকে সে তার আগের দিন, এবং তারও আগে বেশ কয়েকদিনই সন্ধ্যাবেল। জগলের দিকে যেতে দেখেছে। গতবাল তোড়িতবাবুকে না দেখলেও আরেক-জনকে দেখেছে।

কথাটা শূনে ফেলুদার মুখের ভাব বদলে গেল।

'কাকে দেখেছিলে ?'

'তা জানি না হুজুর। তোড়িতবাবুর চেরের মুখটা বড়—তিনি সেলের প্রোন টর্চ। আর এটা ছিল ছোট টর্চ, তার মুখ ছোট। তবে তাই বলে আলো কম নয়।'

'তুমি কেবল আলোই দেখেছ ? আর কিছু দেখিন ?'

'নেই হুজুর। আউর কুছ নেই দেখা।'

ফেলুদা আরো কি বিষয়ে জানি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দুর্ব মহীতোষবাবুর চাকুর বাস্তভাবে দৌড়ে আমাদের দিকে পাঁগরে আসছে।

‘বাৰু আপনাদুৰ ডেকেছেন। বললেন ‘জৱাৰি দৱকাৰা।’

আমৰা কিৰে এসে দেৰি মহীতোষবাৰ্ৰ গাড়িবাবাপ্পায় দাঁড়িয়ে
আমাদেৱ জনা অপেক্ষা কৰছেন। ফেলুসাকে দেখামাণ বললেন,
‘আপনাৰ অনুমান ঠিক। তড়ৎকে গুৰুতা বসবাইসে মাৰেন।’

‘কী কৰে জানলেন?’

‘বৈ অস্তু দিয়ে তাকে মাতা হয়েছিল সেটা আমাদেৱই বাড়তে
ছিল। কাল বৈ ভৱেয়ালটা আপনাকে দেখিয়েছি, সেইটা। সেটা
আৱ ঠাকুৰদাৰ আলমাৰিতে দেই।’

॥ ৭ ॥

কানাই চাকরটাই আদিতন্মারায়ণের ঘরে ধূনো দিতে গিয়ে তলোয়ারের অভাবটা দক্ষ করে, আর করেই মহীতোষবাবুকে ঘরে দেয়। ঘরে অনেক বইপত্র আছে যেগুলো মহীতোষবাবুর শেখার কাজে দরকার হয়; তাই আর পরটায় চাবি দেওয়া হত না। চাকর সবই প্রোন আর বিশ্বসী। চুরি এ বাড়িতে বহুকাল হয়নি, তাই ও নিয়ে কেউ মাথা ধামাত না। তার মনে এই নো, বাড়ির যে-কেউ ইচ্ছে করলে ও তলোয়ার বাবু করে নিতে পারত।

আলমারিটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করেও ফেলুন্দা কোনো ক্ষু বা ওই জাতীয় কিছু পেল না। শুধু তলোয়ারটাই নেই। আর সব যেখানে দেখন ছিল সেইভাবেই আছে।

পরীক্ষা শেষ হলে পর ফেলুন্দা বলল যে, ও তড়িৎবাবুর শোবার ঘর, আর তড়িৎবাবু যেখানে কাজ করত সেই জায়গাটা একটু দেখতে চায়।—'তবে তার আগে আপনার মনে কোনোরকম সন্দেহ হচ্ছে কিন সেটা জানতে চাই।'

মহীতোষবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর খেকে মাথা নেড়ে বললেন, 'তড়িৎকে খুন করার কোনো কারণ থাকতে পারে এমন কোনো লোক ত এখানে আছে বলে মনে হয় না। ওর এমনিতেও মেলামেশা কম ছিল, কাজ নিয়ে থাকত; মাঝে মাঝে হেঁটে বাইরে বেড়াতে যেত। বর্তদুর শানি, বদ অভ্যাস-টিভাসও কিছু ছিল না। আর ঠাকুরদার তলোয়ার দিয়েই র্যাদ তাকে হেবে থাকে তাহলেও ত আমাদের বাড়িরই লোক। না:—আবি ত ভেবে কুর্কিনারা শাঁচি না।'

আমরা তিনজনে মহীতোষবাবুর সঙ্গে তড়িৎবাবুর ঘর দেখতে গেলাম। আমাদের ঘরেরই মতো বড় একটা ঘর। আসবাব হাড়া তড়িৎবাবুর নিজের জিনিসপত্র বলতে নাল রঙের একটা বড় স্টেকেস, একটা কাঁধে কোলানো কাপড়ের ব্যাগ, আলনায় টাঙানো শাট পান্ট পায়জামা গোঁজ তোলাসে ইতাদি, একটা তাকে প্রসাধনের জিনিসপত্র, একটা ছোট টেবিলের উপর রাখা ইঁরেজি আর বাংলা কিছু গল্পের বই, একটা আলার্ম ক্লক, একটা মুসেখা রু-ব্যাক কালি, আর দুটো



স্পেনসিল। এ ছাড়া খাটের পাশে একটা টেবিলের উপর রাখা রাস্ক-
আর জলের গেলাস, আর একটা ছোট প্রানজিনটাৰ রেডিও।

সুটকেসটোয় চাবি ছিল না। ফেল্দা সেটা খুলতেই দেখা গেল
তার ঘো খব পরিপাটি করে কাপড়চোপড় সাজানো গয়েছে। ফেল্দা
বলল, 'ভুলোক কথাকাতায় থাকার জন্য তৈরিই হয়ে ছিলো।'

মিনিটে পাঁচেক পরে টাইবাবুর ঘর থেকে আমরা ইহীতোষ-
বাবুর আপস ঘরের দিকে দুমা দিলাম। ধাবার পথে ফেল্দা
ইহীতোষবাবুকে ভিগোন করল, 'সেক্সেটোরি বলতে ঠিক কী ধরনের

কাজ করতেন তাঁড়িবাবু, সেটা একটু বলবেন কি ?'

মহীতোষবাবু বললেন, 'চিঠিপত্র লেখার কাজ ত আছেই, তাহাড়া আমার হাতের লেখা ভালো নয় বলে পান্ডুলিপি ও-ই কাপ করে দিত। তারপরে প্রফুল্ল দেবত, কলকাতায় গোলে পার্বলিপারদের সঙ্গে দেখা করা, কথাবার্তা বলা, এসবও করত। ইদানিঃ আমার বংশের ইতিহাস লেখার বাপারে শুকে অনেক পুরনো বই কাগজপত্র দিলল চিঠি ইত্যাদি ঘটিতে হয়েছে। সে-সব পড়ে শুন্য নোট করে রাখত !'

'এগুলো কৰ্ত্তব্য সেই সব নোটের খাতা ?' ফেল্দু তাঁড়িবাবুর জেন্সের উপর রাখা গোটা আল্টেক বড় সাইজের খাতার দিকে দেখাল। মহীতোষবাবু সাথা নেড়ে হাঁটি বললেন।

'আর এগুলো কি আপনার নতুন শিকার কাহিনীর প্রকৃতি ?'

সম্মা লম্বা কাগজের তাড়া, দেখলেই বোঝা যায় মেগুলো প্রফুল্ল। ফেল্দু এক তাড়া প্রফুল্ল তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখাইল।

'প্রফুল্ল-দেখিয়ে হিসেবে কি খুব নিউরহোগা হিসেবে তাঁড়িবাবু ?'

শুনটা শুনে মহীতোষবাবু বেশ অবাক হয়েই বললেন, 'আমার ত তাই ধারণা ! আপনার কি সম্ভব হচ্ছে ?'

'প্রথম পাতার প্রথম প্যারাগ্রাফেই দুটো ভুল দেখাই শুধুরনো হয়নি !'

'তাই নাকি ?'

গর্জন কথাটার রেফ বাদ রাখে গোছে, আর হরিপুর র-রে ফুটোক নেই !'

'আশ্চর্য... আশ্চর্য...'

মহীতোষবাবু অনামনস্কভাবে প্রফুল্লের কাগজগুলোর উপর চোখ ব্যালিয়ে ফেল্দুকে ফেরত দিয়ে মিলেন।

'সম্প্রতি তাঁড়িবাবুকে কি চিন্তিত বা উচ্চিক্ষণ বলে মনে হত আপনার ?' ফেল্দু প্রশ্ন করুল।

'কই, সেরকম তো কিছু লক্ষ্য করিনি !'

ফেল্দু তাঁড়িবাবুর কাজের টেবিলের উপর বসুকে পড়ে কাঁ বেন দেখছে। একটা প্যাড খেলা রয়েছে, তার উপর হিঁজিবিঁজি লেখা। ফেল্দু প্যাডটা হাতে তুলে নিয়ে কাগজের উপর চোখ রেখে বলল, 'আপনাদের বংশের ইতিহাস লেখার জন্য কি মহাভাস্তু ঘাঁটার দরকার হচ্ছে ?'

'কেন বলুন ত ?'

'তাঁড়িবাবু এই প্যাডে বোধ হয় অনামনস্কভাবেই করেকটা কথা

লিখেছেন। এই বে দেখন না—অর্জন, কীচক, নারায়ণী, উত্তর, অশ্ববায়। এর সবই ড মহাভারতের নাম। নারায়ণী হল কৃষ্ণের সেনার নাম। কীচক ছিল বিরাট ব্রাহ্মণ শালা, আর উত্তর হল বিরাটের হেলে, অভিমন্ত্র শালা।'

মহীতোষবাবু বললেন, 'আমার কাজের জন্য ওকে মহাভারত পড়তে হয়েনি, তবে ব্যাপারটা কী আসেন, তাঁড়ুঁ ছিল বইয়ের পেছা। ঠাকুরদামুর লাইব্রেরিতে কালীপ্রসমূর মহাভারত রয়েছে। সেটা নিয়ে ঘীটোবাট করে থাকতে পারে।'

আমরা মহীতোষবাবুর আশিস ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একটা ছেলা গুরুগুরীর গলায় খিরেটেরের ড়-এ কথা কানে এল—

'সব ধরনে হয়ে যাবে...সব ধরনে হয়ে যাবে। সত্যের ভিত্তি টেন্ডল করছে, সব ধরনে হয়ে যাবে।'

'ধ্য গলাটাই শূন্যাম, মানুষটাকে দেখতে পেতাম না। মহীতোষ-বাবু দৈর্ঘ্যবাস যেমনে বললেন, বৈশাখ মাসটা প্রতি বছরই দাদার এরকম হয়। তারপর বর্ষা এলে গুরুটা কমলে কিছুটা নিশ্চল্প।'

আমরা আমাদের ঘরের সামনে দোহাই দেলুমো থলল, 'কাল একবার জঙ্গলে যাব ভাবিছিলাম। একটু অনুসন্ধানের পার্যাপ্ত। আপনি কী বলেন ?'

মহীতোষবাবু কুঁচকে বললেন, 'তাঁড়কে বেছানে ফেলে রেখে গিয়েছিল বাঘ, তার কাছাকাছি সে আর আসবে না বলেই ত মনে হয়। বিশেষ করে দিনের দেশ। অন্তত যাব সময়ে আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। কাজেই আপনারা র্যাদি শুই স্পটের কাছাকাছি থাকেন তাহলে বেশ গিস্ক রেই। সাঁজ বলতে কি, এ জঙ্গলে যে বড় যাঘ এখনো রয়ে গেছে সেটাই ত আমার কাছে একটা বিরাট বিপ্রয়।'

'সঙ্গে ঘাথবলালকে পাওয়া যাবে ত ? আর একটা জীপ... ?'

'নিশ্চয়ই।'

মহীতোষবাবু ছলে গেলেন। বললেন, জলোয়ারের ঝুঁকটা ইন্দ্রিপাটুর বিশ্বাসকে ধিতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিকেলের পর থেকে আকাশের মেঘ একদম কেটে গেছে। শালমোহনবাবু অনেকক্ষণ থেকে চুপচাপ ছিলেন; দেখে থেনে ইচ্ছিল ইয়ত কোনো গল্পের প্লট মাধ্যম আসছে, কারণ যদেখে মাঝে পকেট থেকে লাল টুকরুকে একটা টাটার ডারির বার করে কী যেন নোট করাইলেন। ঘরে এসে পাখাটা শূলে দিয়ে থাটে বাস

ফেলনেন, 'কি রকম বোনাস পেয়ে গোলেন বলুন। এটা আমারই দোলতে সেটা স্বীকার করবেন ত ?'

'একশোব্বের !'

ফেলদা তড়িৎবাবুর ডেস্কের উপর থেকে সেই মহাভারতের নাম লেখা প্যাডটা আর 'কোর্টিয়ারের ইতিহাস' বলে একটা বই নিয়ে এসেছিল। এখন সে খাটে বসে প্যাডের দিকে চেয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ ধরে থেকে বিড়াবিড় করে বলল, 'সব ক'টাই মহাভারতের নাম তাতে সন্দেহ নেই, কেবল এই "উত্তর" কথাটা...। উত্তর...উত্তর। উত্তর নামও হতে পারে, উত্তর দিকও হতে পারে, আবার উত্তর মানে উত্তর কাল—প্রবর্তী কাল—এও হতে পারে। আবার উত্তর মানে প্রস্তুত উত্তর...জবাব...জবাব...'

ফেলদা হঠাতে থেন চমকে উঠল। তারপর থাটের পাশের টেবিলের উপর থেকে নিজের খাতাটা নিয়ে সঁকেতের পাতাটা খুলল।

'দিক পাও ঠিক ঠিক জ্বাবে।—খ্যাত্ক ইউ তড়িৎবাবু। আপনার উত্তর বিরাটগ্রামার ছেলে হতে পারে—আমার উত্তর হল উত্তর দিক। দিক পাও ঠিক ঠিক জ্বাবে। অর্থাৎ দিক পাও ঠিক ঠিক উত্তরে। তার মানে উত্তর দিকটাই হলু ঠিক দিক। হাত গোল তাত পাঁচ। পঞ্চম হাত। উত্তর দিকে পঞ্চম হাত। কিন্তু তবেপর ? ফাল্গুন তাল জোড়, দ্বাই মাখে দ্বাই ফৌড়। ফাল্গুন...এই ফাল্গুনটা নিয়েই ষত গণ্ড—'

আবার ফেলদাৰ সেই চমকে উঠে কথা থেমে যাওয়াৰ বাপার।

'তড়িৎবাবুর টেবিলের উপর একটা বাংলা অভিধান ছিল না ?' সে চাপা গলায় বলে উঠল।

লালমোহনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সংসদের অভিধান। জাল রঙ। আমারও আছে।'

'ওটা দেখা দুরকার !'

ফেলদাৰ পিছন পিছন আয়োজন কৃতলাভ ধৃতীতোষবাবুর আপিস অবৈ।

অভিধান খালে 'ফাল্গুন' বার করে ফেলদাৰ তোখ জুলজুল করে উঠল।

'ফাল্গুন—ফাল্গুন হল অর্জুনের একটা নাম ! আব অর্জুন শুধু পঞ্চপাঞ্চবের একজন নয়, অর্জুন গাছও বটে। এ জগতে অর্জুন গাছ কালও দেখেছি।'

'তাহলে ব্যাপারটা কী দাঢ়াচ্ছ ?' লালমোহনবাবু জিনিসটা কলো করে না বুঝেও উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

‘ফাল্গুন তাল ঝোড়, দুই পর্বে ফুই ফোড়। একটা অর্দুন গাছ
আৱ ঝোড়া তাল গাছেৱ মাঝখালে জীৱ বুড়তে হৰে।

‘কিন্তু সেৱকম গাছ কোথাৱ আছে সেটা জানলৈন কি কৰে ?’

ফেলুনা বলল, ‘আৱেকটা কোনো বুঝো গাছেৱ উত্তৱে পঞ্চাশ
হাত গোলৈ পাওৱা বাবে !’

‘আৱেক্ষণ্যবা, বুঝো গাছ ! বুঝো গাছ ছাড়া ছোক্ৰা গাছ আছে
নাকি এ জগতে ? আৱ গাছ ত মশাই সব কেটে যেলৈছে। মহীতোব-
বাবুৰ নিজেৱই ত কাঠেৱ বাবসা। এ সংকেত লেখা হয়েছে কৰ্ম্মন
আগে ? সত্যৰ পঁচাত্তৰ বছৱ হৰে না ?’

আমৱা আমাদেৱ ঘৱে ফিরে এসৈই। ফেলুনা আবাহ চূপ, আবাৱ
গুৰুৰীৱ। মেৰেতে বাবহালেৱ দিকে চেৱে রৱেছে অন্যমনস্কভাৱে।
প্ৰায় খিনিটোখালেক ওইভাৱে খেকে বলল, ‘বা ভাৰছি তাই বনি হয়
তাহলে বড় বাধেৱ ছালটা তড়িববুৰই পাওৱা উচিত ছিল। সংকেত
সমাধানেৱ বাপাহে তড়িব সেন্টাস্ট ফেলু মিঞ্জিৱেৱ চেৱে কষ বাৱ
না। খুড়ি, বেঢ়েন না।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘কিন্তু পাইডে বৈ আৱো সব মহাভাৱতেৱ
নাম রয়েছে ? কীচক, অশ্বথামা—এদেৱ সল্লে সংকেতেৱ কী সংপৰ্ক ?’

‘সেই কথাই ত আৰ্মণি ভাৰ্যী...’

ফেলুনা আবাৱ প্যাণ্ডেৱ দিকে চাইল। তাৰপৰি বলল, ‘অবিলিপি
এই কাগজেৱ সব ক'টা নামই বৈ পৱন্পৰেৱ সল্লে বুঝ, এটা ভাৱাৱ
কোনো কাৰণ নেই। এবে এগুলো যে একই সময় লেখা সেটোও ভাৱাৱ
কোনো কাৰণ নেই। এই দেৰ্থন—কীচক আৱ নাৰামণী ডট পেন ফিরে
লেখা। দেখলৈই বুৰকতে পাৱবেন। কালিন রং সবই এক বলে মনে
হৱ, কিন্তু অন্য লেখাগুলোৱ নিচেৱ টোনগুলো ইয়েই মোটা—
হেটো ডট পেনে কখনো হৱ না।’

লালমোহনবাবু আৱ গোৱেন্দ্ৰাৰ ঘৱে কৰে কাগজটোৱ দিকে ফুৰু
কুচকে তাকিয়ে খেকে বললেন, ‘তাহলে কীচক আৱ নাৰামণীৰ সল্লে
সংকেতেৱ—’

কথাটা শেষ হৰায় আগেই দৱজাৱ দিক থেকে গুৰুৰীৱ গুলাম কথা
এসে পড়াৱ লালমোহনবাবু চমকে উঠে হাত থেকে পাাজ্জটা ফেলেই
দিলেন।

‘কীচকদেৱ নিয়ে কথা হচ্ছ কি ?’

দেৰতোববাবু।

পৰ্মা ফুক হল। কস্তুৰোক ভিজুৱে ঢুকে এলেন। আবাৱ সেই

বেগুনী ভ্রেসিং পাউন। ভন্সোকের কি আর কেনে আমা নেই? ফেলুদা বলল, 'আস্ত্র দেবতোষবাবু, ভিতরে আস্ত্র।' ভন্সোক ফেলুদাৰ কথায় কান না দিয়ে একটা প্রশ্ন কৰে বললেন।

'পৃথিবীৰ জলে ভূবে আস্ত্রহত্যা কৰেছিলেন কেন জান?' ।

'আপনি বলন। আমুৰা জানি না।' ফেলুদা বলল।

'কারণ কৌচিকদেৱ সংস্পর্শে' এসে পাহে ধৰ্মনাল হৱ, সেই ভয়ে।

'কৌচিক একটা জাতিৰ নাম?' ফেলুদা অবাক হয়ে জিগ্যেস কৰল।

'যায়াবৰ জাতি। জলালে গেলে একবার একটু খোঁজ কৰে দেখো ত তাৰা এখানে আছে কিনা। বুনৰোৱগ শিকার কৱত তৌৰ-ধনুক নিয়ে।'

'নিশ্চয়ই দেখব খোঁজ কৰে,' ফেলুদা খুব স্বাভাৱিকভাৱে বলল। তাৰপক বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস কৱতে পাৰি কি?' ।

দেবতোষবাবু কেছন বৈন অবাক ফ্যালফ্যালে ভাৰ কৰে ফেলুদাৰ দিকে চাইলেন।

'জিগ্যেস কৱবে? আমাকে ত কেউ কিছু জিগ্যেস কৰে না!'

'আমি কৱাই। এখানে প্রাচীন গাছ বসতে কেনো বিশেষ গাছ আছে কি? আপনি স্থানীয় ইতিহাস ভালো কৰে জানেন বলেই আপনাকে জিগ্যেস কৱাই।'

'প্রাচীন গাছ?'

'হ্যাঁ। মানে এমন গাছ যাকে লোকে বুঢ়ো গাছ বলে জানে।'

প্রাচীন গাছ শুনে, দেবতোষবাবুৰ ঘোলাটে চোখ আৱো ঘোলাটে হয়ে গিরোহিল, এখন হঠাতে অবসজ্জন কৰে উঠল।

'বুঢ়ো গাছ? তাই বল। প্রাচীন গাছ আৱ বুঢ়ো গাছ কি এক হল? বুঢ়ো সাধ ত শুধু বসন্তে বুঢ়ো বলে নয়। গাছেৰ গায়ে একটা ফোকুৰ আছে, সেটা দেখতে ঠিক একটা ফোকলামাতি বুঢ়োৰ হী কৱা যুক্তেৰ ঘত্তো। সেই গাছেৰ নিচে ঠাকুৰদাসাৰ সঙ্গে গিৰে চড়ুইভাতি কৱেছি। ঠাকুৰদাসা বলতেন ফোকলা ফুকিৱেৰ গাছ।'

'গাছটা কী গাছ?' ফেলুদা জিগ্যেস কৱল।

'কাটা ঠাকুৰানীৰ মলিন দেখেছ? সে-ও রাজুৰ হাত থেকে নিষ্ঠাৱ পায়নি। সেই মলিনৱেৰ পশ্চিম দিকে হল ফোকলা ফুকিৱেৰ গাছ। অন্বেষ গাছ। সেই গাছেই একদিন মহী—'

'দাদা, চলে এস!'

দেবতোষবাবু কথা শেব কৱতে পারলৈন না। কাৰণ মহীতোষ-

বাবু দরজার বাইরে থেকে তাঁর বাজ়ার হাঁক দিয়েছেন। পর্দা আবার ফাঁক হল। মহীতোষবাবু গম্ভীর মুখ করে থেরে ঢুকলেন। ব্যবলায় সেই কঠিন মানবতা আবার বাইরে বেরিবে অসেছে।

‘তোমার ওষুধ খাবার কথা; খেয়েছ ?’

‘ওষুধ ?’

‘মশুধ দের্শন ?’

দেবতোষবাবুর জন্ম একজন আলাদা চাকুর আছে, নাম অস্ত্র !

‘আমি ত ভাল আছি, আবার ওষুধ কেন ? আমার মাথার ষষ্ঠগ্রা—’

মহীতোষবাবু তাঁর দানাকে এক রকম জোর করেই ঘাড় থেরে পর থেকে বাক করে নিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে ছাট ভাইয়ের ধমক শুনতে পেলাম।

‘ভাল আছ কি না-আছ সেটা ভাজার ব্যবহৈ। তোমাকে যা ওষুধ দেওয়া হয়েছে সেটা তুমি খাবে !’

গলা শিলিয়ে এল; আর সেই সশে পায়ের শব্দও।

‘ভদ্রলোককে সত্তাই কিন্তু আজ অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু। ফেল্দার কানে যেন কথাটা গেলই না। সে আবার বিড়াবড় শব্দ করেছে।

‘অশ্বথ গাছ...অশ্বথ গাছ...অশ্বথ...। কিন্তু মৃত্তো হয়ে কেন ? মৃত্তো হয় বড়ো গাছ...মৃত্তো হয়...’

হঠাতে থেকে খাতটো প্রচণ্ড জোরে বিছানার ফেলে দিয়ে ফেল্দা যাঁফিয়ে উঠে চিংকার করে উঠে—‘হয় ! হয় ! হয় ! হয় !’

‘কী হয় ?’ লালমোহনবাবু যথারীতি ভাবাচ্যাক।

‘ব্যক্তে পারছেন না ? মৃত্তো হয় বড়ো গাছ। তার মানে বড়ো গাছ, তার মৃত্তো, মানে মৃত্তু, অর্থাৎ গোড়া—হল হয় !’

‘হল হয় ? সে আবার কী ?’ লালমোহনবাবু আরো হতভম্ব। সত্তা বলতে কি, আমারও মনে হচ্ছে ফেল্দা একটু আবোল তাবোল বকছে। এবার ফেল্দা যেন বেশ বিরক্ত হয়েই লালমোহনবাবুর দিকে চোখ পারিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, ‘আপনি না সাহিত্যিক ? হয় মানে আনেন না ? ঘোড়া, ঘোড়া, ঘোড়া। হয় মানে ঘোড়া। হয় মানে অশ্ব। বড়ো গাছের গোড়া হল অশ্ব। আরো বলতে হবে ?’

‘অশ্বথ !’ চোঁচিয়ে উঠলেন লালমোহনবাবু।

‘অশ্বথ ! তড়িৎবাবু অশ্বত্তহ সিখোছিলেন এমনি কলম দিয়ে, আর পরে খেয়ালবশত আ-কার আর মা জুড়ে দিয়েছেন ডট পেন দিয়ে। আর আমি ভাবছি মহাভারত। ছি ছি ছি ছি !’

আমি জানি ফেলুন্দা কাল অনেক রাত অবধি ঘুমোয়ানি। আমি আর লালমোহনবাবু জেগে ছিলাম প্রায় এগাপ্রোটা অবধি। তাড়িৎ-বাবুর ঘৰতো একজন আশ্চর্য বৃত্তিমান লোক কৌ বিশ্বিতাবে ও কৌ ইহসানকভাবে ঘারা গেলেন সেই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কতকগুলো ব্যাপার যে ফেলুন্দাকেও রীতিমতো ধার্থিয়ে দিয়েছিল সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। ফেলুন্দা নিজেই সেগুলোর একটা লিস্ট করেছিল; সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

১। তাড়িৎবাবু ছাড়া আর কে কাল রাতে জগালে গিয়েছিল? যে গিয়েছিল সেই কি জলোয়ার নিয়েছিল? সেই কৌ খনী? না সে ছাড়াও আরও কেউ গিয়েছিল? হাল ফ্যাসানের টর্চ কার কাছে আছে?

২। প্রথম রাতে মহীতোষবাবু কার সঙ্গে ঘমকের সূরে কথা বলছিলেন?

৩। দেবতোষবাবু কাল মহীতোষবাবু সম্পর্কে কৌ ঘটনা বলতে যাচ্ছিলেন, সে সময় মহীতোষবাবু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন?

৪। দেবতোষবাবু সেদিন যুক্তিপূর্ণের রাহের কথাটা বললেন কেন? সেটা কি পাগলের প্রলাপ, না তার কোনো মানে আছে?

৫। শশোকবাবু এত চুপচাপ কেন? সেটা কি ওর স্বভাব, না বিশেষ কোনো কারণে উনি চুপ রেখে গেছেন?

লালমোহনবাবু সব শুনেট্টনে বললেন, 'মশাই, আমি কিন্তু একটি লোককে যোক্তেই ভরসার জোখে দেখতে পাচ্ছি না। ওই দাদা বাজীটি পাগল হতে পারেন, কিন্তু ওর হাতের কঁজ্জটা দেখেছেন? মহীতোষবাবুর চেয়েও চওড়া। আর কালাপাহাড়ের উপর যা আকেশ দেখলাম, কাউকে কালাপাহাড় মনে করে ধী করে একটা জলোয়ারের ঘা বাসিয়ে দেওয়া কিছুই আশ্চর্য না।'

কথাটা শুনে ফেলুন্দা কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর দিকে চেরে থেকে বলল, 'আগার সঙ্গে যিশে আপনার কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা যে যুগপৎ বেড়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দেবতোষবাবু যে তলোয়ারের আঘাতে খুন করার ক্ষমতা রাখেন সেটা আমিও বিশ্বাস করি। তবে তাড়িবাবুর খনের পেছনে যে-কোনো হিসেবই কার্যকলাপের ইঞ্জিন পাওয়া যায়—আদিতন্মারামগের আলঘারি খলে তলোয়ার নেওয়া, তাড়িবাবুকে অনুসরণ করে এতখানি পথ হেটে জগলে যাওয়া—তাও আবার দুর্বোগের রাতে—তারপর অশ্বকারেই তাজ করে তলোয়ার চালানো—এটা মনে রাখতে হবে যে এক হাতে টর্চ জেলে অন্য হাতে তলোয়ার চালানো সম্ভব নয়—এই একগুলো কাজ একজন পাগলের পক্ষে সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আসলে আরেকবার জগলে গিরে অনুসন্ধান না করলে চলছে না। যা চলছে সব ত ওইখানে। কাজেই বাড়িতে বসে শুধু জলপনা-কল্পনার সাহায্যে বৈশ দুর এসোন যাবে না। এটা ঠিক যে তাড়িবাবু সরকেতের সমাধান করে গৃন্থধনের সন্ধানেই গিয়েছিলেন। গৃন্থধন নিয়ে সেজা কলকাতার চলে বাবেন, এটাই হিল তাঁর শ্বান। কিন্তু এমন একটা আয়ামের ঢাকার ছেড়ে গৃন্থধনের প্রতিই বা তার শোভটা গেল কেন? ভন্ত-গোককে ত রহস্য হালে বেরোহিলেন মহীতোষবাবু। মাইনেও বে ডালো দিতেন সেটা তাড়িবাবুর জামাকাপড়, হাতের ঘড়ি, প্রশান্থনের জিনিসপত্র ইত্যাদি দেখলেই বোৱা যাব। সিগারেটটাও খেতেন বিলিতি, এই শাগ্গির বাজারে।

আজ সকাল থেকে আবার মেঝ করে আছে, তবে যাঁকি শুভে না। আনালা দিয়ে জগলেটা চোখে পড়তেই কেমন আর্দ্ধ গা ছব ছথ করে পড়ে। ফেলুনা সবেমাত্র বলেছে একবার মহীতোষবাবুর সঙ্গে দেখা ইওয়া উচিত, এমন সময় ঢাকুর এসে খবর দিল—নিচে ডাক পড়েছে। একটা জাঁপের আওয়াজ কিছুক্ষণ আগেই পেরেছিলাম। নিচে গিরে দেখলাম ইস্পেক্টর বিশ্বাস হাজির।

‘আপনি দুশ্শি ত?’ বিশ্বাস ফেলুনাকে দেখেই শুন্টটা করলেন।

‘কেন?’

‘একটা রহস্য পেরে গেলেন। এই বাড়ি থেকেই অন্ত নিয়ে গিরে তাড়িবাবুকে খন করা হয়েছে, সেটা ত আপনার কাছে একটা জোর খবর, তাই নয় কি?’

‘অন্ত দেই যানেই যে সেটা দিয়ে খন করা হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই আপনি মনে করেন না।’

‘আমি তা মনে করব কেন? কিন্তু আপনি তাই ভাবছেন না কি?’

দুজনেই বেশ ভুভাবে কথা বললেও বেশ যুক্তে পারাহিলাম

বে দুজনের মধ্যে একটা চাপা বেষারেবি চলেছে। কোনো দরকার ছিল না; মিস্টার বিশ্বাসই প্রথম ঠেস দিয়ে কথা বলেছেন। ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমি এখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাইনি। আর আপনি থাম মনে করেন বে আমি খুশি হয়েছি, তাহলে বলতে থাধ্য হব যে আপনার ধারণা ভুল। দূনের ব্যাপারে আমি কোনো দিনই খুশি না। বিশেষ করে তাঁড়িবাবুর মতো একজন বুদ্ধিমান লোক এত অল্প বয়সে এভাবে প্রাণ হারাবেন, এতে খুশি হবার কী আছে মিস্টার বিশ্বাস ?'

'বুদ্ধিমান লোক ?' বিশ্বাস ঠাট্টার স্বরে বললেন। 'বুদ্ধিমান লোকের অমন সাংতত্য হবে কেন যে রাত দুপুরে বাধের জগলে থাকে সফর করতে ? এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন আপনি, মিস্টার পিতৃ ?'

'পারি।'

আবর্তা ছাড়া ঘরে তিনজন লোক—মহীতোষবাবু, বিশ্বাস আর শশাঙ্কবাবু। তিনজনেই ফেলুদাৰ কথার যেন তটস্থ হয়ে ওৱ দিকে চাইল। ফেলুদা বলল, 'তাঁড়িবাবুর জগলে বাবাৰ একটা পরিষ্কার কালু ছিল।' এবাব ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিকে চাইল। 'আপনার সংকেতের মানে আমি বাব কৰেছি মহীতোষবাবু—তবে আপনারও আমে কৰেছিলেন তাঁড়ি সেনগুপ্ত। কাছেই বাঘচালটা খুরই প্রাপ্ত ছিল। আমাৰ বিশ্বাস উনি জগলে পিয়েছিলেন গুৰুত্বনেৰ সম্মানে।'

মহীতোষবাবু চোখ কপালে উঠে গেছে দেখে ফেলুদা তাকে প্ৰৱো ব্যাপারটা বুঝিবলৈ দিল। ফোকলা ফাঁকিৱেৰ পাছেৰ কথা শুনে মহীতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কই, ওৱকম কোনো গাছ আছে বলে ত জানি না।'

'কিন্তু আপনার দাদা যে বললেন হেলেবেলা আপনাৰা এখনে চড়াইভািত কৰতে দেতেন, আপনার ঠাকুৰদাদাৰ সঙ্গে ?'

'দাদা বললেন ?' মহীতোষবাবুৰ কথায় পরিষ্কার বাপ্পেৰ স্বৰ। 'দাদা থা বলেন তাৱ কড়টা সঁতি কড়টা কল্পনা তা আপনি জানেন ? আপনি ভুলে যাচ্ছেন বে দাদাৰ মাথাৰ চিক সেই।'

ফেলুদা চুপ কৰে গেল। দেবতোষবাবুৰ মাথাৰ ব্যাবাস নিৱে তাৱই আগন ভাইৱেৰ সঙ্গে সে কীভাবে তক্ক কৰবে ?

এদিকে মহীতোষবাবু কিন্তু বেশ ফ্যাকাশে হয়ে গোছেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'তাৱ থানে তাঁড়ি গুৰুত্বন নিৱে কলাভাৰতীৰ পালানোৰ হতলাৰ কৱাইল। হৱত আৰু ফিৱেও আসত না।

অখচ আমি এম কিছুই জানতে পারিনি।'

মিস্টার বিশ্বাস সোফ হেডে উঠে বাঁচ্চিরে বাঁ হাতের তেলোতে তান হাত দিয়ে একটা ঘূরি মেরে বললেন, 'শাক্ত তাহলে ভদ্রলোকের বনে যাবার একটা ক্যারণ পাওয়া গেল। এখানে জানা দরকার আতঙ্গীকে।'

'এই বাঁচ্চিরই লোক তাডে বোধহয় সম্মেহ নেই। আছে কি?' ফেল্দা একটা ধৌয়ার গ্রিং হেডে জিগ্যেস করল।

মিস্টার বিশ্বাস একটা বাঁকা হাসি হেসে চোখ দৃঢ়োকে ছোট ছোট করে বললেন, 'তা ত বটেই। তবে এ বাঁচ্চির লোক বলতে আপনি ও কিম্তু বাদ যাচ্ছন না, মিস্টার প্রিস্টল। আপনি নিজে জলোয়ারটা দেখেছিলেন। পটা হাত করার স্মরণ এ বাঁচ্চির অনা বাসিস্থাদের যেমন ছিল, তেমনি আপনারও ছিল। আপনি তড়িৎবাবুকে আগে থেকে জানতেন কি না, তার প্রতি আপনার কোনো আঙ্গোশ ছিল কি না, সে সব কিম্তু কিছুই জানা যায়নি।'

মিস্টার বিশ্বাসের কথার ফেল্দা আরেকটা ধৌয়ার গ্রিং হেডে বলল, 'কেবল দৃঢ়ো জিনিস সকলেই জানে। এক, আমি এখনে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি, এমনিতে আসার কথা ছিল না; দুই, তাঁচি-বাবু থে ছুরির আবাতে মরে থাকতে পারেন সেদিকে আমিই প্রথম দ্রষ্ট আকর্ষণ করি। নাহলে তাকে বাধের শিকার বলেই জালান্তে দেওয়া হচ্ছিল।'

মিস্টার বিশ্বাস এবার একটা হালকা হাসি হেসে বললেন, 'আপনি আমার কথাটা এত সিরিয়াসলি নিষ্কেত কেন? তব নেই, আমাদের লক্ষ্য আপনার দিকে নয়, অন্য দিকে।'

লক্ষ্য করলাম যে, কথাটা বলার পর বিশ্বাস আর প্রহীতোৎবাবুর ঘণ্যে, বাকে বলে দ্রষ্ট বিনিময়, সেরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল— বোধহয় এক সেকেণ্ডের জন। ফেল্দা বলল, 'আপনি কালকে যে কথাটা বলেছিলেন সেটা এখনে বলছেন কি?'

'কী কথা?' জিগ্যেস করলেন মিস্টার বিশ্বাস।

'আমি আমার ইচ্ছেমতো অনুসন্ধান চালিয়ে বেতে পারি ত?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কেবল আমার আর আপনার কাজটা ঝোপ না করলেই ভালো। কেউ কারুর বাধা স্পষ্ট করলেই কিম্তু হৃশিক্ষণ হবে।'

'সেটার বোধ ইয়ে কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি জলাসের দিকটা-তেই তদন্ত চালাবো প্রয়োগ। সে বাপারে বোধ ইয়ে আপনার খুব

একটা উৎসাহ নেই।'

'এনিষ্টিং ইউ লাইক'—বললেন মিস্টার বিশ্বাস।

এবার ফেল্দা মহীতোষবাবুর দিকে ফিরল।

'দেবতোষবাবুর সঙ্গে কথা বলে কোন ফজ হবে না বলছেন?'

মহীতোষবাবু 'অধৈর' হলেন কিনা জানি না, তবে মনে হল এক-বার যেন ওর চওড়া চোরাপের হাড়টা একটু শুক হল। পরম্পরাতেই আবার স্বাভাবিক হয়ে আস্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'দাদার শরীরটা কাল থেকে একটু বেশি ধারাপ হয়েছে। ওকে ডিস্টাৰ্ব' কুড়াটা ঠিক হবে না।'

ফেল্দা ছাইদানে সিগারেট ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে বলল, 'আমি ত আর অনিদিষ্টকাল আপনার অতিরিচ হয়ে আকতে পারি না, বা আকতে চাইও না। কালই আমাদের মেয়াদের শেষ দিন। আপনাকে বলেছিলাম একবার জগলে থেকে চাই। আপনি বাদি একটু মাথবলালকে বলে দেন, আর আপনার একটা জীপ...'

প্রটোর ব্যবস্থাই হয়ে গেল। এখন সাড়ে আটটা। ঠিক হল আমরা দশটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব। জগলে থোরার জন্য হান্টিং বুট ছিল আমার আর ফেল্দার; আমরা দুজনেই সেগুলো বার করে পরে নিলাম, বাদি ও জানি যে আমাকে ইয়ত জীপ থেকে নামতেই দেবে না। আমার ধারণা ছিল লালমোহনবাবু হয়ত নিজে থেকেই নামতে চাইবেন না, কিন্তু এখন লালমোহনবাবুর হাবভাব দেখে বেশ অবাক লাগল। বাথরুমে গিয়ে ধূতি ছেড়ে থাকি প্যাপ্ট পরে এলেন, আর বাস্তু থেকে একটা জবদস্ত বুট জুড়ো বার করে নিয়ে সেটা পরতে লাগলেন। ফেল্দা ব্যাপারটা শুধু একবার আড়চোখে দেখে নিল, ঘূর্খে কিছু বলল না।

'আজ্ঞা, বাথের চাহনি শুনেছি নাকি সাংবাদিক বাপার? সত্য নাকি মশাই?' বুট পায়ে দিয়ে মেঝের উপর মিলিটারি মেজাজে পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। ফেল্দা তৈরি হয়ে জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, এখন শুধু জীপ আর শিকানীর অপেক্ষা। সে লালমোহনবাবুর প্রশ্নের অবাবে বলল, 'তা ত বটেই; তবে শিকানীরা এটাও বলে বে বাধ নাকি মানুষকে ডুর পাব। একজন লোক বাধ দেখলে পরে তার চোখে চোখ কেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আকতে পারে, তাহলে বাধ নাকি উল্টো-ঘূর্খে ঘূরে চলে যায়। আর শুধু চাহনিতে যদি কাজ না দেয়, তাহলে হাত-পা ছাড়ে চেচাতে পারলেও নাকি একই ফজ হয়।'

‘কিন্তু ম্যানগাইর ?’

‘সেখানে আলাদা ব্যাপার ।’

‘তাই বল্লুন। কিন্তু তাহলে আপনি কে...?’

‘আমি বাঁচছ কেন? তার কানাখ দিনের কেলা থার বেরোবার সংক্ষাবনা আয় নেই বললেই চলে। বলি বেরোয় তার অন্য কম্বুক ত সংলেই থাকছে। আর তেমন বেঙাতিক হেঁকে জীপ ত রাখেইছে, উঠে পড়লেই হল।’

এর পরে জীপ আসার আগে লালমোহনবাবু শুধু একটা কথাই বলেছিলেন।

‘খনের ব্যাপারটা কিছুই বুকতে পারাই না মনাই। এফেনামে টোটাল ভার্কনেস।’

ফেল্দা বলল, ‘অস্বকারটা বাতে না দ্ব্র হয় তার অন্য চেষ্টা চলছে লালমোহনবাবু। সেই চেষ্টাকে বিকল করাই হবে আমাদের জন্য।’

॥ ১ ॥

বেধানে তাঁড়িবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, আমরা সেই-
খানে এসে দাঁড়িয়েছি। সেদিনও এই সমস্তটাতেই এসেছিলাম, কিন্তু
আজ কিছুক্ষণ হল যেখ কেটে গিয়ে রোদ ওঠার ফলে আলোটা অনেক
বেশি। এখানে এখানে পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ মাটিতে পড়েছে, আর
লক্ষ্য করছি সেদিনের জেরে পাখিও ডাকছে অনেক বেশি। লালমোহন-
বাবু, অবিশ্বাস যে কোনো পাখি ডেকে উঠেছে, সেটাকেই বাব কাছা-
কাছি ধাকায় লক্ষণ বলে মনে করছেন।

তাঁড়িবাবুর মৃতদেহ সকালে সরিয়ে নিয়ে থাওয়া হয়ে-
ছিল। কলকাতায় টেলিফোন করে খবর দেওয়াতে খুব বড় ভাই এসে-
ছিলেন, শেষ কর্তৃ তিনিই করে দিয়ে গেছেন। আজ আর সেই বাঁশ-
কাড়ির আশেপাশে সেদিনকার সাংঘাতিক ঘটনার কোনো চিহ্ন নেই।
কিন্তু তাও ফেলুদা অত্যন্ত ঘনোষোগ দিয়ে চারদিকের জমি পরীক্ষা
করছে। মাধবলালও ফেলুদার সঙ্গে কাজে লেগে গেছে। মনে হল বেশ
উৎসাহই পাচ্ছে। লোকটাকে যত দেখছি ততই ভালো লাগছে। চেহারা-
টাও বেশ। হাসলেই গালের দু' পাশে দুটো খুঁজ পড়ে, আর কুসুম না
কুচকালেও ঘুপালে পাঁচ-ছ'টা লাইন পড়েই আছে। জীবে আসতে
আসতে ও বলছিল, বনবিভাগ থেকে মানববৈকোন খবর ছাড়িয়ে পড়ার
পর থেকে এর মধ্যেই বেশ কয়েকজন শিকারী নাকি বাষটা মারার ইচ্ছা
প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে কার্সিয়াং-এর এক চা বাগানের মানেজার
মিল্টার সাপ্তু নাকি আজকালের মধ্যেই এসে পড়েছেন। সাপ্তু নামকরা
শিকারী, তেরাইয়ের জগালে নাকি এককালে অনেক বাব মেরেছেন।
মাধবলাল নিজেই অনেক বাব হরিণ বনে শুধোর ইত্যাদি মেরেছে,
তারই একটি গল্প মনে স্মরণ বলতে আবস্ত করেছে, এমন সময় ফেলুদা
ইঠাং বাঁশবাড়ির দিক থেকে তার নাম ধরে ডাক দিল। মাধবলাল
ব্যস্তভাবে এগিলে গেল ফেলুদার দিকে, তার পিছন পিচল
আমরাও। এটা বলা দরকার যে আমাদের দুজনের জীপ থেকে নামার
ব্যাপারে ফেলুদা আজ কোনো আপাত্য করেন।

ফেলুদা মাটিতে উব্দ হয়ে বসে একটা বাঁশের গোড়ার মিকে

চেষ্টে আছে।

‘দেখুন ত এটা কী ব্যাপার, ফেল্দু মাধবলালকে উপ্পেশ্য করে বললো,

মাধবলাল বুকে পড়ে এক বলক দেখেই বলল, ‘বুলেট লাগা থা।’

মাধবলালের পদবী দ্ববে, বাড়ি সাহেবসঞ্চার, কিন্তু বাংলা বুকতে বা বলতে কেনেৰ অসুবিধা হয় না।

বাঁশটোৱ গায়ে যে একটা ক্ষতিচ্ছ গৱেষে সেটা স্পষ্ট বোৱা আছে। লালমোহনবাবু অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন। ফেল্দুও যে অবাক সেটা বোৱাই আছে। বাৱ তিনেক অসহিষ্ণুভাৱে নিজেৰ হাতেৰ তলোয়াতে ঘূৰি ঘৰে বলল, ‘দাগটো পুরোন কি টাটকা সেটা বলতে পাৱেন?’

মাধবলাল বলল, ‘দিন দুয়োকেৰ বেশি পুরোন হত্তেই পাৱে না।’

‘ব্যাপারটো কী?...ব্যাপারটো কী?...’ ফেল্দু বিড়বিড় কৱে বলল, ‘বন্দুক...তলোয়াৰ...সব যে গুজগোল হয়ে আছে। তড়িৎ-বাবুকে আৱল তলোয়াৰেৰ খোঁচা, বাঘকে ধাৱল গুলি...সে গুলি ত আবার ঘনে হচ্ছে বাঘেৰ গায়ে লাগোনি। নাকি—’

মাধবলাল বাঁশকাড়েৰ নিচ খেকেই কী যেন কুড়িয়ে নিৱেছে। এমনি চোখে তালো দেখাই যাব না। কাহে গিৱে বুকতে পাৱলাম, ইঞ্চি দুয়োক লম্বা লম্বা ক্ষতকগুলো রোঁৰা।

‘বাঘেৰ গোম কি?’ বলল ফেল্দু।

‘বাঘেৰ গোম’, বলল মাধবলাল। ‘গুলি বাঘেৰ গা থেঁবে গিৱে ছিল বলে ঘনে হয়।’

‘আৱ তাই কি বাঘ আনিকটা মাস খেৱেই পালিৱেছিল?’

‘সেই ইকমই মালুম হচ্ছে।’

ফেল্দু দু-এক পা কৱে এপিয়ে বেতে শুরু কৱল। মাধবলালও হাতে বন্দুক নিৱে দৃঢ়িত সজাগ রেখে তাকে অনুসৰণ কৱল। আমৰা দুজনেৰ মাঝামাঝিৰ সবচেয়ে নিৱাপদ জাহাগোটা বেহে নিলাম। ফেল্দু-দাব পকেটে রিভলভাৱ আছে জানি, আৱ তাতে টোটোও ভৱা আছে। কিন্তু তাতে ত আৱ বাঘেৰ কিছু হবে না। পিছন থেকে একটা গাড়িৰ আওয়াজ শুনে বুকলাম, আমাদেৰ সঙ্গে সঙ্গে জাঁপটোও এসোছে। তাৰ ফলে বাবধান কিছুটা কমলেও জাঁপ আমাদেৰ কাহে আসতে পাৱবে না, কাৱল আমৰা রাস্তা ছেড়ে অশ্বলেৰ ডিতৰ চলে এসেছি।

মিনিট তিনেক এভাৱে হাঁটাৰ পৰি ফেল্দু হঠাৎ কী জানি দেখে

ভান দিকে কোণাকুণিভাবে দ্রুত পারে এগিয়ে গেল।

একটা কাঁটা বোপ। তার হাতে একটা কাপড়ের টুকরো আটকে রয়েছে। সবুজ কাপড়। নিম্নস্বেচ্ছে তাঁড়িবাবুর শাটের অংশ। মাধবলাল না বললেও আন্দাজ করেছিলাম, বাবু তাঁড়িবাবুকে মুখে করে নিয়ে যাবার সময় বোপের কাঁটার তাঁড়িবাবুর শাটের একটা অংশ ছিঁড়ে আটকে গিয়ে এই চিহ্ন রেখে গেছে।

এবার দেখলাম মাধবলাল আমাদের ছাঁড়িয়ে নিজেই এগিয়ে গেল। বুরলাম সে-ই এবার পথ দেখাবে, কারণ সে আন্দাজ করেছে বাবু কোন পথে এসেছিল। বোধ হয় আমাদের কথা ভেবেই মাধব-লাল ধীরে ধীরে এগোছে, কারণ চারদিকে কাঁটা বোপ।

সামনে একটা দেতুল গাছ। তার গুড়ির কাছ থেকে জরিটা ঢাল, হয়ে পিছন দিকে নেমে গেছে বোধ হয় সেখানটা শুকলো রয়েছে। মাধবলাল সেখানে পৌঁছে থেমে গেল, তার দ্রুষ্টি মাটির দিকে। আমরাও এগিয়ে গেলাম।

যদিও এ জিনিসটা এর আগে কোনোদিন দেখিনি, তাও বুরতে অস্বিধা হল না যে, আমরা বাঘের পারের ছাপ দেখছি। আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই দিকেই গেছে ছাপগুলো।

কাঁপা ফিসফিসে গলায় লালমোহনবাবুর প্রশ্ন এল, 'একি দু-পেঁয়ে বাঘ নাকি মশাই ?'

মাধবলাল হেসে উঠল। ফেল্দা বলল, 'এইভাবেই বাঘ হাঁটে। সামনের পা আর পিছনের পা ঠিক একই জায়গায় ফেলে, তাই মনে হয় দু' পায়ে হাঁটছে।'

মাধবলাল এগিয়ে রাখেছে, আমরা তার পিছনে। জাঁপের আও-মাঝ আর পাছি না। বোধ হয় হাল হেঢ়ে দিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। একটা নালা জাতীয় কিছু আছে বোধ হয়, কাছাকাছির মধ্যে। লালমোহনবাবুর নতুন বুটো প্রথম দিকে বস্ত বেশী মচ মচ শব্দ করছিল, তাতে ফেল্দা হন্তব্য করেছিল, সেটা নাকি মানবটারের কৌতুহল উদ্দেশ করার পক্ষে আইডিয়াল, কিন্তু এখন কাদায় ভিজে আওয়াজটা প্রায় মরে এসেছে।

একটা শিমুল গাছ পেরিয়ে করেক পা ষেতেই মাধবলাল আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপকা পাস ট্রিভুলভার হ্যায় না ?'

এবার আমাদে, চোখ গেল হাত বিশেক দ্বারে সামনের ঘাসের দিকে। ঘাসগুলো জিরে কী যেন একটা জিনিস এগিয়ে আসছে।

‘জেই’, বলল মাধবলাল।

নামটা জানি। অসম্ভব বিবরণ সাপ।

এবার সাপটাকে দেখতে পেলাম। ছুলা ধারিয়ে স্থির হয়ে আসের উপর দিয়ে আধাটা জুলে আমাদের দেখছে। ফল নেই। সারা গায়ে ইজদে আর কালো ডোরা।

ফেলুন্দা যে কখন রিভলভারটা আর করল টেরই পেলাম না। ইঠাই একটা কানফাটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সাপের আধাটা দেখতে গোল। আরেকটা গুলি। এবার সব স্থির। গাছ থেকে পাখি ডেকে উঠেছে। দূরে আরেকটা গাছ থেকে বাদুরের কিচির মিচির। মাধবলাল শব্দ বলল, ‘শাবাস’, আর লালমোহনবাবু হাঁচি হাসি আপ ক্যাশ মিলিয়ে একটা অস্তুত ক্ষম করে একদম চূপ হৈবে গেলেন।

ফেলুন্দা বী দিকে বাছে দেখে মাধবলাল বাবল করল। বলল, ওদিকে একটা নালা আছে, সেটা পেতুরালেই নাকি একটা উঁচু পাখুরে চিবি আর অনেকগুলো বড় বড় পাথরের চাঁই। ওখানে নাকি বাবের বিশ্বামীর খুব ভালো আছে গা রয়েছে, কাজেই ওদিকটার ধাওয়া খুব নিয়াপদ নয়। অগত্যা ফেলুন্দা মাধবলালের নিম্নেশ হতো সোজাই চলল।

বন যে সব জায়গায় সমান ঘন তা নয়। বী দিকে চাইলেই বোকা ধাই ওদিকে নালা আকার দুর্বল বন পাতলা হয়ে গেছে। আনোয়ারের মধ্যে এক বাদুরই দেখা বাছে মাঝে মাঝে—ল্যাঙ্গ পাঁকিরে গাছের ডাল থেকে দোল থাছে, এসাহ থেকে ওগাছে দিবি লাফিয়ে চলে থাছে, আর আমাদের দেখলে দাঁত খিঁচাছে।

ফেলুন্দা নিচয়েই আশা করছিল যে, আরো অনুসন্ধান করলে আরো কিছু পাবে, কিন্তু এখারে পাওয়াটা জুটে গেল লালমোহন-বাবুর কপালে। লালমোহনবাবুর ব্যটের টোকর খে়ে একটা জিনিস ছিটকে প্রায় দশ হাত দূরে গিয়ে পড়তেই আমাদের চোখ সেদিকে দেল :

একটা গাঢ় ব্রাউন রঙের চামড়ার মানিব্যাগ : ফেলুন্দা সেটা খুলতেই তার ভিতর থেকে দৃঢ়টা একশো টাকার নোট আর বেশ কিছু অনা ছোট ছোট নোট বেরিয়ে পড়ল। এসব ছিল বড় খাপটায়। অন্য খাপ থেকে কয়েকটা বড় চটে ধাওয়া কুড়ি পয়সার ডাকটিকিট, দু-একটা ক্যাশ যেমো আর একটা ওখাদের প্রেসকিপশন বেরোল। ব্যন্টকে ডিঙে বাগটায় অবস্থা বেশ শোচনীয় হলেও নোটশুলো এখনো দিবি ব্যবহার করা চলে।

ফেলুদা সব জিনিস আবার ব্যাপের মধ্যে পুরে ব্যাপটা শার্টের বৃক্ষকেটে ঢুকিয়ে নিল।

আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

এদিকটাৰ জগতে বেশ কুন হৈবে উঠেছে। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল গাছ, মাৰে মাৰে অন্য গাছ—সেগুন, শিমুল, আঘ, কঠাই, ছাতিম। অজ্ঞন গাছও রঁজেছে এখানে দেখানে। আমি জানি ফেলুদা সেগুনোৱ দিকে বিশেষভাৱে চোখ রাখছে, আৱ এও জানি যে অজ্ঞনোৱ কাছাকাছি কেনো তাল গাছ এখনো পৰ্যন্ত চোখে পড়েনি। মাধবলাল এৱেই মধ্যে এক ফাঁকে পকেট ধৈকে একটা দুরি আৱ কৰে দৃঢ়ো গাছেৱ ডাল কেটে আমাকে আৱ সাজমোহনবাৰুকে দিয়েছে; আমরা সেগুনো জাঠি হিসাবে ব্যবহাৱ কৰাইছি। ফেলুদা হাঁটিতে হাঁটিতেই মাধবলালকে প্ৰশ্ন কৰল, ‘বাবেৱ পাবেৱ ছাপ দেখে যাৰ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যাব, তাই না?’

মাধবলাল বলল, ‘হ্যাঁ, এটাকে বেশ বড় বাব বলেই তো মনে হৈ।’

আমি মনে থনে ভাৰছিলাম—একটা আস্তু মানুষেৱ লাশ মুখে কৰে বাবটা এতখানি পথ এসেছে, তাৱ মানে, কৈ সাংঘাতিক পাঁজি বাবেৱ! অবিশ্য মানুষেৱ আৱ কৈই বা ওজন। গুৰু ঘোষ মেৰেও ত শুনেছি বাব গুইভাবেই মুখে কৰে নালাটোলা লাঘিৰে ডিঙিয়ে মাইলেৱ পৰ মাইল পথ চলে দাব। যহীতোষবাৰুৰ বইয়েতেই নাকি আছে বে বাবেৱ ছাল ছাড়ালেই দেখা যাব ভিতৰে কৈবল মাস্ল আৱ মাস্ল।

ফেলুদা এবাব আৱেকটা প্ৰশ্ন কৰল মাধবলালকে।

‘যহীতোষবাৰু এ জগতে কখনো শিকার কৰেননি। তাই না?’

মাধবলাল বলল, যহীতোষবাৰুৰ কুসম্পকাৰেৱ কথাটা সে জানে। তবে এৱেকদিন কুসম্পকাৰ নাকি অনেক শিকাৰীৰ মধোই দেখা যাব। ‘আমাৱ নিজেৱ নেই’, মাধবলাল বলল, ‘তবে আমাৱ বাবাৱ ছিল। জোয়ান বজাসে একবাৱ বাব মাৰতে বাবাৱ আগে হাতে বিছুটি সেগুনুল, আৱ সেইদিনই একটা প্রায় দশ ফুট লম্বা বাবকে বন্দুকেৱ এক গুলিতে ঘাৱেল কৰেছিলোন। সেই বেকে বাব মাৰতে বাবাৱ আগে হাতে বিছুটি ঘৰে নিতেন।’

ফেলুদা বলল, ‘কৰবেট সাহেবেৰও কুসম্পকাৰ ছিল। যানইটাৰ মাৰতে বাবাৱ দিন সকালে একটা সাপ দেখলে তাৱ মনটা পুৰণ হৈবে দেত।’

মহীতোষবাবুর বাপ-ঠাকুরদা দুজনেই এ জগতে বাবের হাতে প্রাপ দেন, কাজেই মহীতোষবাবুর পক্ষে এখানে শিকার করায় আপনিটো খুব স্বাভাবিক।

আমরা মাধবলালের পিছন প্রায় কুড়ি দিনটি ধরে হাঁটার পর ফেলুন্দা আসলে যে জিনিসটা ধোঁজার জন্য এসেছিল, সেটা পেরে গেল। হালকা বেগুনী রঙের ছোট ছোট ফুলে ভরা একটা বোপের ধরে পড়ে আছে, তার পাথরমানো হাতলটা খালি দেখা আছে, ইস্পাতের অংশটা বোপে ঢাকা।

আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার।

জিনিসটা চোখে পড়তেই ফেলুন্দা প্রায় বাবের মতোই নিখিলে কাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারটা মাটি থেকে তুলে নিল।

খুব মন দিয়ে দেখলে বোধ যাব তলোয়ারের ডগার এখনো খরেরি রঙের রঙের মাগ।

ফেলুন্দা তলোয়ারটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ঘূরিয়ে দেখে বলল, 'তার মানে খনের জাহাগুটা এর চেয়ে খুব বেশি দ্রু নহ। আরো একটু এগোন যাব কি, মাধবলালজি ?'

মাধবলাল বলল, 'আর একশো গজ গোলে ত মিস্ট্রি পড়বে।' 'কী মিস্ট্রি ?'

'এখানে বলে কাটা ঠাকুরানীর মিস্ট্রি। কিন্তব্যে কিছু নেই। শুধু দালানটা ভাঙচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।'

কাটা ঠাকুরানীর মিস্ট্রির কথা কালই বিকেলে শুনেছি। দেবতোষবাবুর কাছে। ওবই পশ্চিমে যোকলা ফুকিবের গাছ।

ফেলুন্দা আর কিছু না বলে এগিয়ে চলল, তার হাতে আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার। দেখে মনে হয় সেও যেন শের শা-র মতোই তলোয়ার হাতে যাব মারতে চলেছে।

কাটা ঠাকুরানীর মিস্ট্রি যে বহুকালের পুরোন সেটা দৈবসেই বোধ যাব। তার ফাটল থেকে অশুধ গাছের চারা বোরিয়েছে। তার মাথাটাকে পাশের একটা বটগাছের ঝুঁতি নেয়ে আঁকড়ে ধরে পিষে যেন তার প্রাপটাকে বের করে দিয়েছে। ফেলুন্দা কিন্তু মিস্ট্রির দিকে দেখছিলই না। তার চোখ চলে গেছে মিস্ট্রির ডানদিকে। প্রায় বিশ হাত দ্রু একটা সত্তাই বুঝো প্রকান্ড অশুধ পাই শুকনো ডালপালা যেলে দাঁড়িয়ে আছে। গাছে পাতা প্রায় নেই। বললেই চলে। যেটা আছে সেটা হল মাটি থেকে প্রায় এক মানুষ উচ্চতে একটা ফোকর।

ফেলুন্দার পিছন পিছন আমরা ও প্রায় নিষ্পাস বন্ধ করে গাছটার

দিকে এগিয়ে যেতে ভয়ে ফোকরের চারিদিক ঘিরে গাছের গারের হোপছাপ এবং ক্ষেবড়ো শিমা উপশিমা সব মিলিয়ে একটা দাঢ়ি-ওয়ালা বুড়োর চেহারা আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দাঢ়িটা গাছেরেছে যেন ফোকরের ঠিক নিচে। হাঁ কয়া ফোকলা বুড়োর সুন্দে আশ্চর্য মিল।

ফেলুদার দৃষ্টি আবার ঘুরে গেল।

‘ওই দিকটা উভয় দিক কি?’ ফেলুদা জিগোস করল মাধবলালকে।

‘হ্যাঁ—ওটাই উভয়।’

‘হতেই হবে। ওই ত অর্জুন গাহ। আব ওই যে জোড়া তাম।’

অবাক হয়ে মেখলাম সরকেতের নির্দেশের সঙ্গে সব ইন্দুর মিলে যাচ্ছে।

‘পশ্চায় হাতেই হবে। মেখানেও কুল নেই’, বলে ফেলুদা অর্জুন গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

গাছটার কাছে পৌঁছে জোড়া তাম গাহ দক্ষ করে থানিক দূরে এসোতেই একটা বোপড়ার পিছুরে জলকাদার ভরা একটা বেশ বাড় গত’ চোখে পড়ল। স্পষ্ট বোধ যাচ্ছে গত’টা এই করেকদিন আগেই খোঁড়া হয়েছে।

আব এটাও বোধ যাচ্ছে যে তার ভিতর থেকে একটা হাঁড়িটাড়ি গোছের জিনিস বার করে নেওয়া হয়েছে।

‘গৃষ্টধন হাওয়া?’ লালমোহনবাবু এই প্রশ্ন গলা চাঁড়য়ে কথা বললেন।

ফেলুদার মূখের ভাব ধূমধূমে। এটাকে অবিশ্য নতুন কোনো রহস্য বলা জলে না। বোঁকাই যাচ্ছে তাড়িব্যাবুকে যে খুন করেছে সেই গৃষ্টধন হাত করেছে। ফেলুদা তবুও গর্তের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, ‘তোরা একটু জিরিয়ে নে। আমি আশপাশটা একটু সার্কে করে নিজিছ।’

সাতা বলতে কি, একক্ষণ পা টিপে কাঁটা বাঁচিয়ে জগলে হেঁটে বেশ ক্রান্ত লাগছিল, তাই আমি আব লালমোহনবাবু বিশ্রামের একটা স্থায়োগ পেয়ে থাকিয়ে হলাম। ফোকলা ফুকিবের তলায় একটা শুকনো আঁশগা বেছে আমরা মাটিতেই বসলাম, আব মাধবলাল গাছের গৈড়তে বন্দুকটাকে হেলান দিয়ে দাঢ়ি করিয়ে আমাদের সামনে বসে তার ডেরো বছর বগমে সে ভালুকের আনন্দণ থেকে কীভাবে উঞ্চার পেয়েছিল সেই গল্প বলতে লাগল। আমার

মন কিম্বু পুরোপুরি গল্পের দিকে যাচ্ছে না, কাবুল একটা জোখ অয়েছে ফেল্দুমার দিকে। সে ঠোঁটের ফাঁকে একটা টাটকা ধরানো চার-ধিনার নিয়ে মান্দরের চারপাশটা সাতে করছে। একবার ঘনে হল একটা সিগারেটের টুকরো তুলে নিয়ে আবার সেটাকে ফেলে দিল। আরেকবার হাঁটু গেড়ে বসে কোমরটাকে ভাঁজ করে শায় মাটিতে লাক টেকিয়ে কৌ দেন দেখল।

শায় দশ মিনিট ধরে তা করে চারিদিকে সাতে করে ফেল্দুমা মান্দরের ভেতর ঢুকল। ধনী সাহস ফেল্দুমা র। বাইরের খেকে মান্দরের ভেতরটা অন্ধকাপের ঘতো মনে হল। এককালে নাকি দশকুকুর শ্রতি ছিল, কালাপাহাড়ের দোলতে সে শ্রতির মাথা, চারটে হাত আৱ পেটের ধানিকটা কাটা থার। সেই খেকে মান্দরের নাম হয়ে থায় পেটকাটি বা কাটা ঠাকুরানীর মান্দর। এখন ওঁর ভিতরে নির্ধার সাপ, তক্ক আৱ গিরগিটিৰ থাসা। তাও ফেল্দুমা নির্বিকারে মান্দরের ভিতর ঢুকে সাতে করে মিনিটখানেক পৰে বেরিয়ে এসে রহস্যজনকভাৱে বলল, 'তাঙ্গৰ ক্যাপার। আলো পেতে হলে যে অস্থকাবে প্ৰবেশ কৰতে হল তা এই প্ৰথম জানলাব।'

'কৌ মশাই, ডাক'নেস গন?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

'ধানিকটা', বলল ফেল্দুমা, 'আমাৰস্যাৰ পৰি প্ৰতিপদেৰ চাঁদ বলতে পাৱেন।'

'তাহলে ত ষোলকলা পুৱেতে এখনো অনেকদিন মশাই।'

'আপনি শুধু চাঁদেৱ কথা ভাবছেন কেন? সূৰ্য বলেও ত একটা জিনিস আছে। রাতটা কেটে গেলেই ত তাৰ দেখা পাওয়াৰ কথা।'

'কালাই, তাৰ থানে, ক্লাইম্যাৰ বলছেন?'

'আৰ্য আৱ কিছুই বলাই না লালমোহনবাবু, শুধু বলাই বৈ এই প্ৰথম একটা আলোৱ আভাস দেখতে পাইছ। চ তেঁপদে, বাঁচ্ছি চ।'

১১০॥

আমরা বেরিয়েছিলাম দশটাই, ফিরতে ফিরতে হল প্রাম সাড়ে বারোটা। ফেল্দুদা তলোয়ারটা সোজা মহীতোষবাবুর হাতে তুলে দেবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু এসে শুনলাম উনি আর শশাঙ্ক-বাবু বেরিয়ে গেছেন। বনবিভাগের বড় কর্তা নাকি এসে কালবন্দি-ফ্রেস্ট বাঁলোতে রয়েছেন, সেখানেই গেছেন। কাজেই তলোয়ারটা এখন আমাদের ঘরে, আমাদেরই কাছে।

ঘরে আসার আগে অবিশ্য আমরা একতলার কিছুটা সময় কাটিয়ে এসেছি। ফেল্দুদার মাথার কী যেন ধূরাইল; ও দোতলার না গিরে সোজা চলে গেল ট্রোফি রুমে। সেই ষেখানে আনোয়ারের ছল আর মাথাগুলো রয়েছে, আর রাকে রাখা রয়েছে বন্দুকগুলো। ফেল্দুদা রাক থেকে একটা একটা করে বন্দুক নাখিয়ে সেগুলো থ্ব থন দিয়ে দেখল। বন্দুকের নল, বন্দুকের বাটি, বন্দুকের পিংগার, সেফটি ক্যাচ—প্রত্যেকটা জিনিস ও থ্ব থন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। লালযোহনবাবু কী যেন একটা বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফেল্দুদা তাকে ধমকে ধামিয়ে দিল।

‘এখন কথা বলার সময় নয় লালযোহনবাবু, এখন চিন্তা করার সময়।’

লালযোহনবাবু এতদিনে ফেল্দুদার প্রতিগতি থ্ব ডালোভাবেই জৈনে গেছেন, তাই আর স্বিতীয়বার ম্থ থ্ব লুলেন না।

দোতলার উঠে বারান্দা দিয়ে আমাদের ঘরের দিকে ষেতে ফেল্দুদা থমকে থেমে গেল। তার ম্র্ত্যু দেবতোষবাবুর ঘরের দিকে।

‘সৈকি, দাদার ঘরে তালা কেন?’

সাতিই ত! ভদ্রলোক স্ব হেড়ে গেলেন কোথায়? আর তালা সমগ্রে যাবারই বা কারণটা কী?

ফেল্দুদা কী ভাবল জ্ঞান না। যথে কিছুই বলল না। আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ফেল্দুদার এবন্দকার অবস্থাটা আমার থ্ব চেনা। জটিল ইহসোর অট ছাড়নোর প্রথম অবস্থার ওয় ভাবটা এরকমই হয়। দু’ মিনিট

ভুরু কুঁচকে চূপ করে বসে থেকেই আবার উঠে মাড়াল, তারপর ধানিকটা পাখচারি করে আবার হঠাত দাঁড়িয়ে পড়ে আবা হেট করে চোখ বুজে ডান হাতের মাঝের আঙুলের ডগা দিয়ে কপালে আস্ত আস্ত টোকা আরা, তারপর আবার হাঁটা, আবার বসা—এই রকম আর কি। এইভাবেই একবার খাট ছেড়ে উঠে পাখচারি শুরু করে হঠাত থেমে গিয়ে বলল, 'কেউ যখন নেই, আর দেবতোষবাবুর ঘর যখন বাখ, তখন এই ফাঁকে একটু চোরা অনুসন্ধান চালালে বোধহয় ফন্দ হয় না।'

কথাটা বলে ফেলুন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি দরজা দিয়ে গলা বাঁড়িয়ে দেখলাম, ও এদিক ওদিক দেখে হাঁটোষবাবুর কাজের ঘরে ঢুকল।

বাবের পায়ের ছাপ দেখে অবধি লালমোহনবাবুর সাহস অনেকটা বেড়ে গেছে। উনি এখন দিবিয বাঘছাটার উপর চিত হয়ে শুয়ে বাবের আধ্যাটা বালিশের মতো যাবহার করছেন। এইভাবে কিছুক্ষণ সিলিং-এর দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'কী শ্বভক্ষণেই বইটা মহী-তোষবাবুকে উৎসর্গ করেছিলাম বল ত। এমন একটা শিলিং অভিজ্ঞতা কি না হলে হত? আজ সকালের কথাটাই চিন্তা কর—বাঁশের ভেতর ব্লেট, ঘাসের মধ্যে সাপ, রংবেল বেগালের পায়ের ছাপ, শোড়ো মানিদুর, গুপ্তথম, জরাগ্রস্ত অশথ গাছ—আর কত চাই? এখন এক-বারটি ম্যানচিটারের মুখ্যোমুখ্য পড়তে পারলেই অভিজ্ঞতা কর্মসূচী।'

'শেষেরটা কি সাতা করেই চাইছেন আপনি?' আবি জিগ্যেস করলাম।

'আর ভয় নেই', একটা বিগাট হাই ভুলে বললেন লালমোহনবাবু, 'মাধবলাল শিকারী আর ফেলু মিসির শিকারী দু'পাশে থাকলে মানুষখেকের বাপের সামান নেই কিছু করে।'

লালমোহনবাবু প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আর আমি হাঁটোষবাবুর শিকারের বইটা গড়ছিলাম, এমন সময় ফেলুন্দা ফিরে এল।

'কিছু পেলেন?' .

ফেলুন্দার পায়ের আওয়াজ পেরেই লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসেছেন।

ফেলুন্দা গম্ভীর। বলল, 'যা খুজছিলাম তা পাইনি, আর সেটাই সিগনিফিক্যান্ট।'

তারপর কিছুক্ষণ চূপ করে জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা মাটিতে ঠেকল কেন জানেন ত

লালমোহনবাবু ?

‘সেই অশ্বত্থায়া হত ইতি গুরু-র ব্যাপার ত ?’

‘হাঁ। বৃথিষ্ঠির পুরোপুরি সত্য কথা বলেননি তাই। কিন্তু আজকের দিনে মিথ্যে বললেই যে চাকচ মাটিতে ঠেকে যাবে এমন কোনো কথা নেই। এ বৃগু মানবের দোষের শাস্তি মানবই সিংড়ে পারে, ডগবান নয়।’

এর পরে একটা জীপের আওয়াজ পাওয়ার কিছু ক্ষণ পরেই চাকচ এসে থবর দিল যে, ভাত বাড়া হয়েছে, বাবু এসেছেন, খেতে ভাকছেন।

মহীতোষবাবুর বাড়িতে খাওয়াটা ভালোই হয়। সব সময় হয়ে বিনাজানি না, কিন্তু আমরা যে ক’দিন রয়েছি সে ক’দিন রোজই মুরগি হয়েছে। কাল রাতে বিলিংতি কামদায় যোস্ট হয়েছিল, লালমোহনবাবু কঠিটা চামচ ম্যানেজ করতে পারছেন না দেখে মহীতোষবাবু বললেন যে, পাখির মাংস হাত দিয়ে খেলে নাকি কেতার কোনো ভুল হয় না। আজকেও খাওয়ার তোড়জোড় ভালোই ছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই কথাবার্তা এমন গুরুগুম্ভীর ঘেজাজে শুন্দ হল যে খাওয়ার দিকে বেশ নজর দেওয়া হল না। আমরা খাবার ঘরে ঢুকতেই মহীতোষবাবু বললেন, ‘মিস্টার মিশির, সংকেতের ব্যাপারটা যখন চুক্তেই গেছে, তখন ত আর আপনাদের এখানে ঘরে রাখার কোনো মানে হয় না। কাজেই আপনি যদি বলেন তাহলে আপনাদের ছেরার বস্তু আমার লোক করে দিতে পারে। জলপাইগুড়িতে লোক যাচ্ছে, “আপনাদের রিজার্ভশনটা করে আনতে পারে।”

ফেল্দুদা করেক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, ‘আমাদের দিক থেকেও আপনার আতিথেরতার সুযোগ আর নেবো না বলেই ভাবিছিলাম। তবে আপনার বাদি খুব বেশ আপনি না থাকে তাহলে আজকের দিনটা থেকে কাল রওনা হতে পারি। বুরতেই ত পারছেন, আমি শোরেন্দা মানব, আমি থাকতে থাকতে একজন এড়াবে খুন হলেন, তার একটা কিনারা না করে যেতে পারলে মনটা ঝুঁতখুঁত করবে। আমি ই কারি, যি প্রিলিশই করুক, কীভাবে ঘটনাটা ঘটল সেটা জেনে যেতে পারলে ভাল হত।’

মহীতোষবাবু খাওয়া বল্থ করে ফেল্দুদার দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘সুস্থ মন্ত্রকে খুন করতে পারে এমন লোক আমার বাড়িতে কেউ নেই। মিস্টার মিশির।

ফেল্দুদা খেন কথাটা গায়েই করল না। বলল, ‘আপনার দাদাকে কি অন্য কোথাও নিয়ে খাওয়া হয়েছে? খুব ঘরে ভালা মের্বাছিলাম।’

মহীতোষবাব্দ, সেইরকম গম্ভীরভাবেই বললেন, 'দাসা করেই আছেন। তবে কাল রাত থেকে তাঁর একটু বাড়াবাঁড়ি যাচ্ছে। ওখে থাননি। তাই তাঁকে একটু সংস্কৃত করে রাখা দরকার। নইলে আপনাদেরও বিপদ আসতে পারে। আপনারাও ত মোতলাতেই থাকেন। উনি বাইরের লোককে এমনিতেই সন্দেহের চোখে দেখেন। শুধু তাই না, যে সব ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে তাঁর মনে বিরূপ ভাব আছে, বাইরের লোককে সেইসব চরিত্র বা তাদের অনুচ্ছে বলে কল্পনা করেন। তাড়িৎতে ত কালাপাহাড় ভেবে একদিন ওর টুটি টিপে ধরেছিলেন। শেষটায় মন্তব্য গিয়ে কোনোমতে ছাড়ার।'

ফেল্দুমা থাওয়া না থামিয়ে দিবা স্বাভাবিকভাবে বলল, 'তাড়িৎবাবুর খন ইওয়াটাই কিম্বু একজ্যো ঘটনা নয়। আপনার গুণ্ঠনও কে যেন সারিয়ে ফেলেছে। খুব সম্ভবত সেই একই রাত্নে।'

'সে কি!'—এবার মহীতোষবাব্দের মুখের গ্রাম আর খুব পর্যন্ত পেঁচাল না—গুণ্ঠন নেই? আপনি দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। গুণ্ঠন নেই, তবে তলোয়ারটা পাওয়া গেছে। আর তাকে অন্তের দাগও পাওয়া গেছে।'

মহীতোষবাব্দ বেশ কিছুক্ষণ হতক্ষম হলে বসে রইলেন। এবার ফেল্দুমা তার তৃতীয় বোয়াটা দাগল।

'তাড়িৎবাবুকে বখন বাঁশে থাচ্ছিল, তখন সেই বাঘের দিকে তাপ করে কেউ একটা গুলি ছোড়ে। সেটা বাঁশের গুড়িতে লাগে। গুলিটা সম্ভবত বাঘের গাঘে গিয়েছিল, কানিপ বাঘের কিছু লোম পাওয়া গেছে, ঘাটিতে পড়ে ছিল। কাজেই মনে হচ্ছে সে রাত্নে বেশ করেক-জন লোক বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে জঙ্গলের একটা বিশেব অঞ্চল থোকাফেরা করছিল।'

'পোচার!'

কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে থলে উঠলেন শশাঙ্কবাব্দ। পোচার মানে যে চোরা শিক্কারী সেটা জানতাম। শিকারের বিরুদ্ধে আইন পাল ইবার পরেও এরা লুকিয়ে লুকিয়ে শিকার করে বাঘের চামড়া, হাঁয়িপের সিং, গণ্ডারের সিং, এইসব বিত্ত করে। এমন কি ধীর-ভজ্জনকের বাজ্জা ধরেও মাঝে মাঝে বিত্ত করে।

শশাঙ্কবাব্দ বলে চললেন, 'তাড়িৎকে বৈ-ই খন করে থাকুক, তাকে বাবে ধরে নিয়ে যাবার পর জঙ্গলে নিশ্চয়ই কোনো পোচার যোকে। পোচারই বাঘটাকে গুলি করেছিল, যে গুলি বাঘের গায়ে আঁচড় কেটে বাঁশের গুড়িতে লেগেছিল।'

ফেলুদ্দা ধৌরে ধৌরে মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা অবিশ্য অসম্ভব নয়। কাজেই বন্দুকের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের না ভাবলেও চলবে। কিন্তু অন্য দুটো রহস্য রয়েই থাক্কে।'

'দুটো নয়, একটা', বললেন মহীতোষবাবু। 'গুরুত্বন। ওটা পাওয়া দরকার। ওটা না পেলে সিংহরাম বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওটা পেতেই হবে।'

'তাহলে এক কাঙ করুন না কেন', ফেলুদ্দা বলল, 'আমরা সবাই চলুন আরেকটিবার শুধুনে থাই। জায়গাটা হল কাটা ঠাকুরানীর ঘন্টাগ্রের পাশে।'

* * *

মহীতোষবাবু জগল অভিষ্ঠানে আপন্তি করেননি। কিন্তু হলে কী হবে, বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে চারিদিক অন্ধকার করে ঘূর্ণন-ধারে বৃষ্টি নামল। সম্মে ছ'টা পর্বত মধ্য সে বৃষ্টি ধামল না, তখন আমরা জগলে যাবার আশা তাগ করলাম। ফেলুদ্দা গম্ভীর থেকে এখন একবারে শোমড়া হয়ে গেছে। মহীতোষবাবু যে আমরা চলে গেলে খুশ হন সেটা শীর কথায় পরিষ্কার বোৰা গেছে। কালও যদি খারাপ থাকে তাহলে হয়ত ফেলুদ্দাকে তড়িৎবাবুর খনের রহস্য সমাধান না করেই চলে যেতে হবে। অবিশ্য আরেকবার কাটা ঠাকুরানীর ঘন্টাগ্রে গেলেই যে ফেলুদ্দার মনের অন্ধকার কীভাবে দূর হবে তা জানি না। তবে ও বে মনে মনে ধানিকটা অগ্রসর হয়েছে সেটা ওর চোখ মাকে যেভাবে জগলে উঠেছিল তা থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

এর মধ্যে আমরা তিনজনেই একবার যাইবের বারাস্দাগ বেরিয়ে-ছিলাম। তখন শ্যাম্ভুদার কুকে সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। তখনও দেখলাম দেবতোষবাবুর ঘরের দরজা বন্ধ। লালমোহনবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'একবার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে এসে হত না ভুমলোক কী করছেন! এ জ্ঞানটে ত কেউ সেই বলেই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদ্দা অবিশ্য লালমোহনবাবুর অনেক কথায় অভোই এটা-তেও কান দিল না।

সাতটাৰ সময় মেঘ কেঁচে পিয়ে আকাশে তারা দেখা দিল। মনে হচ্ছিল কুচকুচে কালো আকাশের গায়ে তরাগুলো এই মাছ পালিশ করে বাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেলুদ্দা হাতে জলোয়ার নিয়ে থাটে বসে আছে। আমরা দু'জনে সবে জানাপার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় লালমোহনবাবু আমার শাটের আস্তিনটা খামচে ধৰে

ফিসফিস গলায় বললেন, 'সবু টর্চ !'

দারোঝানের বাঁড়ো আমাদের জ্ঞানালা থেকে দেখা যাব। আমাদের বাঁড়ি আর ওর বাঁড়ির মাঝামাঝি একটা গোল্প গাছ। তার নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটা টর্চওয়ালা লোক সেই লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। এটা সেই ধরনের টর্চ বেগুলো বাঁড়ির পাগ পরেন্টে গুঁজে দিলে চার্জ হয়ে থাকে। হোট বালব, হোট কাচের মুখ, কিন্তু আলোর বেশ তজ্জ্বল।

এবাব ফেলুদা ঘরের বাঁতুটা নিজিয়ে দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

'ঘাধবলাল', ফেলুদা ফিসফিস করে বলল।

বে লোকটা অপেক্ষা করছিল তাকে আমারও ঘাধবলাল বলে মনে হয়েছিল, কারণ এই অন্ধকারেও হলদে শার্টের ইঞ্জটা আবছা আবছা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু যে লোকটার হাতে টর্চ সে যে কে তা বোঝা ভারি মুশ্কিল। সে মহীতোষবাবুও হতে পারে, ওঁর দাদাও হতে পারে, শশাঙ্কবাবুও হতে পারে, আবাব অন্য লোকও হতে পারে।

এখন টর্চের আলো নিভে গেছে। কিন্তু দ্রুতে দাঁড়িয়ে যে খুব নৌচু গলায় কথা বলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ পরে হলদে শার্টটা নড়ে উঠল। তারপর টর্চের আলোটা জললে উঠে আমাদের বাঁড়ির দিকে ছল এল। ফেলুদা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘরের বাঁতুটা ঝরালিয়ে দিল।

জালমোহনবাবু বোধহয় নিজেই নিজের মনের মতো করে গোয়েন্দাগিরি চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই তিনি হঠাৎ এক ফাঁকে বাইস্পোর বেরিয়ে কী জানি দেখে এলেন।

'কী দেখলেন ? দুরজ্যায় এখনো ডালা ?' ফেলুদা জিগোস করল।

'হ্যাঁ !' জালমোহনবাবু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন।

'আপনার কি ধারণা উনিই গিয়েছিলেন ঘাধবলালের সঙ্গে কথা বলতে ?'

'আমি ত গোড়াতেই বলেছি মশাই, দামাটিকে আমার জল জাগছে না। পাগল জিনিসটা বড়ো ডেঙ্গারাস। আমাদের নর্থ ক্যাল-কাটার এক পাগল ছিল, সে আপার সারকুলার রোডের ঠিক র্যাধাখানে দাঁড়িয়ে টাম আর বাস লক্ষ্য করে বেমৰ্জ্য তিল ছুড়ত। কী ডেঙ্গারাস বলুন ত !'

'দেবতোষবাবুর দুরজ্যা বন্ধতে কী শুমাগ হল ?'

‘তার মানে ভুলোক নিচে থান্নিন।’

‘কী করে প্রথম হুসেটো; ভুলোক আসো এ তালা-বাধ দরজার পিছনে আছেন কিনা সেটো আপনি কী করে জানলেন? সারাদিনে তীর কোনো সাজাশব্দ পেয়েছেন কি?’

লালমোহনবাবু যেন বেশ খানিকটা দমে গোলেন। একটা দৌর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললেন, ‘ঝশাই, কত চেষ্টা করি আমার চিন্তা ঠিক আপনার চিন্তার সঙ্গে এক লাইনে চালাব—কোথায় যেন গণ্ডগোল হয়ে থারো।’

‘গণ্ডগোল না। কোলিশন। আপনি উল্টো পথে চলেন কিনা। আপনি আগে ক্রিমিনাল ঠিক করে নিয়ে তারপর তার ঘাড়ে কাইমটা বসাতে চেষ্টা করেন, আর আমি কাইমের ধাঁচটা ব্যবে নিয়ে সেই অনুযায়ী ক্রিমিন্যাল খোজার চেষ্টা করি।’

‘এই বাপারেও তাই করছেন?’

‘ও ছাড়া ত আর গ্রাম্য সেই লালমোহনবাবু।’

‘কোনখান থেকে শুরু করেছেন?’

‘কুরক্ষেত।’

এর পরে আর লালমোহনবাবু কোনো প্রশ্ন করেননি।

আমাদের মশারির বদলে দেওয়াতে ঘুমটা ভালোই হচ্ছিল, কিন্তু মাঝরাস্তের একটা চিংকারে ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসতে হল। চিংকারটা করেছে ফেলদু। জেগে দেখি ও দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝ-থানে, হাতে গয়ে আবিতনামায়নের তলোয়ার। বাইরে থেকে চাঁদের আলো এসে ইস্পাতের ফলাটার উপর পড়াতে সেটা বিলিক মারছে। যে কথাটা শুনে ঘুমটা ভেঙেছিল সেটা ফেলদু আরো দু’বার বলল, তবে অত চেঁচিয়ে নন। ‘ইউরেকা! ইউরেকা! ’

আর্কিমিডিস কী হেন একটা আবিষ্কার করে উল্লাসের সঙ্গে এই শ্রীক কথাটা কলে উঠেছিল। তার মানে হল ‘পেরোছি।’ ফেলদু যে কী পেয়েছে সেটা বৌকা গেল না।

॥ ১১ ॥

সকালে চ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কবাবু আমাদের ঘরে
এলেন দেখে বেশ একটু অবাক লাগল। ফেল্দুদা ভদ্রলোককে বেশ
খাঁড়ি-টাঁড়ির করে বসতে বলে, 'আপনার সঙ্গে আরে আলাপই
ইল না ঠিক করে। মহীতোষবাবুর বন্ধু হিসেবে আপনারও নিশ্চয়ই
অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

শশাঙ্কবাবু টেবিলের সামনে চোরটোল বসে বললেন,
'অভিজ্ঞতার শুরু কি সেই আজকে? মহীর সঙ্গে আমার বন্ধুর
পাপাশ বছরের উপর। সেই ইস্কুল থেকে।'

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'মহীতোষ সম্পর্কে?'

'না। তাঁড়িবাবু সম্পর্কে।'

'বলুন।'

'আপনার এতে উনি কেমন লোক ছিলেন?'

'চমৎকার। অতুল্য বৃদ্ধিমান, অতুল্য ধীর প্রকৃতির ব্যক্তিছিল
তাঁড়ি।'

'আর কাজের দিক দিয়ে?'

'অসাধারণ।'

'আমারও তাই ধারণা...'

এবার শশাঙ্কবাবু ফেল্দুদার দিকে সোজা দৃষ্টি দ্বিতীয় বললেন,
'আগি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাই।'

'বলুন।'

শশাঙ্কবাবুকে এই প্রথম সিগারেট খেতে দেখলাম। ফেল্দুদারই
দেওয়া একটা চারমিনার ধীরিয়ে একটা টান দিয়ে ধীরিয়া ছেড়ে বললেন,
'এই তিনি দিনে আপনার অনেক রকম অভিজ্ঞতা ইল। আপনি
নিজেও বৃদ্ধিমান, তাই সাধারণ লোকের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশ
দেখেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন। আজ হ্রত আপনার এখানে শেষ
দিন। আজ কী ঘটবে তা জানি না। যাই ঘটবে না কেন, এই বিশেষ
জায়গার এই বিশেষ জায়দার পরিবারটি সম্বন্ধে আপনি যা জেনে

গেলেন, সেটা যদি আপনি গোপন রাখতে পারেন, এবং আপনারু এই বন্ধুটিকেও গোপন রাখতে বলেন, তাহলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমি জানি মহীতোষও এটাই চাইবে। বাংলাদেশের প্রায় যে কোনো জমিদার বংশের ইতিহাস ঘাঁটিলেই অনেক সব অভুত অগ্রিয় ঘটনা ঘৰিয়ে পড়বে সে ত আপনি জানেন। সেরকম সিংহ-রায় বংশের ইতিহাসেও অনেক অগ্রিয় কথা লুকিয়ে আছে সেটা বলাই বাহুল্য।'

ফেলুন্দা বলল, 'শশাক্তবাবু, আমি তিনি দিন ধরে মহীতোষ-বাবুর অভিধেয়তা ভোগ করেছি। সে কারণে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমি কলকাতায় গিয়ে সিংহরায় পরিবার সম্পর্কে বদনাম মটাব, এটা কখনো হবে না। এ আমি কথা দিতে পারি।'

এর পর একটা পুন ফেলুন্দা বোধহয় না করে পারল না।

'দেবতোষবাবুর ঘরের মরজা কাল থেকে হম্ম দেখছি। এ বাপারে আপনি কোনো আলোকপাত করতে পারেন কি?'

শশাক্তবাবু একটা অভুত দ্রষ্টিতে ফেলুন্দার দিকে চাইলেন। তারপর বললেন, 'আমার বিশ্বাস আজকের দিনটা ফুরোবার আগে আপনিই পারবেন।'

'প্রিলিপ কি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে?'

'উহু।'

'সে কি! হঠাৎ বন্ধ করার কারণটা কি?'

'যার উপর সন্দেহটা পড়ছে, মহীতোষ চার না যে প্রিলিপ তাকে কোনোরকমভাবে বিশ্রদ করে।'

'আপনি দেবতোষবাবুর কথা বলছেন?'

'আর কে আছে বলুন?'

'কিন্তু দেবতোষবাবু, যদি খুন করেও থাকেন, তিনি ত আর অভিযুক্ত হবেন না, কারণ তাঁর ত মাথা খারাপ।'

'তা হলেও, ব্যাপারটা প্রচার হয়ে পড়বে ত। মহীতোষ সেটা চার না।'

'সিংহরায় বংশের মর্মাদা জৰুর জন্ম?'

'খুন যদি তাই হয়!'-বলে শশাক্তবাবু উঠে পড়লেন।

সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজও প্রথম দিনের মতো দুটো জীপ। একটায় ফেলুন্দা, জালমোহনবাবু আর আমি, অন্যটায় মহীতোষবাবু, শশাক্তবাবু, মাঝবলাল আর মহী-

তোষবাবুর একজন বেয়ারা। আজ আমাদের সঙ্গে তিনটে বন্দুক। একটা নিয়েছে মাধবলাল, একটা মহীতোষবাবু, আর একটা—ফেল্দা। বন্দুক নেবার ইচ্ছটা ফেল্দাই প্রকাশ করল। ফেল্দার রিভলভার চালানোর কথা মাধবলালই মহীতোষবাবুকে খবে ফলাও করে বলেছিল, তাই বন্দুক চাইতে মহীতোষবাবু আর আপনি করবেন না। বললেন, 'আপনার ষাণ্মিতো একটা বেছে নিন। বাবের জন্যই ষাণ্মিতো ত প্রিসেন্স-ফাইফটা নিতে পারেন।' ওসব নম্বর-টপুর আমি বৰ্দ্ধি না, তবে বেশ জবুনস্ত রাইফেল সেটা দেখে বুঝতে পারছি।

লালমোহনবাবুর মধ্যেও একটা চাপা উত্তেজনার ভাব, কারণ ফেল্দা। তার হাতে আদিতনাহায়নের তলোয়ারটা ধরিয়ে দিয়েছে। দেবার সময় বলল, 'একদম হাতছাড়া করবেন না। আজকের নাটকে ওটাই একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।'

ভোরে বধন উঠেছিলাম তখন আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার ছিল, কিন্তু এখন আবার মেঘ করে এসেছে। কালকের ব্র্জিত ফলে রাস্তার কাদা হয়েছিল, তাই আমাদের পেঁচতে ধানিকটা বেশি সময় লাগল। কাটা ঠাকুরানীর মন্দির একেবারে জগলের ভিতরে, ঝীপ অতদ্রু থাবে না। কাল যেখানে নেমেছিলাম আজ সেখান থেকে প্রার আরো আধ মাইল ভিতরে গিয়ে আমাদের ঝীপ থামল। মাধবলাল রাস্তা চেনে; সে বলল, 'সামনে একটা নালা পেঁত্রিয়ে মিনিট পনের হাটিলেই আমরা মন্দিরে পেঁচে যাব।'

অল্প অল্প মেঘের গর্জন আর গাছের পাতা কাঁপানো বিরক্তিরে বাতাসের মধ্যে আমাদের অভিযান শুরু হল। গাড়ি থেকে নামবাবু আগেই ফেল্দা রাইফেলে টোটা ভরে নিয়েছে। মহীতোষবাবু নিজে তার বন্দুকটা নেননি; ওটা রয়েছে বেয়ারা পৰ্বত সিং-এর হাতে। পৰ্বত সিং নাকি সব সময়ে মহীতোষবাবুর সঙ্গে শিকারে গেছে। বেটেখাটো গাঢ়োগোটো চেহারা, দেখলেই স্বাক্ষ আর গায়ে অসম্ভব জোর।

আজ ধানিকদ্রে হাঁটার পরই দূরে একপাল হরিষ দেখে মনটা নেচে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুকটা ধড়াস করে উঠল। এই জগলের অধোই কোথাও হয়ত সেই মানুষখেকে বাঘটা গ্রয়েছে। এমনিতে বাঘ নাকি শিকারের থেকে রোজ অক্তোবে পাঁচশ-ত্রিশ মাইল হেঁটে এ বন থেকে ও বন চলে যায়। কিন্তু এ বাঘ ষাণ্মী বাব হয়ে থাকে তাহলে হয়ত তার পক্ষে বেশি দূর হাঁটা সম্ভবই না। আর এমনিতেই জগল আপন আগের যতো বড় আর হড়ানো নেই। গত

বিশ-পাঁচশ বছরে মাইলের পর মাইল গাছ কেটে ফেলে সেখানে চাবের জীব হয়েছে, চা বাগান হয়েছে, লোকের বস্তি হয়েছে। কাজেই বায যে খুব দূরে চলে যাবে সে সম্ভাবনা কর। দিনের বেলা বাষ সাধারণত বেরোয় না এটা ঠিক; কিন্তু মেঘলা দিনে নাকি বেরোন অসম্ভব না। এ বাপারটা কালকেই ফেলেন্দা আমাকে বলেছে।

যে নালাটা আজ আমাদের পেরোতে হল সেটা কালকেও পেরিয়েছি। কাল প্রায় শুকনো ছিল, আজ কুলকুল করে জল বইছে। নালার ধারে বালি, তাতে জানোয়ারের পায়ের ছাপ। বায নেই, তবে ইরিণ, শূয়োর আর হাইনার পায়ের ছাপ শাধবলাল চিনিয়ে দিল। আমরা নালা পেরিয়ে, ওপারের বনের মধ্যে ঢুকলাম। একটা কাঠ-ঠোক্রা মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে, দূর থেকে একটা অন্ধের ডাক শব্দতে পাঁচছ, আর কয়েকটা বিরু ঝঁঝাগত ডেকে চলেছে। পায়ের সাথনে ঘাসের উপর মাঝে মাঝে সড়াৎ সড়াৎ শব্দ পাঁচছ, আর বৃক্ষতে পার্বাছ যে গিরিগিটির দল মানুষের পায়ের তলায় পিষে ধাবার ভঙ্গে এক ঝোপড়া থেকে আরেক ঝোপড়ার পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

তবে আমরা আমাদের চেনা জাহাজ পেরোছে গেলাম। কাল এখানে এসেছিলাম অন্য পথ দিয়ে। এই যে সেই তলোয়ারের জাহাজ। আমাদের দলপতি শাধবলাল অত্যন্ত সাধারণে শব্দ না করে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে, আর বাকি সকলে তার দেখাদেখি সেই ভাবেই চলার চেষ্টা করছি। মাটি এমনিতেই ভিজে নরম হয়ে আছে, শুকনো পাতা প্রায় নেই বললেই চলে, তাই সাতজন লোক একসঙ্গে হাঁটা সড়েও প্রায় কোনো শব্দই ইচ্ছিল না।

নামনের গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ইটের পাঁজা দেখা যাচ্ছে। কাটা ঠাকুরানীর ফাটা মিস্ট্রি।

একজনও একটাও কথা না খলে একট্টও শব্দ না করে মিস্ট্রির সাথনে পেরোছে গেলাম। সকলে থামল। সেদিন শূধু ফোকলা ফাঁকিরের গাছ, অর্জন গাছ আর জোড়া তাল গাছের দিকে লক্ষ্য ছিল বলে আশেপাশে যে আরো কতুকম গাছ আছে সেটা খেয়াল করিন। সেই সব গাছের ফাঁক দিয়ে বিরুবির করে বাতাস আসছে, আর আসছে নালার কুলকুল শব্দ। মিস্ট্রির পিছন দিকেই নালা। ওই নালার জল থেতে আসে জন্তু জানোয়ার। বাষও আসে। মানুষথেকাও।

ফেলেন্দা অর্জন আর জোড়া তালের মাঝখানে গতটার দিকে এগিয়ে গোল। মহীতোষবাবুও গোলেন পিছন পিছন। আজ গতে আরো বেশি জল। ফেলেন্দা সেদিকে আঙুল দেখিবে নিষ্ঠাখ্যতা ভঙ্গে

দিয়ে প্রথম কথা বলল।

‘এই গতে’ ছিল আদিত্যনারায়ণের গৃহ্ণত্বন।’

‘কিন্তু...সেটা মেল কোথায়?’ চাপা গলায় জিজ্ঞাস করলেন মহীতোষবাবু।

‘কাছাকাছির মধ্যেই আছে, যাই না কাজকের মধ্যে কেউ সেটা সরিয়ে থাকে।’

মহীতোষবাবুর চোখ দুটো অবলজবল করে উঠল।

‘আছে? আপনি সত্য বলছেন আছে?’

‘আপনি জানেন সে গৃহ্ণন কী জিনিস?’ ফেলুদা পাখটা শুন করল।

উজ্জ্বলায় মহীতোষবাবুর কপালের শিরা ফুলে উঠেছে, চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। যান্তেন, ‘না জানলেও অনুমান করতে পারি। আমার পূর্বপুরুষ বশোবন্দি সিংহবাবু ছিলেন কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ রূপের সেনাধ্যক্ষ। বশোবন্দির উপাধিগত টাকা—নরনারায়ণের নিজের টাকাশালের টাকা—ব্যাবস্থার নাম ছিল নারায়ণী টাকা—সেই টাকা ছিল আমাদের বাড়িতে। এক হাজারের উপর রৌপ্যমূল্য, চারশো বছরের পুরোন। আদিত্যনারায়ণ মৃত্যু এ টাকা খুঁকিয়ে গাথেন, তখন তাঁর মাথা ধারাপ হতে শুরু করেছে—বাট বছর বয়সে হেলেমান্দ্রী দৃষ্টিক্ষেত্র থেলেছে। তিনি আর যাবাব পর সে টাকা খাঁজেও আর পাওয়া যায়নি। এতদিনে এই সংকেত তার সন্ধান দিয়েছে। এ টাকা আমার চাই মিস্টার মিস্টির, ওটা হারালে চলবে না।’

ফেলুদা মহীতোষবাবুর দিক থেকে দূরে মন্দিরের দিকে এগোছে। মন্দিরের কাছাকাছি পেঁচে হঠাতে আমার দিকে ফিরে বলল, ‘তোপ্সে, বস্তুকটা ধর ত। মন্দিরের ভিতর রিভলভারই কাজ দেবে।’

আমার হাত কাঁপতে শুরু করেছে। কেনোরক্ষে নিজেকে সাথলে নিয়ে বস্তুকটা হাতে নিলাম। জিনিসটা যে এত অস্পত্য রকম ভারি সেটা দেখে বুঝতে পারিনি।

ফেলুদা মন্দিরের ভাঙা দরজা দিয়ে অঁধকারের ভিতর ঢুকল। চৌকাঠ পেরোনোর সময় লক্ষ্য করলাম, ও পকেটে হাত ঢোকাল।

পাঁচ গোনার মধ্যেই পর পর দু'বার রিভলভারের আওয়াজে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। তারপর মন্দিরের ভিতর থেকে ফেলুদার কথা শোনা গেল।

‘মহীতোষবাবু, আপনার প্রোকটিকে একবাব পাঠান ত।’

পর্বত সিং বন্দুকটা তার হানিবের হাতে দিয়ে র্মান্ডের ভিতরে, দ্বিকে এক ঘিনিটের মধ্যেই একটা সর্বাঙ্গ কানা-মাথা পিতলের বড় নিম্নে বেরিয়ে এল, তার পিছনে ফেল্দা। মহীতোষবাবু, পর্বত সিং-এর দিকে ছুটে গেলেন। ফেল্দা বলল, 'কেউটের যে সৌপান্ডুর প্রতি মোহ থাকতে পারে এটা ভাবিনি। কালই শিসের শব্দ শেয়ে-ছিলাম, আজ মেঁধি বড়টাকে সন্তোষ করে পড়ে আছেন বাবাজী।'

মহীতোষবাবু হাত থেকে বন্দুক ফেলে দিয়ে সেই বড়টার উপর দুর্ভাগ্য খেয়ে পড়ে তার ভিতর থেকে সবে একমুঠো ঝুপোর টাকা বার করেছেন, এমন সময় একটা কাকর হারিগ জেকে উঠল। আবু তার ঠিক পরেই এক সঙ্গে অনেকগুলো বাদির আশপাশের গাছ থেকে চেঁচাতে আরম্ভ করল।

তারপরে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল যে ভাবতেও মন ধাঁধিয়ে যায়। প্রথমে মহীতোষবাবুর মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল। এক মুহূর্ত আগে বিনি একসঙ্গে এতগুলো ঝুপোর টাকা দেখে আহন্দে আটখানা হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি হাত থেকে সেই টাকা ফেলে দিয়ে ইলেক্ট্রিক শক্তি-ব্যবস্থার মতো করে চম্কে উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। আমরা সবাই যে যেখানে আছি সেখানেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছি। ফেল্দাই প্রথমে মুখ খুলল। কিন্তু তার গলার স্বর চাপা ফিসফিসে—'তোপ্সে, গাছে ওঠ। লালমোহনবাবু, আপনিও।'

আমার পাশেই ফোকলা ফাঁকরের গাছ। ফেল্দার হাতে বন্দুকটা চালান করে দিয়ে ফোকলা ফোকরে পা দিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে একটা বড় ডাল ধরে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে আমি মাটি থেকে দশ হাত উপরে উঠে গেলাম। তার পরেই লালমোহনবাবু তার হাতের তলোয়ারটা আমার হাতে চালান দিয়ে একটা তাঙ্গৰ ব্যাপার করলেন। অবিশ্য উনি পরে বলেছিলেন যে ছেলেবেলায় আমড়ার থাকতে নাকি অনেক গাছে চড়েছেন, কিন্তু চাঁপাশ বছর বয়সেও যে তিনি এক নিয়েবে আমার চেয়ে উপরের একটা ডালে উঠে পড়তে পারবেন এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

নাকি ঘটনাগুলো আমি উপর থেকেই দেখেছিলাম। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ দেখে আবু দেখতে পারেননি, কারণ তিনি অঙ্গান হয়ে গিয়েছিলেন; তবে এমন আশ্চর্যভাবে তাঁর হাত-পা গাছের চওড়া



ডালের দু'দিকে বুলে ছিল যে তিনি মাটিতে পড়ে যাননি।

চরিদিক থেকে বিশেষ বিশেষ জানোয়ার আর পাখির ডাক শুনেই
বেঁধো গিয়েছিল যে কাহাকাহির ঘণ্টো বাষ এসে পড়েছে। অবিশ্য ব
বাষ এদিকে আসার আরেকটা কারণ ছিল সেটা পরে জেনেছিলাম।
মোট কথা বাষ আসছে বুঁবেই ফেল্দু আমদের গাছে চড়তে
বলেছিল।

সবচেয়ে আশ্চর্য বাপার করলেন মহীতোষবাবু। তার এই চেহারা যে কেন্দ্রিন দেখব সেটা ভাবিনি। অবাক হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক ফেল্দার দিকে দূরে দাঁতে দাঁত চেপে বলছেন, 'মিস্টার মিস্টির, আপনার বাদি আগের মাঝা থাকে ত চলে যান।'

'কোথায় থাব মহীতোষবাবু?'

দ্রুতের হাতেই বল্দুক। মহীতোষবাবুরটা উপর দিকে উঠছে ফেল্দার দিকে।

'বলছি থান !' আবার বললেন মহীতোষবাবু। 'জীপ বলেছে ওই দিকে। আপনি চলে যান। আমি আদেশ করছি, আপনি—'

মহীতোষবাবুর কথা শেষ হল না। একটা বাধের গর্জনে সমস্ত বনটা কেঁপে উঠেছে। শুনলে মনে হবে না যে একটা বাঘ, মনে হবে পঞ্চাশটা হিস্ত জানোয়ার একসঙ্গে গঞ্জিল করে উঠেছে।

এবার গাছের উপর থেকে দেখতে পেলাম—মিস্টিরের পিছনে আরো কতগুলো অর্জন গাছের সামা ডালের ফাঁক দিয়ে একটা গনগনে আগুনের মড়া চলস্ত রং। সেটা লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটা প্রকান্ড ডোরাকাটা বাধের চেহারা নিল। বাঘটা এগিয়ে আসছে কাটা ঠাকুরানীর ডানে পাশ দিয়ে, আবাদের এই খোলা জায়গাটাৰ দিকে।

মহীতোষবাবুর হাতের বল্দুকটা নিচে লৈয়ে এসেছে। একে ভারি বল্দুক তার উপর হাত ধর থর করে কাঁপছে।

এদিকে ফেল্দার বল্দুকের নলটা উপর দিকে উঠেছে। আরো তিনজন লোক আছে আবাদের সঙ্গে—শশাঙ্কবাবু, মাধবলাল আৱ পৰ্বত সিৎ। পৰ্বত সিৎ এইমাত্র একটা প্রকান্ড লাফ দিয়ে পালাল। অন্য দুজন কী করছে জানি না, কারণ আমার চোখ একবার বাঘ আৱ একবার ফেল্দার দিকে বাছে।

এখন বাঘটা মিস্টিরের পাশে এসে পড়েছে।

বাধের মুখটা ফাঁক হল। তার দাঁতগুলো দেখা থাছে। এতগুলো শিকার এক সঙ্গে চোখের সামনে সে নিশ্চয়ই দেখেনি কখনো।

বাঘটা ধেয়ে গেছে। তার শরীরটা একটা নীচু হল। এটা লাফ আৱার আগের অক্ষয়া, থাকে ওত পাতা বলে। এইভাবে লাফ দিয়ে প'ড়ে বাব একটা মোষকেও—

দূৰ ! দূৰ !

আম একই সঙ্গে দুটো বল্দুক গার্জিয়ে উঠল। আমাৰ কান বালোপালা। দৃষ্টিটাও যেন এক মহুর্তের অন্য আপস্য হয়ে গেল।

তারই মধ্যে দেখলাম বাষটা লাফ দিয়ে যেন শন্মাপথে একটা অদৃশ্য বাধার সামনে পড়ে উল্টো দিকে একটা ডিগবাজি খেয়ে একেবাবে গুপ্তধনের কলসৈটার ঠিক পাশে আছড়ে পড়ল, তার সামনের আপটায়ে কলসৈটা প্রচন্ড খটাং খন্দে ছিটকে গাড়িয়ে গিয়ে তার খেকে চারশে বছরের প্ররোচন সামাজিক টাকা ছাড়িয়ে পড়ল।

ফেলদ্বা বস্তুকটা নামিয়ে নিয়েছে। মাধবজাল বলল, ‘উয়ো মর গিয়া।’

‘কার গুলিতে মরল বলন ক ?

প্রশ্নটা করল ফেলদ্বা। মহীতোষবাবুর উপর দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি মাথা ছেঁট করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে আছেন। তার হাত খেকে ছিনিয়ে নেওয়া বস্তুকটা এখন শশাক্তবাবুর হাতে।

শশাক্তবাবু বাষটার দিকে এগিয়ে চোলেন। তারপর বললেন, ‘এসে দেখুন মিস্টার মির্জা। একটা গুলি গেছে চোয়ালের তলা দিয়ে গিয়ে একেবাবে মাথার খুলি ভেদ করে; আরেকটা গেছে কানের পাশ দিয়ে। দুটোর মধ্যে কেনোটাতেই বাষটা মরে থাকতে পরে।’

জোড়া বালুকের গুলিয় আওয়াজে উভর দিকের গ্রাম থেকে
লোকজন ছুটে এসেছে। তারা মহা ফুর্তিতে বাষটাকে মাস্তের
ওপাশে সর্বিয়ে নিয়ে গিয়ে বাশের সঙ্গে বেঁধে কাঁধে তোলার আয়ো-
জন করছে। এটাই থে মানুষখেকে তাতে কেনো সন্দেহ নেই।
আরো দুটো গুলিয় চিহ্ন বাষের গায়ে পাওয়া গোছে; একটো পিছনের
পায়ে, আরেকটো চোয়ালের কাছে। এর বে কেনো একটার ফলে বাষ
তার স্বাভাবিক শিকারের ক্ষত্য হারিয়ে মানুষের পিছনে ধাওয়া
করতে পারে। বাষটার বুসও যে বেশি সেটা তার গালের দু'পাশের
খন লোম থেকেই বোঝা যায়।

পর্বত সিৎ ফিরে এসেছে। সে শহীতোষবাবুর হাত ধরে তুলে
তাকে মাস্তের ভাঙা সিঁড়ির উপর বসিয়ে দিয়েছে। ভস্তুলোক এখনো
ঘন ঘন দাখ মুছলেন। লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। শাহ থেকে
নামাটো তাঁর পক্ষে ওঠার মতো সহজ হয়নি, আমার সাহায্য নিতে
হয়েছে। নেমে এসেই, যেন কিছু হয়নি এমন ভাব করে আমার হাত
থেকে তলোয়ারটো আবার নিয়ে নিয়েছেন।

কিছুক্ষণ চূপচাপের পর ফেলেন্দা কথা বলল।

'শহীতোষবাবু, আপনি ব্যাই দুর্শিতার ভুগছেন। আমি
আপনার শিকারের অক্ষমতা কারণে কাছে প্রকাশ করব না সেটা আমি
শাশাঙ্কবাবুকে কথা দিয়েছি। আমি ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই
সন্দেহ করেছি। লালমোহনবাবুর চিঠিতে আপনার সই মেখে আমি
ভেবেছিলাম আপনি ব্যক্তি ব্যক্তি। লিখতে গেলে বাধি আপনার হাত
কাপে, তাহলে বন্দুক ধরলে সে হাত স্থির থাকবে কী করে সে চিন্তা
আমাকে ভাবিয়ে তলেছিল। অবিশ্বা এমনও হতে পারে বৈ, আপনার
হাত খুব সংশ্লিষ্ট বিকল হয়েছে; বইয়ে যে সব শিকারের কথা লিখে-
ছেন সে-সব আপনিই করেছেন। কিন্তু আমার মনে নতুন করে সন্দেহ
চূকিয়ে দিলেন আপনার সামা। দেবতোষবাবু, অসংলেখ কথা বলমেও,
তাঁর একটা কথার সঙ্গে আরেকটা কথার সরাসরি সংপর্ক না থাকলেও
তিনি যে আজগুবি শিখে বলছেন এটা কিন্তু আমার কথনো মনে

হয়নি। তিনি খা বলছেন তার মধ্যে খুজলে অর্থ পাওয়া যাব, এটাই আমার মনে হয়েছিল। আপনি শিকারের বই লিখছেন সেটা নিশ্চাই ভৈন জানতেন, আর আপনি যে এত বড় একটা মিথ্যের আগ্রহ নিরেছেন তাতে তিনি নিশ্চল খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। এই যিষ্ঠে নিম্নে আকেশ আমি দ্রুত তাঁর মুখে শুনেছি। সবার হাতে হাঁতিগুৰু বাগ আনে না এটাও তিনি—'

ফেলনুদ্দার কথা বল্প করে মহীতোষবাবু চোঁচিয়ে উঠলেন—

‘বাগ মেনেছিল। সাত বছর বয়সে আমি এয়ারগাম দিয়ে শালিক মেরেছি, চড়ুই যেযেছি—পঞ্চাশ গজ দ্বৰ থেকে। কিন্তু...’

মহীতোষবাবুর মুখ্য বৃক্ষে গাছটার দিকে চলে গেল। তারপর বললেন, ‘একদিন চড়ুইভাতি কুরতে এসে ওই গাছে চড়ে-ছিলাম—ওই ডালে—বেধানে আপনার ভাইটি উঠেছিল। দ্যদা বলল বাবু আসছে, আর আমি বাপ দেখব বলে লাক মেরে—’

‘হাত ভাঙলেন?’

‘কম্পাউণ্ড ফ্লাকচার’, এগিয়ে এসে বললেন মহীতোষবাবুর মুখ্য শশাঙ্ক সানাম। ‘কোনোদিনই হাড় জোড়া লাগেনি ভাল করে।’

ফেলনুদ্দা বলল, ‘কিন্তু বংশের অর্ধাদা বৃক্ষ করার জন্য শিকারী হবার শখ হল? আর নিজের দেশে নিজের জগলে যিষ্ঠে ধরা পড়ে বাবে বলে উড়িষ্যা আর আসামের জগলে শিকার করলেন? আপনি করলেন মানে, করলেন শশাঙ্কবাবু, কিন্তু সোকে ব্যক্তি যে সিংহবাবুর পরিবারে তিনি প্দুরূব ধরে বাবু শিকারের ধাগা চলে আসছে। তাই না মহীতোষবাবু?’

মহীতোষবাবু মৌর্য্যাস ফেলে বললেন, ‘শশাঙ্ক যা করেছে তার মুখ্যের জন্য, তেমন আর কেউ করে না। ওর মতো শিকারী আমাদের পরিবারেও কেউ জন্মায়নি।’

‘কিন্তু সম্প্রতি সেই বশ্যে কি একটু চিড় ধরেছিল?’

মহীতোষবাবু আর শশাঙ্কবাবু দুজনেই চূপ করে আছেন দোষে ফেলনুদ্দা বলে চলল, ‘বই বেরোবাবু আগে আমি অস্তত মহীতোষ সিংহবাবুর নাম শুনিনি। কিন্তু বেরোবাবু পরে আবু হাজার হাজার সোকে তাঁর নাম শুনেছে, এবং একটা বিরাট মিথ্যাকে সাজি বলে মেনে নিছে। আসল শিকারী কিন্তু তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেটা কি তিনি খুব সহজেই মেনে নিতে পারছেন? বশ্যের খাঁতের কুকু আঘাতাগ সংজীব? আপনি সেদিন যাত্যে শশাঙ্কবাবু-কেই কথা শোনাচ্ছিলেন না? আমি কি অনুমান করতে পারি যে,

বেশ কিছু দিন থেকেই শশাঙ্কবাবু আর আপনার মধ্যে একটা মনো-
মালিন্য ও কথা কাটাকাটি চলছে ?

এখনো দুঃসনে চুপ। ফেলুদা স্থিরদৃষ্টিতে মহীতোষবাবুর
দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'মৌনং সম্বৃতি লক্ষণম্ বলেই ধরে নিছি।
আর, আরেকটা ব্যাপারেও আপনারে বোধহয় মৌন অবলম্বন ছাড়া
ব্যাপ্তা নেই।'

মহীতোষবাবু ভয়ে ভয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা
বলল, 'তাড়িৎবাবুর সাহিত্যকৌর্তির জনাই হে আপনি প্রশংসা পাচ্ছেন,
সেটাও বোধহয় সত্ত্ব। তাই নয়, মহীতোষবাবু ? আপনি সৌদিন
আপনার পান্তুলিপির কথা বললেন, কিন্তু আমি তা ত্যব করে
শুন্ধেও আপনার লেখা একটি টুকরো কাগজও কোথাও পেলাম না।
আসলে আপনি লিখতেন না, আপনি মুখে মুখে আপনার মতো করে
বলতেন, আর তাড়িৎবাবু সেটাকে তাঁর 'আশ্চর্য' সাবলীল ভাষায়
সাজিয়ে দিতেন আর সেই সাজানো লেখা প্রকাশিত হত আপনার
নামে। তাড়িৎবাবুকে আপনি ভাল মাইলে দিতেন, তাকে আরামে
রেখেছিলেন, তোমারে রেখেছিলেন এ সবই ঠিক। কিন্তু একজন
সত্ত্বাকারের গুণী প্রস্তাব পক্ষে ওগুলো ব্যথেষ্ট ময় মহীতোষবাবু।
সে সবচেয়ে বেশ যেটা আশা করে সেটা হল তাঁর গুণের আদর—
যেটা না পেয়ে তাড়িৎবাবুর মন ক্ষমে ভেঙ্গে যায়। তাঁরপর সংকেতটা
হাতে পড়ে, আর তাঁর সমাধানও হয়ে যায়। নারায়ণীমন্দির কথাটা
হয়ত তিনি আপনার পারিবারিক ব্যাগজের মধ্যে পেয়েছিলেন। মোট
কখন তিনি স্থির করেন যে, গুপ্তধন নিয়ে আপনার কাজে ইস্তম্ব
দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হল না।'

মহীতোষবাবু যেন বেশ কষ্ট করেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সবই
ত ব্যবস্থায় মিস্টার মিস্টির, এমন সবই ঠিক এবং কোনোটাই আমার
শুনতে ভালো লাগছে না। কিন্তু তাড়িৎকে এভাবে হত্তা করল কে ?
তাঁর না হয় আমার উপর আক্রম হিল, কিন্তু তাঁর উপর কানো
আক্রম হিল বলে ও আমি জানি না তাড়িৎ ছাড়া আর কে এসেছিল
সৌদিন জগালে ?'

'কে, এসেছিল তা বোধহয় আমি বলতে পারি !'

মহীতোষবাবু, পায়চারি আরম্ভ করেছিলেন, ফেলুদার কথা
শুন্ধেও মাকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

'পারেন ?'

ফেলুদার দৃষ্টি ধূরে শেল।

‘শশাঙ্কবাবু, আপনি সৌদিন রাতে মৌঘি রুম থেকে একটি উইন্ডচেস্টার রাইফেল নিয়ে এই জগলে আসেননি? কাল রাতে ওটাৰ বাঁটে সামনা একটি সেগে রঞ্জে দেখলাম, যেটা পৰশু রাতে সেধিনি।’

শশাঙ্কবাবুর নার্ট বোধহৱ বাব শিকার করেই আশৰ্বাদক শব্দ হৰে গিয়েছিল। উনি অস্তুত ঠান্ডাভাবে ফেল্দার দিকে চেয়ে বললেন, ‘যদি এসেই থাকি—আপনি তাৰ কৌ মানে কৱতে ছাইছেন সেটা বলবেন কি?’

ফেল্দা ও ঠিক শশাঙ্কবাবুর মতোই শান্তভাবে বলল, ‘শব্দ সম্পর্কে’ আপনাৰ ইতাশা জগলেও আপনি তাৰ গুৰুত্বসেৱ ওপৰ লোভ কৱবেন সেটা আমি যোতৈ ভাৰছি না। তবে আমাৰ ধাৰণা, তাড়ংবাৰু ষে সংকেতেৰ সমাধান কৱে ফেলেছেন সেটা আপনি আনতেন, তাই না?’

শশাঙ্কবাবু বললেন, ‘শব্দ তাই না, তাড়ং গুৰুত্বন পেলে তাৰ অধৈক আমাকে অফাৰ কৱেছিল। তাড়ং যুৰেছিল মহীতোৰ আমদেৱ দুজনকেই একইভাৱে বাঞ্ছিত কৱছে। কিন্তু আমি তাড়তোৱ প্ৰস্তাৱে রাজী হইনি। শব্দ তাই নহ, আমি গুৰুত্বসেৱ সম্বাদে এখানে আসতে অনেকবাৰ বাৰণ কৱেছিলাম। কাৰণ ওই ম্যানষীটাৰ। শেষটাৱ সৌদিন রাতে জানালা দিয়ে ওৱা টচৰ আলো দেখে আমি বল্দুক নিয়ে বৈৱৰ্যে পড়ি। এখানে এসে দেখি গুৰুত্বন পড়ে আছে, কিন্তু তাড় নেই। তাৰপৰ অনুসম্বাদ কৱে দেখলাম ঋকেৰ দাগ, বাঘেৰ পাৰেৰ ছাপ। গুৰুত্বন মাল্দৱেৰ ভিতৰ লোখে, সেই চিহ্ন ধৰে আমি এগিয়ে যাই বাণিজনেৰ কাছাকাছি পৰ্যন্ত। বিদ্ৰূতেৰ আলোতে দেখি বাব তাড়তোৱ মতদেহেৰ উপৰ হুমকি ধৰে পড়েছে। অস্থকাৱে আন্দাজে গুলি চালাই। বাব পালায়। তাৰপৰ...’

শশাঙ্কবাবু কেন জানি চুপ কৱে গেলেন। ফেল্দা বলল, ‘বাকিটা আমি বলি? এটা ও অনুমান। চুল হলে আমাকে শব্দৰে দেকেন।’

‘বেশ। বলুন।’

‘আপনিই কাল রাতে মাধবলালেৰ সেগে কথা বলছিলেন না?’

শশাঙ্কবাবু অস্বীকাৰ কৱলেন না। ফেল্দা এবাৰ আৱ একটা প্ৰশ্ন কৱল।

‘সেটা কি. মাল্দৱেৰ পিছনে বাঘেৰ জনা টোপ ফেলাৰ প্ৰস্তাৱ দিতে? এই শিষ্মল গাছটাৰ মগডালে শকনিৰ পাল দেখে মনে হচ্ছে ওৱা কাছাকাছি একটা মৱা জানোয়াৰ পড়ে আছে।’

‘মোখেৰ বাচা,’ চাপা গলায় বললেন শশাঙ্কবাবু।

‘তার মানে আপনি চাইছিলেন যে আমি বাস বেরোক, যাতে আপনি অন্তত একজন বাইরের লোকের সাথে প্রশংসন করে দিতে পারেন যে শিকারী আসলে ইচ্ছেন আপনি, মহীতোষবাবু নন।’

মহীতোষবাবু হঠাতে ফেল্দুদার দিকে এগিয়ে এসে কাঁধে হাত দিয়ে অনুন্নতের স্থানে বললেন, ‘মিস্টার মিস্টার, আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব, আপনাকে সেটা জানতে হবে।’

‘কী অনুরোধ?’

‘এই গৃহস্থনের কিছু অংশ আমি আপনাকে দিতে চাই। সেটা আপনাকে নিতে হবে।’

ফেল্দুদা মহীতোষবাবুর চোখে চোখ ক্লেশ ক্লেশ মুদ্দ হিসে বলল, ‘রৌপ্যমুদ্রা আমি চাই না মিস্টার সিংহলাঙ্গ। কিন্তু একটা জিনিস আমি নেবো।’

‘কী জিনিস?’

‘আদিত্যনারায়ণের তলোয়ার।’

লাসমোহনবাবু কথাটা শোনা মাত্র এগিয়ে এসে ফেল্দুদার হাতে তলোয়ারটা দিয়ে দিল।

‘এই তলোয়ার আপনি চাইছেন?’ মহীতোষবাবু অবাক হয়ে বললেন। ‘নারায়ণী রৌপ্যমুদ্রা না নিয়ে ইশ্পাত্তের তলোয়ার নেবেন?’

‘এ তলোয়ারকে আর সাধারণ তলোয়ার বলা চলে না মহীতোষবাবু। এর সঙ্গে ইতিহাস ছাড়াও আরো কিছু জড়িত হয়ে পড়েছে।’

‘আপনি তড়িতের খনের কথা বলছেন?’

‘না।’

‘তবে?’

‘খনের কথা বলছি না, কারণ তড়িৎবাবু খন হননি।’

‘তবে? আম্বহত্যা?’

‘তাও না।’

‘আপনি কি হেয়ালি তৈরি করছেন মিস্টার মিস্টার?’ মহীতোষবাবুর গলার স্বরে বুকলাম, তার ভিতরের কঠিন মানুষটা আবার বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ফেল্দুদা বলল, ‘না, তা করছি না, মহীতোষবাবু। যা ঘটেছিল সেটাই বলতে যাচ্ছি। সেটা এত স্পষ্ট বলেই আমাদের দ্রষ্টব্য সেদিকে যাচ্ছিল না। তলোয়ারটা তড়িৎবাবু নিজেই আদিত্যনারায়ণের ঘর থেকে সরিয়েছিলেন।’

‘সে কি, কেন?’

‘কারণ গুপ্তধন পেতে হলে তাকে যাঁটি খুঁড়তে হবে, আর তার জন্য শাবল জাতীয় একটা কিছুর দরকার। তাঁড়বাবুর হাতের সবচেয়ে কাছে ছিল এই তলোয়ারটা।’

‘তারপর?’

‘তারপর কী—সেটা বনার আগে এই তলোয়ারের একটা ধিশেবস্তু আমি আপনাদের দেখাতে চাই।’

এই বলে ফেলুন্দা তলোয়ারটা নিয়ে বলে জানি শশাঙ্কবাবুর দিকে এগিয়ে গেল। শশাঙ্কবাবু সাহসী হলেও ফেলুন্দাকে ওইভাবে অস্বীকৃত হাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে একটু যেন উস্থুস করে উঠলেন। এবার ফেলুন্দা এক আশ্চর্য খেল দেখাল। সে তলোয়ারটা শশাঙ্কবাবুর হাতের বন্দুকের নলের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেল, আর দুব কাছাকাছি আসতেই একটা খটাং শব্দ করে ইস্পাতে ইস্পাতে জোড়া লেগে গেল।

‘একি, এ যে চুম্বক! বলে উঠলেন শশাঙ্কবাবু।

‘হাঁ, চুম্বক’, বলল ফেলুন্দা। ‘তলোয়ারটাই চুম্বক, বন্দুকটা না। আগে চুম্বক ছিল না, কারণ আদিতনারায়ণের আলমারিতে তলোয়ারের পাশেই আরো ছোটখাটো অনেক মোহর আর ইস্পাতের জিনিস ছিল। চুম্বক হলে তলোয়ার বার করা বা রাখার সময় সেগুলো এর গায়ে আটকে যেত নিশ্চয়ই, কিন্তু যায়নি। এ তলোয়ার চুম্বকে পরিণত হয়েছে প্রশংসন্ত।’

‘কী করে?’ জিগোস করলেন মহীতোষবাবু। সকলেই বৃক্ষ-শালে ফেলুন্দার কথা শুনছে।

ফেলুন্দা বলল, ‘কোনো মানুষের হাতে লোহা বা ইস্পাতের কোনো জিনিস থাকা অবশ্যই ব্যবহার করা উপর বাজ পড়ে, তাহলে সে জিনিস চুম্বকে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, সে জিনিস অনেক সময় বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। তাঁড়বাবুর মৃত্যু হয়েছিল বস্তুঘাতে, এবং হয়ত এই তলোয়ারই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। যাঁটি বুঝে কলসী বার করার পর ব্রহ্ম নামে, তার সঙ্গে বাজ ও বিদ্যুৎ। তাঁড়বাবু অশ্বক-গাহের নিচে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসেন। বাজ পড়ে। তাঁড়বাবু ছিটকে পড়ার সময় তার হাতের তলোয়ার বুকে বিঁধে যায়। সন্তুষ্ট মৃত্যুর পরমহৃতেই তলোয়ার তার দেহে প্রবেশ করে।’

মহীতোষবাবুর সমন্ত শরীর ধূর্ঘন করে কাঁপছে। তাঁর দ্রুত অশ্বক গাছটার দিকে গেল। ভাঙা ভাঙা অস্ফুট স্বরে বললেন, ‘তাই ভাবাহিলাম, এই গাছটা হঠাত এসে বুঝে হয়ে গেল কী করে!

মহীতোষবাবুর কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, 'তড়িৎবাবু, শেষটার তড়িৎপৃষ্ঠ হয়ে আরা গেলেন।'

দুঃখের বিষয় হুর এই চমৎকার কথাটায় কান দেবার মতো মনের অবস্থা তখন ক্ষয়াত্ত হই ছিল না।

* * *

আমরা আজ কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। আজ বাইরে গোস, দু'দিন ব্র্যান্ট হওয়ার দরজন গুরুত্ব কর। আমরা জিনিসগুলি গুঁচিয়ে ঘরে বসে আছি, ঘরে ঘাঁথে বাইরে থেকে দেখতোষবাবুর গলা পাচ্ছ। সকালে উঠেই দেখেছি হুর ঘরের দরজায় আর তালা নেই। গাহ থেকে আমার সময় লালমোহনবাবুর হাঁটু ছড়ে গিয়েছিল। অতএব উপর উনি স্ট্রাক্ট প্লাস্টার লাগাছেন, এমন সময় মহীতোষবাবুর চাকর একটা স্ট্রালের প্রাঙ্গন আগায় করে ঘরে ঢুকে সেটাকে ঘাঁটিতে নামিয়ে রেখে বলল, মহীতোষবাবু, পাঠিরে দিয়েছেন। ফেলুদা সেটা খুলতেই সেখা গেল তার মধ্যে খুব সাবধানে প্যাক করা রয়েছে একটা চমৎকার বাঘছাল। একটা খামও ছিল প্রাঙ্কটোর মধ্যে, তার ভিতরে তিন লাইনের একটা চিঠি—

'ডিয়ার মিস্টার মিস্টর, আমার কৃতজ্ঞতার নিম্নলিঙ্গ স্বত্ত্বাল এই বাঘছালটি গুহ্য কারিগী আমাকে বাধিত করিবেন। ১৯৫৭ সালে স্বল্পতরের নিকটবর্তী' এক অঙ্গালে আমার বন্ধু প্রীশণাকমোহন সান্যাল কর্তৃক 'এই বাঘটি নিহত হইয়াছিল।'

লালমোহনবাবু চিঠিটা পড়ে বললেন, 'দু'জনের গুলিতে যেটা মরল, সেটা কি দু'ভাগে তাগ করা হবে?'

ফেলুদা বলল, 'না। ওটা শণাঙ্কবাবু আমাকেই দেবেন বলেছেন।'

'ও, তার মানে আপনি একাই...'

'না, একা না। দু'টোর একটা আপনাকে উপহার দেবো বলে স্থির করেছি।'

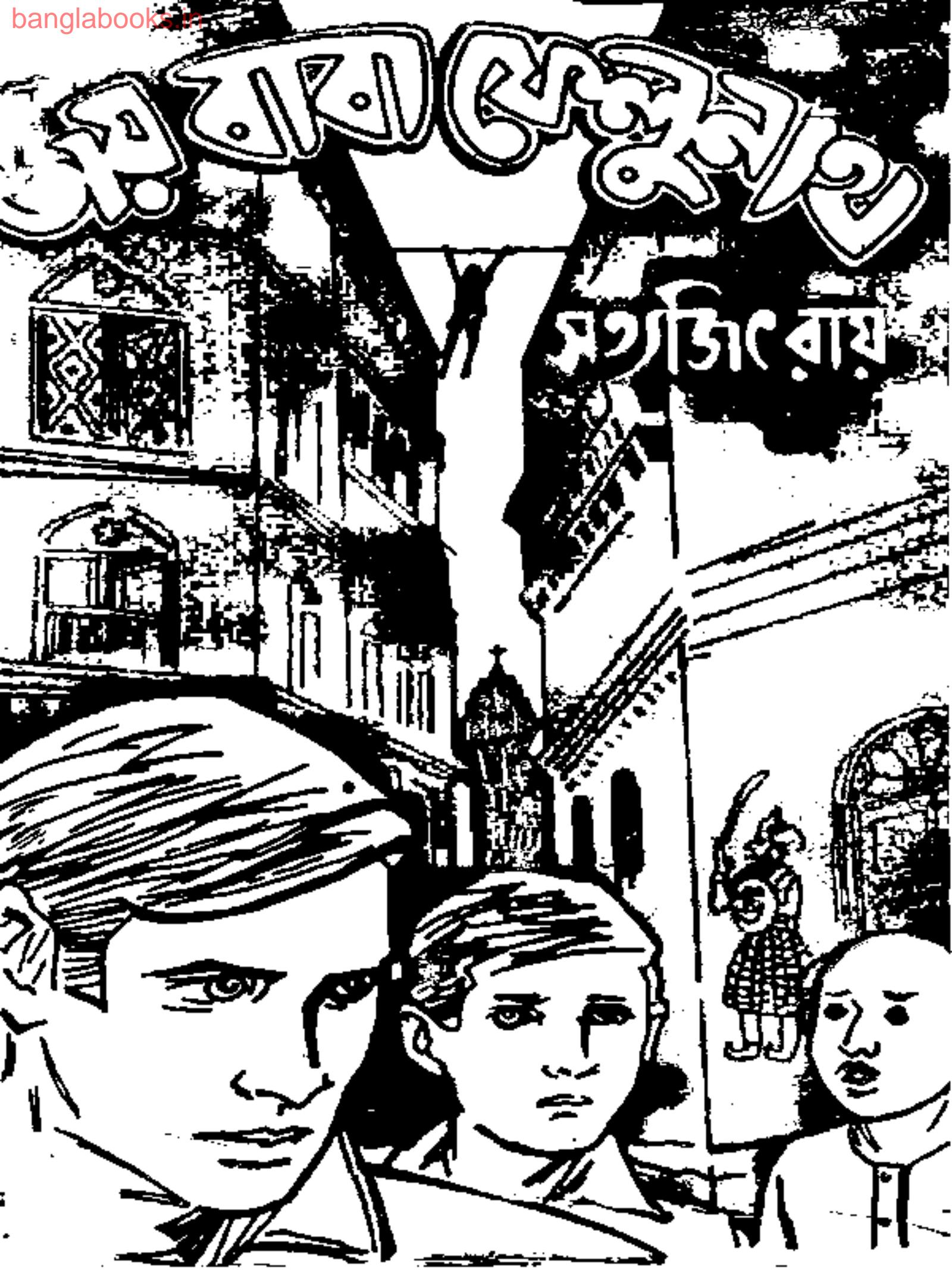
'উপহার?'

'উপহার। গাছের ডালে উঠে অজ্ঞান হয়েও যে ঘাঁটিতে মা পড়ে কুলে ধাকা ধায়, সেইটে সর্বপ্রথম আপনিই প্রমাণ করেছেন।'

লালমোহনবাবু হী হী করে উঠলেন।

'আরে ছশাই, আমি ত বলেইছি আমার কল্পনাশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে একটু বেশি। আপনারা বলছেন বাব, আর আমি দেখেছি একটা লেলিহান আঁখিশখা, আর তার মধ্যে একটা ট্রিপশাচিক দানব দাঁত খিচুচ্ছে, আর সেই সঙ্গে কর্ণপটাই বিদীর্ণ করা এক হৃক্ষার

ছেড়ে একটো জেট প্লেন টেক অফ করছে আমারই উপর ল্যান্ড করবে
বলে। এতেও যদি সংজ্ঞা না হারাই ত সৎস্য জিনিসটা কোথায়ে
করতে ?'



মঞ্জিলের

69

ରହସ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରକାଶକ ଲାଲମୋହନ ଗାନ୍ଧୀଲ ଓରକେ ଡାଟାମ୍ ସେଟ ଥିଲେ
ଏକଟା ଚିନିଆବାଦୀ ଭୁଲେ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ହାତେର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଭ୍ୟନ୍ ଆବ୍ୟନ୍ ପାଶେର ଆଭ୍ୟନ୍
ଦିଲେ ସେଟାର ଉପର ଏକଟା ହାତକା ହୁଲିଯାର ଚାପ ଥିଲେ ଡାଟାମ୍ ଥୋଲିଦେଇ
ଅଧିୟେ ଥିଲେ ଯିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ କରିବାକୁ କରିବାକୁ କରିବାକୁ କରିବାକୁ
ଉପର ପଡ଼ିଲୁ । ସେଟା ମୁଖେ ପାରେ ଥେବାଟା ସାମନେର ଟୌରିଜ୍ ରାଥ୍ ଆଶ-ହେତୁ
ଫେମେ ନିର୍ମାଣ ହାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକାଶ କରିଲେନ, 'ନିର୍ମାଣମେଧ ଘାଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଧରିବୁ
ଦେଖେବାନ କଥିଲୋ ?'

ফেল্দ্যার সামনে দাবার বোর্ড, তার উপরে একটা সাদা রাঙ্গা, একটা সামু গজ আর একটা সাদা বোড়ে, আর একটা কালো রাঙ্গা আর স্টো কালো খোড়া। বোর্ডের পাশে স্ট্রেট গেম্বস অফ চেস বলে একটা বই থেকে ; ফেল্দ্যা তার মধ্যে থেকে একটা চার্চিপ্যানশিপ গেম বেছে নিয়ে তার চালগুলো বই দেখে দেখে চালছিল। খেলার প্রায় ঘাবামারি লালমোহনবাবু এসে পড়েন। আজকাজ আর ঠির সঙ্গে বাড়াবাঢ়ি রুকম ভদ্রতা না করলেও ছলে, তাই ফেল্দ্যা গ্রীন:খেকে তা আনতে বলে দেখাটা দেষ করে নিছিস, আর চালের ফাঁকে ফাঁকে লালমোহনবাবুর শুল্কের জবাব দিছিল। এ-প্রশ্নটার জবাবেও সে বই থেকে ঢোথ না চুলেই বলে, ‘উইন্দু।’

‘ও—সে যা ব্যাপার না ! সে এক যাকে বলে, অবস্থাট ব্যাপার ! সে দশাই আপনি না দেখলে ইয়েই ক্ষণতে পারবেন না !’

ফেলন্দা দেশার শেষ চালটো মনে বোর্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি কি আমার দোক্টর দেশার চেষ্টা করছেন?'

‘ଆ କତକ୍ତେ ଟିକିବେ ଧରେଇନ୍ ଦେଇ ଦେଇ ।’

କିମ୍ବୁ ଆପଣି ସେ-ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେନ ତାତେ ଆପଣାର ଚଢ଼ୀ ବାର୍ଧ ହତେ ବାର୍ଧ ।'

‘কেন?’—লালমোহনধাক্কুর ডুর্দ দুটো নাকের উপর জুড়ে গিয়ে স্বেচ্ছা
ব্রাক্তে হায়ে গেল।

ফেন্দা বোর্ড ভাঙ্গ করে দ্বিতীয়স্তরে বাস্তু ভবতে ভবতে বলল, 'কারণ কোনো ঘটনা বা সম্পর্ক কেবলম্বাত্মক অবস্থাতে বিশেষণটা ব্যবহার করলে

আসলে কিছুই বলা হয় না। ওতে চোখের সামনে কোনো ছবি ফুটে ওঠে না, ফলে দশাক্ষয়ে বিজয়া-দশমীর বিশেষস্তো কিছুই বোধ নাই না, আর তার ফল ফল, মিহিরের মনে কোনো সাজা জাগে না। আপনি উপরাজে দ্রোধেন, আপনার বর্ণনা এত মায়সারা হবে কেন?’

‘ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন,’ সালমোহনবৰু জিজ কেটে বাস্ত হয়ে দলে উঠলেন। ‘আসলে আর পাঁচিশ বছর হয়ে গেল ত, তাই ডিপ্লোম্যুলো সহ গাথার মধ্যে জলগোল পাকিয়ে গেছে। তবে দশাক্ষয়ে ভাসান দেখে চোখ-কান ধাঁধিয়ে গেস্ত এটা বেশ মনে আছে।’

‘ওইত—চোখ এবং কান। বর্ণনার ওই দ্রোতের জন্য খোরাক চাই, স্বত্ব হলে নাকও।’

‘নাক!—সালমোহনবৰু তুরু দ্রোতে উপর দিকে উঠে এক জোড়া খিলেন হয়ে গেল।

স্বত্ব হলে...কলকাতার জাস্তাঘাটে এমনিতে কোনো যে বিশেষ গুরু পাওয়া যায় তা না। মৈক মার্কেটের কাছে বিকেলের দিকটা বেলফ্লোর গুরু, বা নিউ ঘার্ডার্টের পুর্ণিম দিকে বার্ষার স্টৌটের কোনো বিশেষ অংশে শ্বার্টেক আছের গুরু, হাসপাতালের কাছে ডিস্ট্রিন্ফেক্টেটের গুরু, শ্বশানের কাছে ঘড়া পোড়ার গুরু—এই সবই নিশ্চয় লক্ষ করে ধারণবেন। তেমনি কাশীর বর্ণনাতেও কিছু বিছু গুরুর উল্লেখ না করলে কি চলে? বিশ্বনাথের গলিতে ধপে ধূমো গোবর শয়েক্ষণ। তোকের ঘাম মেশানের গুরু, আবার গাঁল ছেড়ে থাইরে এসে বড় রান্তা দিয়ে ঘাটের দিকে হাঁটির সময় কিছুক্ষণ প্রায় একটা নিউগ্রোল গুরুহীন অবস্থা, আবার ঘাটের সিঁড়ি যেই শুরু হল অর্থনি ধাপে ধাপে একটা উগ্র গুরু ভূমে ষেড়ে গিয়ে প্রায় পেটের ভাত উল্টে আসার অবস্থা। সেটা যে এই বোকাপাঁচাগুলোর গাথেকে বেরোচ্ছে সেটা যে না জানে তার ব্যবহৃত কিছুটা সব্য লাগবে। ত্যারপর ছালগুলোকে পিছনে ফেলে একটু এগোলেই প্যাবেন একটা গুরু আতে জল মাটি তেল যি ফুল চন্দন ধূপ ধূনো সব একসঙ্গে মিশে রাখে।’

‘তার মানে আপনি বৈনারস গেছেন’, মন্তব্য করলেন জটায়ু।

‘গুরু। তখন কলেজের ছাত্র। হিন্দু ইউনিভার্সিটির সপ্লি ডিপ্লোম্যুলোতে গ্রেসলাই।’

সালমোহনবৰু প্রকৃট হাতড়ালেন দেবৈ ফেলসো বপল, আপনি যে কাগজের কাঁটিটা খুজছেন, সেটা আপনি ঘরে দেখাবে আর মিনিটের মধ্যে আশনার পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে এখন এই টেলিফোনের টেবিলের পায়ায় লাটিকে আছে।’

‘এই হে—রুমালটা বাবু করার সবস...?’

শালমোহনবাব, ওঠার আগেই আমি কাগজটা তুলে খুর হাতে এনে বিলামা
ফেল্দা বলল, ওটা সেই বালকের খবরটা ত? কাশীর সেই সাধ্ব্যবাবুর মাপারে?

শালমোহনবাব, ভাবির বাস্ত হয়ে বললেন, 'আপনি জানেন, তব্দু এতক্ষণ
কিছু বলেননি? কী রহস্যজ্ঞনক বাপার বলুন ত!'

আমি শালমোহনবাবুর হাত' থেকে কাটিএ-টা নিজে দেখলাম তাতে লেখা
রয়েছে—

বারাণসীর মহালি-বাবা

বারাণসীতে সত বহুপ্রতিবার এক সাধ্ব্যবাবুর আবির্ভাব খুলে
বিশেষ চাপ্টলোর স্ট্যাট করেছে বলে জানা গেল। অভ্যর্চনণ চুক্তি
নামক বাঙালীটোলার জন্মেক প্রবীণ বাসিন্দা কেদার ঘাটে প্রথম
সাধ্ব্যবাবুর সাক্ষাত পান, এবং আচরেই তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিকল্পনা
পান। সাধ্ব্যবাবু আপত্তি শ্রীচুক্তির গ্রহেই অবস্থান করছেন।
ভুগদের নিকট ইনি মহালি-বাবা নামে পরিচিত। তাঁরা বলেন, বাবাজী
নাকি প্রয়াগ থেকে গঙ্গায়কে ভাসমান অবস্থায় বারাণসীতে এসে
পৌছেছেন।

এ-ধরনের সাধ্ব্যবাবুর কথা আজকাল এত শোনা যায় যে আমার কাছে
খবরটা তেমন একটা কিছু বলে মনে হল না। কিন্তু শালমোহনবাবু, দেখলাম
ভয়স্করভাবে হেতু উঠেছেন। বললেন, 'হস্ত সেই একেবারে তিক্ষ্ণতে গম্ভীর
সোর্স' থেকে তসা শুন, করেছেন। ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।'

'গম্ভীর সোর্স' তিক্ষ্ণতে এ খবর কে দিল আপনাকে?

'ও হো হো, সরি—ওটা বোধ হয় পক্ষপাত্র। বাই হোক—তিক্ষ্ণত না হোক
হিমালয় ত! তাই বা কম কিম্বে?'

'আপনার কি তাকে সর্বনি কয়ার ইচ্ছ করেছে?'

'যেমন-তেমন সাধু হলে হত না, কিন্তু এর মধ্যে একটা অহসের গম্ভী
শান্তেন না আপনি? মহালি-বাবা—নামটাই ত ইউনিক।'

ফেল্দা তত্পোর থেকে উঠে পড়ল।

'নামটা মন্দ হয়নি সেটা স্বীকার করছি। খবর পড়ে ওই একটি জিনিসই
মনে দাগ কাটে, আর কিছু নয়। কাশী ঘদি যেতেই হয় ত মহালি-বাবুর জন্য
নয়। কচৌরি গলিয়া হনুমান হাল-ই-করের রাবচির স্বাদ এখনো মুখে লেগে
রয়েছে। এ জিনিসটা ত কলকাতার বাজার থেকে উঠেই গেছে।'

'আর ধর্দন র্যাদি গিয়ে দেখেন হয় হাল-ই-করকে কোনো অভাব আতঙ্গাবী
খন করে গেছে—তার বাধাড়ির রসে উরের ছিটে পড়ে নস গোলাপী হয়ে

শেষে—ভাইলে ত কথাই নেই। কাশীও হল, কেসও হল, কাশও হল—যাও হাঁ। এক টিল তিন পাঁধি। আপনি ত বেশ কিছুদিন বসে, তাই না?’

কথাটা ঠিকই। মাস তিনেক হল ফেল্দুর হাতে কোনো কাজ নেই। অবিশ্বাস তার একটা কারণ আছে, আর সেটা আমি এর আগেও বলেছি। ফেল্দুর বলে একটা কাইমের পিছনে বসি কোনো তৌক্যবৃত্তি ক্রিমিয়ালের কারস্মীজুর ছাপ না থাকে, তাহলে সে-কাইমের কিনারা করতে বিশেষ মাথা-শাটনোর প্রয়োজন হয় না, আর মাথা না খাটতে পারলে ফেল্দুর ভূমিত হয় না। কাজেই কেস মার্বলি ব্যবহার করতে পারলে সে বেশির ভাগ সময়ই সংরেলকে কিরিয়ে দেয়।

এক কথায় ফেল্দু চায়। তার তৌক্যবৃত্তিটাকে শান্তিয়ে নেবার সুযোগ। সে সুযোগ পত তিন মাসের মধ্যে আসেনি। এই অবসরে অবিশ্বাস ফেল্দু অজপ্র বই পড়েছে, নিরামিত ধোগবাজার করেছে, সিগারেট খেওয়া করিয়েছে, দাবা খেলেছে, দুর্বার চুল ছাঁটিয়েছে, দ্রটো বাঁচা, একটা হিল্ডী আর পাঁচটা বিদেশী ছবি দেখেছে, একদিন আমাকে সংশ্লি করে শামবজ্জ্বার পাঁচ মাথার মোড় থেকে বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ি অবধি হেঁটে এসেছে এক ঘন্টা স্বাতান্ত্র মিনিটে। এর মধ্যে একবার দাঁড়ি গোঁফ রাখবে থলে সাতদিন শ্রেণিং বন্ধ করে আট দিনের দিন আফসোস নিজের চেহারা দেখে পত পালেটিনে আবরে প্রদরোন করার ফিরে গেছে।

আলমোহনবাবু বললেন, ‘আপনার কেস নেই, আর আমার মাথার গংগপুর জ্বাট নেই। এই প্রথম প্রজ্ঞায় আমার বই বেরোল না, আনেন ত? আগে ত এ-বই, সে-বই থেকে এটা ওটা বাধচে সিয়ে তার উপর কিছুটা বং চাঁড়য়ে থা হোক একটা কিছু খাড়া করে দিতাব; আশনার হাতে বার বার ধরা পড়ে চুঁরি বিদ্যে ত নো লংগুর বড় বিদ্যে, তাই এখন নিজেরই মাথা খাটতে হয়। ভাবছিল্লুম কলকাতার এই বন্ধ আবহাওয়া থেকে বেরোতে পারলে বোধ হয় হেনটা কিছুটা ঘূলত।’

‘থেতে পারি, তবে একটা রিম্ব আছে।’

‘কী রিম্ব?’

‘গোয়ে-টিরে শেষটায় আমিও কেস পেলাম না, আপনিও প্লট পেলেন না।’

বেনারস গিরে আলমোহনবাবু গংগের প্লট পেরেছিলেন ঠিকই; তবে মিঠে আসার দুয়ার পরে বড়দিনে ডৌর বে বহস্য উপনাসটা বেরোল, সেটার সঙ্গে টিনটিলের একটা গংগের আশচর্য মিল।

ফেল্দুর কিস্তু গিরে সতিই লাভ হয়েছিল। তা না হলে অবিশ্বাস এ বইটাই শেখা হত না। ফেল্দুর জীবনে সবচেয়ে ধূর্যবৰ্ধ ও সাংবাদিক

শ্রীতিশ্রীর সঙ্গে তাকে এই বেনরেসেই লভ্যতে হয়েছিল। ও পরে বলেছিল—‘এই বৃক্ষ একজন লোকের জন্মই অ্যাশ্বিন অপেক্ষা করছিলাম রে তোপ্পশে। এসব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে পেটা বেশ একটা উন্নতের কাজ দেয়।’

দশাশ্বরমেধ ঘাটের রাম্ভার উপর পাটাশ বহরের পুরোন বাঁগালী হোটেলে কালকাটা লজ। হোটেলের যানেজার নিরঞ্জন চক্রবর্তী লালমোহনবাবুর গড়-পারের প্রতিবেশী প্লাট চাটার্জির ভায়রা ভাই। প্লাটবাবু আগে থেকে আমরা আসছি যদে ভানিয়ে দেওয়াতে হোটেলে বেঁগা পেতে কোনো অস্থিধা হয়েনি। অম্ভসর মেজে আমরা বেনারস পেঁচলাম সকাল পাঁচে নটার। সেখান থেকে টার্মিন নিয়ে হোটেলে আসতে আসতে হয়ে গেল দশতা।

যানেজার মশাই নিজে তখন হোটেলে নেই, কিন্তু তার ভায়গার যিনি ছিলেন তিনিই, চাকর হরকিবশের হাতে আমদের জিনিসপত্র উপরে পাঁচিয়ে আতাহ আমদের নাথ-ধার ত্যিখিয়ে সই করিয়ে নিলেন।

সোভলার গিরে দেখি যে চারটে খাট। তার একটা নিচে একটা মাঝোর সুটকেশ, আর বেমন-তেমনভাবে গুটিয়ে রাখা একটা হোল্ড-অল। এ ছাঁজ ঘাটের পাশে তাকে আর আলনায় কিছু জিনিসপত্র কাপড়-চোপড় ইত্যাদি রয়েছে। ফেনুদা সেগুলোর উপর একবার ঢাক বুলিয়ে নিয়ে লালমোহনবাবুর দিকে কিরে চাপা গলার বলল, ‘মাসিকা গর্জনে আপনার ঘূমের বাধাত হয় না ত?’

‘কেন? কই, আপনার ত নাক ডাকে না।’

‘আমার না; আমি আমদের রূম-ঘুমেটের কথা বলছি।’

‘সেকি মশাই, আপনি লোকটার ওই কাটা জিনিসপত্র দেখেই—’

‘সঠিক বলে বলছি না; এটা অনুমান-যান্ত। সাধারণত হোটা সেকেরাই নাক ডাকার বেশি, আর ইনি যে শীর্ষকায় মন দেষ্টেও এই সার্ট আর পাচটের বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার উপরে ফেনজের শিশি থেকে অনুমান করা বায় থে এই মাঝে মাঝে নাক বন্ধ হয়ে যায়। সেখানেও নাক ডাকার একটা সম্ভাবনা থেকে থাক্কে।’

‘সর্বনাশ!—আরো কিছু বুবলেন নাকি?’

তাকের উপর প্রশান্তের জিনিসের ধারে শেভি-এর সরঁশামের অঙ্গাবটা অর্থপূর্ণ নয় কি? অবিশ্বা যাদি ইনি মাকুল হয়ে থাকেন তাহলে আলাদা কথা, না হলে বলব পার্টি-গোঁফ অবশ্যাঙ্গভাবী।’

হরকিবশের আনন্দ চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তিনজন ঘরের উত্তরে দিকের আরামদার এসে দাঁড়ায়। যে-রাম্ভার উপরে বাজাস্বা, সেটাই পূর্বে দিকে চলে গৈছে সোজা দশাশ্বরমেধ ঘাটে। রাম্ভার দুর্দিকে সারি সারি দোকানে হিঁস

আর ইংরাজিতে শেখা সাইনবোর্ড'। ফেল্দা কিছুক্ষণ তাঁকিয়ে থেকে বলল, 'তোপ্পে, তোকে বাদ কলা ধায় কলকাতার পাট উঠিহে এখানে এসে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে—পারিবি?'

একটু ভেবে বললাগ, 'বৈধহুর না।'

'কিন্তু এখানে এসেছিস যন্স করেই মনটা নেঞ্চ উঠছে—তাই নয় কি?'

সত্তাই তাই। কাশীতে সরাজীবন ধাকতে ভালো লাগবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু যখনই কাবাহি আট-দশ দিনের বেশি ধাকবার দরকার নেই তখনই মন বলছে বেনারসের হত্তে জাহাগা হুর না।

'তাম কারণটা কী জানিস?'—ফেল্দা বলল—'তুই যে নিচের দিকে তাঁকিয়ে শুধু একটা রাস্তা দেখছিস তা ত নয়; তুই দেখছিস বেনারসের রাস্তা। বেনারস! কাশী! বারঘাসী!—চারটিখানি কথা নয়। প্রথিবীর প্রাচীনতম শহর, পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর, পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর, পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর! বায়ুযুগ যাহাতারত মুনিবৰ্ধি যোগী সাধক হিন্দু অসলহান বৌদ্ধ জৈন সব মিলে এই বেনারসের একটা জেলকি আছে থার ফলে শহরটা নোংৰা হয়েও ক্রিতিহ্যে ঝলমল করতে থাকে। যাত্রা এখানে বসনাস করে তামা বিন গুজরানোর চিন্তায় আর এসব কথা জ্ঞানবার সময় পায় না, কিন্তু বাবা কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে আসে তামা এইসব ভেবেই ফশগ্রাম হয়ে থাকে।'

লালমোহনবাবু এই ফাঁকে কথন জানি ভিতরে চলে গিয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর গলার আওয়াজ পেয়ে পিছন ফিরে দেৰি তিনি সঙ্গে একজন অচেনা লোককে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাঝারি বয়স, মাথার কাঁচাপাকি চুল মাঝখানে সির্পি করে পিছন দিকে টোল করে আঁচড়ানো। ঢোকা মাকের নিচে পাতলা পান-পাত্র ঠোটি অল্প হাসিলে ফাঁক হয়ে আছে। ভদ্রলোক ফেল্দাকে সমস্কার করে বললেন, 'আপনার পৰিচয় পেলুম এন্তর কাছ থেকে। আমার হোটেলের সম্মান বাড়ল, হেঃ হেঃ।'

বুঝলাগ ইনিই হলেন ম্যানেজার নিম্নজন চৰকৰ্তা।

'কোনো অস্ত্রবিধা-টেপ্রিভেশন—?'

'না না—দিবি ধসম্বৰ্দ্ধা।'

আস্ত্র, নিচে আস্ত্র আঘাত হবে। আপনাদের চা দিয়োছে? শুধু চা? আঃ—ছি ছি!

দেয়ালে তিনটে ইংরিজি আর দুটো বাংলা কারলেডার, আর রবীন্দ্রনাথ স্বৰূপ বোস বিবেকানন্দ আর শ্রীঅর্পণদেৱ ছবি টাঙ্গানো। ম্যানেজারের ঘরে বসে আমরা আয়েক কাপ চা আর হাল্লুয়া সোহন খেলাম। এ ঘরটা বাড়ির ভিত্তিতে দিকে, তাই সাইকেল রিকশার হন্ম ছাড়া রাস্তার আগে কোনো শব্দই আসে না।

নিরঞ্জনবাবু বললেন, 'আমাৰ হোটেল গত মার্চ মাসে কিম্বত্তী গুণমত্ত
বাগচী থেকে গেছেন—ওই আপনাদেৱ তিনি মন্বৰ ঘৰটোতেই। ও—কৈ মাস্তু
মশাই! আপিৰ পাঞ্জাবীৰ প'ৰে গোৰুলিয়াৰ মোড়ে পান কিনতে গেচ, আৱ
তিনি মৰ্মনটে রাম্ভায় ভীড় জমে গেচে। হাত ভাঁক কৰে পান মুখে পুৱৰতে
আৱ তাতেই বাইসেপ টেলে বেৰুচ্ছে।..আপৰি কিম্বতু যাবাৰ অগে আমাৰে
অ্যালবামে দু লাইন লিখে দিয়ে যাবেন। অনেক গুণী লোকেৰ দেখা দয়েছে
ওতে। তবে মাঞ্চায় বাজাৰ, বোফেন ত—মনেৱ অতো হেন্দ বিতে পাৰব না
আপনাদেৱ, এই ষা দুঃখ।'

ফেল্দু বলল, 'আপৰি শুধু আমাৰ দেখা চাইছেন হেন—ইমিও কিম্বতু
খাঁড়তে কম যান না।'

জালমোহনবাবু বিনয় কৰাৰ ভাৰ কৰে কৈ একটা বলতে গিয়েও বললেন
না। নিরঞ্জনবাবু হেসে বললেন, 'ওৰ কথা আমাৰ ভাজাৰা ভাই আগেই জানিলো-
চিল। আপনাৰ আসাটা সাম্প্ৰাইজ কিমা, ভাই বলচি আৱ কি।'

জালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্কুস কৰছিলেন, এবাৱ আৱ আকতে
না প্ৰেৰ বললেন, 'কাগজে দেখলুম—এখনে একটি সাধুবাবাৰ আৰিঝাৰ
হয়েছে?'

'কে, আবলুস বাবা?'

'কই না ত। আবলুস ত নহ। অছাল-বাবা নাম দিয়েছে যে কাগজে।'

'ওই হল। হিন্দুগালাগা মছলি বলছে। আবলুস নাম আমাৰ দেওৱা।
গিজে দেখলে বুৰুবেন নামকৰণটা কেমন হয়েছে।'

'সতিই সতিৰে এসেছেন নাকি?'

প্ৰশ্নগুলো জালমোহনবাবুই কৰছেন, ফেল্দু প্ৰোত্ত। নিরঞ্জনবাবু
বললেন, 'ভাই ত বলচে। বলে এখন নাকি প্ৰাপ থেকে আসচোন। তবে স্টেটিং
পয়েন্ট হল গিযে হৰিম্বাৰে। এখন থেকে যাবেন মুক্ষু-পাটমা। তাৰপৰ
একদিন হয়ত দেখবেন কাৰ্য্যালয়ে গিয়ে মোঙ্গল ফেলেচেন বাবাজী।'

'অলৌকিক ক্ষমতাৰ ব্যাপারটা কৈ মশাই?'

'ষা শুনিঁচ ভাই বলচি। কেদাৰ ঘাটে টিংপাত হয়ে পড়ে হিলেন বাবাজী।
ভোৱ বাঁতিৰে অভ্য চৰোচি ঘাটে নেহেছেন। প্ৰয়াতিশ বজৱেৰ অভোস মশাই—
—ঝড় ধৰে সাড়ে চাৰটে—ফাল্ট ট, আৱাই-ত—শীঁড় প্ৰীঁড় কৰ্য। দেনো
তফাত নেই। সতৰ বছৰ বৰাস, চোখে ছাঁচি। পা যন্মাতে গিয়ে শান্তে বললো
নৰঞ্জ নৰঞ্জ কৈ ঠেকেছে, ঝুকে দেখে ঘনৰুৱ। গুয়েৱ চৰোড়া ঝুঁকোনো, মনে
হয় অনেকক্ষণ জলে ছিল। লোকটা এপাশ ওপাশ কৰছিল—যেন দেহৰু
অবস্থা থেকে সবে জ্ঞান ছিৱচ। চৰোচি মশাই ঘাড় নিচু কৰে দেখাচন,
ওমন সময় বাবাজী চোখ খুলে ভাৱী দিকে তেজে হিন্দি টালে বাল্লা ভাখাৰ

বললেন, 'মা এত জল দিয়ে থিলে রেখেছে তোকে, তা ও তোর আগন্তুনের ভয়?'
—বাগ, ওই এক কথাতেই অভয় চক্ষোর্ত্ত করত।'

আপোরা তিনজনে মুখ চাপয়া-চাপোর করছি দেখে নিরঙমনকাৰু বাজপাইটো
শুনিয়ে দিলেন।

'কাশী আসোৱ আগে অভয় চক্ষোর্ত্ত থাকতেন চুচ্ছোয়। সেইখনে একবার
কালীপুজোৱ তাৰ বাজ্জিৰ আগন্তুন লাগে। তাতে তাৰ শৰী আৱ একটি জোপ



বহনৰ হেলে মারা যায়। সেই থেকে ভূগোল বিবাগী হৱে কাশীবাসী হয়ে
আন। অত্যন্ত সদাশয়, সার্তুক মানুষ। বাকাছীৱ এই কথায় তাৰ ঘনেৰ কৈ
অবস্থা হবৈ সে ত বুঝতেই পারচেন।'

'সৈদিন থেকেই বাবাজী অভয় চক্ষোর্ত্তৰ থাজ্জিতে?'

'সৈদিন কৈ মশাই, কয়েক ষষ্ঠীৰ মধ্যে দীক্ষা-টৈকা কম্পিলট। তাৰপৰ
যা হয়। থবৰ কুটে যাব। লোক আসতে শ্ৰদ্ধ কৰে। তেগলোৱ দৰ্শন। ঘাটেৰ

কাছেই অভয় চঞ্চোগুর বাঁড়ি। ভেতরে উঠোন। দণ্ডয়ার উপর বাবাজী বসেন, উঠোনে ভস্তুয়া। একটি একটি ভঙ্গ কাছে আস, বাবাজী তাদের একটি করে মন্ত্রপ্রত শম্ভু দিয়ে দেন।

‘শুম্ভু কী মশাই?’ প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

‘মাছের আশি মশাই, মাছের আশি। সোকেরা বলছে স্বরং বিকু আবার
মাছ হয়ে এসেছেন।’

‘সে আশি কি খেতে হয় নাকি মশাই?’ লালমোহনবাবু এমনভাবে নাক
কুঁচকেছেন যেন আশটে গুৰু পাছেন।

‘খেতে হবে কেন? পর্যাদিন সুর্য ওঠার ঠিক আগে—যাকে বলে গ্রাম্যবৃক্ষ—
—সেই স্থানে গম্ভায় ভাসিয়ে দিলেই হল।’

‘গো করে কী কেউ কেনে ফল পাছে?’

‘আরে পাঁচজনের কথা ত বলতে পারি না—আমার একটা কলিক পেনের
মতো হাঁচিল; গোপেন ডাকাত আগকস্ত খেতে বলেচিল। খাঁচিলস্ব। বাবাজী
এলেন, দশম করলস্ব, আশি পেলস্ব—পর্যাদিন ভলে ভাসিয়ে দিলস্ব। এখন
পেনটা নেই বলেই চলে—তা সে হোৰিওপ্যাথির গুণ না আশপ্যাথির গুণ
তা বললে পারি না।’

‘কিম্বদন থাকবেন এখনে কিছু জানেন?’

‘ইনি ডাকাত কোনোথেকেই নাকি বেশিদিন থাকেন না। তবে এ’র আওয়াজ
দিনাটা নাকি ভস্তুয়াই ঠিক করে দেন।’

‘কিম্বকৰ?’

‘সটা আজ সম্মেবেলা জানা বলবে। আপনাদের নিয়ে যাৰ। আজই নাকি
জানা যাৰে বাবাজীৰ কাশীৰ মেয়াদ আৱ কিম্বদন।’

চুই

নিঃজনধার্য ঘরে বসে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু দোক বললেন খুব হাতে কিছুটা সময় আছে, তারপর নাকি বাস্কে যেতে হবে, তার আগে প্রবন্ধ উনি আমাদের সঙ্গে আবাসনে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ভাব দিকে কিছু দ্বর গেলেই রাস্তার দোক আর গাঁড় মলাচলের শব্দের সঙ্গে একটা নতুন শব্দ কানে আসতে থাকে। আরো কিছু দ্বর গেলেই একটা যোড় ঘরে সামনে গঙ্গা দেখতে পাওয়া যাব। এখান থেকে রাস্তাটা ঢালু হয়ে সির্পিড়ির ধাপ আরম্ভ হয়ে যাব। প্রত্যেক ধাপের মধ্যেখালে আর দু পাশে লাইন করে ভিত্তিরী। এক সঙ্গে এতে ভিত্তিরী এর আগে কখনো দৈর্ঘ্যিলি। এই ভিত্তিরীর অশেপাশেই চতুর দেড়াছে বোকা-পাঠার দল। লালহোহনবাবু বললেন, 'ধৰ্ম আপনার নাকের স্মরণশৰ্তি মশাই। এ গুরু ত আমি নিজেও শেয়েছি আগের বার—কিন্তু তুলে গেলাম কি করে?'

দশাখন্ডমেধ ঘাটের বর্ণনা দিতে গেলে আমিও ইহত আলহোহনবাবুর মতো জহজমাটি কথাটা ব্যবহার করতাম, কিন্তু ফেলদুর ধরকের পর আর করব না। হোটেলে ফিরে এসে ঘাটের দোককে কী কী কাজ করতে দেখেছি তার একটা নম্বর দেওয়া লিপ্তি করতে গিয়ে একশো ততো অর্ধধ পেঁচে থেমে গেলাম। সেটা আবার ফেলদুর পড়ে কজল, 'দিয়া হয়েছে—কেবল গোতা দিশেক বাবু পড়েছে।'

ঘাটের সির্পিড়িত দাঁড়িয়ে উন্নৰ দিকে চাইলে রেলের ত্রিজটা দেখা যাব, আর প্রব দিকে নদীর ওপারে দেখা যায় রামনগর—যেখানে রাজা আছে, কেন্ত্র আছে, আর নদীর ধারে নাকি সহামসৌদের একটা আস্তনা আছে।

দশাখন্ডমেধের পাশেই উন্নৰে হল মানসিঙ্গির ঘাট। ঘাটের উপরেই একটা বাড়ির ছাতে প্রায় চারশে বছর আগে জাজা জয়সিংহের তৈরি জেরাতিবিদ্যার বন্ধপাতি বয়েছে। দিলৈরটাৰ মতোই এটাও একটা ছোটখাটো ঘন্টুর-মন্তুর। ফেলদুর হয়ত সেটা দেখবার মতলবেই মানবন্দির ঘাটের সির্পিড়ি দিয়ে উঠোছিল, এখন সময় একটা ঘটনা ঘটিল।

এটা বলা দুরকার যে একটায় দশাখন্ডমেধের স্নানের হট্টগোল প্রায় পেঁচাইর না বললেই চলে। আওয়াজের মধ্যে দ্বর থেকে ভেসে আসা লাউডপৰ্সীকারে

হিমে ফিলের পান, আব আমাদের থেকে বেশ করেক ধাপ নিতে দৃঢ়ন
লোকের কাপড় কাচার শব্দ। আমাদের ডান দিকে একটা বটগাছ, তাতে
কতগুলো বাদুর বাদুরামো করছে। গাছের উপর দিকের ডাম্পালা একটা
হলদে বাঁড়ির ছাতের উপর ন্যয়ে পড়েছে। একটা চীৎকার শুনে আমাদের
চারঙ্গনেরই দৃষ্টি ছাতটার দিকে চলে গেছে।

একটি ছেলে ছাতের পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। তিনতলা বাঁড়ির ছাত।
ছেলেটি যেখানে দাঁড়িয়েছে তার সামনে একটা সরু গালি, আর গালির ওপাশে
আবেক্ষণ্য তিনতলা বাঁড়ি। সেটার রং লাল। সেটার ছাতেও নিষ্ঠয়ই একজন
কেউ আছে, যদিও তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাকেই উদ্দেশ্য করে প্রথম ছেলেটি
চাঁচাচ্ছে।

‘শয়তান সিং!'

হাঁক দেবার মেঝাজটা থেন সে একটা ফিলের হিঁড়ো।

গাল থেকে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ফিসফিস করে বলতেন, ‘যোগালদের বাঁড়ির ছেলে।
কুমার ভানাপটে।'

আবার তলপেটটা কেবল জানি করছে। ছেলেটি যাই একবার টাল হাঁয়ান
ত চীঁপশ-পাঞ্চাশ ফুট নিচে পাথরে বাঁধানো রাস্তায় পড়বে।

‘আব লুকিয়ে কোনো স্বত্ত্ব নেই। আমি জানি তুমি কোথায় আছ।’—
আবার চীৎকার করে উঠল ছেলেটি।

ফেল্দুও টাল হয়ে উপহের দিকে তেয়ে বটনাটা দেখছে। এবার ফেল্দুও-ব্যবস্থা
খসখসে চাপা ধালা শেনা শোল।

‘শয়তান সিং হচ্ছে অকুর নলীয়ের দেখা পাঁচখানা বইয়ের ভিত্তিন ঘণাই—
বহসা-যোগাপ সিরিজ।’

‘আমি আসাই তোমার কাছে।’—আবার চীৎকার এল—‘তুমি অ্যাসলপাঁশের
জন্ম প্রস্তুত হও।’

ছেলেটি হঠাতে পাঁচিল থেকে নেমে উঠাও। ভাবছি এবার কৌ নাটক দেখব
কে জানে, ওমন সহের হঠাতে দেখি একটা বাঁশ হলদে বাঁড়ির পাঁচিলের উপর
দিয়ে বেরিয়ে সামনের সাল বাঁড়ির ছাতের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই বাঁড়ির
আবধানে একটা ত্রিখ তৈরি করল। এইবার ফেল্দুও ধূম ধূল, যাদও গলার
শব্দ চাপা।

‘ওনার অতলবটা কৌ?’

‘শয়তান সিং!—আবার হৃষ্কার।’ তুমি মশ গৃহণতে গৃহণতে আমি তোমার
কাছে এসে পড়ব।

এবার বেটা ঘটল ভাতে আমাদের সকলেরই ঘাম ছুটে দোল।

ছেলেটি পাঁচিল থেকে কর্মিণে নেমে ধপ্ত করে বাঁশটা ধরে শুনো ধূলে



পঞ্চম :

‘এক...দুই...তিন...চার...’

উল্টো দিকের ছাত খেকে শয়তান সিৎ গুগতে শুরু করেছে, আর এ ছেলেটি বাধি খরে ব্লতে ব্লতে এগোচ্ছে।

‘একটা কিছু করল মশাই।’ নিরঞ্জনবাবু ধরা গলায় বললেন,—‘আমার কলিক পেন্টা আবার—’

ফেল্দার ডান হাতের তর্জনীটি গোথরোর ফোস করার মতো এক লাফে ঠোঁটে চলে এল। আবরা সবাই মর ব্যথ করে এই খন্দে ছেলের দুসাহসিক ব্যাপারটা দেখতে শাগলাম।

‘হয়...সাত আট...ন—র।’

নব গোনার সঙ্গে ছেলেটি উল্টো দিকে পোছে গিয়ে কানিংশে পা ফেলেই বাঁশেরই উপর ভর করে পাঁচিল টপকে লাল বাঁড়ির ছাতে দেমে গেল। তারপর শোনা গেল একটা অচেনা গলায় এক বিকট চীৎকার, আর সেই সঙ্গে প্রথম ছেলেটির এক অস্তুত উল্লম্বের হাসি।

লালমোহনবাবু বললেন, ‘মেরেই ফেললে নাকি মশাই?—কোথায় কেন হোরা গোছের কী একটা ব্লতে দেখলুম।’

ফেল্দা গালির দিকে পা বাঁড়িয়ে বলল, ‘ভিলেনটি কিরকম জানি না, হিরোটি যে দুর্মান্ত সাহসী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।’

নিরঞ্জনবাবু বললেন, ‘ঘোঁষল বাঁড়িতে নিপোট করা ছাড়া আর কোনো বাস্তা নেই।’

আবরা আরেকটা এগোতেই জাল বাঁড়িটার মুখজন সামনে পোছে গেলাম। ডিতরে অধিকার। কাছেই বোধ হো সিঁড়ি, কারণ ধূপ ধাপ পায়ের শব্দ পাওয়া, আর সেই সঙ্গে ছেলেটির কথা এগিয়ে আসছে।

...‘তারপর বপাং করে পড়বে জলে, আর ভাসতে ভাসতে ভাসতে জলে থাবে একেবারে সম্মতে, আর দেখানে একটা হাতের এসে উপ, করে গিলে দেলবে। আর সেই হাতের মখন ক্যাপ্টন স্পার্কের দিকে চার্জ করবে; তখন ক্যাপ্টন স্পার্ক হারপুন দিয়ে ঘাচাং করে মাঝে সেটাৰ পেটে, আর—’

এইটুকু বলে আর বলা হল না, কারণ ঘামে চপ্ট চপ্ট ছেলে দৃষ্টি দৱজা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে, আর প্রথম ছেলেটি আঘাদের দেখেই খন্দকে দাঁড়িয়েছে। বয়স বছর দশের বেশি নয়, ধূপধাপে ফরসা রং, চোখ নাক একেবারে ধাঙ্গপুত্রের মতো। অন্য ছেলেটির বয়স কিছুটা বেশি। ইনি যে বাঙালী নন সেটা দেখলেই বোধ যায়। দ্রঞ্জনেরই চোয়ালা যেভাবে চলছে তাতে বোঝাই যায় তারা মুখে চুইং গায় পুরে নিয়েছে।

ফেল্দা প্রথম ছেলেটিকে বলল, ‘ও-ত শয়তান সিৎ আর তুমি কে?’

‘ক্যাপ্টেন স্পার্ক’, চাবুকের মতো উত্তর দিল ছেলেটি।

‘তোমার আরেকটা নাম আছে না? তোমার বাবা তোমাকে কী বলে ডাকেন?’

‘আমার নাম ক্যাপ্টেন স্পার্ক’। আমার বাবাকে বিষাণু-জীর মেরে খুন করেছিল শহীতান সিং আঞ্চলিকার জগলে। তখন আমার বয়স সাত। তখন বেকে আমার চোখে প্রতিহিংসার বিদাং জগলে, তাই আমার নাম স্পার্ক।’

‘সর্বনাশ,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘এ যে অকুর নন্দীর বই মৃত্যু করে ফেলেছে মশাই।’

ছেলেটি লালমোহনবাবুর দিকে একবার কটমট করে ডাকিয়ে তার বন্ধুকে নিয়ে গম্ভীরভাবে গল্প দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘বন্ধু আকেট’—মন্তব্য করলেন জটায়ু।

জেলদা নিরঞ্জনবাবুকে জিগোস করল, ‘বোঝাল বাড়তে কাউকে ডেনেন?’

‘চিনব না? আসিদন রয়েছ কাশীতে।’ ওদের সকলেই ছেনে। প্রায় একশো বছর হল বেনারসে বাস। এই যে খোকাকে দেখলেন, এর ঠাকুরদা অস্বিকা ঘোষাল এখানেই থাকেন। ওকালাতি করতেন, বছর বাবেক হল ছেড়ে দিয়েছেন। খোকার বাপ উমানাথ ঘোষাল কলকাতায় থাকেন, ফেরিক্যালের বাবস্য। প্রত্যেক পুরোজুর ফার্মালি নিয়ে এখনে আসেন। এদের বাড়তেই দুর্গাপুরো ইয়। খনদানি পরিবার মশাই। আদের জামদারি ছিল ইস্টবেঙ্গলে পদ্মাৰ ধারে।’

‘একবার উমানাথের সঙ্গে দেখা করা যায়?’

‘কেন যাবে না? আপনারা ত আবলুসবাবা সর্বনে যাবেন বৰাছিলেন, সেখানেও দেখা হবে যেতে পারে। শুনৰ্ছ বাকি ইনিও দীক্ষা নেবেন নেবেন কৰচেন।’

আবলুসবাবাকে সেখে নিরঞ্জনবাবুর নামকরণের তারিফ না করে শারা যায় না। জেলদা দেখেছে কিনা জানি না, অমি নিজে জীবনে এত বিশকালো লোক দেখিনি। শুধু কালো ময়, এমন মস্ত কালো বৈ ইঠাং দেখলে মনে হয় গায়ে বুঝি সরপের খোলসের মতো একটা কিছু পরে আছেন। তার উপরে কাঁধ অবধি চেউ খেলানো চুল, আমি বুক অবধি চেউ খেলানো দাঢ়ি—দুটোই কুচকুচে কালো। সাধুবাবা জোয়ান লোক; বয়স ক্রিশ-পঞ্চাশের বেশি হলে আশচর্য হব। অবিশ্য জোয়ান মাঝলে আর এত সীতায় কাটেন কী করে। বাবার চেহারা আরো খোলতাই হয়েছে তার গায়ের টকটকে লাল সিঙ্কেকে ঢাদুর অৱে লুঁগুড় জন্ম।

আমরা জারুরি উঠোনে উঠেছের ভৌজের পিছনে দীঢ়িয়েছি, বাবাজী

বারান্দার শৈতল-পাটির উপর বিছানো একটা সাদা চামরে বসেছেন, তার দুপাশে দুটো আর পিছনে একটা হলদে মখমলের তাঁকিয়া। বাবার বী পাশে একজন বৃষ্টি চোর বুঝে হাত জোড় করে বসে আছেন, যোবাই থাক্কে ইনি হলেন অভয় চক্রবর্তী। হাবা নিজে পশ্চাসনের ভুঁগতে বসে অল্প অল্প দূরে আছেন, আর ড.ন হাতের ডেলো দিয়ে ছাঁটিতে হাত ব্লোকেন। দোলানিটা হচ্ছে তালে তালে, কারণ বারান্দার এক ধারে বসে একজন লোক কাঠের খালি খাঁকিয়ে একটা হিন্দুস্থানী ভজন গাইছে। গানের প্রথম দুটো লাইন মনে হিল, হোটেসে ফিরে এসে থাতার লিখে বেখোছলাম—

ইতনী বিনাতি রঘুনন্দন সে
দৃষ্টি স্বৰ্গ হামারা মিঠো জী—

আজ আর সেই মাছের আঁশের ব্যাপারটা হচ্ছে না। তার বদলে আজ একটা বিশেষ ঘটনা ঘট্যার কথা আছে; মহলিবাবা আজ তার ভক্তদের কাছ থেকে জেনে নেবেন আর কিম্বন পরে তাকে কাশী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সেটা যে কী ভাবে জানা হবে তা এখনো কেউ জানে না।

লালমোহনবাবুর দেখাই বেনারসে এসেই ভাঙ্গভাবটা একটু বেড়ে গেছে। সরকালে দশাপর্যন্ত ঘটে শুকে বার তিনেক বেশ গলা উঁচিয়ে 'জয় বাধা বিশ্ববন্ধে' খলতে শুনেছি। এখানে এসে দেখাই খাবাজীকে সেখেই ওর হাত দুটো অপেনা থেকেই জোড় হয়ে গেছে। এত ভাঙ্গ দেখালে অ্যাডভেণ্চুর গল্পের প্রাচ মাথায় কী করে অসমে জানি না। বোধ হয় তারেছেন মহলিবাবা ওকে স্বল্পে স্বল্প দিয়ে দেবেন।

কালো প্যান্ট আর নৈল রঞ্জের গুরু, সাট পর্যা একজন ভদ্রলোক সবেমাদু আমাদের পিছন দিয়ে চুকে আমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে বোধহয় তারেছেন ভৌঁড় টেলে কী করে এগোন যান। নিরঞ্জনবাবু, লোকটির দিকে ঝুকে পড়ে বললেন, 'ঘোশল সাহেব এলেন না?' ভদ্রলোক গলা নামিয়ে উঠের বিসেন, 'আজে না, এনার প্রত্তুতো ভাই আর তার শ্রী এসে পৌছেছেন আজ দুর্গাপুরে থেকে, বাড়িতে ভাই...'

ভদ্রলোকের রং ফুরসাৰ দিকে, ঝুঁপিটা হাল খালান্তে, চোখে চশমা, পৰ বিলিয়ে মোটাহুটি চালাক চতুর চেহারা। 'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে নিই'—নিরঞ্জনবাবু ফেলুন্দাৰ দিকে চেয়ে বললেন—'ইনি বিকাশ সিংহ—উমানাগবাবুৰ সেক্রেটারি।'

প্রারম্ভ আমাদের তিনজনেরও পরিচয় করিয়ে বিসেন নিরঞ্জনবাবু। ফেলুন্দাৰ নাম শুনেই সিংহ হশাইয়ের কুরুটা কুঁচকে গেল।

'প্রদোষ হিত? গোয়েন্দা প্রদোষ হিত!'

'হ্যাঁ মশাই'—নিরঞ্জনবাবু গলা চাপতে ভুলে গেলেন—'স্বনামধনা ভিটেক-

ঠিক। আর ইনি অবিশ্য কথ ইয়ে নন—'

নিরঞ্জনবাবু লালমোহনবাবুর দিকে দেখান্তে সত্ত্বেও সিংহ মশাইয়ের দ্রুত
ফেল্দুর দিকেই রয়ে গেল। ভদ্রলোক কী বেন বলতে চাইছেন।

‘ইয়ে আপনি এখানে আছেন জানলে...কোথায় উঠেছেন কজন ত?’

‘আবারই হ্যাতেলে মশাই!—নিরঞ্জনবাবু এবার খেয়াল করে গোটা নামকে
কথাটা বললেন।

‘ঠিক আছে, মানে...’ বিকাশবাবু এখনো আমতা-আমতা করছেন—
‘একবারটি খোখ হৱ...ঠিক আছে, কাল না হয় বোগাবোগ করব।’

ভদ্রলোক মহস্কার করে তীক্ষ্ণ চেলে এগিয়ে গেলেন।

‘এক তৃষ্ণ, এক স্বৰ্ব, এক চন্দ্ৰ।’

মহলিবাবা দুহাত তুলে চৌচিয়ে উঠেছেন। ভজন থেয়ে গেল। ভজন
সবাই খমকে শিয়ে সোজা হয়ে বসল। এতক্ষণ লক্ষ করিন, এবার দেখলাম
বাবার হ্যাতিকে অভয়বাবু বসেছেন তার উপরে দিকে আরেকটি ভদ্রলোক—বছর
চাঁপশেক বয়স—সামনে একটা নকশা করা ঘৰি নিয়ে বসেছেন। ঘৰির পাশে
স্তুপ করে কালো কালো কী জানি আখা রয়েছে।

‘দু হাত দু পা দু চোখ দু কান!—বাবাজী আবার শুব্দ করলেন। এসব
বলার কী খানে কিষ্টই বুঝতে পারাই না; অনেকো কেউ বুঝতে কিনা তা ও
বুঝতে পারাই না।

‘তিন কুল তিন কাল চারদিক চাত বৃগ পঞ্চ ভূত পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ নদ পঞ্চ
পান্ডব—এক, দো, তিন, চার, পাঁচ।’

বাবাজী একটু থামলেন। ঘৰিওয়ালা ভদ্রলোক তার দিকে হাঁ করে চেয়ে
আছেন, ভজনও সব চেয়ে আছে। লালমোহনবাবু আবার কানের কাছে ফিস-
ফিস করে বললেন, “প্রিলিং।” বাবাজী আবার শুব্দ করলেন—

‘ছে রিপু ছে অভু, স্মৃত স্মৃত স্মৃত স্মৃত, অভু ধাতু অভু সিংধি, নববৃক্ষ
নবগ্রহ, দশকর্ম’ দশ মহাবিদ্যা দশবিজ্ঞার দশাবিমেধ—এক থেকে দশ।’

এইটুকু বলে বাবাজী ঘৰিওয়ালা ভদ্রলোকের দিকে ইশারা করলেন।
ভদ্রলোক ফিসফিস করে বাবাজীকে কী যেন বলে দিলেন। তারপর ভজনের
দিকে ফিরে অস্বাভাবিক বৃক্ষ সরু গলায় বললেন, ‘এবার আপনারা এক থেকে
দশের হ্যাতা একটি সংখ্যা বেছে নিয়ে একে একে বাবাজীর সামনে এসে এই
ঘৰের অধো থেকে একটি কাগজের টুকরো নিয়ে তাতে এই কাঠকয়লার সাহায্যে
সংখ্যাটি লিখে আবার হাতে দিয়ে দেবেন।’ প্রথমে বাঙলায় বলে আবার সেটা
হিল্দি করে বললেম।

ফেল্দু নিরঞ্জনবাবুর দিকে ঝুকে পড়ে বলল, ‘যে সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি
আব পড়বে, সেটাই কি বলে দেবে বাবা কীদিন ধাকবেন?’

হয়ত তাই। সেটা ত বললে না কিছু।'

'বাদি তাই হয় তাহলে বোধহীন ব্যাবাজীর সাতদিনের বৈশিষ্ট্য আরাদ দেই।'

'আপনি লিখবেন নাকি?'

'না মশাই। বাবা ধাকছেন কি বাচ্চের সে নিয়ে ত আমাদের অত বাবা-বাপ নেই। আমরা দেখতে এসেছি, সূর থেকে দেখে চলে যাব—বাস্ত। তবে একটা জিনিস জানাব কোতুহল হচ্ছে। এইসব ক্ষমতার মধ্যে কিছু কিছু গণমান লোকও আছেন ত, নাকি সবাই সাজানো ভুল?'

'কী বলছেন মশাই!—নিরঞ্জনবাবুর চের কপালে উঠে গেল। 'এয়া সব বলতে পারেন একেবারে ঝৌঁঁ অফ কাশী। ওই দেখন—সাথ চান গায়ে, যাথায় টাক—উনি হলেন শুভ্রতার হেপ বাচস্পতি, মহাপাংক্ষত—আজন্ম কাশীতে রয়েছেন। তারপর ওই দেখন ভূতুলুর মেল কবিবাজে, দুরাশকুর শুভ্রা—এলাহাবাদ ব্যাক্ষেব এজেন্ট। যিনি ব্যাবাজীর পাশে পালি নিয়ে বসে আছেন তিনি হলেন অভয় চকোন্তির ভাইপো-আলিগড় ইউনিভার্সিটিতে ইংরিজির প্রফেসর। উকৌল ব্যারিস্টার ডাকার প্রফেসর ইল-ইকর—কিছু বাদ নেই মশাই। আর মাহলা কৃত আছেন সে ও দেখতেই পাচ্ছেন। আর ওই দেখন—'

নিরঞ্জনবাবু একজন সাধা পাখাবি আর সাদা বেনারিসী টুপি পরা জৌদরেন লোকের দিকে দেখালেন।

'ওক চেমেন? উনি হলেন মশানলাল মেঘবোজ। ওর মতো পুরুষা আর সাপট কাশীতে আর কারুর নেই। বেনারিসে যাই ধার ধাকত ত এখানকারে বলদগ্রামের সঙ্গে এক ঘাটে জল খেত ওর নামে।'

'মশানলাল মেঘবোজ?...নামটা চেনাচেনা মনে হচ্ছে।'

নিরঞ্জনবাবু ফেল্দুদার দিকে আরো থানিকটা কুকুরে পড়েন—আর সেই সঙ্গে আঘাত।

'দ্বাৰা প্রদলশ রেড হয়ে গেছে ওৱ বাঁজিতে। একবাবু কলকাতায়—ওৱ বড়বাজারের গাদতে—একবাবু এখেন্মে। চোৱা কারবাবু, কালো টাকা—যা ভাবতে চান ভাবন না।'

'প্রদলশ ত পাইনি কিছু—তাই না?'

'প্রদলশ ত সব ওৱ হাতের মুঠোয় মশাই। রেড ত নামকাওয়ালেত।'

জঙ্গের দল এখনো একজন একজন করে গিয়ে কাগজে নম্বৰ নিয়ে আসছে। দেখে মনে হয় কেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আমরা আরো মিনিট পাঁচেক দেখে বাইবে বেরিয়ে এলাম। গেটের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতে পিছন থেকে একটা ডাক শব্দে ঘূরে দেখি আর সঙ্গে নিরঞ্জনবাবু আমাদের আলাপ করিষ্যে দিলেন, সেই ঘিন্টায় সিংহ বাস্তভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে

আসছেন।

‘আপনারা চললেন?’—ভুবনেশ্বর বিশেষ করে যেস্তুদার পিকে তাকিবেই প্রশ্নটা করলেন। উত্তরে ফেলুন কিছু বলার আসোই ভুবনেশ্বর বললেন, ‘ইয়ে, আপনাদের এখনই একবারটা আমাদের বাড়ি আসা সম্ভব হবে কি? মিস্টার হোমাল আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে খুশি হতেন।’

যেস্তু হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, ‘আমাদের আর কী অসুবিধা বলুন। নিরঞ্জনবাবুকে অবিশ্বাস হয়ত হোটেলে ফিরে বেড়ে হবে।’

‘আপনারা তিনজনে দুরে আসলে?’ নিরঞ্জনবাবু কললেন, ‘তবে বেশ খাত না করলে খাবারটা গরম গরম থেতে পারবেন—এইটে শব্দ বলে বুঝলাম। আজ আপনাদের জন্য ফাউল কার্য করতে যাচ্ছি।’

তিনি

‘আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনিই ত ভুবনেশ্বরের যকীন তাঁর মাঝে উপ্থার করে দিবেছিলেন—তাই না?’

‘আজে হ্যাঁ—ফেল্দা’ ওর পক্ষে বতটা সম্ভব বিনয়ী হাসি হলে কলঙ্গ। উমানাথ বেঁধালের বয়স চাঁচিশেন্দুর বেশ না, গায়ের মণ হেলেহেই মতো টকটকে, চোখ দুটো কঢ়া আর চলচ্ছে। কথা কলার সময় সক্ষ করলাম যে দুটো ছুর, এক সঙ্গে কখনই উপরে উঠেছে না; একটা ওঠে ত অন্যটা নিঁড়ে ধেকে থায়।

‘এই সব আপনার—?’—ভুবলোকের দৃষ্টি ফেল্দাৰে দিক দেকে আমাদের দ্বন্দ্বের দিকে ঘূরে গৈছে।

‘এটি আমার খুড়ভুতো ভাই তপেশ, আর ইনি লালমোহন গাল্পলী, কটাই, ইন্দনাথে আডভেনচারের গাল্প দেখেন।’

‘জটাই?’—উমানাথের জন দুর্দণ্ড উঠে গেল। ‘নামটা চেনা চেনা আগছে। কিন্তু কাছে ওর কিছু বই দেখেছি বলে বলে মনে পড়ছে। তাই না হ্যে বিকাশ?’

‘আজে হ্যাঁ,’ বললেন বিকাশবাবু, ‘খান তিনেক আছে বোধহয়।’

‘বোধহয় আবার কি। তুমই ত বত গাজোর রহস্যের বই কিনে নাও বলে?’

বিকাশবাবু, অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, ‘ও ছাড়া ও আর কিছু পড়তেই চায় না।’

‘ও বলসে ত ওসব পড়বেই, পড়বেই,’ বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। সকালে ক্যাপ্টেন প্রার্ক আৰু শুভাজন সিৎ-এৰ নাম শোনা অবধি উনি বেশ অনশ্বর হয়ে ছিলেন; এখন আবার মুখে হাসি ফুটেছে। রহস্য রোমাঞ্চ বইৰের বাজারে অন্তৰ নম্বী নাকি জটাইৰ সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান।

ফেল্দা বলল, ‘আমি এমনিতেই একটা কাগে আপনার কাছে আসতে চেয়েছিলাম।... আপনার ছেলের সঙ্গে আজ আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তাৰ আসল নামটা যদিও এখনো জানতে পারিনি; তবে সে যে ভূমিকাৰ অভিনন্দন কৰিছিল তাৰ নামটা জানি।’

‘অভিনন্দন?’—উমানাথবাবু ছাঁহো করে হেসে উঠলেন। ‘আবে ও হে শুন্দি, নিজে অভিনন্দন করে তা ত নহ, অন্যদেরও দে নামটাম বসলৈ অঁচলঁঘ কৰাবো।

তোমাকেও একটা কী নাম দিয়েছিল না, বিকাশ ?

‘মাত্র একটা ?’ বিকাশবাবুও হেসে উঠলেন।

‘মাই হোক—তা, কোথায় দেখা হব আমার ছেলের সঙ্গে ?’

ফেল্দুদা কোনোক্ষম বাড়াবাড়ি না করে অপেক্ষা অন্তর্ভুক্ত গুহ্যে সকালের ঘটনাটা উমানাথবাবুকে বলল। ভদ্রলোক শৰ্মে প্রার্থ করার হেতু উঠে পড়লেন।

‘কী সর্বনাশের কথা !—ছেলে আমার ডার্নাপটে সে ত জানি ; তা থেকে তার একটা প্রসাহস সে ত জানতাম না। ও ত মরতে মরতে বেঁচে গেছে ! ইন্দুকে একবার ডেকে পাঠাও ত হে বিকাশ !’

মিষ্টার সিংহ ছেলেটির খোঁজে বেরিয়ে গেলেন। ফেল্দুদা কলল, ‘ডাক-নাম ইন্দু সে ত জানলাম। তালো নামটা কী ?’

‘ই-কিন্ধুরুমার’ কলানে উমানাথবাবু। ‘ও-ই আমার একমাত্র ছেলে ; কাজেই ঘটনাটা শৰ্মে আমার মনের অবস্থা কী হচ্ছে সে ত ব্যরতেই পেরেছেন।’

দুর্গাকুণ্ড বোজের উপর বিশাট কম্পাউন্ডের ধার্ঘা বিশাল বাড়ি ঘোষাল-দের। রাতে বাড়ির বাইরেটা ভালো করে দেখতে পাইনি—শুধু গেটের উপর শার্বেল ফলকে সেখা শংকরী-নিদাস নামটা দেখেছি। আমরা বসেছি একতলার বৈঠকখানায়। আমদের ডান পাশে দরজা দিয়ে পূজোর দালান দেখা যাচ্ছে। আমি যেখানে বসেছি সেখান থেকে প্রতিমার আধ্যাত্ম দেখতে পাইছি। ইঙ্গ চীয়ার কাছে এখনও চলেছে।

চাকর টেকে করে চা-শিষ্টি এনে আমদের সামনের টেবিলে দেখে বাবা’র পর উমানাথবাবু বললেন, ‘আপনারা মহলিয়াবা দর্শনে গিয়েছিলেন শুনলাম। কী মনে হল দেখেটেখে ?’

ফেল্দুদা একটা পেঁচার আধ্যাত্ম কাষত দিয়ে হ্রথে ফেলে বসল। ‘আমরা অল্পক্ষণই ছিলাম। শুনলাম আপনিও মারি যাচ্ছন ?’

যাচ্ছ মানে একবারই গোছ। বিভৌঁয়ুবাবুর যাবার আর বাসনা সেই কারণ সেদিন আমি না-থাকার জন্যেই দুঃখটিনা হটল।’

উমানাথবাবু চুপ করলেন। আমরাও চুপ। লালমোহনবাবু দেখলাম আড়তোখে একবার ফেল্দুদার দিকে দেখে নিলেন।

‘দুঃখটিনা ?’—ফেল্দুদা ফৌক তয়াবার জন্য প্রশ্ন করল।

‘হ্যাঁ !’ উমানাথবাবু একটা মৌখিক্যাস ফেললেন। ‘শুধু দামুর দিক দিয়ে নয়, প্রভাবের দিক দিয়েও একটি অম্লো জিমিস গত দু-বছর—অর্থাৎ আমি যেদিন বাবাজীকে দেখতে যাই সেদিন—আমার বাবার ঘর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আপনি যদি সেটিকে উম্মার করতে পারেন ত আমদের অশেষ উপকার হবে, এবং সেই সঙ্গে আপনাকে উপর্যুক্ত প্রাপ্তির্পণিক্ষণ দেব।’

আমার বুকের ভিতরে আমার খুব চেনা একটা ধূকপুরুনি আরম্ভ হয়ে গেছে।

‘জিনিসটা কী সেটা জানতে পারি?’ ফেল্দু জিগোস করল।

‘ছাপ্টা একটা জিনিস। মিষ্টার ঘোষাল দ্বাৰা অঙ্গুল ফাঁক কৰে জিনিসটাৰ সাইজ বৃদ্ধিৰে দিলেন। ‘আড়াই ইঁচ লম্বা একটা গণেশৰ ঘূর্ণ। সোনার ঘূর্ণ, তাৰ উপৰ দামী পাথৰ বসানো।’

‘ওটা কীভাৱে এস্টো আপনাদেৱ ধাঁড়িতে?’

‘বৰ্ণালি সেটা। একেবাৱে গলেপৰ অজো।...আপনাৰে ত বোধহয় চাৰামিনাৰ ছাড়া চলে না—’

ভদ্ৰলোক নিজে একটা ভানহিল মৃত্যু পূৰণতেই ফেল্দু আগুন এগিয়ে দিয়ে সেই সপ্তে নিজেও একটা চাৰামিনাৰ ধৰিয়ে নিল। একটা বড় টান দিয়ে ধৈৰ্যা ছেড়ে মিঃ ঘোষাল তাৰ কাহিনী বলতে শুৰু কৰলেন।

‘আমাৰ ঠাকুৰদাদাৰে থাবা। সোমেশ্বৰ ঘোষালেৰ ছিল কুমুণেৰ নেণা। ছাঁচিল বছৰে বসন্তে তিনি একা দেশ দেখতে বৈৰিয়ে যান। তখন নতুন বৈলগাঁড় হয়েছে, কিন্তু পথ তাতে থাবেন, অৱ বাকিটা হৱ হৈতে, আৱ না হুয়ত যা আনবাবন পাওয়া যায় তাতেই। দক্ষিণ ভাৱতে ধূৰাছলেন। তিচিনপঞ্জী থেকে যাদুৱা হয়ে সেতুবন্ধেৰ দিকে যাচ্ছলেন গৱৰুৰ গাঁড়িতে, জপলে ভয়া পাহাড়ে পথ দিয়ে। এই সময় মাৰুৰাতিৰে তিনিটি সশস্ত্র ভাকাত তীৰ গাড়ি আক্ৰমণ কৰে। সোমেশ্বৰ সাংসারিক শক্তিশালী লোক ছিলেন। সপ্তে বাঁশেৰ সাঠি ছিল। এবা তিনজনেৰ সপ্তে ল'ভে একটিৰ মাথা ফাটিয়ে দেন, অন্য দুটি পালায়। ভাকাতদেৱ একটা থলে পিছনে পড়ে থাকে। তাৰ মধ্যে ছিল এই গণপতি। সেই ঘূর্ণ সপ্তে কৰে উনি দেশে ফেলেন। তাৰপৰ থেকেই আমাদেৱ বংশেৰ ভাগা হিয়ে যায়। আমাকে আপৰিৰ কুসংস্কাৰাচ্ছন্ন সেকেল মানুষ থলে মনে কৰবেন না। আমাদেৱ বংশে যা ঘটতে দেখেছি তাৰ থেকে কতকগুলো বিশ্বাসি আমাৰ মনে জন্মেছে—বাস, এইচুই। সাতা বলতে বি, গণেশ আসাৰ পৰ থেকে আমাদেৱ ফ্যামিলিতে কোনো বড় বকম দ্রুতিৰ্মাণ ঘটেনি থলালেই চলে। ওটা আসাৰ দু বছৰেৰ মধ্যেই পৰমাদু ডাঙলে নদী আমাদেৱ বাঁড়িৰ বিশ হাতেৰ মধ্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু বাঁড়িৰ কোনো স্তৰত হয়নি। অবিশা এ ছাড়াও আৱো অনেক নৰ্জিৰ আছে, সব দিনত থেকে দীৰ্ঘ ইতিহাস হয়ে যাবে। আসল কথা এই বৈ, একশো বছৰ আমাদেৱ ফ্যামিলিতে থাকাৰ পৰ আজ সে ঘূর্ণ উধাও। বাঁড়িত পূজো, বাইৰে থেকে আদীয়-স্থান আসছে, কিন্তু সমস্ত সমাবোহেৰ উপৰ থেন একটা ছাড়া পড়ে বায়েছে।’

উমানাথবাবু যেন গুৰুত হয়ে সোফায় এলিয়ে পড়লোন। ফেল্দু পুনৰ কৰল, ‘কৰে গিয়েছিলেন আপৰিৰ মহলিবাবাকে দেখতে?’

‘তিনিদিন আগে। প্রতি বৃক্ষবারঃ পনেরই অক্টোবর। আমরা এসেইছি মাত্র দিন দশক হল। যহুলিবাবার কথা শুনে আমার গিজুর দেখতে যাবার শব্দ হল; তাই তৎক্ষণাৎ সঙ্গে করে নিয়ে দেলাই।’

‘আপনার ছেলেও যেতে চাইল?’

‘নামটা শুনে কৌতুহল! বলল ওর কেবল এক বইয়েতে নাকি কান কথা গয়েছে যে সত্তর মাইল সৌতার কেটে এসেছিল কুমুরীর হাঙ্গরের মধ্যে সিয়ে। অবিশ্বাস্য বাবাজীকে দেখে মোটেই ভালো লাগেনি। দশ মিনিটের মধ্যে উপর্যুক্ত শব্দ হয়ে গেল। ওর জন্মেই ত তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি এই কাশ্মৰ্দ্দি।’

‘সিল্ক আপনার বাবার থবে থাকে বলছিলেন না?’

‘হাঁ, তবে চাবিটা এমনিতে আমার ঘরেই থাকে। রিং-এর মধ্যে পাঁচ ছটা চাবি, তার মধ্যে একটিই হল ওই সিল্ককের। এমনিতে কেথাও বেয়োজে আমার সুন্দরীর কাছে চাবিটা থাকে, কিন্তু সেদিন ও-ও যাজে বলে বাবার থবের দেরাজে চাবিটা রেখে দাই। হয়ত খুব দুর্ঘটনার কাজ হয়েন, কারণ বাথা সন্ধের দিকে একটু আফিয়া-টাফিয়া থান, খুব একটা হৃৎ থাকে না। যাই হোক— বাবার সময় চাবিটা রেখে দেরাজটা একেবারে শেষ অবধি ঠেলে বস্থ করে দিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি আধ ইঁগ থেজে। সম্ভেদ হল; তখন সিল্ক থবে দেখি প্রশংস্য নেই।’

ফেল্দু একটুক্ষণ ছুঁচকে থেকে বলল, ‘আপনার বাড়িতে সেদিন সেই সময়ে কে কে ছিলেন সেতো জানতে পারি কি?’

ফেল্দু আতা আনন্দিন, তবে উত্তরটা যে ওর হ্রদ্যস্থ ধাক্কে, আর নামগুলো হোটেলে গিয়ে লিখে নিতে পারবে সে বিষয়ে আমার কোনো সম্ভেদ নেই।

যিঃ দ্যোতি বললেন, ‘বাবোয়ান তিলোচনকে অপেক্ষা রেখে দেখলেন; ও প্রায় পঁয়তিশ বছর হল আমাদের বাড়িতে বয়েছে। ছফর ঠাকুর বিস সবাই পুরোন। প্রতিমা পড়েন শশীবাবু, আর তার ছেলে কানাই। শশীবাবু কাজ করছেন তিশ বছরের উপর। ছেলেটিও খুব ভালো। এ ছাড়া মালী আছে, সে পুরোনো। আর আছে বিকাশ—বে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে এল।’

‘বিকাশবাবু কল্পন আছেন?’

‘সেক্রেটারির কাজ করছে বছর পাঁচেক, আছে অনেকদিন। ও প্রায় ফ্যামিলি মেম্বারের মতোই হয়ে গেছে। ওর বাবা অর্থিলবাবু, আমাদের জয়বিদ্যারি সেরেন্টারের কাজ করতেন। ওর মা বিকাশ হবার সময়ই মারা যান। তার দুজন দলেক পারে বাপও চলে গেলেন জুপসিতে। অনাথ ছেলেটি সশান্মোচন মন্ত হয়ে যাজে শুনে আমার জ্যাঠামশাই ওকে বাড়িতে এনে রাখেন। ইস্কুল কলেজ সবই আমাদের বাড়িতে থেকেই। এর্বাচ দুর্ঘটনাই হল।’

কুইর খবরটা প্রলিখে সেননি ?

‘দেই রাখেই। এখনো পর্যন্ত কোনো হাদিস পাখনি !’

গণেশের খবর বাইরের কেউ জানত ?

উমানাথবাবু উত্তর দেবার আগেই বিকশবাবুর সঙ্গে রূক্ষণীকুমার এসে আসছিল। আমি জেবেছিলাম ক্যাপ্টেন স্প্যানের ভাগো বুবি প্রচণ্ড ধূমক আছে, কিন্তু দেখলাম উমানাথবাবু সেরকম লোক নন। শব্দে আড়ম্বোখে একবার জেলের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘কাল থেকে প্রজ্ঞোর কটা দিন আর বাইরে থাবে না। বাড়িতে বাগান আছে, ছাত আছে—থত খুশি খেলতে পার; ধূঢ়ি আছে, ধূঢ়ি ওড়াতে পার, বই আছে পড়তে পার, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছাড়া বাইরে বেরোবে না।’

‘আর লয়নান সিং ?’ কুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রূক্ষণীকুমার।

‘সে আবার কে ?’—উমানাথবাবুর বাঁ ভূমটা উঠে গোছে উপর দিকে।

‘ও বৈ কারাগারের শিক জেঙে পালিয়েছে !’

ঠিক আছে, আমি এর খবর এনে দেব তোমাকে,’ হাসকাত্তীবে হেসে আশবাসের সুবে বললেন বিকশবাবু। রকু মনে হল খানিকটা ভগসা পেয়েছে। অস্তত সে তার শাস্তির বাপারে আর কোনো আপত্তি না করে বিকশবাবুর হাত খরে ঘর থেকে বেরিয়ে দেল।

উমানাথবাবু বললেন, ‘বুঝতেই পারছেন আমার প্রত্যু একটু অতিমাত্রার কল্পনাপ্রবণ। যাই হোক—আপনার প্রশ্নের জবাব দিই এবার—গণপাতির খবর আমরা হেসে ধুক্কতে অনেকেই জানত। ওটা একটা কিংবদন্তীর ফতো মুখে সুখে রাটে গিয়েছিল। সেটা অবিশ্ব আমার জন্মের আগে। পরের দিকে এ নিয়ে আর বিশেব কেউ আলোচনা করত না। আমার নিজের হাতজীবন কাটে কলকাতার। কলেজে ধুক্কতে দু’একটি বশ্যাকে আমি গল্পছিলে গণেশের কথা বলেছিলাম। তার মধ্যে একটি বশ্য—অবিশ্ব এখন তাকে আর ধুখ ধরিল না—সন্তুষ্টি কাশীতে রয়েছেন। তার নাম ইগনসালে ঘেঁঠুজ !’

‘বুঝেছি,’ ফেলুদা বলল, ‘তাকে আজ মছলিবাবার ওখানে দেবলাই !’

‘ভানি। আমি বৌদ্ধন প্রেছিলাম সেদিনও ছিল; তার বাবাজীর কাছে বাতাসাত করার একটা করণ আছে। কিছুদিন থেকে তার ভাগা পরিবর্তন হয়েছে। খাজাসের দিকে অবশ্যই। বছর দু’এক আগে ওর প্লাইডের ফাট্টারিতে আগনে লাগ; থেকে এর শুরু। তারপর এই পত কয়েক মাসের মধ্যে ওর গোলমেলে কারবাজ সম্বন্ধে অনেক গভীর বাজারে ছাড়িয়ে পড়ে। ফলে ওর কলকাতার এবং বেনারসের বাড়িতে প্রলিস রেড হয়ে থার। আমি এখানে আসার স্মৃদিন বাদেই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। শোভাসুজি বলল যে গণেশটা শুর দুরকার। ওটা বৈ কলকাতায় আমার কাছে থাকে না,



এখানে বাবার শিল্পকে ধাকে, সেটা ও জানত। চাঁপশ শাজাৰ অবধি অফাৱ
কৰেছিল ওটাৰ জন্ম। আমি সোজামড়জি না বলে দিই। ও যাবার সময় শাস্তিয়ে
থায় যে জিনিসটা ও হাত কৰে তবে ছাড়বে। তাৰ ঠিক পাচদিন পৰে গণেশ
শিল্পক থেকে উদাও হৰে যায়।'

ভুলোক চুপ কৰলেন। ফেল্দাও চুপ, চিন্তিত। আমি জানি ওৱা
তিনমাসেৰ অবসৰ এইখানেই শেষ হল। সামনেৰ কাটা মিন কাশৈই হবে ওৱা
কাজেৰ জায়গা, সেক্ষতৰ জায়গা। লালমোহনবাৰুৰ বৰ্বিষাঢ়বাণী ইনে পড়ছে—
এক চিলে কিম পাৰ্থ। অবিশ্ব কাশেৰ ব্যাপোৱাটা মিৰ্জাৰ কৰছে—

‘আমাদেৱ থৰু ভাগা ভাল ষে আপনি ঠিক এই সময়ে এসে পড়লেন।
আপনাৰ উপৱ কাজেৰ ভাৱটা দিতে পাৱলে—’

‘নিশ্চয়ই। একশোবাৰ।’ ফেল্দা উঠে দাঁড়িয়েছে। ‘আপনি অনুমতি দিলে
কাজ সকালে একবাৰ আসতে চাই। আপনাৰ বাবার সঙ্গে একবাৰ কথা বলা
থাবে কি?’

‘কেন যাবে না? বাবার ত এখন কিউডার্ড জীৱন। অবিশ্ব বাবার মেজাজটা
ঠিক যাকে বলে দোলায়ে তা নয়। তবে সেটা বাইবেৰ খোলস। আৱ আপনি
বদি আমাদেৱ বাড়িৰ এণ্ডিক এণ্ডিক ঘূৰে দেখতে চান, তাও পাৱেন ম্বজল্দে।
আমি তিলোচনকে বলে রাখব আপনাকে এলো যেস চুক্ততে দেয়। আৱ বিকাশ
গ্ৰন্থেছে, ও-ও সব ব্যাপোৱে আপনাদেৱ হেলপ কৱতে পাৱে। আটটা নাগাড়
এলো ভাল—হাহমে যাবাকে তৈৰিৰ অক্ষম্যাৰ পাৰেন।’

বাড়ি কৰোৱ পথে পৱ পৱ দৃঢ়ো অন্ধকাৱ গালি দিয়ে আসবাৱ সময়
তিন টিমবাৱ পায়েৰ আওয়াজ শুনে পিছন কিৱে চাদৰ মুক্তি দেওয়া একই
লোককে দেখতে পেয়ে সেদিকে ফেল্দাব দৃঢ়ি আকৰ্ষণ কৱাৱ চেষ্টা
কৰেছিলাম। ও যে শব্দ পাস্তাই দিল না তা কয়—সাবাৰ রাস্তা ধৰে গুনগুন
কৰে ইশক ইশক ইশক ছীৰুৰ এহনিতেই একটা যাজে গান সমানে ভুল স্মৰণ
গৈৱে গৈল।

চার

ক্যালকাটা লজের ঠাকুর ফাউল কারিটা দিবা রেখেছিল। এ ছাড়া রেই
মাছের কালিয়া ছিল, রাশাও তাসো হয়েছিল, কিন্তু খুন লম্বোহনবাবু খেজেন
না। বললেন, 'হচ্ছিবোকে দেখার পর থেকে আর মাছ খেতে ঘন চাপ না
মশাই।'

'কেন?' ফেল্দু যন্তে, 'খেলেই মনে হবে বাবাকে চিবিয়ে থাক্কেন?
আপমার কি ধারণা বাবা নিজে মাছ খান না?'

'খান বৰ্তুকি?'

'শুনলেন ত বাবা জলেই থাকেন বেশির ভাগ সময়। জলে মাছ ছাড়া
আর খাবার কী আছে বলুন। মাছেরও যে মাছ খায় সেটা জানেন?'

লম্বোহনবাবু চুপ হেয়ে গেলেন। আমার বিশ্বাস কাল থেকে উইন আবার
মাছ খবেন।

সার্বাদিনের নানারকম ঘটনার পর রাত্রে একটা লম্বা ঘূর্ম দেব ভেবেছিলাম,
কিন্তু খানিকটা ব্যাধাত করলেন রংম-মেট জীবনবাবু। জীবনবাবু দোটা,
জীবনবাবু বেটে, জীবনবাবুর চাপ দাঁড়, আর জীবনবাবু বালিশে যাথা
যাথার দশ হিনিটের মধ্যে নাম ডাকতে শুরু করেন। ডন্ডোক একটা ডাক্তারি
কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ, দুর্দিন হল এসেছেন, কালই সকালে চলে যাবেন।
ফেল্দুর সঙ্গে পারিচয় হোর এক মিনিটের মধ্যে বাগ খুলে কোম্পানির
নাম দেখাই করা একটা ডট পেন ফেল্দুকে দিয়ে দিলেন—যাদও সেটা ওকে
অস্বীকৃত গোরেন্দা বলে চিনতে পারার দরখ কিমা বোঝা গেল না।

পর্যবেক্ষণ সকালে সাড়ে সাতটার মধ্যে আমরা তিনজন চানটান করে চা ডিম
প্রতি খেয়ে রেডি। বেরোবার শুধে নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ফেল্দু
দুটো আজেবাকে কথার পর জিগোস করলে, 'মগনলাল মেঘরাজের বাড়ীটা
কোথায় জানেন?'

'মেঘরাজ? যদ্বৰ জানি ওর দুটো বাড়ি আছে শহরে, দুটোই একেবাবে
হাট অঞ্চল কাশীতে। একটা বোধহয় জ্যোতিশাপীর উত্তর দিকের গালিটায়।
আপনি ওখানে কাউকে জিগোস করলেই দোখয়ে দেবে। প্রথম ধার্মিক ত,
তাই একেবাবে খোদ বিশ্বনাথের ঘণ্টা শূলতে টাকার হিসেব করে।'

নিরজনবাবুর কাছ থেকে আটটো খন পেলাম। অঙ্গীরাবাবা নাকি আম
কথিন আছেন শহরে। কথাটো শুনে ফেলুন শুন্দি ওর একপেশে হাসিটা
হাসল, শুবে কিছু বলল না।

ঘড়ি ধরে আটটোর সময় আমরা শুকরী নিবাসের গেটের সামনে গিয়ে
হাজির হলাম। তিলোচনের জেহারাটো রান্ডে ভালো করে দেখিনি, আজ দিনের
অন্তে গালপাটোর বহর দেখে বেশ হক্কিয়ে গেলাম। বয়স সতৰ-টতৰ
হবে নিশ্চই, তবে এখনো মেরুস-ড একসহ দোকা। আমাসের মেখেই হাসির
সঙ্গে একটো প্রাট সালত্ত ঠুকে গেটটো খুলে দিল।

গাঁড়বাবাস্দার দিকে কিছুব্ব এগিয়ে যেতেই বিকাশবাবু বেরিয়ে এলেন।

‘জানবো দিয়ে দেখলাম আপনাদের চুক্তে।’ ভদ্রলোক বোধহয় সবেমন
সাড়ি কাছিয়েছেন; যা দিকের ঢুলাপন নিচে এখনো সাধান লেগে রয়েছে।
ভেতরে বাবেন? কর্তীমণ্ডাই কিশু রেড। আপনি ওর সঙ্গেই আগে কথা
বলবেন ত?’

মেলুন বলল, ‘তাত্ত আগে আপনার কাছ থেকে কিছু কথা জেনে সোট
করে নিতে চাই।’

‘বেশ ত, থলুন না কী জানতে চান।’

বিকাশবাবুর কাছ থেকে কতকগুলো তারিখ নোট করে মিরে খাতার যা
দাঁড়াল তা এই—

১। মগনজাল উমানাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ১০ই অক্টোবৰ।

২। উমানাথবাবু তাঁর স্তৰী ও ছেলেকে নিয়ে অঙ্গীরাবা দৰ্শনে যান ১৫ই
অক্টোবৰ সন্ধিশ সাড়ে সাতটোর। দাড়ি ফেরেন সাড়ে আটটোর কিছু পরে। এই
সময়ের মধ্যাই গণেশ মুরি যার।

৩। ১৫ই অক্টোবৰ সাড়ে সাতটো থেকে সাড়ে আটটোর মধ্যে শুকরী-
নিবাসে হিল—উমানাথবাবুর বাবা অম্বিকা ঘোধাল, বিকাশ সিংহ, অম্বিকা-
বাবুর বেয়াদা টৈকুন্ট, চাকর ভয়স্বাঙ্গ, কি সৌদামিনী, ঠাকুর নিতানল, মালী
লক্ষ্মণ, তাঁর বড় আর তাঁদের একটি সাত বছরের ছেলে, দারোয়ান তিলোচন,
প্রতিমার কাঁবিগর শশী পাল ও তাঁর ছেলে কানাই, আর প্রতিমার কাজে
জোগান দেবার একজন লোক, নাম নিবারণ। এই এক ঘণ্টার মধ্যে বাইরে
থেকে কেউ না অসে থাকলে বুঝতে হবে এদেরই মধ্যে কেউ না কেউ
অম্বিকাবাবুর দরে ঢুকে তাঁর টৌবিলের দেরাজ থেকে চাবি নিলে সিদ্ধক
পুলে গণেশ বার করে নিয়েছিল।

খাতায় নেট করা শেষ হলে ফেলুন বিকাশবাবুর দিকে ফিরে বলল,
‘কিছু মনে করবেন না—এ ব্যাপারে ত কাউকে বাদ দেওয়া চালে না, কাজেই
আপনাকেও—’

ফেল্দার কথা শেষ হবার আগেই বিকাশবাবু হেমে থলেন, 'ব্যর্থেছি;
এ ব্যাপারটা পুরিশের সঙ্গে এক দফা হয়ে গেছে। আমি সেদিন ওই এক
দফ্টা সময়টা কী করছিলাম সেটা জানতে চাইছেন ত ?'

'হ্যাঁ—তখে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে !'

'বলুন।—কিন্তু এখানে কেন, আমার ঘরে চলুন !'

বাঁড়ির সামনের দরজা দিয়ে চুকে ভান্দাকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি,
আর বাঁদিকে বিকাশবাবুর ঘর। বাঁক কথা ঘরে বসেই হল।

ফেল্দা বলে, 'আপনি গণেশের কথাটা জানতেন নিশ্চয়ই !'

'অনেকদিন থেকেই জানি !'

'মগনলাল যেদিন উমানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেদিন আপনি
বাঁড়িতে ছিলেন ?'

'হ্যাঁ। আমিই মগনলালকে নিসিড় করে কৈতকথানার বসাই। তারপর
ভৱ্যাজকে দিয়ে দোতলায় মিষ্টার ঘোষালের কাছে খবর পাঠাই !'

'তারপর ?'

'তারপর আমি নিজের ঘরে চলে আসি !'

'দ্বিতীয়ের ঘণ্টা যে কথাকাটাকাটি হয়েছিল সেটা আপনি জানতেন ?'

'না। আমার ঘর থেকে কৈতকথানার কথাবার্তা কিছু শেনা যাই না।
তাছাড়া আমার ঘরে তখন রেডিও চলছিল।'

'যেদিন গণেশটা চুরি শেল, সেদিনও কি আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন ?'

'বেশির ভাগ সময়। মিষ্টার ঘোষালরা যখন বাইরে থান তখন আমি
ওদের গেটে পর্যন্ত পৌঁছে দিই। ওখান থেকে বাই প্রজোগ্নিপে। শব্দীবাবুর
কাজ দেখতে বেশ লাগে। সেদিন তদন্তকে দেখে অস্ত্র মনে হল। জিগোস
করাতে থলেন শরীরটা মাজমাজ করছে। আমি ঘরে এসে ওষুধ নিয়ে
ওকে দিয়ে আসি।'

'হোমিওপ্যাথিক কী ? আপনার শেলকে দ্বটো হোমিওপ্যাথিক বই দেখেছি !'

'হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক !'

'কী ওষুধ জানতে পারি ?'

'পালসেটিলা পাটি !'

'ওষুধ দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন ?'

'হ্যাঁ !'

'কী কর্তৃছিলেন ঘরে ?'

'লখনৌ রেডিও থেকে আখতারি বাইরের বেক্টর দিছিল—তাই
শুনছিলাম !'

'কতক্ষণ রেডিও শেনেন ?'

‘ওটা চালানোই ছিল। আমি মাগাজিন পড়াচ্ছাম। ইলাম্প্রেচে
উইকলি।’

‘তাত্ত্বিক মিস্টার যোগাল হেরা না পর্যন্ত আর বাইরে বেরোন নি?’

‘না। বেল্পোরী ক্লাব কাব্যলিঙ্গালা খিরেটার করছে; তবে তারক থেকে
দুজনের আসার কথা ছিল মিস্টার যোগালের সঙ্গে দেখা করার অন্ত—যোগাল
প্রধান অভিষ্ঠি হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে। তবের আসার অন্তক্রম বলে
ছিলাম।’

‘ওরা এসেছিলেন?’

‘অনেক পরে। নটার পরে।’

ফেল্দ দরজা দিয়ে দোতলায় আবার সির্ভিটার দিকে হেঁথে বললেন,
আপনি যেখানে বসেছিলেন সেখন থেকে ওই সির্ভিটা দেখা বাঞ্ছিল কি?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওটা দিয়ে কাউকে উঠতে বা নমতে দেখেছিলেন বলে অনেক ক্ষেত্রে?’

‘হ্যাঁ। তবে ওটা ছাড়াও আরেকটা সির্ভিটি আছে। পিছন দিকে। জমাপাত্রে
সির্ভিটি। সেটা দিয়ে কেউ উঠে আকলে আবার জানার কথা নয়।’

বিকাশবাবুর সঙ্গে কথা শেখ করে আমরা ভবনোককে সঙ্গে নিয়ে দোতলায়
অবিকাশবুর ঘরে পেলাম।

আনালোর ঘরে একটা প্রয়োন্ন আবাস কেদানার বসে ব্যবহৃত ভবনোক নিরিষ্ট
হনে স্টেটসমান পড়ছেন। পাশের আওয়াজ সেবে কমপক্ষে সাতকে থাক
ক্রিয়ে সেনার চশমার উপর পিয়ে অকুটি করে আবাসের দিকে দেখলেন।
ভবনোকের মাথার ঘোরানে টেক, কানের প্রস্থাপনে সাদা চুল, পাতি
গোক কাহানো, দু চোখের উপর কাঁচাপাকা মেশানো বন ছুরু।

বিকাশবাবু আবাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

অবিকাশবু মুখ খুলতেই ব্যবহার হে কুর দুশাটি দাঁতই কল্স। কুর
বজার সময় কিটু কিটু করে আওয়াজ হয়, যদে হয় এই বুকি দাঁত দুলে পড়ে।
প্রথমেই সোজা লালমোহনবুর দিকে চেতে বললেন, ‘আপনারও প্রতিশি
নাকি?’ লালমোহনবুর চুক্কে পিয়ে চোক শিখে বললেন, ‘আমি? ন ন—
আমি কিছুই না।’

‘কিছুই না? এ আবার কিরকম বিনয় ইহ?’

‘ন। ইনই, ধানে, গো-শো—’

বিকাশবু এগুরে এসে বাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন।

ইন শব্দের মিথ। গোরেলা হিসেবে এব নাম-জাক। প্রতিশি ত কিছুই
করতে পারল না, তাই মিস্টার যোগাল বলেছিলেন...’

অবিকাশবু এবার সেজা ফেল্দ দিকে চাইলেন।

উমা কৌ বলেছে? বলেছে গণেশ পেছে রলে ঘোষাল বৎশ বদস হলে
যাবে? নন্সেন্স! আর বদস কত। চীম্বল পেয়েছেনি। আমার তিরান্ত।
ঘোষাল বৎশের ইতিহাস সে আমার চেয়ে বেশি জনে? উমা ব্যবসায়ে উন্নতি
করেছে সে কি গণেশের দোলতে? নিজের বৃত্তিশূণ্য না থাকলে গণেশ কৌ
করবে? আর তার যে বৃত্তি সে কি গণেশ দিয়েছে? সে বৃত্তি সে দেয়েছে



তার বৎশের রঙের জেতে। নাইনিটিন টোন্টেনিকোরে কেন্দ্রজে ম্যাথামাটিকস্-এ
প্রাইপস করতে যাচ্ছিল অস্বিকা ঘোষাল—যাকে দেখছ তোমাদের সামনে। ধারার
সাতাঁদিন আগে পিঠে কারবাস্কেল হলে যায় থার অবস্থা। যাচ্ছিয়ে দিল না হয়
গণেশ, কিন্তু বিলেত যাওয়া যে প্রস্ত ইয়ে হেল চিরকালের জন্যে, তার জন্য কে
দ্বারা? ... উমানাথের বাবসা বৃত্তি আছে ঠিকই, তবে শুরু কর্মান্বয়ে উচিত ছিল
একশো বছর অংগ। এখন ত শুরুই সার্ক কেন্দ্ এক বস্বাহীর কাছে দৌকা
নেবাৰ হতলাৰ কৰছে।

‘তার মানে আপনার গণেশটা যাওয়াতে কোনো আপসোন নেই?’

— অস্বিকাবৰ্দ্ধ চশমা বুলে তার ঘোলাটে চোখ দুটো কেল্পনাৰ ঘূৰ্থের উপর
ফোকাস কৰলেন।

‘গণেশের গল্প একটো হৌৰে বসানো ছিল সেটোৱ কথা উমানাথ বলেছে?’

‘তা বলেছেন।’

‘কৌ হৌৰে তার নাম বলেছে?’

‘না, সেটা বলেননি।’

‘ও তা অনে না তাই বলেন। কল্পন্তি হৌৰের নাম শুনেছ?’

‘সহজে গুৰে কি?’

ফেলুন এই এককথার অস্বিকার্য, নয়ম হবে গোলেন। দৃষ্টিটা নামিলে নিয়ে বললেন, 'অ, তুম এ বিষয়ে কিছু জানতোন দেখুন। অতাম্ব কেয়ার হৈবে। আমার অপ্রসর হয়েছে কেন জান? পুরু দামী জিমিস বলে নয়; দামী ত বটেই; ওটোর জন্ম কত টাক্কা দিতে হচ্ছিল শুনলে তোমার মাথা ঘূরে থাবে। আসল কথা হচ্ছে—ইট ওয়েজ এ শয়ক অফ আট। এসব লাক্টোক আমি বিশ্বাস কৰি না।'

'ওই টেবিলের সেরাজেই কি ঢাবিটা ছিল?' ফেলুন প্রশ্ন করল। অস্বিকা-বাবুর আরাম কেনারা থেকে তিন-চার হাত দ্বারেই দুটো জনালার মাঝখানে টেবিলটা। এটা ঘরের দাঁকণ দিক। সিন্দুকটা উয়েছে উভয়-পশ্চিম কোণে। দুটোত মাঝখানে একটা প্রকান্ত আলিঙ্কালের খাট, তার উপর একটা ছ' ইঁক পুরু তোষকের উপর শাতলপাটি পাতা। অস্বিকার্য ফেলুন প্রশ্ন কোন জব না দিয়ে উল্লেখ আরেকটা প্রশ্ন করে বসলেন।

'আমি সংখ্যেলো মেশা কৰি সেটা উমা বলেছে?'

'আজে হাঁ।'

ফেলুন এত নুরমতাবে কাবুর সংস্ক কোনোদিন কথা বলেনি। অস্বিকা-বাবু বললেন, 'গৃহেশ নাকি ঢাইলে সিঁধি দেন; আমি থাই আফিং। সংখ্যের পর আমার বিশেষ হাত্প থাকে না। কাজেই সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আমার ঘরে কেউ এসেছিল কিনা মেকণ্ঠ আঘাতে জিগেস করে ঘল হবে না।'

'আপনার চেয়ার এখন বৈ ভাবে রাখা রয়েছে, সংখ্যেলোও কি সেইভাবেই আকে?'

'না। সকালে কাগজ পড়ি, তাই জনালা থাকে আমার পিছনে। সংখ্যের আকাশ দৌৰ্য, তাই জনালা থাকে সামনে।'

'তাহলে টেবিলের দিকে পঞ্চ করা থাকে। তার মজন ওদিকের পরজা দিয়ে কেউ এলে দেখতেই পাবেন না।'

'না।'

ফেলুন এবার টেবিলটার দিকে এগিয়ে গিয়ে খ'ব সাবধান ঢান দিয়ে দেয়াজট ঘূলল। কোনো শব্দ হল না। বাথ কবার বেলাতেও তাই।

এবার ও সিন্দুকটার দিকে এগিয়ে গেল। চৌকির উপরে রাখা পেঁজাজে সিন্দুকটা প্রার আমার ব'ক অবধি পৌঁজে গেছে।

'পুরুলিশ নিশ্চয়ই এটাৰ ভিতৰ ভালো করে খ'জে দেখেছে?'

বিবানৰ ঘললেন, 'তা তো খ'জেইহে, অভেবের হাপের খাপাবেও পুরুজ্জা করে দেখেছে, কিছুই পাইন।'

অস্বিকার্য ঘরের নংজা দিয়ে বেরোলে জাইনে পড়ে নিচে খাবার সি'ডি, আৰু ধীয়ে একটা ছোট ঘৰ। ঘৰটা দিয়ে ডান দিকে বেবিয়ে একটা

চওড়া মৈত্র পাথরে বাঁধানো বারান্দা। এটা বাড়ির দক্ষিণ দিক। পুরু দিকে বাগানের নিখ আৰু তেঁচুল গাছেৰ মাঝখনেৰ ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূৰে গঙ্গার কল সকালেৰ গোদে চিক্কিত কৱাচে। আমাদেৱ সামনে আৱ ভাইনে বেনারস শহৰ ছাড়িয়ে আছে। অৰ্মি মাসদেৱেৰ চৰ্জে গুৰুত্ব, ফেলুদা বিকাশ-বাবুকে একটা লিঙারেট দিয়ে নিজে একটা মুখে পুৱোছে, এমন সময় ফ্রান্সৰে হাতোয়াৰ সঙ্গে উপৰ দিক ধৰেক কী হেন একটা জিনিস পাক খেতে খেতে নেয়ে এসে লালমোহনবাবুৰ পাঞ্জাবৰ উপৰ পড়ল। লালমোহনবাবু সেটা খপ্প কৰে ধৰে ছাতেৰ ছুটে। খলতেই দেখা গেল সেটা আৱ বিছুই না—একটা চুইঁ গাহেৰ ঝাপার।

‘বৰ্কুণামুকুমাৰ ছাতে আহেন বলে মনে হচ্ছে?’ ফেলুদা বলল।

‘আৱ কোথাৰ থাকবে বলুন’, বিকাশবাবু হেলে বললৈন, ‘তাৰ ত এখন বস্তু অহস্থা। আৱ তাছাড়া ছাতে তাৰ একটা নিজস্ব ধৰ আছে।’

‘সেটা একবাৰ দেখা থার?’

‘নিচয়ই। সেই সঙ্গে চেনুন পিছনেৰ সিঁড়িটোও দেখিয়ে দিই।’

একবাবণ লোহার সিঁড়ি হয় বেগুলো বাড়িৰ বাইৱেৰ দেয়াল বেয়ে পাক ধৰে উপৰে উঠে থার। এটা দেখলাম সেৱকম সিঁড়ি নহ। এটা ইটেৰ ভৈরি, আৱ বাড়িৰ ভিতৱেই। অবে এটাও পাকানো, সিঁড়ি। ওঠবাৰ সময় ঠিক যানে হয় কোনো মিলাৰ বা মন্তুমণ্ডে উঠিছি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই ছাতেৰ ঘৰ, আৱ যী দিকে ছাতে যাবাৰ দৱজা। ঘৰেৰ ভিতৱে যেখেতে উব, হয়ে কসে আছে রুকু। একটা লাল-সাদা পেটকাটি ষুড়ি ধাটিতে ফেলে হাঁটিৰ চাপে সেটাকে ধৰে বেঞ্চে তাতে সৃতো পৱাচ্ছে। আমাদেৱ আসতে দেখেই কাজটা বস্থ কৰে সোজা হয়ে থসল। আমজ্ঞা চাবজনে ছোট ঘৰটাতে চৰকলাম।

বোৰাই থায় এটা বৰ্কুৱ ধেঞ্জাৰ ঘৰ—হাসি ও ইচ্ছুক জিনিস ছাড়াও আঝো অনেক কিছি, বোঝতাসা কৰে বাধা রয়েছে—সুটো পুদেস মচে ধৰা ষাণ্ক, একটা প্যাকিং কেস, একটা ছেঁড়া শাদুৰ, তিনটৈ হাঁরিকেন শপ্টন, একটা কাঁও কোনা জাকাই জালা, আৱ কোণে ডাই কোনা পুৱোন ধৰয়েৰ কাগজ আৱ ঘাঁসক পত্ৰিকা।

‘তুঃখি গোৱেন্দা?’

ফেলুদাৰ দিকে সঠাল একস্কেট তাৰিয়ে প্ৰশ্ন কৰল রুকু। আজ দেখাইছ ঘৰসা রঁটো গোহে পুকুড় হেন একটা আমাটো সাধছে। তাৰ মুখে হে চুইঁ গাম রয়েছে সেটা তাৰ চো঱াল নাড়া দেখেই বোৰ বাজ্জে। ফেলুদা হেলে, ‘ধৰগটা ক্যাপ্টেন স্পার্ক’ কি কংগৰে পেলেন সেটা জানতে পাৰি?’

‘আমাৰ আসিস্টেন্ট বলেছে।’ গম্ভীৰ ভাবে জানাল রুকু। সে আবাৰ

কুড়ির দিকে ঘন দিয়েছে।

‘কে তোমার আসিস্ট্যান্ট?’ ফেল্সা জিগ্যেস করল।

‘স্পার্কের আসিস্ট্যান্ট কুড়ে প্রাইভেট সিটি জান না? তুমি কিরকম ঘোড়েশ্বা?’

লালমোহনবাবু ছেট একটা কাশি দিলে তার দিকে আবাদের দৃষ্টি আবর্ণন করে রাখলেন, ‘বৃদ্ধিমাম ব্রাহ্মিত। সাড়ে চার কুট হইট। স্পার্কের জন্ম হাত।’

ফেল্সা বাপুরাটা বুরে নিজে বলল, ‘তোমার আছে তোমার আসিস্ট্যান্ট?’

উত্তরটা এল বিকাশবাবুর কাছ থেকে। ভদ্রলোক একটা অনশ্বৃত হাসি হেসে রাখলেন, ‘ও তুমিকাটা এখন আঢ়াকেই পেলেন করতে হচ্ছে।’

‘তোমার বিভাগার আছে?’ হঠাতে প্রশ্ন করল রংকু।

‘আছে,’ বলল ফেল্সা।

‘কী বিভাগার?’

‘কোম্পট।’

‘আর হারপ্লন?’

‘উইল। হারপ্লন নেই।’

‘তুমি জলের জলার শিকার করো না?’

‘এখন পর্যন্ত প্রোজেক্ট হয়নি।’

‘তোমার ছোরা আছে?’

‘ছোরা নেই। এমনকি এয়কম ছোরাও নেই।’

রংকুর থাথার উপরেই দেরালে পেরেক থেকে একটা ক্ষেত্র ছোরা ক্ষেত্র। এটাই কাল ওর কোথারে বাঁধা দেখেছিলাম।

‘ওই ছোরা অয়ি শরতান সিং-এর পেটে ঢুকিলে তুর নাড়িভুঁড়ি বার করে দেব।’

‘সে ত বৃক্ষলাম?’ ফেল্সা রংকুর পাশে আবেদ্ধে বসে পড়ে বলল, কিন্তু তোমাদের বাঁড়ির পিন্ডুর থেকে বে একজন শরতান সিং একটা সোনার গালেশ চুরি করে নিয়ে গেল তাৰ কী হবে?’

‘শরতান সিং এবাঁড়তে ঢুকিলে শারবে না।’

‘ক্ষেত্রে স্পার্ক’ মেদিন বৃক্ষলামবাবাকে দেখতে না গেলে এ বাপুরাটা হত না—তাই না?’

‘বৃক্ষলামবাবুর গালের বাঁটা কলোর গালের গালের মতো কলো।’

‘শারবে?’ বলে উঠলো লালমোহনবাবু, ‘তুমি গোরিলাৰ সোগোশ পড়েছ রংকুবাবু?’

গোরিলা বে লালমোহনবাবুই লেখা গোরিলার গোগোন-এর নম্বই
যুট সম্বা অতিকার বাক্সে গোরিলার মাঘ সেটা আমি জানতাম। গলেপুর
আইডিলাটা কিং কং থেকে নেওয়া, সেটা লালমোহনবাবু নিজেও স্বীকার
করেন। অতীব্যুর বর্ণনার গোরিলায় গায়ের রং হিল কল্পিপাথরে আলকাতড়া
মাধ্যমে যেৰকম হয় সেইরকম। লালমোহনবাবু 'ও বইটা আসলে আম—'
বলেই ফেলুন্দাৰ কাছ থেকে একটা কড়ু ইশারা পেঁয়ে থেমে সেশেন।

বুকু বলল, 'গণেশ ত একজন রাজাৰ কাছে আছে। শয়তান সং পাবেই
না। কেউ পাৰে না। ভাকু গণ্ডারিয়াও পাৰে না।'

'আবাৰ অক্তুৰ নম্বী!—দীৰ্ঘবাস ফেলে বললেন জটুৰু।

বিকাশবাবু হৈসে কলনেন, 'ওৱা কথাৰ সম্বো ডাল ঘোৰে চলতে হলে
আগে রহস্য প্ৰোয়াশ সিৱিজ পুলে থেতে হবে।'

ফেলদো এখনও যাইতে বসে আড়চোখে বুকুৰ দিকে চেঁহে আছে, তাৰ
ভাৱ দেখে ঘনে হয় ষেন সে বুকুৰ আজগৰুৰী কথাগুলোৱ ভিতৰ থেকে আসল
হান্দৰটাকে থৰে বাৰ কৰিব চেষ্টা কৰছে। বুকু তাৰ কথাৰ মধোই দিবি
ধূঁজিতে সুড়ো লাগিয়ে চলেছে। এবায় ফেলদো প্ৰশ্ন কৰল, 'কোথাকৰ রাজাৰ
কথা বলাহ তুমি বুকু ?'

উত্তৰ এল—'জ্যাফিকা।'

বোধবৰ্ণি থেকে চলে আসাৰ আগে আমৰা আৰেকজন জোকেৰ সম্পৰ
কথা বলোছিলাম। তিনি হলেন শশিভূষণ পাল। শশীবাবু নাইকোলেৰ ঘালায়
হলকে রং নিয়ে নিজেৰ তৈৰি ডুলি দিয়ে কাঠি'ক ঠাকুৰেৰ পালে সাগাইছলেন।
কনুলোকেৰ বৰস বাটি প'য়ৰাটি হবে নিশ্চয়ই, রোগা প্যাকাটি চেহারা, চোখে
প্ৰতি কাঁচেৰ চেষ্টা। ফেলদো জিগোস কৰাতে বস্তুলন উনি নাকি ধোল
বছৱ বৰ্ষস থেকে এই কাজ কৰছেন। ত'ৰ আদি বাঁড়ি হিল কৃষ্ণগুৰ,
ঠাকুৰদাশ অধৰ পাল নাকি প্ৰথম কাশীতে এসে বসবাস আৰম্ভ কৰেন
সিপাহী বিদ্রোহেৰ দণ্ড কছৰ পৰে। শশীবাবু বাকেন প্ৰেশ মহান্নায়। সেখানে
নাকি কুৰা দাঢ়াও আয়ো কৰেকৰি কুমোৰ থাকে। ফেলদো বলল, 'আপনাৰ
জৰুৰ হৱেছিল শ্ৰেণীয়াম; এখন ডাল আছেন ?'

'আকে হাঁ। সিংহি শশাইৰেৰ ওব্বে দ্বাৰা উপকাৰ হৱেছিল।'

শশীবাবু কথা বলছেন, কিন্তু কাজ বন্ধ কৰছেন না।

আপনাৰ কাজ শেষ হচ্ছে কৰে ?' ফেলদো জিগোস কৰল।

'আজে পৰশ্বই ত যষ্টী। কাল রাতিৱৰে কেতুবই হৱে থাবে। বিয়স হৱে
গেল ত, তই কাজটা একটু ধৰে কৰাতে হৱ।'

‘তাও আপনার কুলির টানে এখনো দিয়া কোর আছে?’
 আল্টে এ কথা আপনি বলছেন, আর, আরবছর এই দুস্মাঠাকুর্ব দেখেই
 ওই একই কথা বলেছিলেন কলকাতার আটে ইম্বুলেট একজন শিক্ষক। এ
 ছিলসের কদর আর কে করে বল্ন। সবাই ঠাকুরই দেখে, হাতের কাজটা আর
 ক'জন দেখে?’

বিকাশবাবু যেদিন আপনাকে ওধূ দেন, মেদিনী সংস্কার বাড়ির মোতলার
 সিদ্ধুক থেকে একটা জিনিস চুরি কর। এ খবর আপনি জানেন?’

শশীবাবুর হাতের কুলিটা যেন একমুহূর্তের জন্ম কৈগৈ দেল। গলার
 স্বরটাও দেন একটু কাঁপা। বললেন—

‘আজ পন্থাশ বছর হল প্রতি বছর এসে এই একই কাজ করে থাক্কি এই
 ঘোষাশবাড়িতে, আর আমার কিনা এসে পুর্লশে জেরা কুলি! হাতে কুলি
 নিজে আমার আর কোনো হ'শ থাকে না, জানেন, নাওয়া থাওয়া কুলি থাই! আপনি
 জিগ্যেস কর্ন সিংহি মশাইকে, উনি ত ফখে থাকে এসে দাঁড়িয়ে
 দেখেন। আপনি ধোকাকে জিগ্যেস কর্ন। সেও ত এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে
 দেখে আমার কাজ। কই বল্ন ত ভাঁয়া—আমি ঠাকুরের সামনে ছেড়ে একটা
 মিনিটের জন্মো কোথাও থাই কি নো?’

শশীবাবুর সঙ্গে আরেকটি বছর কুড়ির হেলে কাজ করছে। জনপাম ইনিই
 হেলেন শশীবাবুর হেলে কানাই। কানাইকে তার বাপের একটা ইয়াঁ সংস্করণ
 ধরা চলে। কাজ দেখলে মনে হয় সে বৎশের ধারা বজায় রাখতে পারবে। কানাই
 নাকি গণেশ চুরির দিন সাতটার পরে ঠাকুরের সামনে ছেড়ে কোথাও থার্নি।

বিকাশবাবু আমদের সঙ্গে গেট অবধি এলেন। ফেল্দা ধলল, ‘আপনাদের
 বাড়িতে এখন অনেক লোক ভাই আর উমানাথবাবুকে বিয়ত করলাম না।
 আপনি শুধু বলে দেবেন যে আমি হয়ত মাঝে মাঝে এসে একটু ঘৰে টকে
 দেখতে পারি, প্রয়োজন হলে একে-ওকে দু'একটা প্রশ্ন করতে পারি।’

বিকাশবাবু বললেন, ‘মিস্টার ধোঁপাল যখন আপনার উপর ব্যাপারটা ছেড়ে
 দিয়েছেন তখন ত আপনার মে অধিকার আছেই।’

বেরোবার হুঁকে একটা শব্দ পেয়ে ফেল্দাৰ সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখটোও
 বাড়ির হাতের দিকে চলে গেল।

ব্রহ্ম অর লাল-সাদা পেটিকাটিটা সবে মাত উঠিয়েছে। স্বামৈর টানে
 বাড়িটাই হাত্তো কেটে ফরফর শব্দ করছে। ব্রহ্মকে এখান থেকে দেখতে পাবার
 কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে তার লাটাই সমেত হাত প্রটো থাকে হাতের
 পাঁচলের উপর দিয়ে উঁচি থারছে।

‘ছেলেটিকে খুব একা হলে মনে হচ্ছে, যেজন্মা ঘৰ্জিটাৰ দিকে ঢাক রেখে
বলল: ‘সাতাই কি ভাই?’

বিকাশবাবু, বললেন, ‘কুকু উপানীষদারুর একমাত্র ছেলে। এখানে ত তবু
একটি বশ্য হয়েছে। আপৰি ত দেখেছেন সুরূষকে। কলকাতায় ওৱা সমবয়সী
বশ্য একটিও নেই।’

পাঁচ

এখনে এসে অধিব বেশির ভাগ সময়টা বরে বসে বাস্তুলৈদের সঙ্গে কথা বলে ধরে ভুলে হৈতে হাঁচল হৈ আমরা কাশীতে এসেছি। এখন সাইকেল রিফশা, টাপ্পা আৰ লোকেৰ ভীড় বাঁচিয়ে মনপুরো রোড দিয়ে হোটেলেৰ বিকে হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে আবাৰ কালীৰ মেজাজটা ফিৰে পেলাম। বড় রাস্তাৰ গোলমাল এড়িয়ে হোটেলে থাকাৰ শটকাটেৰ গাঁলটাতে চুকলাম আমরা তিনজনে। লালমোহনবাবু একটা ছাগলেৰ বাচ্চাৰ পঢ়ে ছাতা দিয়ে একটা ছেঁটা থোঁচা মেৰে বললেন, 'আমাৰ একটা ব্যাপার কৈ জানেন ফেল্দুবাবু—কলকাতা ছেড়ে বাইৱে কোথাও গেলেই সেই আমগার মেজাজটা আমাকে কেমন যেন পেৰে বসে। সেবাৰ রাজস্থান গিয়ে থালি খালি নিজেকে ঝাঙপ্ত বলে মনে হাঁচল। অনামনস্ক হয়ে মাথাৰ হাত দিয়ে পাপড়িৰ বদলে টোক ফীল কৰে রৌদ্রিমত চম্কে উঠছিলুম।'

'এখনে এসে কি জটাৰ অভাৱ ফীল কৰে চম্কে উঠছেন?'

আ যাটে গিয়ে যে একটু বৈজ্ঞানিকাবী ভাৱ হয় নি তা বলতে পাৰিব না। আবাৰ এই সব অলিগনিতে চুকলে ঘনে হয় কোম্বৰে একটা ছোয়া থাকলে হাতলটাতে মাঝে মাঝে বেশ হাত বোলানো হৈত।

আমি কিম্বু কালকেৰ সেই লোকটাকে আবাৰ দেখেছি। আমি জানি শব্দকী-নিবাস থেকে বেরোবৰ কিছু পৱেই সে আমদেৱ পিছু নিয়েছে। কিম্বু কালকে ফেল্দুৰ তাঙ্কিলা ভাবেৰ পৰ আজ আৰ কিছু বদলতে পাৰছি নো। সকালমেলা গলিতে বিস্তৰ লোক—কেউ সনান কৰে ফিৰছে, কেউ বাজাৰ থেকে ফিৰছে, কিছু বজে দাওয়াৰ বসে আস্তা মারছে, এখনে ওখানে বাচ্চাৰ দল হইহোৱা কৰছ—তাৱই মধ্যে পিছন ফিৰলে চাপা পায়জামাৰ উপৰ গাঢ় বেগুনী চানৰ মুড়ি দেওয়া লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি আমদেৱ বিশ-বিশ হাত পিছনে সজানে আমদেৱ ফলো কৰে চলেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনাৰ এই গণেশেৰ মাঘলাটি বিলক্ষণ ডিফিকাল্ট বলে মনে হচ্ছে মশাই।'

ফেল্দুৰ বলল, 'কোনো মাহলা একটা বিশেষ অবস্থায় পোঁছানোৰ আগে সেটা সহজ কি কঠিন তা বোকা সম্ভব নহ'। আপনাৰ কি ধাৰণা সেই সেটজ

সেৱাহো গোছে ?'

'যায় নি বুকি ?'

'একেবাবেই না !'

'কিন্তু বিলি আসল ভিলেন, তৌর পক্ষে তো ও জিনিস চুরি কৰার কেনে ক্ষেপই ছিল না !'

'কাকে ভিলেন ভাবছেন আপনি ?'

কেন, তই যে দেবরাম না মেঝেলাল না কী নাই বললো। যাকে দেবলুম্ব মহালিবাবার শুধানো !'

'আপনার কি ধারণা দেববাজ গুণেশ চুরি কৰার জন্য নিজেই পাঁচল টপকে ধোঁয়াল বাঁজুড়ে চুক্কেন ?'

'ওজেন্ট লাগাবে বলছেন ?'

'সেটোই স্বাভাবিক নয় কি ? আর তা ছাড়ী তো শান্তিরে গোছে বলে যে সেই চুরি কৰেছে এমন তো নাও হতে পাবে !'

লালমোহনবাবু, একটুক্ষণ চুপ যেরে হঠাতে যেন শিউরে উঠে বললেন, 'ওয়াকম কাধি দেখিনি যশাই ! না জানি সামনের দিক দেখে কি বক্ষ দেখতে। ওর মাথায় এক জোড়া শিং জাগিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ছেড়ে দিলে নিয়মোঁ চু মাঝে !'

ক্যালকাটা লজে চুকে সামনেই আশিসদৰ। যানেজারের চেয়ার ছাড়া আরো তিনটে চেয়ার আৰ একটা বৈশিষ্ট আছে। সেগুলোতে দু-তিনজন কৰে নিরঞ্জনবাবুৰ আলাপী লোক প্রায় সব সময়ই বসে আস্তা পারে। অজ চুকে দেখলাম নিরঞ্জনবাবুৰ উল্টো দিকে একজন প্যান্ট-শার্ট পৰা বেশ জোয়ান লোক বসে তা বাছেন, আৱ হাত নেড়ে নিরঞ্জনবাবুকে কৰ্ণ যেন বোঝাছেন। আমাদেৱ চুক্ষতে দেখেই যানেজার যশাই পানমুখে একগাল হেসে বললেন, 'এই ত—ইনি আপনার জন্য প্রায় কুণ্ডি মিনিট বসে। আলাপ কৰিয়ে বিই—সাব-ইন্সপেক্টৱ তেওয়ারি—আৱ ইনি—'

নিরঞ্জনবাবু পৰ পৰ আমাদেৱ তিনজনেৰ নাম বলে বললেন, 'তব নেই—হিন্দু বলতে হবে না—ইনি দৰিদ্বাৰা বাল্লা বলোন !'

তেওয়ারি ফেল্দুৱাৰ খিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। চাথৰে কোণে হাসি এই এলো দৃশ্য, আৱ ফেল্দুৱাৰ চোখে ভ্ৰকুটি, সেটোও হনে হচ্ছে একটা হাসিৰ অপেক্ষায় রয়েছে।

'তৈ কি যশাই—ফেল্দুৱাৰ ভ্ৰকুটি হাওয়া—আপনি এলাহাবাদে ছিলেন না ?'

দ্বাৰোগা সাহেব খুক্ককে পাঁত বাৱ কৰে হেসে ফেল্দুৱাৰ হাত ধৰে

কুকুরি দিয়ে বললেন, 'আমি শিশুর ছিলাম না আপনি ছিলবেন কি না।'

'চেনা মুশ্কিল। গোকুটা থা হিল তার চার ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে। রোগাও হয়েছেন বেশ খানিকটা।'

ভদ্রলোক ফেল্দুর সমান লম্বা আর গড়সেও ফেল্দুরাই মতে ছিমছায়। এবর দু-এক আগে এলাহাবাদে ফেল্দুরের একটা কেস পড়েছিল। পুলিশ পাঁচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেল্দুর দু-দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে চর বিনের ভিতর কলকাতায় ফিরে এসেছিল। বুরুলাম সেইবারই তেওয়ারির সঙ্গে আলাপ হয়।

'আমি মিস্টার ঘোষালের কাছে গিয়েছিলাম কাল রাতে আপনি চলে আসার পর। তখনই শুনলাম আপনি এসেছেন আরে কালকাটা লজে আছেন।'

নিরঞ্জনবাবু, জায়ের অর্ডার দিয়েছেন, আমরা তিনজনে বশলাম। ফেল্দুর স্বিস্তর নিষ্পাস ফেল্দুর বলল, 'হাক্ক!—মিস্টার ঘোষাল পুলিশের কথা বলাতে আমার একটু দুশ্চিন্তা থাক্কিল: এখন আপনাকে দেখে অনেকটা হ্যালকা লাগছে। আপনার সঙ্গে ঝ্যাশ হয়ে না। আর হনে হয় দুটো শাখা এক কংলে বোধ হয় কাজের দ্রুবিধৈ হবে। বেশ গোলমেলে বাপার—তাই না মশাই?'

তেওয়ারির একটা শুরুনো হাসি হেসে বললেন, 'ইন ফ্যাক্ট ইট ইঞ্জ সো সোলমেলে বে আর্থি তো আপনাকে এলাম বাবু করতে।'

'কেন বল্স তো?'

'ঝগনলাল যে বেপারে আছে, সে বেপারে এই হচ্ছে আমার অ্যাভিভাইস। আপনি দুদিন গেলেন মিস্টার ঘোষালের বাড়ি, তার জন্য আমার খুব ভালো হচ্ছে। আপনাকে খুব সাওদান পাকতে হবে। ওর স্পাই আর ভাড়াট গুঞ্জা সারা বেনারিস শহরে ইডিয়ে আছে।'

হৃদ্রুক্ষণ চা নিয়ে এল। ফেল্দুর চিন্তিতভাবে একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ঝগনলাল যে এ বাপারে সাঁচাই ঝাঁড়ি সে সম্বন্ধে আপনি এত বিশ্বিত হচ্ছেন কি করে?'

মিস্টার তেওয়ারি ভুরুটা কুঁচকে বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে টেবিলের উপর কয়েকটা টোকা মেরে বললেন, 'আমরা যে লাইনে ইনভেস্টিগেশন করাই, তাতে ঝগনলালকে একেবারে বাদ দেওয়া থাক না। ওর মত্তে কানিং লোক আর নেই।'

'আপনারা কোন লাইনে তদন্ত চালাচ্ছেন সেটা.....

'বলাই আপনাকে। আপনার কাছে আর্মি কিছুই লুকাব না। ঘোষাল-বাড়ির সহাইকের সঙ্গে আপনার আলাপ হওয়ে কি?'

'চাকর-বাকর বাবে আর মোটামুটি সভলের সঙ্গেই হয়েছে।'

'শশীবাবুকে দেখেছেন তো?'

‘হ্যাঁ, দেখোই বই কি। আজই সকালে তার সঙ্গে কথা হয়েছে।’

‘ওর ছেলেটিকে দেখেছেন নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ—সেও তো কাজ করাইল।’

‘কিন্তু শপোবাবুর আরেকটি ছেলে আছে সেটো কানেক?’

এ ব্যবস্থা অবিশ্ব আমরা কেউই জানতাম না।

‘এ ছেলেটির নাম নিতাই। ডেরি ব্যাড টাইপ। আঠারো বছর বয়েস, আর এ বয়সে যত বাড়াপ দোষ থাকতে পারে সবই আছে। আমরা এখনো কোনো প্রদাপ পাইনি, কিন্তু ধরন, বিদি সে মগনলালের বাপরে পক্ষে আছে—’

ফেল্দা হাত তুলে বলল, ‘ব্যবেছি। মগনলাল নিতাইকে হাত করবে, নিতাই হয় তার বাপকে না হয় দাদাকে ইঞ্চিরি দিয়ে তাদের সিল্ক খুলিয়ে পাশেল তুরি করবে।’

‘ওগজ্জাহেনি,’ বললেন মিস্টার তেওয়ারি। ‘নিতাইরের বাপবাটো জানাব পর শেকেই শনে হচ্ছে একটা রাস্তা পাওয়া গেছে। আমার অ্যাডভাইস আপনি এখন চুপচাপ থাকুন। দেখো টাইমে বেলারসে অনেক কিছু দেখবার আছে—সেই সব দেখন, কিন্তু ঘোষণাভিতে যেলী খতোয়াত করবেন না।’

ফেল্দা অল্প হেসে চারে চুম্বক দিয়ে একেবারে অন্য প্রস্তুতে চলে গেল।

‘আপনারা মছলিবাবা স্বত্বে কোনো তদন্ত করার প্রয়োজন যোগ করছেন না?’

তেওয়ারি হাতের কাপটা টেক্কলের উপর রেখে একটা প্রাণধোলা হাসি হেসে বলল, ‘আপনাদের এই ভিতরেই মছলিবাবা মর্ম হয়ে গেছে? কী হচ্ছে ইল?’

‘তদন্তের কথা ধৰন তুললাম, তখন ব্যব বে একটা ভারি ঝাগেন যানে সেটো নিশ্চয়ই ব্যুক্তে পাওয়েন।’

‘সে তো আপনার কথা হল, কিন্তু আপনি তার ভৱদের দেখেছেন? আপনি ইনভেস্টিগেশনের কথা বলছেন—ঘোলাখুলি ত্যাবে কিছু ক্যাতে গেলে করবা আমদের আশ্চর্য করবে?’

কথাটা বলে মিস্টার তেওয়ারি আজ্জ্বরে নিয়ন্ত্রণব্বৰ দিকে চাইতে ভস্তুলাক হাত তুলে বলে উঠলেন, ‘আমার দিকে কী দেখছেন মশাই! আমদের ভারি ঘানে কী? ভার্টোর কিছু না—মছলিবাবা হলেন আমদের ককে বেলা একবেরে জীবনে সামান একটু বাতিভুমের ছিটকেটো—কস্ট।’

ফেল্দা বলল, ‘একটা জিনিস আপনি করতে পারেন মিস্টার তেওয়ারি—হারিচৰ আর এমাহাবাবে ব্যব নিয়ে দেখতে পছুকেন সেখানে গুরু মাস্থানেকের মধ্যে মছলিবাবা নামে কোনো সিংহপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল

কি না।

জৈর গড়। এটা করতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি দু-দিনের মধ্যে আপনাকে ইনফরমেশন এনে দেব।

দারোগা সাহেব বাঁড়ি দেখে উঠে পড়লেন। দরজার মুখে ভুলোক ফেলে দুর
পিঠ চাপতে বললেন, 'একদিন চৌকে আমাদের ধানার আস্ত না। কি বুকম
কাজ হচ্ছে দেখে দান। আর—' তেওয়ার ম্বাই—'আমি আপনাকে
স্মীরিয়াসলি বলছি—আপনি বত ইচ্ছে হালিজে করুন, কিন্তু এ বেপাকে
জড়বেন না।'

দুপুরের ডাল ভাত কপির যাহের বোল আর দাইরের সঙ্গে
জিলিপি থেয়ে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পান কিনলাম। লালমোহন-
বাবুকে এমনিতে কখনো পান থেতে দেবিনি; এখানে দেখলাম সাত রুক্ষ
মশলা দেওয়া রূপোত্তম তবক দিয়ে মোড়া একটা প্রকাশ পান চার অঙ্গুল
দিয়ে টেসে মুখের ডিতর পুরে দিবা চিবেতে লাগলেন। আমরা কোনো
বিশেষ জ্যোগায় যাবো বলে বেরিয়েছি কিনা জানি না, কারণ ফেল্দা কিছু
বলেনি। লালমোহনবাবু একবার আমার কানের কাছে মুখে এনে ফিসফিস
করে বললেন, 'তোমার দানা বোধ হয় সেই হাল-ইকবের মোকামে গিরে গাঁড়ি
থাবেন।' আমার ধারণা কিন্তু অন বুকম—হাঁসও সেটা আমি মুখে প্রকাশ
করলাম না। ফেল্দাকে অনুসরণ করে আমরা হোটেলের উল্টো দিকে একটা
গানিতে চুক্তে এগিয়ে চললাম।

একটি এঁগমে ব্রকতে পান্তিয় বাজলীর নামগুলি নেই; লালমোহনবাবু চাদরটিকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি চোখ,
কান আর নাকের কথা বললেন, কিন্তু টেম্পারেচারের কথা তো বললেন না।
এমনিকটায় বেশ শীত শীত গাছে ফশাই।'

দু-দিকে তিন তলা চার তলা বাঁড়ি উঠে গেছে, আর তার অংশে দিয়ে
একবেইকে চলেছে গলি। স্বর্বের আলো প্রায় পেঁচামের ন্য বললেই চলে।
ফেল্দা বলল বেনারসের গলির বেশির ভাগ বাঁড়িই নাকি দেড়শো থেকে
দুশো বছরের প্রৱানো। বাস্তার দু-দিকের দেয়ালে বেখানে সেখানে র্হব
আৰু—হাঁত, ঝোড়া, বাঁৰ, টিয়া, ঝোড়সওয়ার। কারা কবন একেছে জানি
না, কিন্তু দেখতে-বেশ লাগে। যাকে যাকে এক একটা হাতে-লেখা হিন্দ
বিজ্ঞাপন—তার মধ্যে 'নওজোয়ান বিঁড়ি' সবচেয়ে বেশ চেখে পড়ে।

একক্ষণ চারিদিকে বেশ চুপচাপ ছিল—এবার তুমে তুমে কানে নানাবুকম
নতুন শব্দ আসতে আবশ্য করল। তাৰ মধ্যে সব ছাপিৰে উঠেছে খণ্টাৰ শব্দ।
খণ্টাৰ ফৌকগুলো তৰিঙ্গে রেখেছে যে শব্দটা তাকেই বলা হয় কোলাহল।

ফেল্দুদা যাসে এই কোলাহল জিনিসটা কৰ মজার। হাজার লোক এক জায়গায় অঞ্চলে, সবাই নিজেদের মধ্যে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলছে, কেউ গলা তুলছে না, অথচ সব মিথিয়ে যে শব্দটা হচ্ছে তাতে কান ফেঁটে শাবার জোগাড়।

এই মধ্যে বেশ কয়েকটা ধীড় আমদারের সাথেন পড়েছে, আর প্রতিবারই লালমোহনবাবু বলে উঠেছেন, 'ওই দেৰ্বন, মেৰুৱাম!' শেষটায় ফেল্দুদা বলতে বাধ্য হল বৈ তার ধারণা বেঢ়ায়েজ্জৰ চেয়ে ধীড় জিনিসটা অনেক বেশী নিৰীহ এবং নিৰাপদ।—'আমি মশাই একজন ডাকসাইটে প্রতিষ্ঠানী কল্পনা কৰে মনে উৎসাহ আনাৰ চেষ্টা কৰছি, আৰু আপনি বাবু বাবু ধীড়েৰ সঙ্গে তুলনা কৰে তাকে খাটো কৰছোন!'

চোখ, কান আৱ নাককে একসঙ্গে আকৃতি কৰতে বিশ্বনাথেৰ গালিৰ মতো আৱ কিছু আছে কিনা জানি না। এখানে এসে আৱ নিজেৰ ইচ্ছেমতো ইটা থাক না; তীড় যে মিকে নিয়ে যাব মেই বিকে যেতে হয়। আমৰাও এগিয়ে জেলাম ভীড়েৰ সঙ্গে। 'দৰ্শন হবে বাৰু?' বাবু বিশ্বনাথ দৰ্শন হবে? পান্ডুৱা চাৰিদিক থেকে হোকে ধৰেছে। ফেল্দুদা নিৰ্বিকাৰ। আমৰা তিনজনেই পিছলে আঝগাগড়ুলা ধীড়েঁয়ে এগিয়ে চলায়। লালমোহনবাবুৰ মন যতই পিছলে আঝগাগড়ুলা ধীড়েঁয়ে এগিয়ে চলায়। লালমোহনবাবুৰ মন যতই কণ্ঠভাব জাগুক না কেন, ওৱা চোখ কিন্তু চোল গেছে মিশ্বৰেৰ সোনাম মোড়া চুড়োৱ দিকে। একবাৰ ফেল্দুদাকে কী যেন প্ৰশ্নও কৰলেন চুড়োৱ দিকে আঙুল দেৰিয়ে। গোলামলৈ বৰী বললেন শুনতে পেলাম না, তবে 'ক্যারেট' কথাটো কানে এল। চুড়োৱ দিকে চাইতে গিয়েই চোখে পড়ল আকশে দশ-কথাটো কানে এল। চুড়োৱ দিকে, আৱ তাৰই এক পাশে একটা লাল-সাদা পেটকাটি ধূড়ি গৌৰ খেয়ে মিশ্বৰেৰ পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেল্দুদাৰ ধূড়িটাকে দেখেছে।

আমৰা দুজন ফেল্দুদাৰই পিছন পিছন আৱোঁ থানিকটা এগিয়ে গেলাম—যদি আবাৰ ধূড়িটাকে দেখা থাক। হাঁ-ওই ত আবাৰ দেখা থাক্কে—লাল-সাদা পেটকাটি। ওই তো উপৰ বিকে উঠল, আৱ ওই তো আবাৰ শোঁ বোঁ বিকে দিকে জাম্ব একটা চারতলা বাড়িৰ পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'যোলট ইন্টাৰেপিটিং...'

চলা গলায় বললেও, ফেল্দুদাৰ তিক পাশেই থাকয় ওক কথাটো আমি শুনতে পেলাম।

লালমোহনবাবু বললেন, 'শুধু ইন্টাৰেপিটিং কেন বলছেন ইশাই—আমাৰ কাছে তো ডিস্টাৰ্বিং বলেও ঘনে হচ্ছে। আনে, ধূড়িটোৱ কথা বলাই না। চারতলাকে এত দাঢ়ি আৱ জটোৱ মধ্যে যেৰবায়েৰ কত স্পাই ঘোৱাফেৰা কৰছে ভাবতে পারেন? একটি স্লোক তো আপলৰ বিক থেকে চোখ কেৱালে না।

আমি আড়তোখে গুরুত করে যাচ্ছি প্রার্থ তিনি মিনিট ধরে।

ফেল্দু আকাশের দিক থেকে ঢোখ না নামিয়েই বলল, 'গোঁফ-দাঁড়ি-জটা-মিষ্টি-কম্ভুল, আর গায়ে টাটকা নতুন-কেনা হিন্দি নামাবলী তো ?'

'ফুল মার্কস,' বললেন জটাৰু।

আহরা আবাস এগিয়ে গেলাম। সামনেই একটা ধীভুর পিছনে একটা পিন্দুর আৰু জবাফুলে বোৰাই দোকানের পাশে লোকটা মাঁড়িয়ে আছে। ফেল্দু আৰু সামনে এসে বেশ জোৱা গলায় বলল, 'জুব বাবা বিশ্বনাথ !' আমাৰ হাসি হপলেও একদম চেপে গেলাম।

বিশ্বনাথ থেকে আমৰা সোজা চলে গেলাম জানবাপী। এখনেই অওৱল্প-জৈবের মসজিদ, আৰু এখনেই সেই প্রকান্ড খোলা চাতাল। চাতালটোয় এসে আবাৰ আকাশের দিকে চাইতে আৰু ধূড়িটো দেখতে পেলাম না।

উত্তৰ দিকে ষেখালে চাতালটো শেষ হয়েছে সেখাল দিয়ে একটা শিঁড়ি নেমে গেছে রাস্তায়—কারণ চাতালটো রাস্তার তফয়ে প্রায় আট-দশ হাত উঁচুতে। ফেল্দু কৈ হতলবে বেৰিয়েছে সেটা নিয়ে আমাৰ মনে যে সন্দেহটা ছিল, এখন সেখাল লালমোহনবাবুও সেই একই সন্দেহ কৰছেন।

'আপনি কি মশ্যাই দেৱৰামের বাড়ি যাবার ভাল কৰছেন নাকি ?'

ফেল্দু বলল, 'আমাৰ আবাধ্য দেৱতা আৰু কে আছে বলুন। কাইম না থাকলে তো ফেল্দু মিস্তিৱের বেছগার বন্ধ হয়ে যাবে, সুতৰাং এখানকাৰ সবজোৱে বড় কিম্বিন্যালেৰ প্ৰদৰিটো একবাৰ দেখে যাব না ?'

দিনেৰ বেলা চাৰিদিকে শৱৎকালীয় ঝলমলে রোদ আৰু লোকেৰ ভিড় বলে হয়ত ফেল্দুৰ কথয়ে অতটো শিউৰে উঠলাম না; তবে ওই এক কথাক ব্যক্তিৰ ধীড়িটোৰ দম দেওয়া হয়ে গেছে, আৰু ধূকপুক শুৰু হয়ে গেছে।

এখনে গোলমাল কম, তাই লালমোহনবাবু পৰেৰ প্ৰশ্নটো কলা মাঁড়িয়ে কৱতে পাৱলেন।

'আপনাৰ অস্তি সঙ্গে নিয়েছেন তো ?'

'ইন্তে অস্তিৰ কথা বলছেন ? রিভলভাৱ নিইনি। বাকি তিনটো সব সমষ্টি সঙ্গেই থাকে।'

লালমোহনবাবু জিজ্ঞাসু দাঁড়িতে ফেল্দুৰ দিকে চাইতে গিয়ে একটা হোচ্চি খেয়ে কেলমতে সাবলে নিয়ে আৰু কিছু বললেন না। ভুলোকেৰ বোৰা উচিত ছিল যে ফেল্দুৰ তিনটো স্বাভাৱিক অস্তি হল ওৰ মিস্তিক, স্নান্দ আৰু যাস-স্পেশনী। এৰ অধ্যে প্ৰথমটো অবিশ্বা আসল।

সিঁড়ি দিয়ে রাস্তার নেমে সামনেই একটা দ্বিজিৰ দেৱকান। দোকানেৰ সামনেই বসে একটা লোক পারে কৰে সেলাইয়েৰ কল চালালেছে। ফেল্দু তাকে জিগোস কৱতেই লোকটা মগনলাল মেঘৱাজুৰ বাড়ি বাতলে দিল। রাস্তাটো

ধরে পূর্ব দিকে কিছুদূর গেলেই বায়ে একটা মহাবীরের মন্দির পড়বে, তার দুটো বাড়ি পরেই ঘগনলালের বাড়ি। চেমা সহজ, কারুণ সাধনের দক্ষতাকে দু-দিকে দুটো মশস্তু প্রহরীর ছবি আঁকা রাখেছে।

‘ছবি ছাড় এমনি প্রহরী নেই।’ ফেল্দুদা প্রশ্ন করল।

‘হ্যাঁ—তাও আছে।’

সোজা রামতা, এ-গাল ও-গালি ধোবার বালাই নেই, তাই ঘগনলালের বাঁকে পেতে কোনোই অসুবিধা ইন্দ না। এখানটাক সত্তা করেই বিশ্বনাথের বন্দোবস্ত শব্দ ছাড়া আর কানো শব্দই শোঁকায় না। আর মুঢ়ুরবেলা বলেই বোধ হয় গলিটা এত কিন্তু। বাঁড় তো নেই-ই, এমন কি হাগল কুকুর বেড়াল কিছু নেই।

ঘগনলালের বাড়ির দরজার দু-দিকে তলোয়ার উঁচোন প্রহরীর ছবি আছে ঠিকই, কিন্তু জ্যামত প্রহরী কাউকে দেখা গেল না। অথচ দরজার পাশা দুটোই হৈ করে খোলা। বাপারটা কৌ? শোকগুলো পেতে গেল নাকি? ফেল্দুদা নাক টেনে বলল, ‘বৈরি বাড়া হয়েছে মিসিট অনন্দের আগোই।’ তামপর এদিক ওদিক দেখে বলল, ‘অস্বীকৃত। কেউ চাপেজ করলে বলব নতুন এসেছি, যানবাঁশিদ্বা চেব চুকেছি।’

ফেল্দুদাকে সাধনে রেখে চুকে পড়লাম দরজা দিয়ে।

সর্বনাম—এ কি ঘগনলালের বাড়ি, না গোয়ালেবর? অথবার, সাঁতসেইতে উঠেনে তিনটে জলজ্বামত গুরু দাঁড়িয়ে নির্বিকারে জাবার কাটছে, আমাদের দিকে হিয়ে দেখবারও কোন আগ্রহ নেই তাদের। গন্ধগুলো বৈ রাঠেও এখানেই থাকে তার চিহ্ন চারিদিকে ছাঁড়িয়ে আছে।

ফেল্দুদা ফিসফিস করে বলল, ‘এ বাপারটা এখানে খুব কমন। এই সব গলিতে বাঁড়িতে এক উঠোন ছাড়া আর খোলা জান্মগা কলে কিছু নেই। অথচ দুধ ধি না হলে এদের চলে না।’

আমাদের ভাইনে বায়ে উঁচু বারাস্তা দু-দিকেই দুটো দরজায় গিয়ে দেখ হয়েছে, দুটোর পিছনেই ঘৰঘৰ্টি অস্থকার। আস্দজে মনে হয় ওই অস্থকারেই দেওতলায় যাবার সিঁড়ি। বাঁড়িটা বৈ চারতলা সেটা বাইরে থাকতেই সেখোচি। উপর দিকে চাইলে লোহার গয়াদের মধ্যে দিয়ে খোলা আকাশ দেখা যায়। গয়াদের দরজার হয় বাঁদরের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

এর পরে কী করা উচিত ভেবে পাইছি না, এমন সময় জন দিকের বারাস্তাকে তোখ দেল।

একটো লোক নিঃশব্দে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের সিকে দেখেছে। যানবাঁশিদ্বা আখারি হাইটের লোক, পায়ে সবুজের উপর সাধা ঘৰ্টি-দেওয়া কুতু, মাথায় কাজ-করা সুদা কাপড়ের টুপি। এক জোড়া শুরু

গোফ ঢৌটের দুপাশ দিয়ে নেমে গালপাটা হতে হতে ইয়নি।

জ্বোকটা মুখ খুলুল। গলার স্বর শব্দে অনেক দিনের পুরনো
কাহে যাওয়া প্রাক্কোফন রেকর্ড থেকে কথা বেরোছে। ফেল্দার দিকে তাবিজে
জ্বোকটা যে কথাটা বলল সেটা হচ্ছে এই—

‘শেঠজী আপসে খিলনা চাহতে হে’।

‘কোন শেঠজী?’ জিগ্যেস করল ফেল্দা।

‘শেঠ মগনজালজী।’

‘চলিয়ে’, বলে ফেল্দা জ্বোকটার দিকে পা দাঢ়াল।

ছয়

‘জর বাবা বিশ্বনাথ!’

লালমোহনবাবুর হৃদের দিকে চাইতে গুরসা পাঁচলাম না, তবে ওর গলার আওয়াজেই ওর মনের ভাবটা বেশ ব্যক্তে পারলাম।

‘আপনার এত ভগ্নসা বিশ্বনাথের উপর?’

ফেলনো এখনো কি করে হালকাভাবে কথা বলছে জানি না।

‘জর বাবা ফেলনো!’

‘দ্যাটস বেটোর।’

এত উচু উচু শাথরের ধাপওয়াজা এত অশ্বকার সিঁড়ি এর আগে কখনো দেখিনি। যে লোকটা ডাকতে এসেছিল তার হাতে আলোটলো কিছু নেই। লালমোহনবাবুকে বার-দু এক ‘ব্র্যাক হোল’ কথাটা বলতে শুনলাম। ছেচিলে ধপ সিঁড়ি উঠে তিনতলায় পৌছলাম আমরা। লোকটা এবার সামনের একটা পরজা দিয়ে তিতেবে ঢুকে গোল। আমরা চুক্লাম তার পিছন পিছন।

একটা ঘর, তারপর একটা সরু পাসেজ, আর তারপর আয়েকটা ঘর দোরিয়ে একটা অশ্বকার বারান্দা দিয়ে বেশ খানিকদূর গিরে একটা নিছু দরজা পড়ল। লোকটা এক পাশে নরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দিবে ভান ছাত বাড়িয়ে দরজার কিন্তু যাবার জন্মা ইশারা করল। কথা নই বললেও লোকটার অন্ধ বেকে বিড়িয়ে কড়া গাথ পাঁচলাম।

বে ঘরটার চুক্লাম সেটো যে কত বড় সেটো তক্কনি বোৱা গেল না, কারণ প্রথমে ঢুকে কয়েকটা বুঁনী কাঁচ ছাড়া আম কিছুই দেখা গেল না। চুক্লাম! কাঁচগুলো আনলাম লাগানো বলে ভাবে বাইরের আলো পড়েছে।

‘মোমেন্স্কার হিপ্টোর হিটোর।’

অস্থসে সগম্ভীর দানাদায় গলাটা আমাদের সামনে থেকেই গেমেছে। এবারে তো অশ্বকারে সরে এলেছে। একটা সাদা গাদ দেখতে পাঁচ্ছ—আমাদের সামনে কিছুটা দূরে মেঝেতে বিহানো রয়েছে। তার উপরে চারটে সদা তাঁকিয়া। একটা ভর দিবে আড় ইয়ে বসে আছে একটা লোক, যার শুধু পিছন দিকটা আমরা সৌন্দর্য দেখেছি মহিলিশাবার ভুক্তদের শখে।

একটা খুঁটি শব্দের সঙ্গে সিলিং-এ একটা বাতি জল্পে উঠল। পিতলের বলের গায়ে ফুটো ফুটো জাঁচির কাজ—সেটা হল বাতিটার শেক্ষ। ঘরের তারাদিক এখন খুঁটিমার আলোর নকশায় ভরে গেছে।

এখন সব কিছু দেখতে পার্জন। মগনলাল বেঘরাজের ডুরুর নিচে গড়ে বসা চেষ্ট, তার সিঁক ছোটু খাবড়া নাক, তার তায় নিচে এক জোড়া ঢোটি, যার উপরেরটা পাতলা আর নিচেরটা পুরু। ঢোটের নিচে খুত্তনিটা সোজা নেমে এসেছে একেবারে আর্দ্ধর পাখাদ্বির গলা অবর্ধ। পাখাদ্বির ঘোতাদু-গুলো হাঁয়ের হলে আশ্চর্য হব না। এ ছাড়া বলমলে পাথর আছে দশটা আঙুলের আটটা আটটিতে, যেগুলো এখন নমস্কারের ভিশাতে এক জয়গায় ছড়ো হয়ে আছে।

‘বোস্বন আপনারা। দাঁড়িয়ে কেনে?’

দিবা বাঞ্ছা।

‘চাই তো গাদিতে বস্বন। আর নয়তো চেমার আছে। বাতে ইচ্ছা বস্বন।’

জ্যোতিগুলো শিশু। পরে ফেল্দা বলেছিল কগুলো নাকি গুজুরাটো। আমরা গাদিতে সা বসে চেরারেই বসলাম—ফেল্দা একটাতে আর আমি আর লালমোহনবাবু আরেকটাতে।

মগনলাল সেইভাবেই কাত হয়ে দেকে বললেন, ‘আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল, ভাবছিলাম আপনাকে ইনভাইট করে নিয়ে আসব। কগুলানের কৃশায় আপনি নিজেই এসে দেলেন।’ তারপর একটু হেসে বললেন, ‘আপনি আমাকে চিনেন না, কিন্তু ইয়মি আপনাকে চিনি।’

‘আপনার নামও আর শুনেছি’, ফেল্দা পালটা ভদ্রতা করে বলল।

‘নাম বলছেন কেন, বদনাম বল্বন। সাতা কথা বল্বন।’

মগনলাল কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠলেন, আর তার ফলে তাঁর পানখাওয়া দাঁতগুলোতে আলো পড়ে চকচক করে উঠল। ফেল্দা চুপ করে রইল। মগনলালের ঝাঁধাটা আধাৰ দিকে ঘূরে গেল।

‘ইনি আপনার ব্রাদার?’

‘কাজিন।’

‘আব ইনি? আকুল?’

মগনলালের চোখে ইসি, চোখ ঘূরে গেছে ঝটিয়ের দিকে।

‘ইনি আমার ব্রাদ। লালমোহন গাগুলি।’

‘ভোর গড়। লালমোহন, মোহনলাল, মগনলাল—সব জাজ, সালে জাজ—এ? কৌ বলেন?’

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ দেকে ইটি নাচিয়ে ‘আমি একটুও নার্তাস

চইন', ভাব দেখানোর চেষ্টা করছিলেন, এবার মগনলালের কথাটা শুনেই হাটু দুটো খটু খটু শব্দ করে পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়ে নাচানো বন্ধ হয়ে গেল।

এবার মগনলালের 'বী হাতটা একটা থাপড়ের ভিপ্পতে তাকিয়ার পিছনে নামাতেই ঠৰ করে একটা কলিং কেল বেজে উঠে লালমোহনবাবুকে বিষম থাইয়ে দিল।

'গলা সৃষ্টিয়ে গেলো?' কলিলেন মগনলাল।

বী দিকে তাকিয়ে দেখি যে-লেনকটা আমাদের উপরে নিজে এসেছিল সে আবার দরিদ্রার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

'সর্বৎ লাও,' হৃকৃষ করলেন মগনলাল।

এখন ঘরের সব জিনিসই প্রস্ত দেখতে পাইছ। মগনলালের পিছনের দেয়ালে দেবদেবীর ছবির গ্যালারী। তার দিকে দেয়ালের সামনে দুটো প্টৌলোর আলমারি। গদির উপরে কিছু আত্মপত্র, একটা বোধ হয়ে ক্যাশবাজু, একটা লাল রঙের টেলিফোন, একটা হিল্ড ব্রেকের কাগজ। এ ছাড়া তাকিয়ার ঠিক পাশেই রয়েছে একটা রূপোর পানের জিবে আর একটা রূপোর পিকদান।

'ওয়েল মিস্টার মিতির'—মগনলালের স্থির দৃষ্টিতে আর হাসির নামনাম দেই—'আশানি বনারস ইলিজের জন্যে এসেছেন?'

'সেটাই হুল উদ্দেশ্য ছিল।'

ফেলুন মটান মগনলালের চোখের দিকে চেঁরে কথা বলতেছে।

'তা হলে—আপনি—টাইম—ওয়েল্ট—করছেন—কেন?'

প্রত্যোকটা কথা ফাঁক ফাঁক আর স্পষ্ট করে বলা।

'নারানাথ দেখেছেন? রামনগর দেখেছেন? দ্রগ্রামার্ডি, মালমাল্ডি, হিল্ড ইউনিভার্সিটি, বেগীমাধোব ধূজা—এসব কিছুই দেখলেন না, আজ বিশ্বনাথজীর দরগাজার সামনে গোলেন, কিন্তু ভিতরে ঢুকলেন না, কচোরি পালিতে মিঠাই খেলেন না...যেবালবাড়িতে কী কাম আপনার? আমার বজ্রা আছে আপনি জানেন? তৈরি ঘাটসে অস্র্সি ঘাট টিরিপ দিয়ে দেবো আপনাকে, আপনি চলে আসুন। গঙ্গার হাওয়া থেয়ে আপনার মনমেজাজ খুশ হয়ে যাবে।'

'আপনি ভুলে আছেন'—ফেলুন গলা এখনো স্থির, যাকে বলে নিষ্কাশ্প—'যে আমি একজন পেশাদারী গোয়েন্দা। মিস্টার ঘোষাল আমাকে একটা কাজের ভাব দিয়েছেন। সে কাজটা শেষ না করে ফুর্তি করার কোন প্রশ্ন আসে না।'

'কতো আপনার ফী?'

ফেল্দ্রা প্রস্তা শব্দে কয়েক সেকেন্ড ছুপ করে রইল। তারপর বলল,
‘ম্যাটে ডিপেন্ডস—’

‘এই লিল !’

তাসজুব, দম-বন্ধ-করা আপার। মগনলাল কাশবার খেলে তার থেকে
একতাড়া একশো টাকার সোট বার করে ফেল্দ্রার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

ফেল্দ্রার চোকুল শক্ত হয়ে গোল।

‘বিনা পরিষ্কারে আমি প্যারিশ্রমিক নিই না মিষ্টার অবগুজ !’

‘বাহুরে বাটি—মগনলালের পান-খাওয়া পাত আবার হৃদয়িন্দ্র গেছে—
আপনি পরিষ্কার করে কী করবেন ? যেখানে তোরই হল না, সেখানে আপনি
চোর পাকড়াবেন কী করে মিষ্টার মিত্র ?’

‘চুরি হল না যানে ?’—এবারে ফেল্দ্রাও অবাক—‘কোথায় গোল সে জিনিস ?’

‘সে জিনিস তো উমানাথ আবার কাছে বিকী করে দিয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট
কাশ দিয়ে আবি সে জিনিস কিনে নিয়েছি !’

‘কী বলছেন আপনি উলটো-পালটা ?’

ফেল্দ্রার বেপরোয়া কথায় আমার হাত-পা ঠাড়া হয়ে গোল। সিলিং-এর
আতিটা থেকে একটো আলোর নকশা সালমাহনবুর নাক আর ঠৌটের উপর
পড়েছে। বেশ ব্যর্লাম খুর ঠৌট শুরুক্তয়ে ফাকাসে হয়ে গেছে।

মগনলাল ওর শেষ কথাটো বলে হেসে উঠেছিল, ফেল্দ্রা কথাটো বলতেই
মনে হল একটো হাসির রেকর্ডের উপর থেকে কে যেম সাউন্ড-বক্সটা ইঠাই
তুলে নিল। মগনলালের ঘুথ এখন কালবৈশাখীর মেঘের মতো কালো, আর
চোখ দুটো যেন কোটির থেকে বেরিয়ে এসে বুলেটের মতো ফেল্দ্রাকে বিখ্যতে
চাইছে।

উলটো-পালটা কে বলে জানেন ? উলটো-পালটা বলে উলটো-পালটা
আদীয়। মগনলাল বলে না। উমানাথের বেপার কী জানেন আপনি ? আর
বেস্মার বিষয় কিছু জানেন ? উমানাথের দেনা কত জানেন ? উমা নিজে
আমাকে ডেকে পাঠাল জানেন ? উমা নিজে সিল্দুক থেকে গণপতি চৌর
করেছে জানেন ? আপনি চোর কি ধরবেন মিষ্টার মিত্র—চোর তো আপনার
মুকেল নিজে !

ফেল্দ্রা গম্ভীর গলায় বলল, ‘আপনি কী বলতে চাচ্ছেন সেটা পরিষ্কার
ইচ্ছে না মগনলালজী ! নিজের জিনিস চুরি করবার সরকারটা কোথায় ? সোজা
সিল্দুক থেকে বার করে আপনার হাতে তুলে দিয়ে টাকাটো নিয়ে নিলেই ত
হতো !’

‘কার সিল্দুক ? সিল্দুক তো ওর বাবার !’

‘কিন্তু গণেশটা তো—’

‘গণেশ কার? দোষাল ফ্যারিলির। ফ্যারিলি তিম জনপ্রিয় ভাগ হলো গেছে। বড় হলে বিলাইতে ভাকটো—ছোট হলে উমানাথ কলকাতার কেন্দ্রিক্যালস—আর বাবা বেনারসের উকীল—এখন প্লাফটিস হৃষে দিয়েছেন। গণপাতি হিল অল অ্যালং বায়ার কাছে। গণপাতির ইনস্ট্রুমেন্ট দেখবেন তো শুনাবে দেখন। কতো টাকা কামাবেছেন দেখন, মেজাজ দেখন, আবায দেখন। তার সিন্দুর থেকে গণেশ বার করে উমানাথ আমাকে বিকৌ করল—সে কথা সে বাপকে আনবে কী করে? তার সাইস কোথায়?’

ফেলুদা ভাবছে। সে কি মগনলালের কথা বিশ্বাস করছে?

‘সিন্দুর থেকে করে গণেশ নিলেন উমানাথবাব?’

মগনলাল জাকিয়াটো আরো বুকের কাছে টেনে নিল।

‘শুন—অফোবৰ দশ তারিখ আমাকে ডেকে পাঠাল উমা। সেদিন কথা হল। আমি এগু করলাম। আমার সাক তি কৃষ্ণ ধারাপ আছে—আপনি হয়ত জানেন। সেকিন আমার টাকার অভাব এখনো হয়নি। আর উ শৈন ডায়মন্ডক কত দাম জানেন? উমা জানে না। আমি যা টপ করলাম তার চেমে অনেক বেশি। এনিওরে—দশ অফোবৰ কথা হল। উমা বলল আমাকে দো-তিন দিন টাইম দাও। আধি বললাম নাও। ফিফ্টিনথ অফোবৰ ইভনিং উমা আবার ফেল করল। বলল গণেশ আমার হাথে এসে গেছে। আমি যবলাম তুমি চলে এসো মছলিবাবা দশনি করতে। উমা এসে গেল। আমি এসে গেলাম। আমার হাথে বাগ, উর পাকিটে বাগ। উর বাগে গণপাতি, আমার বাগে তিন-সও হাস্তেজ-রূপ লোটেস। দশন তি হল, বাগ যদল তি হল। বাস্তু যত্ন।’

মগনলাল যদি সত্য কথা বলে থাকে, তা হলে বলতে হবে উমানাথবাব, আমদের সাধোতিক ভাওতা দিয়েছেন আর নিজের মান বাঁচানোর জন্য একটা চুরির গল্প বাজা করে ফেলুদাকে তদন্ত চালাতে বলেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে প্রাণিশকেও ভাওতা দিয়েছেন। প্রৱো বেপারটাই ফেলুদার পক্ষে প্রত্যন্ত হবে, আর পক্ষে প্রাণিশকেও আসবে না। কিন্তু মগনলালই বা ফেলুদার প্রতি এক সদয় হবে কেন?

আমি প্রায় চমকে উঠলাম যখন ফেলুদা-ঠিক এই প্রচন্টাই মগনলালকে করে বলল। মগনলাল তার জোখ দ্রুতেরে আরো ছোট করে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, ‘কাবণ আমি জানি আপনি বৃদ্ধমান লোক। অর্ডিনারি বৃদ্ধ না, একস্ট্র-অর্ডিনারি বৃদ্ধ। আপনি আরো কিছুদিন তদন্ত করলে যদি আসল বেপারটা বুকে ফেলেন, তখন উমারও মৃশকিল, আমারও মৃশকিল। আমদের এই লেনদেনের বেপারটা তো ঠিক সিধা-সাফা নয়—সে তো আপনি বুবেন মিষ্টার মিস্টার।’

ফেলুদা চুপ করে আছে। তিন গেলাম সবুজ ঝাঁকের সরবত এসেছে—

আবাদের সামনে টেবিলের উপর রাখা। ফেল্দু একটা গোলাস হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'গণেশটা তা হলে আপনার কাছেই আছে। সেটা একবার দেখা যাব কি? যেটাৰ সম্বন্ধে এত বকল ইতিহাস রচিত, সেটা একবার দেখতে' ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক এটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।'

মগনলাল রাখা মেডে বললেন, 'ভেরি সারি মিস্টার মিস্টির, আপনি তো আনেন আবার এ বাড়িতে একবার রেড হয়ে গেছে। ও জিনিস কি করে আমি এখানে রাখি বলুন। ওটা আমাকে একটা সেফ ভাবণায় পাঠিয়ে দিতে হবে।' ফেল্দু পরের কথাতে ওয়া বেপরোজা ভাবটা আবার কাছে আবার নতুন করে ফুটে বেরোল।

'তো পাঠিয়েছেন বেশ করাছেন, কিন্তু আপনি সত্তা বলছেন কিনা জানান জনাবে ত আমাকে অন্সেধান চালিয়ে যেতে হবে মগনলালজী!—তাতে বাধি আপনার কথা সত্তা বলে প্রমাণিত হব তাহলে ত কথাই নেই, কিন্তু ধৰন বাধি তা না হয়?'

মগনলালের ডাক ঠৌটটা বিশ্বাসে নিচের দিকে বুলে পড়ল, আব তার তুরুজোড়া আরো লেখে এসে চোখ দ্রুতেকে অশ্বকারে টেলে দিল।

'আপনি আবার কথা বিশ্বাস করতেন না?'

শালমোহনবাবু সরবতের গোলাসটা তুলেই আবার ঠক করে নামিয়ে রাখলেন। ফেল্দুর হাতের গোলাস আস্তে আস্তে ঠৌটের কাছে চলে গেল। সরবতে একটা চুম্বক দিয়ে একদণ্ডে মগনলালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি নিজেই বললেন আপনাকে আমি চিনি না। কী করে আশা করেন প্রথম আলাপেই আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করব? আপনি নিজেই কি সব সহজ নতুন লোকের কথা বিশ্বাস করেন—বিশেষ করে যখন সে লোক সিনকে রাত করে দেন?'

মগনলাল সেইভাবেই ঢেরে আছে ফেল্দুর দিকে। একটা ছড়ির টিক টিক শব্দ শুনতে পাইছ, যদিও সেটা কৈখায় আছে তা জানি না।

এবার মগনলালের ডাক হ্যাতটা আবার ফেল্দুর দিকে এগিয়ে এল—তাতে এখনো সেই লোটের ডাঢ়া।

'তিন হাজার আছে এখানে মিস্টার মিস্টির। আপনি নিম এ টাকা। নিয়ে আপনি বিশ্বাস করুন, স্ফুর্তি করুন আপনার কাজিন আব আশ্বকলকে নিয়ে।'

'না মগনলালজী, ওভাবে আমি টাকা নিই না।'

'আপনি কাজ চালিয়ে যাবেন?'

'থেতেই হবে।'

'ভেরি গুড়।'

কথাটা বলার সম্বন্ধে সেগুলো মগনলালের হাত আবার কাঁচাই বেলের উপর

আছড়ে পড়ল। সেই লোকটা আবার পরজ্বার সাথনে এসে দাঁড়িয়েছে। যগনলাল
লোকটার প্রিয় সা তাকিঙ্গ কুলু, 'অজ্ঞনকো বোলাও—আউর তেরা নম্বৰ
কক্ষ লাও—আউর তুম্বা।'

লোকটা জলে গেল। কী বে আনতে গেল তা ভগবান আনে।

যগনলাল এবার হাসিহাসি শুধু করে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন।
লালমোহনবাবুর ডান হাত এখনো সরবতের গেলাসটাকে ধরে আছে, বিসও
সে গেলাস টেবিল থেকে এক ইঞ্চি উঠেনি।

'কেম্বা মোহনভোগবাব, আবার সরবৎ পরিষ্পৰ হল না?'

'না না—বৎসর—ইয়ে, সরবত—মানে...' আরো বললে আরো কথার গাঢ়গোল
হয়ে বাবে মনে করেই বোধহীন লালমোহনবাবু গেলাসটা তুলে ঢক্ ঢক্ করে
দু ঢোক সরবৎ থেকে ফেললেন।

'আশানি দ্বাবড়াবেন না মোহনবাব—উ সরবতে বিষ দেই।'

'না না—'

'বিষ আমি খাবাপ জিনিস বলে মনে করি।'

'নিশ্চয়ই—বিষ ইজ—আরেক ঢোক সরবৎ—'ভেঁড়ি বাজি।'

'তার চেরে অন্য জিনিসে কাথ দের বেশি।'

'অন্য জিনিস?'

'কী জিনিস সেটা আবার আপনাকে দেখাব।'

'খাব—'

'কী হল 'মোহনভোগবাব?'

'বিষ—মানে বিষ লাগল।'

শাইরে পায়ের শব্দ।

একটা অস্তুত প্রাণী এসে থেরে ঢুকল। সেটা আন্দৰ ত বটেই, কিন্তু
একেম আন্দৰ আমি কখনো দেখিবান। হাইটে পাঁচ ফুটের বেশি না, যোগা
শিকলিকে শরীরের মাথা থেকে পা' পর্যন্ত শিরা-উপশিরান গিছিগিজ করছে,
খাথার চুলে কদম্ব ছাঁটি, কান দুটো খাড়া হয়ে বেরিয়ে আছে, তোখ দুটো
দেখলে হনে হয় সেগোলী, কিন্তু লাকটা খাড়ার মতো উচু আৰু ছচেল।
আরো একটা লক্ষ্য কৱায় বিষর এই থে, লোকটার সারা গায়ে একটাও লোম
নেই। হাত শা আৰু বুকের অনেকখানি এমনিসেই দেখা যাবে, কাৰণ লোকটা
পৱেছে একটা শতজুন্ম হাতকাজি গেঁঠী আৰু একটা বেগুনী মঞ্চের ময়লা
হাত প্যাট।

লোকটা ঘৰে ঢুকেই যগনলালের দিকে ফিরে একটা সালুট কৰল।
তাম্বৰ হাতটা পাশে নামিয়ে কোম্পটাকে একটু ভাঁজ করে সামনের দিকে
কাঁকে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার ঘরে আরেকটা জিনিস ঢুকল। এটাই দোখহঁড় তের নম্বর বাঁজ। কুটো লোক বাঁজটা বয়ে এমন গাঁদির সামনে অবস্থান করছেন বাখল। বাবার সময় একটা কনোঁৎ শব্দে বুঝলাম ভিতরে লোহা বা পিতলের জিনিসপত্র আছে।

আরো কুটো লোক এবার একটা দেশ ধড় কাঠের তরা নিয়ে এসে আবাদের পিছনের সরঞ্জাটা বন্ধ করে তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। অক্ষণে অগন্মলাল আবার অন্ধ খুলেলেন।

‘নাইফ-গ্রোইঁ আনেন কৈ জিনিস মিস্টার বিস্তির? সার্কাসে দেখেছেন কখনো?’

‘দেখেছি।’

সার্কাস আমি দেখেছি, কিন্তু নাইফ-গ্রোইঁ দেখিনি। ও-ই একবার বলোছিল ব্যাপারটা কিরকম হচ্ছ। একজন লোককে একটা খাড়া করা তত্ত্বার সামনে দাঁড় করিয়ে দ্বি থেকে আরেকটা লোক তার দিকে একটা পর একটা ছোরা এমনভাবে মারতে থাকে যে, সেগুলো লোকটার গায়ে না লেগে তাকে ইঁগ খানেক বাঁচিয়ে তত্ত্বার উপর গিয়ে বিধত্তে থাকে। সে সার্ক এমন সাধারিতক থেলা যে দেখে লোম খাড়া হয়ে যায়। সেই থেলাই আজ দেখাবে নাকি এই অর্জন?

তত্ত্বো নম্বর বাঁজ খোলা হয়েছে। ঘরে আরো কুটো বাঁজ খুলে উঠল। থাক্কে বোকাই করা কেবল ছোরা আর ছোরা। সেগুলো সবকটা ঠিক এক রকম দেখতে—সব কটায় হাতির দাঁড়ের হাতল, সব কটায় ঠিক একরূপ নকশা করা।

‘হ্যাবনসপ্যুরের রাজার প্রাইজেট সার্কাস ছিল, সেই সার্কাসেই অর্জন নাইফ গ্রোইঁ-এর খেল দেখাত। এখন ও হাওর প্রাইজেট সার্কাসে খেল দেখায়—হেঁ হেঁ হেঁ...’

বাঁজ থেকে গুনে গুনে বাঁজটা ছোরা বাব করে আবাদের সামনেই একটা দ্বিতীয়বারের টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা হওয়েছে একটা খোলা জাপানী হাতপাথার মণ্ডো করে।

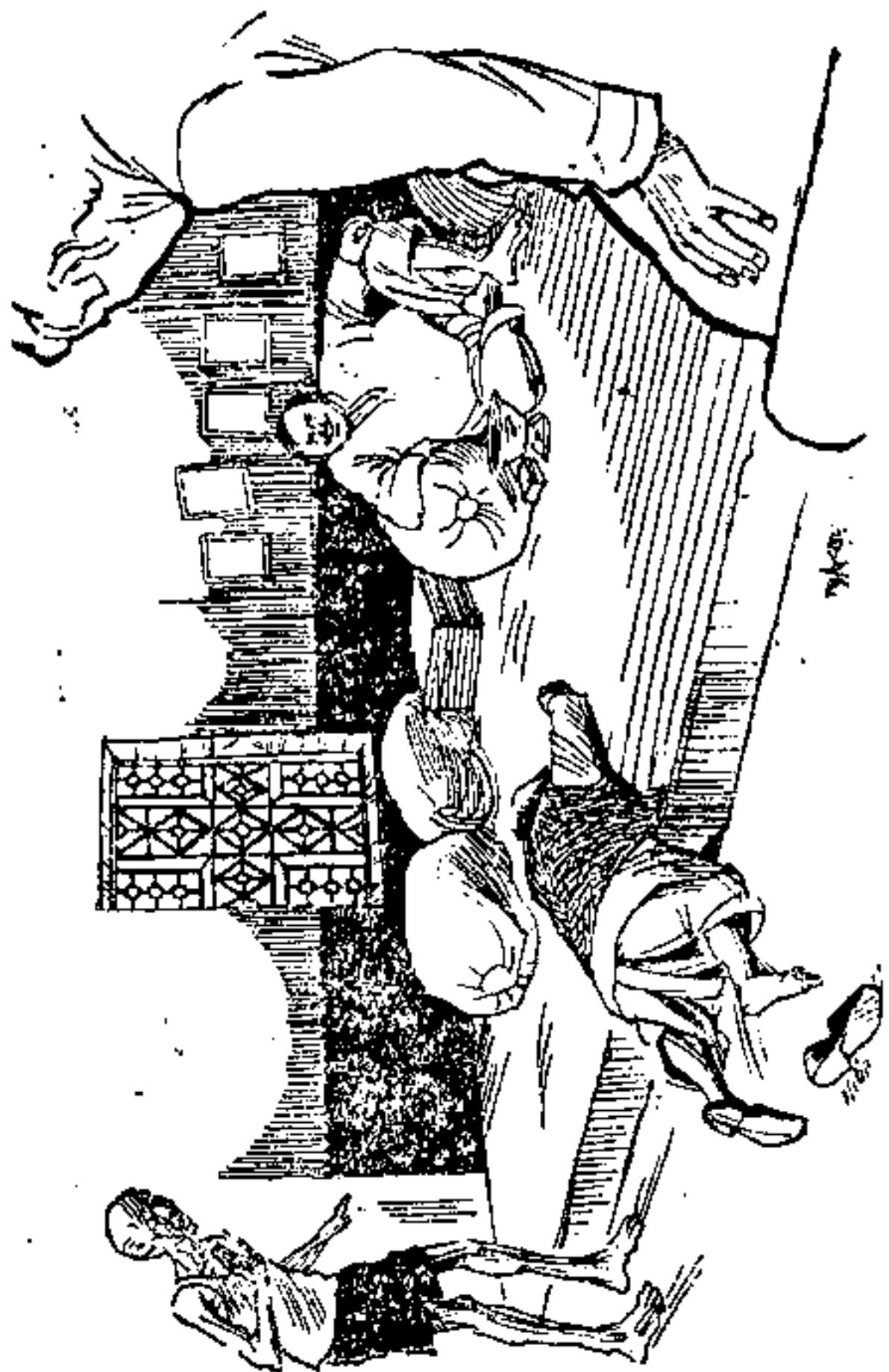
‘আসুন আস্কজ।’

আস্কজ কথাটা শুনে লালমোহনবাবু তিনটে জিনিস একসম্পূর্ণ করে ফেললেন—হাতের কটকার গোলাসের অর্ধেক সরবরাত মাটিটে ফেললেন, পেটে ঘৰি, খাবার মণ্ডো করে সোজা থেকে সামনের দিকে ঝুকে ফেললেন, আর ‘আঁ’ বলতে গিয়ে ‘গ্যাঁ’ বলে ফেললেন। পরে জিগোস করাতে বলোছিলেন উনি নাকি ‘আঁ’ আর ‘গোলুব’ একসম্পূর্ণ বলতে গিয়ে গাঁ বলেছিলেন।

এবার ফেল্দার ইস্পাত-কঠিন গলায় স্বর শোনা গোল।

‘ওকে ডাকছেন কৈন?’

অগন্মলালের হাঁসির ছাটে তার কন্দই আরো ইঁগ তিনেক তাকিয়ার ভিতর



ভুকে গেল ।

‘ওকে ডাকব না ত কি আপনাকে ডাকব মিস্টার মিত্তির? আপনি ততোয়ে
সামনে দাঁড়ালে খেল দেখবেন কী করে?...আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন
না মিস্টার মিত্তির। আমার কথা বিসেমাস না করে আপনি আমাকে অনেক
আপনার কারণে। আপনি জানবেন যে চাকু ছাড়াও অন্য হার্টয়ার আছে
আমার কাছে। ওই ঘূর্ণবুলিক দিকে দেখন—দো ঘূর্ণবুলি, দো পিস্তল
আপনার দিকে পহেলে করা আছে। আপনি বামেলা না করেন ত আপনার
কোনো ক্ষতি হবে না। আপনার বন্ধুর ভি কোনো ক্ষতি হবে না। অর্জুনের
জবাব নেই, আপনি দেখে নেবেন।’

ঘূর্ণবুলির দিকে চাইবার সাথে আমার নেই। লালমোহনবাবুর দিকেও
চাইতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু চাপা মিহি গোয় ওর একটা কথা শুনে না
চায়ে পারলাম না। ভুক্তোক হাতল ধরে যোর ছেড়ে উঠতে উঠতে কথাটা
কলছেন, তার ফাঁকে ফাঁকে ওর হাঁটুতে হাঁটু লেগে ঘটঘট শব্দ হচ্ছে।

‘বেঁচে থাকলে...পপ্প-প্লাটের আর চি-হি-হিস্তা নেই।’

বুজন লোক এসে লালমোহনবাবুকে দু দিক থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে
অর্জুনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লালমোহনবাবু চোখ বুজলেন।

তারপর আমার পিছন দিকে যে জিনিসটা ঘটল সেটা আর আমি দেখতে
পারিনি। ফেলুন নিশ্চাই দেখোছিল, কাইল না দেখলে নিশ্চাই ঘূর্ণবুলি
থেকে পিস্তলের গুলি এসে ওর বুকে বিধত। আমার শব্দ শুনেই বুক বুক
হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখ ছিল সামনের টেবিলের দিকে। তার উপর থেকে
একটা একটা করে ছুরি তুলে নিজে অর্জুনের হাত, আর তার পরেই সে
ছুরি ঘাঁটাই শব্দ করে তত্ত্বাত্মকাঠ তেবু করে ঢুকছে।

জ্যে শেষ ছুরিটা তোলা হয়ে গিয়ে টেবিল খালি হয়ে গেল, আর ঘাঁটাই
শব্দ, আর অর্জুনের কোস ফোস করে দয় ফেলার শব্দ, আর মগনলালের
ধন ধন ‘বহুৎ আজ্ঞা’ থেকে গিয়ে রইল শুধু অদৃশ্য ঘাঁড়ির টিক টিক আর
বিশ্বনাথের ঘণ্টার উৎ উৎ শব্দ। আর তার পরে হল এক ভাস্তব কাণ্ড।

লালমোহনবাবু দুরজার দিক থেকে ফিরে এসে অর্জুনের হাতে শেক
করে ‘থাক ইউ স্যার’ বলেই অজ্ঞান হয়ে ইমাইড থেকে মগনলালের গাঁদজ
উপর পড়ে সেটার অনেকখানি ঝামগা ধায়ে ভিজিয়ে চপচপে করে দিলেন।

সাত

দৃঢ়ো থাজে। আকাশে মেঘ। দশান্বসেধ ঘাটে এখন লোক নেই বললেই চলে। আমরা তিনজন জলের ধারে বসে আছি ঘাটের সৰ্পিড়ির উপর। মগন-লালের ধরে বিভীষিকার খটনটুঁয়ে পর প্রায় এক ঘণ্টা কেড়ে গেছে। মগন-লালের লোকই লালমোহনবাবুর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিল চোখে মুখে জলের কাপটা দিয়ে। তারপর মগনলাল নিজে দূরের সলো শার্টে মিশয়ে থাইয়ে লালমোহনবাবুকে চাপ্যা করে বলেছিল, 'আপ্পল, ইউ আর এ বেড ম্যান।' তারপর থেকে লালমোহনবাবু কথাটো আর বিশেষ বলছেন না, কেবল ফেল্দুকে একবার জিগ্যেস করেছেন তার মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে কিনা। তাতে আমরা দ্রুজেই তাকে আশ্বাস দিয়েছি যে নতুন করে একটি চুলও পাকেন।

মগনলালের হাবড়ায়ে স্পষ্টেই দোকা গিয়েছিল যে ফেল্দুর তদন্ত চালাতে গেলেই সে ব্যতি হয়ে থাবে—হয় ছুরিতে, না হয় গুলিতে। অবিশ্য দেব পর্যন্ত ফেল্দু একটা কনসেশন আদায় করে নিয়েছে; সে আরে একটি বার হোবালবাড়িতে থাবে, কারণ হঠাতে পুর মেরে গোলে সেটা তার সম্মানের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হবে। ধাওয়ার ব্যাপারে দোরি করে লাভ নেই, কাজেই সেটা আজই বিকেলে সেরে ফেলতে হবে। মগনলাল আমাদের বিদায় দেবার আগে লক্ষ্য কথার শাস্তি দিয়েছে—'আপানি জেনে রাখবেন মিষ্টার মিস্টির যে আপানি বাস্তুবাড়ি যা করবেন তা আট ইওর ওন রিস্ক।' আর আপনার উপর নজর রাখার বেওপ্পা আমার আছে সেটাও আপানি জানবেন।'

এটা বলতে ধারাপ লাগছে যে এখন পর্যন্ত মগনলালই ফেল্দুর উপর টেক্কা যেয়ে আছে। এটা আরি জানি যে যতই ডাকসাইটে প্রতিশ্বন্দী হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই ফেল্দুর জয় হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে মগনলাল যেখানের মতো সংবোধিক প্রতিশ্বন্দীর সামনে এর আগে ফেল্দুকে কখনো পড়ত হয়নি।

বৈল কিছুক্ষণ চুপ করে গল্পার দিকে চেয়ে থেকে ফেল্দুর দৌর্যবাস কলে বলল, 'গোশটা যোবাল বাড়িতে দয়ে গেছে রে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নইলে লোকটা আমাকে তদন্ত করার জন্য এতগুলো টাকা অফার

করে না। কিন্তু কথা হচ্ছে—সেটা কোথায়? সেটা কেন এখনো শর্পিত মগনলালের নামালের বাইরে? কখন কৌতুবে সেটা সে হাত করার কথা ভাবছে? আর সব শেষে আয়ো দুটো প্রশ্ন—কে সেটা সিন্দ্রিক থেকে সরাল, এবং বাড়ির কার সঙ্গে মগনলালের বৈগম্যাজশ রয়েছে?

ফেল্দা পকেট থেকে তার খাতাটা বাল করে মিনিট পাঁচেক উল্টুটে-পালটে দেখল। ব্যবহৃতে পারাহি ইতিবাহো সেটাটে বেশ কিছু নতুন জিনিস লেখা হয়েছে, কিন্তু সেটা যে কী তা এখনো জানি না। লালমোহনবাবুকে লক্ষ্য করাই যাবে মাঝে শিউরে উঠেছেন, আর নিজের শরীরের এখানে ওখানে হাত বুলিয়ে দেখছেন। তিনি বে অক্ষত আছেন সেটা বৈধহয় এখনো কুর বিশ্বাস হচ্ছে না।

আমরা যখন ঘাট থেকে উঠেলাম তখনো আকাশে ছাই মাত্রের মেঝের টুকরোতে ছেঁজে আছে। আকাশটা দেখতে গিয়েই লাল-সাদা ট্যাটকাটি বুড়িটোর বিকে চোখ গেল। ফেল্দাও দেখেছে, কারণ ওর সিঁড়ি-ওঠা থেমে গোল।

বুড়িটো উঠছে যে বাড়িটোর মাধ্যার উপর সেটা আমাদের চোনা থাই। এটা সেই লালবাড়ি—ঘার ছাতে শহীদ সিংকে কাশ্টেন স্পার্কের কাছে আন্দামপর্ণ করতে হয়েছিল। বাড়ির ছাতে কে? শহীদ সিং না? হ্যাঁ—কোনো সঙ্গেই নেই। এ হল বুকুর বন্দু সুরু। মে এক দৃশ্টিতে আকাশের বুড়িটোর পিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার বুড়িটো শোঁক থেকে সুতোর টানে নিচের পিকে লেয়ে এল। সুয়াহের জন হাতটা একটা আটকা পিয়ে উপর পিকে উঠল। তার ফলে একটা জিল শূন্য উঠে বুড়িটোর পিছন পিকে চলে গোল।

এবার বুকুর জিলটা একটা সুতোর সঙ্গে বাঁধা, আর সুতোটা ধরা সুয়াহের ছাতে।

সেই সুতো ধয়ে সুরু টান দিলে, আর তার ফলে বন্দী বুড়িটো তার ছাতে চলে আসছে।

গোখুলিয়ার মোড়ে একটী শোকানে বসে ছা থেয়ে আমরা যখন শুকনী নিবাসে পেঁচলাম তখন প্রাক চারটে বাজে। তিলোচন পাঁচে সেলাম ঠেকে ফটক খুলে পিল। আমরা গাড়িবাবাস্তোর পেঁচানুর আগেই সকালেরই মতো বিকাশবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

‘কী খবর? এনি প্রোগ্রেস?’

‘উইন্দু’ ফেল্দা থলল। ‘শহুর দেখে বেজুলাম সাবা দিন।’

‘ওঁয়া ত সব বেরিয়েছেন।’

উমানাথবাবুর গাড়িটো দেখিছলাম না। তাছাড়া বাড়িটো দেখেও কেমন

জানি খালি খালি মনে হচ্ছি।

‘কোথায় গেছেন?’ ফেল্দা জিগোস করল।

‘সারনাথ। আজও কিছু আপীলস্বত্ত্ব এসেছেন বাইরে থেকে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেতে দুটো গাড়ি বোঝাই করে যোগাযোগেন সব, ফিরতে সম্ভব হবে।’

‘রকু গেছে?’

‘না। রকুর সাজনাথ দেখা হয়ে গেছে। ও গেছে টুরবাল দেশতে ওর এক সামাজিক সঙ্গে।’

আসবাব সময় রাস্তার দেয়ালে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। সেই আদিকালের ছবি—আগাম জন্মের আগে, ফেল্দার জন্মের আগে, এমন কি লালমোহন-বাবুর জন্মের আগে—টারজন হি এপ ফ্যান।

‘আশাৰ ঘৰে এসে বসবেন একটু?’ বিকাশবাবু প্রশ্ন কৰলেন।

ফেল্দা বলল, ‘আগে একবার ছাতে থাব—বৰ্দি সম্ভব হৈ।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনার জন্ম এ বাড়িৰ সব দৱজা খোলা।’

সামনের দৱজা দিয়ে ঢুকেই চড়ীপাটো আওয়াজ পেলাম। সেটা প্রজ্ঞামণ্ডপ থেকে আসছে জানি, কিন্তু এত জোৱে আওয়াজ ত কাল পাইনি। তান দিকে চাইতেই বাপাগাটা পরিষ্কার হয়ে গৈল। সিঁড়িৰ পিছনের দৱজাটা আজ খোলা, আৱ সেটা দিয়ে খিল্লি প্রজ্ঞার জায়গাটা দেখা ষাটেছে। আমৰা চার জনেই দৱজাটোৱ দিকে এগিয়ে গেলাব। দুৱ থেকেই দেখা যাচ্ছে শশীবাবু এক মনে তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

‘কালই ত শশীবাবুৰ কাজ শেষ’, বলল ফেল্দা।

‘হ্যাঁ’ বললেন বিকাশবাবু, ‘ভদ্ৰলোকেৰ জন্ম এখনো সম্পূর্ণ সারোবি, তাৰে এক নাগাড়ে তুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।’

ছাত দেখা যানে যে আসলে রকুৰ ঘৰ দেখা সেটা আগেই আল্দাজ কৰেছিলাম। সেদিন সকালে এ ঘৰে বোৰ ছিল না, আজ পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে চারিদিকের হড়ানো হিন্দিসেৱ উপৰ পড়েছে।

আমি ভেবেছিলাম আজ যখন রকু নেই তখন ফেল্দা হয়ত তপ্প কৰে অনসন্ধান চলাবে, কিন্তু তাৰ পৱেই মনে হল মগনলালেৰ হ্ৰাস্বিকৰ কথা। বেশিক্ষণ শঁকুৱাই-নিবাসে থাকাটোই ফেল্দার পক্ষে বিপজ্জনক। তাহাড়া বৈল কলসন্ধানেৰ দৱকাৰ হল না, কাৰণ ফেল্দা হেটা খুজছিল সেটা ঘৰে ঢুকেই পেয়ে গৈল।

আজই বিকেলে স্বামৈৰ কৌসে বদ্দী হতে দেখেছি এই লাল-সাদা পেটকাটিটাকে। মেৰেৰ উপৰ লাটাই-চাপা অবস্থায় পড়ে আছে বুড়িটা; সেটাৰ উপৰ যে উৎপাত হয়েছে সেটা দেখলাই বোৰা যাব; কাল আজ এ ঘৰ্তি

আকাশে উড়বে না।

ফেলুন্দা লাটাইটে কুলতেই একটা বিনিস তোখে পড়ল।

পুরুষের সানা অংশটাতে নৈল প্রেনসিল দিয়ে হিন্দ অক্ষরে কৌ বেন লেখা গয়েছে। দ্রোঢ়ে আয়গায় আল্যানা করে লেখা।

কাহ থেকে পড়ে বন্ধুতে পানলাম ভাষাটা বালো। বোধহয় স্বরে বালো পড়তে পারে না বলেই রুকুকে এটা করতে হয়েছে।

একটা লেখা ইল এই—

‘আমি বন্দী। সব ঠিক আছে হা হা। আবার বিকেলে। ইতি ক্যাপ্টেন প্রাক্ত’।

অনাটা ইল—

‘টারজন দেখতে যাচ্ছ। আবার কাল সকালে। ইতি ক্যাপ্টেন প্রাক্ত’।

‘আপ্তের বাপ।’ বলে উঠলেন সালমোহনবাবু। ‘কোন জগতে বাস করে? এশাই এ ছেলে?’

ফেলুন্দা পুরুষটাকে আবার ঠিক ধুইজাবে ইল সেইজাবে রেখে বলল, ‘বিহস্য রোমাণ সিরিজের অগং। শিশুমনের উপর আপনাদের বইয়ের কৌ’ প্রভাব তার প্রশংসন নিয়ন্ত এটা।

আমরা রুকুর ঘর থেকে নিচে ফিরে এলাম। বিকাশবাবু চারের কথা আগেই বলে দিয়েছিলেন, তার ঘরে গিয়ে বসতেই ভরস্বাঞ্জ টে নিয়ে চুকল।

গল্পটা বেশ বড়। একাদিকে থাট, অনাদিকে একটা কাজের টেবিলের সামনে একটা চেয়ার। এ ছাড়াও বসবার জন্য একটা সোফা গয়েছে। ফেলুন্দা টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসল, আমরা দুজন সোফাতে, আর বিকাশবাবু আটে। পাশের বৈঠকখানার ঘাঁড়তে মোলায়ের সূর্যে চু চু করে চারটে বাজল; শুনলেই বোধ যায় জাত ঘাঁড়।

‘মিস্টার বোধালোর কেমিকালের বাবসা কিরকম চলে?’ ফেলুন্দা প্রশ্ন করল।

‘ভালোই ত।’ বিকাশবাবু বাদ প্রস্তুত শুনে অসাক হয়ে থাকেন ত সেজো তার কথায় কিছু বোঝা গেল না—‘অবিশ্বা মাঝে-মধ্যে যে স্পোর্টক ইত্তাদি হয় না তা নয়। তা সে কোন বাবসায় হয় না বলুন।’

‘হ্যাঁ...’

ফেলুন্দা হঠাত হাতের কাপটা রেখে উঠে পড়ে বলল, ‘একবার বৈঠকখানাটা দেখতে পারি?’

‘নিশ্চয়ই।’

আমরা চারজনই চা খাওয়া বল্ব রেখে বৈঠকখানার গিয়ে হাঁজুর হলাম। বিকাশবাবুর ঘর থেকে বৈঠকখানার বাবার কোনো মরজা নেই; যেতে হলে

আগে একটা বারান্দা পড়ে।

‘সেদিন হগললাল আৰ উমানাথবাৰু, কোথাৰ বস্তিচ্ছেন সেটা জানতে পাৰি?’

বিকাশবাৰু, দুটো শুধুমাত্ৰ সোজা দৰিদ্ৰে দিলেন।

‘ওদিকে কি যৰ? না আৱেকটা বারান্দা?’

আমৰা যে বারান্দা দিয়ে চৰকুচাৰ সেটা পূৰ্ব দিকে; ফেলদুৰা দক্ষিণ দিকেৰ দুটো; পৰ্যায় দেওয়া দৱতাৰ দিকে দোখিয়ে পুনৰ্বো কৰল।

‘ওদিকে দুটো সৱজাৰ পিছনে দুটো ঘৰ। একটা ঘড় কৰ্তাৰ আঁপস ঘৰ ছিল; অন্যটাৰ ঘৰেজৰা অপেক্ষা কৰত?’

আমৰা দুটো ঘৰেৰ ভিতৱ্যেই ঢৰকে মিনিটখালেক কৰে থেকে আবাৰ বিকাশবাৰুৰ ঘন্টে কিমৰ এলাম। এবাজ ফেলদুৰা ছিগোস কৰল, ‘গণেশটা কি কলকাতাত থাকত, না এখানে?’

‘এখানে’, বিকাশবাৰু, বললেন, ‘ওটো যাবোতে মিষ্টার ঘোষালেৰ ঘৰ না কখন হয়েছে, তাৰ চেয়ে তোৱে কল্প কল্প হয়েছে তুমি যাবাৰ। তুম মন ভালো কৰাব জনাই মিষ্টার ঘোষাল এতটা হয়ে হয়ে পড়েছৰন।’

ফেলদুৰা ইতিমধ্যে বিকাশবাৰুৰ টেবিলৰ উপৰ থেকে পানিস্টাইটা হাতে তুলে নিয়েছে। পানৰিৰ সাইজেৰ মার্ফ’ রেডিও, চামড়াৰ পেঁচাম দিয়ে ঢাকা। ফেলদুৰা নবটা-ধৰে ঘোষালে স্কাইচেৰ কোনো আওয়াজ ইল না। তাৰপৰ সেটা উল্লেখ দিকে থোৱাতে খটক কৰে একটা শব্দ হওয়াৰ শব্দে সকলে ফেলদুৰাৰ চুৰু কুচকে গেল।

‘একি, আপনাৰ রেডিও ত খোলা ছিল।’

‘তাই—তাই বৰ্ণনা?’

বিকাশবাৰু চেহাৰাটা বে ঠিক কি রকম হোল সেটা আবাৰ পক্ষে লিখে বোঝান ভীষণ শক্ত। শুধু এটা পৰিস্কাৰ ভনে আছে বে বিকাশবাৰু আদেৰ জান্ডাটোৱা হেলান দিতে যাইছিলেন, ঠিক সেই সময় স্কাইচেৰ আওয়াজটা হওয়া থাক পিতৃ সোজা হয়ে গিয়ে হেলান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে ফেলদুৰা রেডিওৰ পিছনে বাটোৱিৰ খোপেৰ দৱজাটা খূলে ফেলেছে। আড়চনাখে দেখলাম বিকাশবাৰু একটা চোক গিলজিল। তিনটো ব্যাটাৱিৰ রেডিওটোৱা ভিতৱ্য থেকে বেৰিয়ে এল।

‘আপনাৰ ব্যাটাৱিৰ ত লৈক কৰেছে’, ফেলদুৰা বলল, ‘বেশ কিছুদিন হল এত আগত ফুৰিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।’

বিকাশবাৰু চুপ।

‘রেডিও আপনি শোনেন নিশ্চয়ই, কিন্তু গত দেশ কৰ্মদিন আৰ শোনা হৱান। কেন বলুন ত?’

কোনো উত্তর নেই।

‘আপনি যদি কিছু না বলেন, তাহলে আমাকেই বলতে দিন।’ ফেল্দুর গলায় আমার খুব চেনা একটা ধোনো স্বর শুনতে পাইছ।—‘সৌদিন মগনলালের কথা শোনার সোভ আপনি সামলাতে পারেননি, তাই না? রেডিও কাম্পেন দিয়ে আপনি নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন ওই সংক্ষিপ্ত বাজ্রায়। দরজার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনি টেলিভিনার কথাবার্তা শুনেছিলেন। আপনি জানতেন মগনলাল মিস্টার দ্বোধালকে শাসিয়ে গেছেন। আপনি আনতেন শগনলাল মিস্টার দ্বোধালকে দিশ হাজার টাকা অফার করেছেন গণেশটার জন্ম। তাই নয় কি?’

বিকাশবাবুর মাথা হেটে হয়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই তিনি থাবা নেতে ‘হাঁ’ বললেন।

‘এবার আরেকটা প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাব দিন ত—ফেল্দুর ব্যাটারিগুলো টেবিলের নিচে ওয়েস্ট শেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ‘ধৈরিন অস্বিকাবাবুর ঘরের সিন্দুর থেকে গণেশ চূর্ণ যান—অর্থাৎ পনেরই অক্ষোব্দ—সৌদিন আপনি সঞ্চয় সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত কৌ করছিলেন? আপনি রেডিও শোনেননি, কারণ রেডিও তার গাঁচ দিন আগেই—’

‘বলছি, বলছি—আমাকে বলতে দিন।’—বিকাশবাবু বেল মারিয়া হয়ে বলে উঠলেন। ফেল্দুর কথা বুঝ করে বিকাশবাবুর দিকে ঢেয়ে দাঁড়িয়ে গিলে। বিকাশবাবু মম নিয়ে যেন বেশ কম্বে তাঁর কক্ষগুলো বলতে শুরু করলেন—

‘সৌদিন মগনলালের হৃষ্মাক শোনার পর থেকেই আমার মনে ভীষণ একটা উৎকণ্ঠার ভাব ছিল। রোজই মনে হচ্ছিল একবার সিন্দুর খুলে দেখি গণেশটা আছে কিনা। কিন্তু সে স্মৃতি প্রথম এল সৌদিন মিস্টার দ্বোধাল মছলিয়াবাকে দেখাতে গেলেন। উনি যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই আমি অস্বিকাবাবুর ঘরে যাই। দেরাজ থেকে চাবি বার করি, করে সিন্দুর খুলি।’

‘তারপর?’

ফেল্দুরকে প্রশ্নটা করতেই হল, কালগ বিকাশবাবুর কথা স্বেচ্ছে গিয়েছিল। ‘সিন্দুর খুলে কৌ দেখলেন আপনি?’ ফেল্দুর আবার প্রশ্ন করল।

বিকাশবাবু যাকাশে মুখ করে ফেল্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দেখলাম—গণেশ নেই।’

‘গণেশ নেই?’ অবিশ্বাসে ফেল্দুর ভুরু ভীষণভাবে ঝুঁঁচকে গেছে।

বিকাশবাবু বললেন, ‘আমি জানি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। বিন্দু আমি শপথ করে বলছি যে সৌদিন আমি সিন্দুর খোলার আগেই গণেশ চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমি যে কেন একথাটা এতদিন আপনাকে বলিনি সেটার কাবণ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিস্টার মিশ্র। সত্য বলতে কি,

আমি যে কৌ অন্তর্ভুক্ত মানসিক অবস্থার মধ্যে রয়েছি সেটা আপনাকে বলে ব্যোবাতে পারব না।'

ফেলুদা আবার চায়ের কাপটা তুলে নিজেছে।

'ও সিন্দুকটা কি এমনিতে প্রায়ই খেলা হয়?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'অফেবারেই হয় না। আমি কভের জানি, এবার উমানাধবাবু আসার পরের দিনই একবার খোলা রয়েছে—কিছু পুরোন দলিল নিয়ে বাপ আর ছেলের মধ্যে আলোচনা হিলে। এ ছাড়া থের সম্ভবত আর একবিনাও খোলা হয়েন।'

ফেলুদা চুপ করে বসে আছে। বিকাশবাবুর অবস্থা যদেই শোচনীয় বলে মনে হচ্ছে। প্রায় দ্ব্যামিনিট এইভাবে থাকার পর ভঙ্গলোক আর না পেরে বললেন, 'আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না মিস্টার মিস্টির?'

ফেলুদার গলার স্বর এবার রৌদ্রিতে রুক্ষ।

'আই আমি সরি মিস্টার সিংহ—কিন্তু ধারা প্রথমবারেই সত্তা কথাটা বলেন না, তাদের উপর ক্ষেত্রে সন্দেহটা সহজে মুছে ফেলা ধার না।'



আঠি

প্রদিন সকালে উঠে দোধ আকাশ যেয়ে ছেয়ে আছে। টিপ টিপ করে ব্র্যান্টও পড়ছে, আর আলতার অবস্থা সেখলে হোলা যায় যে সারাবাত এই ভাবেই ব্র্যান্ট পড়ছে। আমি সাড়ে ছটায় উঠেই। লালমোহনবাবু, তখনও বিছানায় শ্বেত পড়িমাস করছেন। তার নম্বর ঘাটে থালি, কারণ সেই মেডিক্যাল প্রিস্রেজেনটেটিভ কালকেই চলে গেছেন। ফেল্দু যে কখন উঠেছে জানি না। প্রথমে ভেবেছিলাম যে ও বেরিয়ে গেছে, তারপর বাসান্দীয় বেরিয়ে দোধ ও এক কোণে রেলিং-এর উপর পা তুলে কেয়ারে বলে স্টেটবুকের পাতা গুটাক্ষে। পায়ের পাতাটা যে ব্র্যান্টে ভিজে সেদিকে ওর খেয়ালই নেই। ওর পাশে তেপায়া টেবিলের উপর একটা থালি ছায়ের কাপ, চারমিনায়ের খোলা প্যাকেট, আর একটা ছোট পাথরের বাটি—য়েটাকে ও অ্যাশ-ট্রি হিসেবে ব্যবহার করছে। ব্র্যান্ট দিনেও যে ঘাটে ধারার লোকের অভাব হয় না সেটা আলতার দিকে চাইলৈই বেরা যায়। আর শব্দেরও কোনো কম্পি নেই। অবিশ্য এটা আমি জানি যে এ ধরনের গোলমালে ফেল্দুর চিন্তার কোনো ব্যাপার হয় না। একবার ওকে দ্বিগুস করাতে ও বলেছিল, 'চিন্তা যদি গভীর হয় তাহলে আশেপাশের গোলমাল তার তলা অবধি পোকতে পারে না। কাজেই, তুই ঘেটাকে ডিস্টার্বেশন ক্যাবিস, সেটা আমার কাজ আসলে ডিস্টার্বেশন নয়।'

লালমোহনবাবু পোনে সাতটায়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বললেন, 'স্থগ্ন দেখলুম আমার সর্বাঙ্গে ছোরা বিংশে বজেছে, আর আমি সেইভাবেই রহস্য-রোগী সিরিজের অপিসে লেখার শুরু আনতে পিলেই, আর পাবলিশার হেমবাবু বলছেন--আপনার ছস্নামটা চেপে কয়ে ছটায়, থেকে সজার্ন করে দিন-দেক্কবেন বাইরের কাটিত বেড়ে গেছে।'

আবগু দুর্জনে যখন ব্র্যান্ট ধূয়ে চা খাচ্ছ, তখন ফেল্দু বাসান্দী থেকে খরে এসে বলল, 'লালমোহনবাবু, আপনার কোনো বইয়েতে ধূড়িয়ে সাহায্য করেছে পাঠানোর কোনো ঘটনা আছে?'

লালমোহনবাবু আকেপের সঙ্গে যাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই, থাকলো, অ ব্র্যান্টই ইতুম। ওটা অস্ত্র যনে পড়ে নিশাচরের একটা বই থেকে নেওয়া। বোধহয় "মানুষের রঞ্জিম্ব"।'

‘নিশ্চাতৰ কে?’

‘ওটা ক্ষিতীশ চাকলাদারের ছন্দনাম। রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজেরই আবেকজন লেখক। বলছি না—আপনাদের রক্তুবাজী ওই সিরিজ একেবারে গুলে খেড়েছে।’

‘আপসোস হচ্ছে! ফেলুদা খাটে বসে বলল—‘এতটা কৃক্ষ-তাঞ্জলা করা ভাঁচত ছিল না’ আপনাদের ওই সিরিজটাকে। ইয়ে—এক খেকে দশের মধ্যে একটা নম্বৰ বল্বুন ত।’

‘সাজি।’

‘হ্যাঁ...। শতকরা সত্ত্ব ভাগ মোক ওই নম্বৰটা বলবে।’

‘তাই খুবি?’

‘আম এক খেকে পাঁচের মধ্যে জিগোস করলে কলবে তিনি, আর ফুল জিগোস করলে পোলাপ।’

সাড়ে আটটাত্ত্ব সময় হোটেলের চাকর হুর্কিল এসে খবর দিল ফেলুদাকে ফোন এসেছে। শুনে রেশ অবাক হলাম। কে ফোন করছে এই সকালবেলা? একবার ভাবলাম ফেলুদার সাথে বাই নিচে, কিন্তু এক দিকের কথা শুনে বিশেষ কিছু বোকা বলবে না বলে ধৈর্য ধরেই বসে রইলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফেলুদা ফিলে এসে বলল, ‘তেওয়ারি ফোন করেছিল। প্রয়াগ বা হরিনবারে গত কয়েক মাসের মধ্যে কোনো নামকরা নতুন বাবাজীর আবির্দ্ধী ঘটেনি। নো মছলিবাবা, নাথিৎ।’

‘বোকো! ইনি তাহলে ফোর-ট্যুরেন্টি?’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘সেবুকল্প ত অনেক বাবাজীই, লালমোহনবাবু; কাজেই তার জন্ম একে আলাদা করে ভৰ্মনা করার কিছু লেই। এই প্রত্নতাত্ত্ব পিছনে আর কেনেন গড় সিনস্ট্রাই অভিসার্থি শুকিয়ে আছে কিনা সেইটোই হচ্ছে প্রশ্ন।’

‘আপনি কি জোড়া-তদলতে জড়েনে পড়ছেন নাকি মশাই?’

‘জোড়া কথাটো মনে হয় জানেন ত? জোড়া মানে ডবল আবাদ জোড়া মানে যুক্ত। একেত্তে জোড়া মানে যে কৌ সেটা এখনো ঠিক জানি না।’

‘তেওয়ারি আর কিছু বললেন না?’—আর্ম জিগোস না করে প্যারলাম না। ফেলুদা প্রাপ্ত চার মিনিটের মতো টেলিফোনে কথা বলেছে, কিন্তু আমদের এসে ঘেটা বলল তাতে এক মিনিটের বেশি লাগার কথা না।

ফেলুদা চিত হয়ে বিছুনায় শুন্ধে পড়ে বলল, ‘রায়বেরিলির জেল যেকে হস্তা তিনেক আগে এক জালিয়াত পালিয়েছে। এখনো নিখোঁজ। চেহারার বর্ণনা মছলিবাবাৰ সঙ্গে খানিকটা মেলে, থাইও দাঙ্গি-গোঁফ মেই, আর এতটা কলো না।’

‘তা সে ত মশাই মেক-আপের বাপোৱ, বললেন লালমোহনবাবু, ‘একবার

দিনের ক্ষেত্রে কাছ থেকে ভালো করে দেখে এসে ইহু নাই? থাট্টে গিরে করে আকলেও ত ইয়। কাদা ঘাট্টে ধান নিষ্ঠাপ্তি।

‘সে গুড়ে বাবু। শুধু সন্ধিয়া দর্শন দেন, যাকি সময়টো সরুজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকেন। সেখানে অভয় চক্রোত্তি হাড়া আৱ কারো প্ৰবেশ নেই। বাবুমা দাওয়া সব ওই একই ঘৰে—আৱ নাওয়াটো মাইনাস।’

আমুৰা দৃঢ়নেই অবাক। বাবাজী স্বান কৰেন না?

‘এসব তেও়োৱাৰ বললেন?’—লালমোহনবাবু প্ৰশ্ন কৰলেন।

‘এত কথা হল তোমার সঙ্গে?’—আমি জুড়ে দিলাম।

ফেলুনা আমাৰ দিকে চৰে ধীৰে ধীৰে তিনবাৰ মাথা দেবড়ে বলল, ‘পঞ্চ-বেশণ-পৰাবৰ্ত্তন ফেল। তুই বাৰান্দাকু গোলি আৱ জঙ্গা কৰলি না যে আমাৰ ভিত্তে পাঞ্জাৰি আৱ পায়জামা দাঁড়িতে কুলছে? ঘৰে বসে কাপড় জেজ্জে শুনেছিস কথনো?’

আমি চৰ মুখে চুপ হৈৰে গোলাম।

ফেলুনা এবাৰ যা বলল তা এই—ও চাৰটো উঠে সাড়ে চাৰটো আগে কেদোৰ ঘাটে পৌছে অভয় চক্ৰবৰ্তীৰ জন্য অপেক্ষা কৰে শেষটোৱা তাৰ দেখা পেয়ে তাৰ সঙ্গে আলাপ কৰে।—‘কেবাৰে মাটিৰ মানুষ। না, মাটি ভুল হল; মোমেৰ মানুষ। গলৈই আছেন। আমাকেও গলোৱা অভিলম্ব কৰতে হল। বুজো অনুবৰ্বৰ সঙ্গে ছল কৰতে ভালো লাগছিল না, কিন্তু এসব বাপারে গোয়েন্দাৰ কিছুটো নিৰ্যায় না হলে ছলে না। ওৱ কাছেই বাবাজীৰ হ্যাবিট্ৰেস জানলাম। স্বান কৰেন না শুনে বোধহয় অজ্ঞানতে আমাৰ নাকটো সিঁটকে গোস্তু, তাতে বললেন—‘মনে ৰখন মৱলা নেই, তখন মশটো দিন গায়ে জল না হৈয়ালো ক্ষতি কৈ বাবা? জলেৱই ত মানুষ, জল ধেকেই ত উঠেছেন, আবাৰে জলেই ত ফিরে যাবেন।’—গায়ে অশটে গন্ধ কিনা সেটো আৱ জিগোস কৱলাম না। একটি চেজ নাকি বোজ সকালে আসে একবাৰ কৰে—মাহেৱ অলি সিৱো ধাৰ, যেগুলো সন্ধিয়াৰেলা বিলি হয়। অভয়বাবু ঘাট থেকে চলে থাবাৰ পৰও আমি কিছুক্ষণ ছিলাম। এক পাঞ্চা ওখানে ছাতাৰ তলায় বসে, নাম লোকনাথ। সেদিনেৰ ঘটনাটো দেখেছিল, যদিও গোড়াৰ দিকটো মিস্ কৰেছে। সে যখন এসেছে তখন থাবাজীৰ জ্ঞান হয়েছে। পাঞ্চাকে দেখে তাৰ নাম ধৱে ডেকে অনেক কিছু বলেছে। থাবাজী বৰ্দি ফোৱ-টুমেলিট হয়েও থাকেন, ওৱ বৈ একটি তুখোড় মানেজাৰ হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।’

‘তিনি অভয় চক্ৰোত্তি নন?’

লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস কৰলেন।

‘না। অভয় চক্ৰোত্তি মশাই নিখাদ সজ্জন থাকি। ওৱ মনে সংশয় চোকানৱ চেষ্টো কৰেছিলাম। বললাম—প্ৰাপ থেকে সাত্ৰে থাশী আসাটো প্ৰাপ অবিশ্বাস।

মন কি?—তাতে বললেন, ‘সাধনার কৌ না হয় যাবা।’—এদের বিশ্বাসের জোরেই ত এই বাণিজ্যিক যুগেও বাশী আজও কাশী। দেখবে চাঁদের মাটির নিচে মানুষের বসবাসের অবস্থা হয়ে গেলেও কাশী কাশীই থেকে যাবে।’

সাড়ে চারটে সাগাত ব্লিট থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পাঁচটাৰ সময় আমৰা তিনজন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ুন্মাম। আজকে ফেলুদা প্রয়োগ কৰি ট্রিরিস্ট, কানপুর তাৰ কাঁধে কামেৰা ঘূলছে। এই দুদিন সেটা ওৱে স্টেকেসই বম্ব ছিল। ফেলুদা আৱ লালমোহনবাবু দুজনেই ইজে আজ কচৌরিৰ গালতে ইন্দুমাম হালচুকদেৱ দোকানে গিয়ে রাখিড় থাবে। আমাৰও যে ইজে সেটা বোধহয় না বললেও জিবে।

বিশ্বনাথের পাশেই কচৌরি গালি। এত বছৰ পৰেও তাৰ চেনা দোকানটা খ'কে বৰ কৱতে ফেলুদাৰ কোনো অসুবিধা হল না। দোকানেৰ সামনে বেঁচি পাতা কয়েছে, তাতে বাসে শাটিৰ ভাড়ি থেকে রাখিড় বেতে বেতে লালমোহনবাবু সবে বুলছেন ‘রাখিড়িৰ আৰ্বিষ্কাৰটা টেলিফোন-টেলিগ্রাফ আৰ্বিষ্কাৰেৰ চেয়ে কিম্বা হলাই’—এমন সময় কালকেৱ সেই লোকটাকে দেখলাই বিশ-গ্রিল হাত ধৰে একটা দোকানেৰ পাশে আমাদেৱ দিকে পিঠ বৰে দাঁড়িয়ে আৱেকজন লোকেৰ সঙ্গে কথা বলছে। যগনলালেৰ বাপারটা মাঝে মাঝে মন থেকে স্কুল হেলান চেষ্টা কৰি, ফেলুদা ওৱে কথা না মনে শুক্ত বেচাল চাললে কৌ সাংগৰ্ভিক বাপার হতে পাৰে সেটাও না-ভাৱাৰ চেষ্টা কৰি, কিন্তু ওই বোলা সোফতওয়ালা সোকটা আবাৰ সব মনে কৰিয়ে দিছে। যাই হোক, রাখিড়িৰ এত বেশি ভালো হৈ যগনলালেৰ চেহারাটা মনে শৰ্কা সকৃত মৃত্যুৰ স্বাদ নন্ত হল না।

ফেলুদাৰ যা মনেৰ অক্ষম্যা তাতে ও যে খ'ব বেশিক্ষণ এই খিজি গালতে থাকতে পাৰবে না সেটা অৰি আগেই জনতোম। কচৌরিৰ গালি থেকে বেরিয়ে ফেলপুরা তোড় ধৰে গোধূলিয়াৰ মোড় হাতিয়ে আমৰা খাঙালী-টোলাৰ দিকে হাঁটিকে অৱস্থ কৱলাই। দুদিন ঘৰেই এদিকেৱ রাখিড়াগুলো বেশ চেনা হয়ে গেছে। ধীৰে ধীৱে হাঁটিছ, ফেলুদা এদিক ওদিক দেখছে, দু-একবাৰ কামেৰাক প্যাটাদেৱ শব্দ ও পোয়েছি। আৰি মাঝে মাঝে পিছন হিন্দে দেখছি সেই লোকটা এখনো আমাদেৱ ফলো কৱছে কিনা; কিন্তু বড় জামতামা পড়ে অৰ্ধি তাৰ আৱ কোনো পাতা পাইন। শেষটাৰ ফেলুদাকে বাধা হয়েই বলতে হয়, ‘তোৱ কি ধাৰণা যগনলালে আমাদেৱ উপন্য নজৰ রাখাৰে জন্য মাত্ৰ একটা লোক আপনোক্ত কৰিবে?’

এৱ পৰ আৰি আৱ পিছনে তাকাইলি।

ওই বে সেই আল্মিৰিনীয়ামেৰ বাসনেৰ দোকান। ওৱে পৰেৱ বৰ্ব দিকেৱ

বোঢ়টা নিতে হুর অভ্যর চক্রবর্তীর বাঁড়ি থাবার অন্ত।

‘মিস্টার মিংটের! প্রদোষবাবু!'

পিছন থেকে ডাক। তিনজনেই থামলাম। গলাটা অচেন। দুটি ভুলোক, বয়েস বোশ না—একজনের ঢাকে চশমা, মুখে হাস। ইন্নই বোমহু ডেকেছিলেন।

‘আপনার হোটেলে গিয়েছিলাম খোঁজ করতে’, ভুলোক বললেন।

‘কী ব্যাপার?’ ফেলুদা জিগোস করল।

‘আমরা বেপালী ক্লাবের তরফ থেকে আসছি। আমর নায় সজুর বাস—ইনি গোকুল চ্যাটার্জি। ইয়ে—আপনাকে কিন্তু আসতে হবে। যানে আপনাদের তিনজনকেই। আমাদের ক্লাবে খিয়েটাৰ আছে—পরশ্দ—স্মৃতমৌৰ দিন।’

‘কাবুলিওয়ালা?’

‘আপনি জানেন?’ ভুলোক দুজনই অবাক এবং ঘূর্ণ।

‘আপনারা মিস্টার ঘোষালকে নেমচত্ব করতে গেলেন না?’

‘ওৱে বাবা—আপনি দেখছ সবই জানেন, হচ্ছে হচ্ছে।’

‘উনি ত জানবেনই’, অন্য ভুলোকটি সর্বি হওয়া গলায় হেসে বললেন। গোয়েন্দা হিসাবে ফেলুদার খার্ট বেগলী ক্লাবে পৌঁছে গেছে।

‘আপনাদের কার্ডটা নিরঞ্জনবাবুর কাছে দেবে এসেছি। যাবেন কাইডলি। আমরা সবাই কিন্তু একস্পষ্ট করে থাকল।’

‘বেশ ত, অন্য কোনো কুব্রী খাপারে জড়িয়ে না পড়লে নিশ্চয়ই যাব।’

‘জড়িয়ে যানে আপনি কি এখানেও কোন—?’

সহয় রায় আৰ গোকুল চ্যাটার্জিৰ মাথা একসঙ্গে সামনেৰ দিকে বাঁকে এল। ফেলুদা এককম অবস্থায় পড়লে একটা হাসি বাবহার করে বেটোৱ তিনবকশ মানে হয়—হ্যাঁ, না, আৰ হত্তেও পাৱে। এখানেও তাই কৱল। হাসিৰ মানেটো না বুকলো বোকা হত্তে হয়, তাই সহয় রায় আৰ গোকুল চ্যাটার্জি দুজনেই ‘হুন্দে ফেলোছ’ ভাবেৰ একটা হাসি হেসে আবার কাবুলিওয়ালা দেখতে থাবার অন্তরোধ জানিয়ে চলে গেলেন।

যাস্তা আৰ দোকানেৰ বাতি সব জুলে গিয়েছে, আকাশেৰ ঝুঁঝেল ঝুঁ থেকে পার্মাইনট ঝুঁ ত্ৰিকেৰ দিকে যাচ্ছে, কীৰ্তিৰাম ছেট্ৰামেৰ পানেৰ দোকানে এই হাত ট্রান্সিস্টোৱ খোলাতে লতা হংগেশকৰ সাইকেল রিকশাৰ পাঁক-পাঁকানিব ধূঁগে পালা দিতে শুৰু কৰেছে, এমন সময় ফেলুদা আনাউন্স কৱল যে তাৰ ডাঙ্গিভাৰ জেগেছে, একবাৰ মহীলবাবাৰ দৰ্শন না পেলেই নয়।

টেলিফোনটো লেন্সে প্ৰি প্ৰেল্ট ফাইতে হাত সৈকেণ্ড একস্পোজাৰ দিয়ে ফেলুদা উজদেৱ পিছনে দাঁড়িয়ে আবাৰ কাঁধে ক্যামেৰা বেঁধে ক্ষোচ হজে

বাবু' কলে হাজিবাবার একটো ছবি পুরুল। আজ শহরের ভৌতি সৌন্দর্যের ছবিয়েও বেশি—বোধহীন বাবাজী পৌর্ণবিন পরে রেখে যাবেন কলে। হগলগলকে বেশভাব না। হ্যাত এখনো আসেন নি—কিন্তু জোড় আসেন না। কানকান পিন্টি কাঁকে রেকে আবার রেকে পক্ষলাম।

জন দিকে হোক নিটে একটো নতুন গালিতে এসে সামনে একটো কালো গুরুকে গাস্তা করুকে পাঁড়িজা বাবুর দেখে লালমোহনবাবু একটো ছেটে কালু কেলে দেখে গোলেন।

'কী হল?' কেলুয়া প্রশ্ন করুল।

'কটোর হাইট কড় হবে কলু তা।'

'কেমি?'

'এবিনিয়াথ ইন্স্টিটিউটের হাইকাম্পের কেক' হিল মশাই আসুৰ। তাবপুর একবার ভেপ্ট হয়ে বী হাঁটুতো...'

'আসুৰ আয়াৰ সম্পো।'

কেলুয়া এগিয়ে পিয়ে পুরুটোৱ পাইকার মুক্তিন্তে আলতো ঢাপক দিতেই সেটা খুটু খাই করে একপালে সুনে ঢাল, আবু আমুরাও তিনজনে পিচু পাল কাঁচিয়ে বৈশিষ্ট্যে গোলাম।

'কেবলো যাইছ মশাই আয়া?'—আবো পিন্টি পাঁচক অগিয়ালিতে হাঁটোৱ পথ লালমোহনবাবু প্রস্তুতি কুলেন।

'আইন না।'

আইর আবু লালমোহনবাবু পৰম্পৰায়ে দিকে চাইলাম। সব সময় দো ছাইলোই এ-ওঁর অ-ধ্য দেখতে পাইছ ভা সয়, কিন্তু ঠিক এই সবজোতে একটো গাস্তা আবো মাথার উপৰ এসে পড়ায় লালমোহনবাবুৰ ভায়াচাকা জাকো বুকেতে অস্মৃত্যু হল না।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটুলেও অনেক সময় মাথা খোলে, কল কেলুয়া, 'এখনে মাথা খোলাটোই উৎসুক।'

'কুলছে কী?'

একটো ইন্দ্ৰ যদি অন্ধে ছত্র দেত তাহলে বোধহীন লালমোহনবাবুকে প্রস্তুতি এই কুলহী কৰত। কেলুয়া কী উল্লেখ দিত আৰ্দ্ধি না, কাথশ ঠিক এই সময়ে একটো ঘটনা খটকে আগদেৰ ঘনটো গলো দিকে চলে গোল।

অন্তক্ষম এ-বোক ও-বোক থায়ে আয়াৰা যে পাইচার পোইছেছিলাম সেটা একটু হিলেৰ রকম নিজুন। কিছুক্ষণ আপো পৰ্যন্ত আগদেপদেৱ বাঁড়িগুলোৱা ভিতৰ থেকে মানুষৰ গুলাৰ স্বৰ পেয়েছি, বাজুৱাৰ কজাৱ শব্দ পেয়েছি, রেডি ও থেকে আনেৱ আওয়াজ পেয়াৰীছি। ওয়ায়েৱ গাঁটোয় ধ্য থেকে ভেসে আসা হাঁপ্যদেৱ ধন্তো জাহা আবু খেনো লাগই নৈই। একটু এগোত্তে পোলা কেল

তার সঙ্গে আরেকটা শব্দও একটানা এক তালে হয়ে চলেছে—ধূপ, ধূপ, ধূপ, ধূপ, ধূপ...

লালঘোহনবাবু আমাদের প্রজনের মাঝখালে হাঁটিছিলেন; শব্দটা শুনে দুদিকে হাত দাঁড়িয়ে আমাদের কোটের আস্তিন ধরে মৃদু টান দিয়ে হাঁটার স্পীড কমিয়ে দিলেন। তারপর ফিস্ক, ফিস্ক, করে ধললেন, 'হাইলি সাস্ট্রিপশনস।'

ফেলনুমা নিজের হাতটা দাঁড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ওটা সাস্ট্রিপশনস কিছু না; পানের ত্বক টৈরি হচ্ছে। সাস্ট্রিপশনস হচ্ছে ওইটো।'



এবার দেখলাম একটি লোককে আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক ধূয়ে।
সে একটা যোড় ধূরে সবেমাত্র এ গুলটাৰ ঢুকেছে।

লোকটা এগোৱে এসে আমাদের দেখেই হেন কমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার
মুখে আজো পড়োন, তাই এতদ্রু থেকে তাকে চেনা থাবে না। গ্রামীণ

আলোটা তার পিছন দিকে। সেই আলো তার পিঠে পড়তে একটা প্রকাণ্ড লম্বা ছায়া সার। গলি জুড়ে প্রায় আমাদের পা অবধি পৌঁছে গেছে।

হাতাটা অচ্ছুতভাবে দৃঢ়াছে। লোকটা হাতাল নাকি?

ফেল্দু টেলিফোটো সমেত ক্যামেরাটা চাবে লাগাল।

শশীবাবু।

নায়টা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফেল্দু বিদ্যুম্বেগে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। তিনজন প্রায় একসঙ্গেই গিয়ে পৌঁছলাম শশীবাবুর কাছে। ঠিক্কে বেগিয়ে আসা চেষ্টে চেষ্টে আছেন শশীবাবু, ফেল্দুর দিকে, তার টেলিট দুটো কাঁক দেখে মনে হয় তিনি কিছু বলতে চাইছেন।

‘কিছু বলবেন?’—ফেল্দু কাঁকে পড়ে চাপা গলায় জিগ্যেস করল।

ইঁ...হাঁ...

কী হয়েছে শশীবাবু? কী বলতে চাইছেন আপনি?

সিঁ...সিঁ...সিঁ।

শশীবাবুর দেহটা সামনের দিকে এলিয়ে পড়ল।

তার পিঠে আলো পড়েছে।

সেই আলোতে দেখলাম শশীবাবুর পিঠে একটা ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে তার পাঞ্জাবির অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়েছে।

নয়

‘গোবিন্দার্গাঁর ছেড়ে দেব রে।’

ফেল্দু এ ধরনের কথা আগে কোনোবিন বলেনি, কিন্তু এবার যে অপস্থান
পড়েছে, তাতে এটা বলা বোধহয় খুব অশ্যাভাবিক নয়।

আজ সপ্তমী। সোমবাৰ। এখন সকাল। শশীবাবু খুন হয়েছেন সুদিন
আগে। আমরা সকালে চা কুটি ডিব খাওয়া সেৱে আধামের হোটেলেৰ ধৰে
যে থার থাটে বসে আছি। একটুকুণ আগে তেওৱারি ফোন কৱে জানিয়েছেন
যে শশীবাবুৰ ছেটে ছেলে নিতাইকে নাকি আয়োস্ট কৱা হয়েছে। নিতাই
খোঁপ হলে এটা আগেই শনৈছি। তাৰ সঙ্গে নাকি বাপৰ অনৰুত পথিকৰিট
লাগত। শশীবাবু নাকি প্রায়ই ওকে পুলিসে ধৰিয়ে দেবার ভয় দেখাতেন।
তাই হোলেৰ পকে শেষ পৰ্বতি বাপকে খন কৱাটো অস্বাভাবিক নয়। নিতাই
কিন্তু খন স্বীকাৰ কৱেনি। সে নাকি সৈদিন সন্ধিবেলা টেলিগঞ্জেৰ একটা
সিনেমাক হিস্সি ছানি দেখছিল। তাৰ সাটৈৰ পকেটে টিকিটেৰ আধাৰনা পাওয়া
গৈছে। যে খুৰি দিয়ে শশীবাবুকে খন কৱা হয়েছিল সেটা নাকি পাওয়া
বাবুনি।

অস্তুৱ দিন সপ্তমা ছটো অধো শশীবাবু চক্ষুনেৰ কাজ শেষ কৱে দেন।
বিকাশবাবু পুলিসকে বলেছেন যে কাজটো শেষ কৱেই শশীবাবু বিকাশবাবুৰ
কাছে থান হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ঢাইতে, কাৰণ তাৰ নাকি আবাৰ নতুন কৱে
জুৰ অসেছিল। বিকাশবাবু ওষুধ দেন, শশীবাবু তখনই ওষুধ খেয়ে বাঁক
যাবার অনা বৈৰিয়ে থান। পথেই তাকে খন কৱা হয়।

‘মাকে মাকে বোধহয় এ ধৰনেৰ একটা ধাকা খাওয়া ভালো।’—ফেল্দু
অবোৱা কথা বলছে। আমি জানি কখনো ঠিক আমাদেৱ উদ্দেশ্য কৱে বলা হচ্ছে
না। ফেল্দু মেটো কৱছে তাকে ইঁৰেজিতে থলে খিঁকিং আলাউড়।—‘বেশ
লাগছে নিজেকে একটা সাধাৰণ ন্তৰেৰ মানুষ বলে ঘনে কৱতে।—লালমোহন-
বাবু, আজ কাৰ্বুলওৱালা দেখতে যাবেন ত? এৱা শনৈছি’ বেশ কালো অভিন্ন
কৱে।

‘হ্যাঁ তা আপনি গেলো, মানে আপনি যাস...’

‘আৱ কাল যাৰ টোৱজন। পৰশু জঞ্জীৱ; তৱশু রফ, চৰু। আৱ’

দ্রুগাবার্ডিটি একবার দেখিয়ে আনব আপনাদের। মেখবেন ওখানকার বাইর-
গুলো ফেল্দ মিঠিরের চেয়ে অনেক বেশি ব্র্যান্ডিশন।'

সত্তা স্থাবেলা আমরা কাবুলিয়োগ্য দেখতে বেশলী ক্ষাবে হাজির
হলাম, আর সাঁতাই মেখলাম ওরা বেশ ভাল আকৃতি করে।

পর্যান্দ মহাশ্মৰী। সকালে ঠাকুর দেখতে দেয়োন হল। ঘোষাল বাড়ি
জাড়াও আরো জন্ম বর্ণিতে পূজো হয়। গোটা পাঁচেক ঠাকুর দেখে আমরা
দ্রুগাবার্ডিটে গেলাম। লালমোহনবাবু মন্দিরের যাইরে রইলেন, কারণ বাসির
জিনিসটো নাকি ঠুর বাচার বাইরে ভালো লাগে না। বললেন, 'কাসদেব, ব্র্যান্ড-
ব্র্যান্ডের যে কেন আনোয়াগাটোকে জাতে পুলেছেন তা আজ পর্যন্ত
ব্রততে পারলাম না। যায়া মাটির খোঁচা না খেলে মাচতে পারে না তারা করবে
মেতুবন্ধন? ছোঁ!—আর আমার গপ্পোকে বলা হয় গীজাব্র্দির।'

দ্রুগুরে ফিল্টার ঘোষাল ঠুদের বাড়িতে খেতে বলেছিলেন: ফেল্দু
হোটেল দেকে ফোন করে বিকাশবাবুকে আপজাজি জানিয়ে দিল। আমরা
হোটেলেই থেলাম। ফেল্দু দ্রুগুরে হাতের রুটি খায়। আজ হঠাত এক-
গাদা ভাত খেরে বিহুনায় শুয়ে এক ঘুমে সাড়ে চারটে বাজিয়ে দিল। পরে
ব্র্যান্ডেছিলাম যে বাড়ের আগে প্রকৃতির যে একটা ম্যাদামারা ডাব হয়, এ হল
তাই: কিন্তু ফেল্দুকে কক্ষনো এরকম অফেজে আর বিমুক্ত অবস্থায়
দেখিন বলে হন্টা ভীষণ ধারাপ লাগছিল।

লালমোহনবাবু অবিশ্ব ঠিক অকেজে ছিলেন না; তাঁর খাতায় তিনি
একটা গল্পের যসড়া আকৃত করে দিয়েছেন গতকাল দেকে। দ্রু লাইন লিখছেন
আর সৈলিঙ্গের দিকে চাইছেন। খালি একবার আমার দিকে ফিরে বললেন,
'ক্ষম্পুতে কী অর্ডারে হৃষ্ট-উ নৈর্দ-উ আসছে কলবে কাই-ডলি?'

শেষ পর্যন্ত টারজান দি এপ ম্যানও ধাওয়া হল, কিন্তু ফেল্দুদার আর
প্রয়ো ছবিটা দেখা হল না। পুরো কেন বলাই-গেটো-গোল্ডেইন মেজারের
নামের পর ছবির নামটা হবে পর্দায় পড়েছে, এমন সবৰ ফেল্দু দৈখ সীট
ছেড়ে উঠে পড়েছে।

'তোপ্সে, তোমা থাক। আমার একটু কাজ আছে।'

কিন্তু বলার আগেই ফেল্দু ধাওয়া।

আঘাত মনের অবস্থা অস্তুত। ছবিটাও ভালো লাগছে, ফেল্দুকে মনে
হঠাত কেম জান উৎসাহ জেগে উঠেছে, সেটোও ভালো লাগছে, অথচ ও যে
কিসের জন্ম জমে গেল সেটা ভেবে পাঁচ্ছ না।

আটটার সময় ছবি দেয় হল; রিকশা নিয়ে হোটেল ফিলাম সোম্যা
অটোয়া। ঘরে এসে দৈখ ফেল্দু থাটে বসে থাতা খুলে ভীষণ অনোয়েগ
দিয়ে কি সব ক্ষেত্রে হিসাব করছে। আমাদের দেখে বলল, 'তোরা খেয়ে নিস।

আমার জন্য এক পেরালা কফি পঢ়িবে দিতে বলেছি।'

'কৃতি থাবেই না?'

'পেট ভরা। তাছাড়া তেওরারির কাছ থেকে একটা অরুরী টেলিফোন আসছে।'

আজ অস্ট্রেলী বলে হোটেলে স্ট্রিং মাস ছিল, প্রায় তাঙ্গো হত্তেছিল, কিন্তু পাহে তেওরারির ফোন আসার আগে খাওয়া শেষ না হয় তাই সব কিছু গোগ্যাসে গিলতে হল।

ফোনটা এল আমাদের খাওয়া শেষ ইওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। এবার আমি ফেল্ডুর কাছে না থেকে পারলাম না। ফেল্সা যা বলল তা হচ্ছে এই—

'বল্টন হিস্টোর তেওরারি...হাঁ, ডেরির গৃহ...না না, এখন কিছু করবেন না, একদম শেষ ধূর্ঘতে...হাঁ, সেইজনেই ত গোড়ায় এত গুড়গোল লেগোছিল...হাঁ—আর ইয়ে—ওই বাড়িটায় খৌজ করেছিলেন?...ডেরির গৃহ...ঠিক আছে, কাল দেখা হবে...গৃহ নাইট।'

লালমোহনবাবু আমার সঙ্গে নিচে যাননি। সিনেমা থেকে ফেরার পথেই আমাকে বলছিলেন, 'তোমার দাদার আঙ্গকের তিড়িবাজির টেলার আমার প্লটের খেই হারিয়ে গেছে; আবার নতুন করে সব সাজাতে হবে।' ঘরে ফিরে এসে দোখ তিনি খাজা খেলে মৃদু বেজার করে বসে আছেন। ফেল্সা ফিরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যেই পায়চারি শব্দ করে দিল।

লালমোহনবাবু খাতা বন্ধ করে খললেন, 'খুব খারাপ হচ্ছে এটা, কানেন ত? না পারাই আমার গল্প এসেগোত্তে, না পারাই আপনার কেসের সঙ্গে পায়া দিতে। এসকেও একটু ছিটেফেটো হাড়ন। আমাদেরও ত বেন বলে একটা জিনিস আছে। একটু খাটোবার সুযোগ দিন।'

'কোনো আপরিয় নেই', ফেল্সা একটা ধৌমায় গিং ছেড়ে বলল, 'আপনাকে পাঁচটা সূর্যোদী দিয়ে আপনি বস খুশি জান বল্টন।'

'সূর্যো?'

'আত্মকার রাজা, শশীবাদুর সিং, হাঙ্গেরের মৃদু, এক দ্বিতীয় দশ, আর অগন্তকালের বরুবা।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ফেল্ডুর দিকে তারে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস তক্ষণে বললেন, 'তার চালো বলালেই পারতেন চন্দ্রবিশ্বর চ, বেজালের তালবা চ, আর রংমালের মা। সে বরং চের সহজ হত।'

'কিন্তু একটা কথা আমাদের দিতে হবে আপনাদের'—ফেল্সা হঠাতে সিরিয়াস—'কাল থেকে আর কোনো বাপারে কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না।'

'একটা করেই যা জবাব দেগুম—আবার প্রশ্ন?'

ফেলুদা লালমোহনবাবুর সামিক্ষণ্য অগ্রহ করে বলে চলল, 'কাল থেকে
আগামে ইয়ত মাঝে থেরোতে ইতে পাবে, তবে আপনাদের সঙ্গে না।
আপনারা দুজনে যেখানে খুশ থেতে পাবেন: আমার মনে হয় না তাতে কোনো
বিস্ক আছে। যদি তেজন বুঝি তাহলে আগে থেকেই সাইরে থেতে বারণ করব।
...আপ লালমোহনবাবু সাঁতার জানেন ত ?'

'সাঁত— ?'

'জলে নেমে জেসে থাকতে পাবেন ত ?'

'হাঁ হ্যাঁ—ফটি—ফেরে হোদাতে—'

'ওতেই হবে।—অবিশ্বা সাঁতারের যে প্রয়োজন হবেই তা বলছি না।'

পরের দিন নবমী। সকালে তা থেয়ে আর্মি আর লালমোহনবাবু বেরিয়ে
পড়লাম। ফেলুদা বলল ও হোটেলেই থাকবে, কারণ ফোন আসতে পাবে।
লালমোহনবাবুর একা চড়ার শখ—এলকে কাশীতে আজকল ঘোড়ার গাড়ি
ধানে বেশির ভাগ টাল্যা। অনেক খাঁজে থেবে একটা একা পাওয়া গেল।
সোনারপুরা রোড দিয়ে হিন্দু ইউনিভার্সিটি পর্শন্ত গিরে নুর্মান্দুক্ত রোড
দিয়ে ফেরার পথে অনিদির মসজিদ প্রাসাদ বা কিছু পড়ে সব দেখে সাড়ে
এগারোটাই সহয় আমরা হোটেলে ফিরে এসে দ্বিতীয় ফেলুদা কালিশ বুকের
তাম্র রেখে খাটোর ওপর শয়ে খুব মন দিয়ে তার তোলা কঢ়কটা ছবি
বোয়ার্টার সাইজ জনলার্টেনেট দেখেছে। পরশ্ব বেগলী ক্লাবে যাবার পথে ও
কাউন্ট লোস্টো স্টোরসে ওর ফিল্মটা দিয়ে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে তেওয়ারির টেলিফোন এল; ফেলুদা মিনিট দুরেকের
মধ্যেই কথা শেব কাবে উপরে চলে এল। বাড়িতে বলে থাকতে তাহো জার্গন্টল
না, তাই আর আর লালমোহনবাবু মিনিটীর্বৰ্বার শব্দান দেখে এসাম।
শাখেয়ে হনবাবু গাবার ও ফেরার পথে বাবু ক্লিনেক বললেন, 'আজ আর কেউ
ফেলো কঢ়ছে বলে মনে হচ্ছে না।'

ফিরে এসে শুল্লাম ফেলুদা হোটেলেই ছিল। শক্রুরী-নিয়াস থেকে
বিকাশবাবু তোল করেছিলেন; মিস্টার দোষাল জানতে চেয়েছেন ফেলুদা হাজ
ছেড়ে দিয়েছে কিনা।

'তৃতীয় কি বললে ?' আমি জিগোস কইলাম।

'উন্নত এল, 'না।'

পরবর্তী তোর ছটায় উঠে দেখি ফেলুদা নেই। বিছানা পরিপাটি করে চাদর
দিয়ে ঢাকা, তার উপর হাই ফেলুর সেই পাথরের বাটি, আর তার তলায় এক
টেকরো কাগজ। তাতে লেখা—'ফোন করব।'

তার মাঝে আমাদের হোটেলেই অপেক্ষা করতে হবে। তাতে আর্পণা নেই,

কেবল ফেল্দুরা যেন নিরাপদে থাকে, এব বেশি রকম বেপরোয়া কিছু করে না বসে। ফেল্দুরা শব্দও এ বিষয়ে কিছু বলেন, কিন্তু আবার বিশ্বাস শ্রদ্ধীবাবুকে মগনলালের গোত্র বলে করেছে। শ্রদ্ধীবাবু নিষ্পত্তি ফেল্দুরা চেয়ে বড় শত্রু নয় মগনলালের। তাহলে ফেল্দুরাকেই যা—

আর ভাবব না। যা থাকে কপালে। কেবল মনে সাহস ব্রাহ্মতে হবে।

যা থাবার সময় লালমোহনবাবু বললেন, মগনলাল সেদিন গণেশের কথা যা বললেন, সেটা তোমার দাদা বিশ্বাস করে হাত পা গুটিয়ে নিলেই পারতেন।

আমি বললাম, 'গুটিয়ে ত নিয়েই হিল; হঠাতে সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে কী যে হল।'

'শেষটায় টোরছান থে এরকম সর্বনাশ করবে তা কে জানত বল।'

দুপুর পর্যন্ত ফেল্দুর কোনো ফোন এল না। আবার পরে লালমোহনবাবু আর কিছু করার না শেয়ে শেষটায় গণেশ চুরি সম্পর্কে ওর নিয়ের কী ধারণা সেটা আবার বললেন।

'বুবলে উপেশ, গণেশটা আসলে চুরিরই থায়নি। ওটা অশ্বিকাবাবু আফিং-এর ঘোকে সিদ্ধক থেকে বার করেছেন, আর তাহপর দেশা কেটে যাবার পর ওটোর কথা বেহালাম জুঙে গেছেন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু তাহলে এখন সেটা আছে কোথায়?'

'তুর তামাতলার চাটিটা দেখেছে? তুর পায়ের চেয়ে চাটি জোড়া করখানি বড় সেটা লক্ষ্য করেছে? একজন বড়জো মানুষের চাটি পায়ে লিয়ে যসে থাকলে কে আর চাটি খুলে তার ভেতরে সাঁচ করতে যাবে বল?'

আবার একটু সন্দেহ হল। বললাম, 'আপনার নতুন গল্পে এরকম একটা বাপুর থাকছে বুঝি?'

লালমোহনবাবু অত্যন্ত হেসে বললেন, 'ঠিক থারেছে: তবে আবার গল্পে গণেশের বদলে একটা দু' হাজার ক্যারেটের হীনে।'

'দু' হাজার!—আবার চক্র চড়কগাছ!—'প্রাচীবীর সবচেয়ে বড় হীনে প্রাচীর অফ আঙ্গুলিকা, কত ক্যারেট জানেন?'

'কত?'

'পাঁচশো। আর কোইন্দুর হল মাত্র একশো দশ।'

লালমোহনবাবু গম্ভীরভাবে আব্দা নেড়ে বললেন, 'দু' হাজার না হলে গম্ভীর না।'

বিকেলে সাড়ে চারটার সময় ইরকিবশ ওসে বলল আবার টেলিফোন এসেছে। বড়ের থতো ছুটে নিজে গিয়ে নিরঞ্জনবাবুর আসিসটান্টের হাত থেকে ফোনটা প্রায় ছিলয়ে নিলাম।

'কে, ফেল্দুরা?'

‘শোন্’—গভীর চাপা গলা—‘কুব মন দিয়ে শোন্। দশামেথের দক্ষিণে
ওর ঠিক পরের মল্ল হল মনশী ঘাট, আর তার পরে হল রাজা ঘাট। শুনছিস?’
‘হাঁ হাঁ।’

শুনশী আর রাজার মাঝামাঝি একটা নির্বাচিত জায়গা আছে। একটা
ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে আরেকটার ধাপ যেখানে শুরু হচ্ছে তার মাঝামাঝি।
‘বুঝেছি।’

‘দেৰ্ঘি বৈদুনাথ মালসার একটা বিজ্ঞাপন আছে হিন্দিতে লেখা, পাথরের
দেৱাসের গায়ে। আর তার নিচেই একটা মস্ত বড় চৌকে খুপারি।’
‘বুঝেছি।’

‘তোরা দুজন এখানে গিয়ে পেঁচাবি ঠিক সাড়ে পাঁচটাই। খুপারির
সামনে অপেক্ষা কৰব। আমি ছটা নাগাত পেঁচব।’
‘বুঝেছি।’

‘আমি ছন্দবেশ থকব।’
কথাটা শুনে আমার যুক্ত এমন খড়াস করে উঠল যে আমি কিছি বলতেই
শ্যায়লাম না। ফেলদুদার ছন্দবেশ মানে নাটকের ক্লাইম্যাক্স।

‘শুনছিস?’

‘হাঁ হাঁ।’

‘আমি ছটা নাগাত তোদের মৌট কৰব।’

‘ঠিক আছে।’

‘না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কৰবি।’

‘ঠিক আছে। তুমি ঠিক আছ ত?’

‘ছাড়িছি।’

ঘুট পাখি ওদিকের টেলফোনটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ফেলদা কেল অবের
কুয়াশার মধ্যে অব্ল্য হজে গোল।

দশ

শশাশ্বরে আজ দসেরায় দিন ভৌতি হবে বলে আমরা তিক করলাম অঙ্গ
চক্রবর্তীর বাড়ির রাস্তা পিয়ে আগে কেদার ঘাট যাবো। সেখান থেকে সির্পি
ঘরে উভয়ে হাটিলে শুধুমেই পড়বে রাজা ঘাট। লালমোহনবাবু আজ সকালে
হোটেলের কাছেই একটা ভাঙ্গারি দোকান থেকে খোল অঙ্গরের নামওয়ালা কৌ
একটা বাড়ি কিনে এনে এরই ঘণ্টো দ্বার দৃঢ়ো করে থেঁয়ে নিয়েছেন। বললেন
গতকাল রাতে নাকি তাঁর আধুনিক অবস্থায় বার বার দাঁড় কপাটি লেগে ঘাঁচ্ছল,
এখন সেটা একদম সেরে গেছে।

শাহস হৈ খানিকটা বেড়েছে সেটা বুকলাম থড় রাস্তা থেকে থোড় ঘুরে
শুধু গলিটোক ঢুকেই। সাথনেই একটা বাড়ি—গরু, নয়, বাড়ি—রাস্তা জুড়ে
দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে। লালমোহনবাবু সটান এগিয়ে
গিয়ে 'আই বশ, হ্যাট হাট' বলে সেটাকে টেলা মেরে সরিয়ে পাশ কাটিয়ে
দিবিবা চলে গেলেন। আমি জ্যে পাইন, তবে মজা দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম;
লালমোহনবাবু আমাকে 'এসো তপেশ, কিছু বলবে মা' বলে হাতছানি দিয়ে
ভাকলেন।

অজ্ঞবাদীর বাড়ির বাইরে আর ভিতরে বেশ ভৌতি দেখলাম। কেল ভৌতি
সেটা ভাবতে গিয়েই খেয়াল হল যে আজই ত ঘৰ্তলিবাবার চলে যাবার দিন।
আমরা এসেছি তৃতীয়তে, আর আজ হল দশমী। যাক, তাহলে ভাসান ছাড়াও
একটা বড় ঘটনা আছে আজকে।

বাইরে যাবা দাঁড়িয়েছিলেন তার ঘণ্টো আমাদের হোটেলের এক ঘুর্খচেনা
ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে জিসোস করলাম ঘৰ্তলিবাবা কেদারঘাট থেকে যাবেন
কিনা। ভদ্রলোক বললেন, 'না—বোধহয় দশাশ্বমেধ।' তাহলে আমাদের একটু
দূরে থেকে দেখতে হবে ঘটনাটো! লালমোহনবাবুর তাতে আপন্তি নেই।
বললেন, 'ভুন্দের চাপে চিত্তে-চাপটা হয়ে দেখার চেয়ে একটু দূর থেকে দেখা
চের ভাল।'

কেদার ঘাট থেকে উত্তর দিকে হাটি শুরু করে ছিনিটি শাঁচেক লাঙল
যাজ্ঞাঘাট পৌছতে। ঘনটির পাশে সারি সারি উচু বাড়ি থাকার জন্য এদিকটা
থেকে গ্রোস সরে যায় অনেক আগেই। বর্ষাক পরে জল এগিয়ে এসেছে,

বাড়ির ছায়া জলের কিনারা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। কিছুক্ষণ
পরে আর রোদ থাকবেই না। আর তার পরেই ঝপ করে নামবে অঞ্চলকার।
ঘাটের পাশে এক জায়গায় সাঁরি সাঁতি নৌকো, তার উপরে ঢাঙ্গা বাঁশের
মাথায় কার্তিক মাসের বাতি জুলছে। উত্তরে বেঁধহর দশাশ্বমেধ ঘাট দেখেই
একটা শব্দের ঢেউ তেসে আসছে—বুরতে পার্নিছ বহু লোকের ভীড় জমেছে
মেখানে। তার মধ্যে ঢাকের শব্দ পার্নিছ, আর ঘাবে মাঝে পটকারে শব্দ আর
হাউইয়ের শব্দ।

ঘাজা ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে ভিজে আটি শুরু হল। মিনিট খানেক হাঁটির
পর বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। বৈদিনায় সালসা। আয় এক-মানুষ বড় বড়
এক-একটা হিন্দি অঙ্কর। পরে ফেলুদাকে জিয়েস করাতে ও বলেছিল সালসা
কথাটা নাকি পোকুর্গীজ; ওটার মানে হল একরকম বড় পরিষ্কার-করা শব্দ।

জায়গাটা সাঁতি খুব নিরিবিলি। শুধু তাই না—এখান থেকে দশাশ্বমেধ
দিব্যা দেখা যাচ্ছে। ঘাটের ধাপে মানুষের ভীড় আর জলে নৌকো আর
বজরার ভীড়।

‘শুরু আমৰ্কী জয়!’

একটা ঠাকুর ভাসান হয়ে গেল। বজরার মাথায় তুলে খাঁনিকটা নদীর
ভিতরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলেই হল। দু নৌকো ফাঁক করে ভাসান দেওয়ার
ব্যাপার এখানে দেই।

যেসে চলে গেল, কিন্তু ঘাটের গন্ডগোল এখন বেঁজেই চলবে। ছাঁটা
বাজতে কুড়ি। জালমেহেনবাবু হাতের ঘাঁটিটা দেখে সবে বলেছেন ‘তোমার
দাদার টেলিফোনাস্টা থাকলে খুব ভালো হত’, এখন সময় একটা নতুন
চিংকার শোনা গোল—

‘গুরুজী কি জয়! মহলিবাবা কি জয়! গুরুজী কি জয়!’

বেনারসের ঘাটে একরকম আটকোনা বুরুজ থাকে, যার উপর অনেক
সময় ছাতার তলায় পান্ডারা বসে, পালেয়ানজা খুঁত খুঁত, অব্যাক এখনি
সাধারণ তোকও বসে। অসাদের ঠিক সাথনেই হাত পাঞ্চশেক দ্বারে সেইরকম
একটা বুরুজ জল রেকে চার-পাঁচ হাত উঠুতে উঠে রওঁছে—সেটা এখন
আলি। সেইরকম বুরুজ দশাশ্বমেধে অনেকগুলো আছে। তার মধ্যে যেটা
আসাদের দিকে, তার উপর কিছু লোক একঙ্গল দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।
গুরুজী কি জয়! শুনেই তাদের মধ্যে একটা বাস্ত ভাব দেখা গেল। তারা
এখন সবাই ঘাটের সিঁড়ির দিকে চেয়ে রয়েছে।

এখার দেখলাম একটা প্রকাপ্ত দল সিঁড়ি দিয়ে নেমে বুরুজের দিকে
গিয়ে যাচ্ছে। দলের মাথায় বিনি রায়েছেন তিনি আর কেউ নন—স্বরং
প্রচলিবাবা। টকটকে জাল লাঁজিটা এখন মালকোচা দিয়ে ধূতির মতো করে

পুরা। গাঁথের লাল চামুরের উপর হলদে ঝড় দেখে বুরুলাস বাবা অনেক গাঁদা ফুলের শাখা পরে আছেন।

বুরুজ এবার প্রায় খালি হয়ে গেল। শব্দ, দৃঢ়ন রইল, তারা বাবার হাত ধরে তাকে উপরে তুলল। বাবার শাখা এখন সবাইয়ের উচুতে।

বাবা এবার দ্রু হাত তুললেন ভুঁদের দিকে ফিরে। কৌ বললেন, বা কিছু বললেন কিনা সেটা এতদ্ব থেকে বোধ গেল নয়।

এবার বাবা হাত তোলা অবস্থাতেই বুরুজের উলটোদিকে এগিয়ে গেলেন। বাবার সামনে এখন গম্ভী। পিছন থেকে যাবার জয়ধর্ম উঠল—'জয় মহলি-বাবা কৌ জয়।'

সেই জয়ধর্মির মধ্যে বাবা গম্ভীর ঘাঁপ দিলেন।

একটা অস্তুত আওয়াজ উঠল ভুঁদের মধ্যে। লালমোহনবাবু সেটাকে 'সমস্বরে বিজাপ' বললেন। বাবাকে কিছুক্ষণ জলের মধ্যে সাতরাতে দেখা গেল। তারপর তিনি অস্থি হয়ে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, 'ভুঁব সাতারে পো'ছে যাবে পাটনা—কৌ ত্রিলিং ব্যাপার ভাবতে পার?'

আরো একটা ত্রিলিং ব্যাপারে আমাদের প্রায় হার্টফেল হয়ে যাবার অবস্থা হল শখন দশাশ্বরেখ ঘাট থেকে চোখ ঘুরিয়ে দেবি এই ফাঁকে কখন জানি একটি লোক এসে আবছা অস্থকারে নিঃশব্দে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার বী হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মাথায় পাগড়ি, দুখে গোক-দার্ঢি, গাঁজে লম্বা সার্টের উপর ওয়েস্ট কোট, নিচে পায়জমা, আর তারও নিচে একজোড়া ডাকসাইটে কাবলি জুতো।

কাবুলিওয়ালা।

কাবুলিওয়ালা জান হাতটা অল্প কুলে আমাদের আশ্বাস দিল।

ফেল্দু। কাবুলিওয়ালার ছন্দবেশে ফেল্দু। এই যেক-আপই সেদিন বাবহার করেছিল বেশের্লি ক্লাবের বিদিয় ঘোষ।

'ওয়ান্ডার—'

লালমোহনবাবুর প্রশংসা হাতপথে ধামিয়ে দিল ফেল্দুর প্রাঁটের আঙুল।

কী ঘটতে যাচ্ছে জানি না, ছন্দবেশের কৌ দুরকার জানি না, অপরাধী কৈ বা কারা জানি না, তব ফেল্দু যদি চুপ করতে বলে তাহলে চুপ করতে হবেই। এটা আঁশও জানি, আর লালমোহনবাবুও আঁশিনে জেনে গেছেন।

ফেল্দু এক দৃঢ়ে চেয়ে রয়েছে দশাশ্বরেখ ঘাটের দিকে। আমাদের চোখে সেইনিকে চলে গেল।

দ্ব র থেকে একটা কজরা ভেসে আসছে ঘাটের দিকে। ক্ষার মাথায় একটা বাঁশি কলছে। বড় কজরা। বজরার ছাতে চার পাঁচজন লোক। কাউকেই জেনা যায় না। এতদ্ব থেকে সম্ভব নয়।

“দুর্গা প্রাণিক জয়। দুর্গা প্রাণিক জয়।”

আরেকটা প্রতিমা আসছে বাটে। দীর্ঘ দিয়ে নামানো হচ্ছে। হাত্তাক জন্ঠনের আলো পড়ে ঠাকুর মাথে মাথে বলমল করে উঠছে। দূর থেকেও চিনতে অসুবিধা নেই। এটা বোমালদের ঠাকুর।

ফেল্দার সঙ্গে আমরাও পাথরের ঘরে দাঁড়িয়ে বিসজ্জন দেখতে গুলাম।

বিরাট প্রতিমা বজরার আপ্ত্য চড়ে গেল। বজরা এগোতে শুরু করল আমের গভীর জলের দিকে।

তারপর সেখলাম প্রতিমাটা একবার খাঁকি দিয়ে উপরে উঠে চিত হয়ে বজরার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। অপার শব্দটা এলো কিছু পরে—যেমন ক্রিকেট ঘাটে বল মারাটা চোখে দেখার কিছু পরে শব্দটা আসে।

হঠাতে মনে হল শশীবাবুর ভূলির টান এখন জলের তলায়। হঠাতে এর মধ্যেই সব ধ্যান ঘূরে গেছে।

মহলিবাবাকে দেওয়া গাদা ফ্লের ছালাগুলো এখন কেসে বাছে আমাদের সামনে দিয়ে।

যে বজরাটা দূর থেকে নদীর ধার দিয়ে আসছিল, সেটা এখন সশ্রাদ্ধমেধ হাঁড়িয়ে আমাদের দিকে আসছে।

মগনলালের বজরা। মগনলালের বিশাল দেহটা দেখতে পাঁচ বজরার ছাতে। তবে বালু হয়ে বনে আছে, সঙ্গে আমো চারজন লোক।

ফেল্দার ডান হাতটা তার কোমরের কাছে, বী হাতটা এখনো লাঠিটাকে ধরে আছে। আলো কর্মে এসেছে, কিন্তু তা ও আমি বাঁশের একটা গাঁটের নিচে ঘূঢ়ে করে ধরা বী হাতটা দেখতে পাঁচ।

সেদিনের গালিতে শোনা ধূপ ধূপ শব্দটা আবার শূনতে পাঁচ। এখন সেটা হচ্ছে আমার বুকের ভিতরে।

আমার চোখ শুই বী হাতটা থেকে সরাতে পারছি না।

ফেল্দার বী হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখটা লম্বা।

কাবুলিওয়ালার বী হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখটা কাটা।

ফেল্দার বী হাতের কর্বিজির কাছে একটা তিল।

কাবুলিওয়ালার বী হাতের কর্বিজির কাছে কোনো তিল নেই।...

এ লোকটা ফেল্দা নয়।

কে এসে দাঁড়িয়েছে কাবুলিওয়ালা সেজে আমাদের পাশে?

দালামোহনবাবু, কি জানেন তার পাশে কে দাঁড়িয়ে আছে?

ভিন কি বুবেছেন ও ফেল্দা নয়?

বজরাটা আমাদের সামনের বুরুজের কাছাকাছি চলে এসেছে। এখন থেকে

ব্রহ্মটা প্রায় পাঁচি গজ দূরে। বজরা এখন তারও প্রায় পাঁচি গজ উচুন্ন দিকে। ব্যবধান করে আসছে।

কাবুলিওয়ালা আমাদের ইশারা করল খুপুরিটার ভিতর ঢুকে দেতে। লালমোহনবাবু নিজে ঢুকে আমার হাত ধরে টেনে নিলেন। এক হাতের বেশ গভীর নয় খুপুরিটা। আমরা এখান থেকে সবই দেখতে পাইছি, যদিও বাইরের শোকে আমাদের দেখতে পাবে না।

বজরা এবার থামো-থামো।

ব্রহ্মজের ঠিক পিছনে জলে কৌ যেন নড়ছে।

একটা লোকের শুধু মাথাটো জলের উপর উঠল। লালমোহনবাবু হাতটা দাঁড়িয়ে আমার কোটির আস্তিনটা থামচে ধরলেন।

একটা লোক বজরা থেকে প্রায় নিঞ্চলে জলের ঘধ্যে লাঁকিয়ে পড়ল।

লোক নয়—ছোকরা।

ব্রহ্ম বন্ধু স্বর্য।

স্বর্য সাঁতরে এগিয়ে এলো ব্রহ্মজের দিকে।

ব্রহ্মজের পিছনে জল থেকে এদার লোকের মাথাটো উঠতে শুধু করে কীবিধ অবিধ বেরিয়ে এল। একি স্বপ্ন, না সতি? ও যে মছলিবাবা! দুর হাতে জাপটে কৌ যেন ধরে আছে। স্বর্য তার বিকেই এগিয়ে এসেছে; বজরার হাতের লোকেরা ওদের দ্রুজনের দিকেই দেখছে।

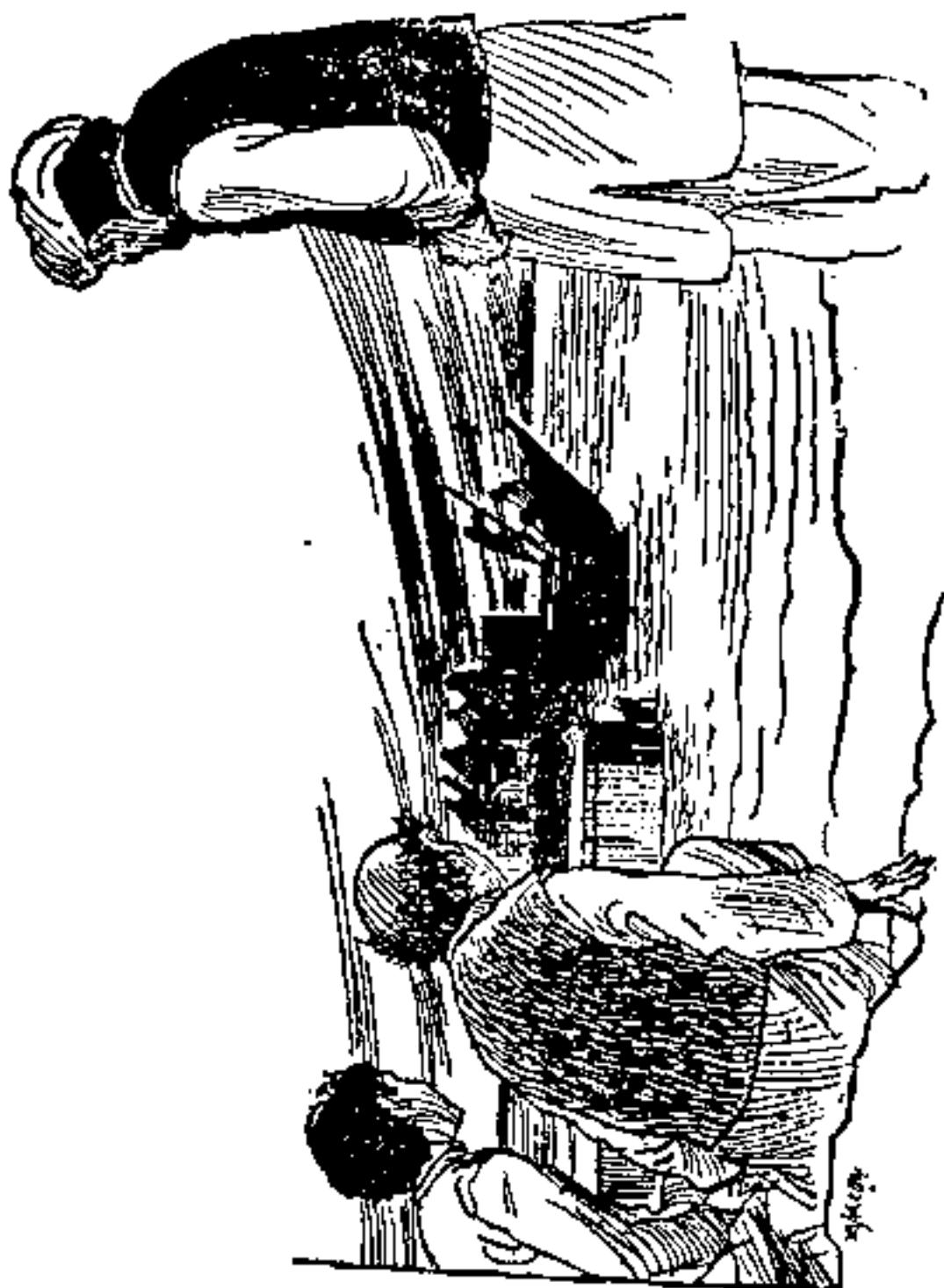
বোর আরেকটা—একটা নয়, পর পর দুটো—ধীধা লাগানো জিনিস ঘটল। মছলিবাবা তার হাত থেকে এবড়ো-খেবড়ো বলের ঘতো জিনিসটা ছাঁড়ে ঘাটের দিকে ফেলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কাবুলিওয়ালা হাতের সাঠিটা ছাঁড়ে যেসে দিয়ে বিদায়বেগে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে জিনিসটা বী হাতে তুলে নিবে তান হাতে পকেট থেকে রিভলবার বার করে বজরার দিকে তাগ করে দাঁড়াল।

সেই সহৃদাতেই, ঘগনলাল এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম তারও হাতে একটা রিভলভার এসে গেছে। তার পাশে দ্রোকগুলোও উঠে দাঁড়িয়েছে, আর মনে হচ্ছে ওদের হাতেও অস্ত রয়েছে।

এদিকে আমাদের মাথার উপরেও পায়ের শব্দ পাইছি। শুপ ধাপ করে দ্বিতীনটো সশস্ত্র পুলিস বৈদ্যনাথ সালসার পিছনের চতুরটা থেকে লাঁকিয়ে আমাদের দ্বপাশে পড়ল।

তারপরেই শুধু ইল কান ফাটানো গুলির শব্দ। একটা গুলি আমাদের খুপুরির ঠিক পাশে দোয়ালের গায়ে লাগল। জথম দোয়ালের গুড়ো গুলির হাওয়ায় সোজা এসে ঢুকল লালমোহনবাবুর নাকের ভিতর।

‘হাঁচো!’



গুদিকে মগনলালের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে বেরিবে গেছে। আবু
তার পরেই এক তাঙ্গুয় বাপায়। ওই হিপোপটেমাসের মতো লোকটা বজ্রার
উল্টোদিকে ছুটে গিয়ে এক বিকট চিংকার দিয়ে হাত দুটো মাথার উপর
ভুলে একটা কিমাট লাফ রিয়ে গুপ্তায় পড়ে চতুর্দিকে অঙ্গের ঝোয়ায় ছিটকে
থিল।

কিন্তু কোনো সাড় নেই। দুটো নেকো এবই ঘধো বজ্রার পাশে এসে
পড়েছে, তাতে প্রলিম বোঝাই।

আবু যাহলিবাবা?

তিনি স্বৰবকে বগলদাবা করে জল থেকে উঠে আসছেন।
এবার তিনি ক্যাবুলিওয়ালার দিকে ফিরে বললেন, ‘খ্যাত্ক ইউ,
তেওয়ারিজী।’

আবু ক্যাবুলিওয়ালা যাহলিবাবার দিকে হাত ‘বাঁজুরে দিয়ে তাকে জল
থেকে ঢেনে ভুলে বলল, ‘খ্যাত্ক ইউ, মিস্টার মিস্টার।’

আবু আবু লালমোহনবাবু, প্রাইভেট যন্সে পড়লায়; না হলে হৃষ্ট আধা
ঘূরে পড়ে বেতায়।

স্বৰব একজন প্রাঁলিসের হাতে ভলে সেল। ফেলুদা কাছে আসতে
যুক্তলায় তার মেঝে-আপটো কী অসাধারণ হয়েছে—যদিও কৃখন শুরীনের
কোনো কোনো জারগায় কালো প্রশঁসন ফৌক দিয়ে চামড়ার আসল রংটো বেরিবল্লে
পড়েছে।

‘ক্ষেত্রীর মতো কাগজে না রে তোপ্পনে?’

‘শ্যাম্ভুরফুল।’—বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা এবার তেওয়ারিজ দিকে ফিরে বলল, ‘আশনার লোককে বলে
মিন ত—কৌশে তোমালো আবু আমার আমাকাপড়গুলো রয়েছে—চৰ্ট করে
মিলে আসুক।’

এগারি

বিজয়া পশুয়ী, রাত শৌনে দশটো। যোৰাল বাঁড়িৰ একতলাৰ বৈঠকখানা। থাঁৰা ঘৰে বয়েছেন তাৰা হলেন—গোয়েন্দা প্ৰদোষ শিতিৰ, আলমোহন গান্ধুলি, সবে-ইনসপেক্টৰ তেওঘাৰি, অস্বিকা বৰাষাল, উমানাথ বৰাষাল, উমানাথবাবুৰ স্তৰী, বৃকিণীকুমাৰ ঘোষাল, বিকাশ সিংহ, আৰ আৱো সব থারা বাইৱে থেকে এসেছেন থাসেৱ নাম জানি না, আৱ আমি—তপেশৱজন মিত্ৰ। এ ছাড়া ঘৰেৱ দৱজাৰ থাইৱে থেকে উৎকি মাৰতে দেখছি তিনজন লোককে—দাবোয়ান তিলোচন পাশ্চে, দেৱৱাৰা বৈকুণ্ঠ আৱ বৃক্ষো চাকুৰ ভৱনবাবু।

ফোলাকুলি শেৰ, মিষ্টি শেৰ—অস্তত স্টেট শেৰ, বৰিও কাৰুৰ কাৰুৰ জোৱাল এখনো লড়ছে। বেমন ফেল্দার : ঠাকুৰ ভাসান হয়ে থাবাৰ পৰ বাঁড়িৰ লোকেৰ মন থাৱাপ হৰে যাব ; এখনোও তাৰ হয়েছিল। কিন্তু এখন আবাৰ এক ঠাকুৰ জলে গিয়ে আৱেক ঠাকুৰ তিৰে পাখাৰ আশায় সকলেৰ মুখেই বেশ একটা হাসিহাসি উঠেছিল ভাৰ। এটা বলে রাখি যে গণেশ পাওয়া গোছে কিনা সেটা কিন্তু এখনো জানা যাবৈনি। দেটা জানা গোছে সেটা হল মহলিবাবাৰ ঘটনা। আৱ বিবেল চাৱটৈৰ সময় ভক্তেৰ দল আসাৰ আধৰণ্টো আগে অজয়বাবুৰ বাঁড়িৰ পিছনেৰ দৱজা দিয়ে চুকে পুলিস মহলিবাবাকে আৱেস্ট কৰে। বাবাজী আসলে ছিলেন সেই বাবা বেৰিলৈৰ কেল থেকে পলাতক জালিয়াত। তা ছাড়াও তিনি ছিলেন মগনলালেৰ একজন সাঙ্গাই। তাৰ আসল নাম নাৰি পুৱন্দৰ রাউত, বাঁড়ি পূৰ্ণিয়া। লোকটা অনেকদিন বলিবাবায় ছিল, মনু-মেষ্টেৱ তলাখ ইতি, সাকাইয়েয় খেলো দেখনো থেকে শুন্দ, কৰে অনেক বুকমেৰ অশূৰ কাজ কৰে শেষটোৱ ভালিয়াতি ধৰে। আৱেস্টৰ এক সাটোৱ থায়ে বেগলী কুবেৰ কাহ থেকে ধাৰ কৱা মেৰু-আশেৱ সৱজামেৰ সাহাৰে মহলিবাবাৰ চেহাৰা নিয়ে ফেল্দার ভঙ্গদেৱ সামনে হাজিৰ হৈল। তাৰ আগেই অবিশ্ব পুৱন্দৰ রাউত পুলিসেৱ চাপে পড়ে সব কথা কৰিস কৰে দিয়েছিল। আজ শঙ্গাৰ ঘাটে বে দৰ্ঘাৰ্ঘ নাটকটা মগনলাল ক্ষান কৰেছিল সেটাৰ পুৱন্দৰ বলে দিয়েছিল। আসলে মহলিবাবাকে মগনলালই থাড়া কৰেছিল। তাৰ পিছনে যে কি সাংঘাতিক শয়তানি ফিল্ড ছিল সেটা পৰে ফেল্দার কথা থেকে জানা থায়।

সবাই যদ্য যথ করে উদ্ঘৃত হয়ে বলে আছে, সকলেরই প্রিণ্ট ফেলুন্দার
দিকে। লালমোহনবাবু বে কেন মাঝে মাঝে হেসে উঠেছেন আৰ্দ্ধ না; হ্যাত
বিকাশবাবু ওকে জোর করে সিংগুল খাইয়েছেন বলে। সিংগুল থেলে মার্ক
হাসি পায়।

ফেলুন্দা জল থেরে হাতের কাঁচের গেলসেটা আওয়াজ বাঁচিয়ে থ্ব
সাবধানে পিতনের কাশ্মৰী চোকিলটার উপর রেখে থলল, 'মগনলালই
মছলিবাবার স্মৃতিকর্তা' একথা আৰ্দ্ধ আপনাদের আগেই বলেছি। মছলিবাবা
অন্তর্ষ্যায়ী, মছলিবাবা অঙ্গীকৃক ক্ষমতার অধিকারী—এখননের কয়েকটা
ধারণা ঝটাতে পারলেই কাৰ্যসিদ্ধ হয়। কেবাৰ ঘাটে মছলিবাবাকে এনে
ফেলার আগে অভয় চুক্তি' এবং লোকনাথ পান্ডা সম্বলে দু'একটা কথা
জেনে নেওয়া মগনলালের মতো লোকের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না। বাৰ্ক
কাজটা সম্ভব হয়েছিল অভয়বাবুর অন্ধ ভাস্তিৰ জোৱে এবং প্রানীৰ বাসিন্দাদেৱ
বিশ্বাসেৱ জোৱে।'

ফেলুন্দা ধামল। লালমোহনবাবু হাসবাৰ কলা মাথা পিছনে হেলিয়ে মুক্তা
থুলতেই আৰ্দ্ধ ওৱ কলুইয়ে খোঁচা মেৰে ওকে ধামলাম। থৰেৰ আৰে প্ৰত্যোক্তি
লোক হ'ব কৰে ফেলুন্দাৰ কথাগুলো গিলছে। ফেলুন্দা বলে চলল—

'মগনলালেৱ সপ্লো সম্প্ৰতি তাৰ বাড়িতে বলে আমাৰ কিছু কথা হয়েছিল।
মগনলাল বলেছিল গণেশটা তাৰ কাছে আছে, এবং উমানাথবাবু, নিজে মাৰ্ক
সেটা তাকে বিকৃতি কৰেছেন।'

'আৰ্দ্ধ!—চূখ গাঁড়িয়ে চেয়াৰ হেডে উঠে পড়লেন উমানাথ বৰাবাৰ।
'আপনি বিশ্বাস কৰেছিলেন তাৰ কথা?'

ৱহসেৱ একটা নতুন দিক হিসাবে কথাটা শ্ৰূতে বে থ্ব থায়েল লেগে-
ছিল তা বলব না। কিন্তু পৰমহৃতেই থখন মগনলাল তসলত বধ কৰাৰ
জনা আমাকে একটা মোটা থ্ব অফাৰ কৰলো, তখন মনে একটা ঘটকা লাগল।
বধ কৰাৰ একটা কাৰণ অবিশ্য মগনলাল বলেছিল, কিন্তু সেটা আমাৰ কাছে
থ্ব বিশ্বাসঘোগা বলে মনে হয়নি। তাৰ কথা সঁত্য হলো বৱং আপনি আমাকে
থ্ব অফাৰ কৰতে পাৱলেন—কাৰণ কোঁচা থ্বৰ্জুত সাপ বেয়িয়ে গোলে সেটা
আপনার পক্ষে মোটাই সুবিধেৰ হত না। অৰ্থ আপনি আমাকে নিজে থেকে
অনস্মান চালাতে বলেছেন।'

'নিজে থেকে', প্ৰতিধৰ্মি কৱলেন লালমোহনবাবু, 'হাঃ হাঃ—নিজে থেকে।'

ফেলুন্দা লালমোহনবাবুৰ পাগলামো অগ্রাহ্য কৰে বলে চলল—

'তখনই আমাৰ প্ৰথম সন্দেহ হয় বে তাহলে হয়ত গণেশটা আপনাদেৱ
বাড়িতেই কোথাৰ রঞ্জে গেছে, এবং মগনলাল কোনো উপাৰে কোনো একটা
লম্বয়ে সেটা পাৰাৰ আশা কৰছে। বাড়িতে রঞ্জে, অৰ্থ সিন্দুকে মেই—

তাহলে সেল কোথায় জিনিসটা? সেই সঙ্গে আবার এটাও মনে হল যে এ বাড়ির সঙ্গে মগনলাঙ্গের একটা বোগস্ত্র না থাকলে সেই বা কী করে আশা করছে গণেশটা পাবার?

‘এই সব যখন জাবাছ, তখন একটা কাগজে ইঠাই সঙ্গেছটা গিয়ে পড়ল মিষ্টার সিংহের উপর; কাগজ আধি জানতে পারলাম যে তিনি একটা জরুরী সত্তা আমার কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলেন। জেরার ফলে বিকাশবাবু স্বীকার করলেন যে তিনি দশই অঙ্গোবুর লুকিয়ে লুকিয়ে মগনলাঙ্গের সঙ্গে উদ্বানাথবাবুর কথাবার্তা শুনেছিলেন। শোনার পর থেকে তার মনে গণেশটা সম্পর্কে একটা উল্লেখ থেকে যাব। মিষ্টার বোবাল যেদিন মহলিয়াবাকে দেখতে থাক, সেদিন আর থাকতে না পেরে বিকাশবাবু দোতলায় অস্বিকাবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর দেরাজ থেকে ঢাবি নিয়ে সিদ্ধুক থেকলেন। খুলে দেখেন গণেশ নেই।’

‘গণেশ তখনই নেই?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন উদ্বানাথবাবু। ‘তার মাদে তার আগেই ছুরি হয়ে গোছে?’

‘ছুরি না’, ফেল্দু বলল। ফেল্দু উঠে দাঁড়িয়েছে—তার হাত পুঁজো প্যান্টের পকেটে। ‘ছুরি না। একজন অত্যন্ত বৃদ্ধিমান বাজি গণেশটিকে ঘণন-ধালের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেটিকে লুকিয়ে রেখেছিল।’

‘ক্যাপ্টেন স্পার্ক!’—বলে উঠল বুকিয়ুগীকুমার।

সবাইয়ের দ্রষ্টি রক্তুর দিকে দূরে দেল। সে দুরের এক কোণে একটা দুরজার পাশে পদ্মা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

‘ঠিক বলেছ। ক্যাপ্টেন স্পার্ক, ওয়কে আমাদের বৃক্ষবাবু।—আচ্ছা, ক্যাপ্টেন স্পার্ক, সেদিন যখন তোমার বাবার সঙ্গে একজন মোটা জনুসোক এ ঘরে বসে কথা বলছিলেন—’

বুকু ফেল্দুর কথা শেব না হতেই চেঁচিয়ে উঠল—‘তাকু গড়ারিয়া!—ক্যাপ্টেন স্পার্ক’ তাকে বার হার বোকা বানায়।

‘সে যখন কথা বলছিল, তুমি কি তখন এই প্রশ্নের দর থেকে শুনছিলে?’

বুকু তৎক্ষণাত উত্তর দিল, ‘শুনছিলাম ত। আর তক্ষণ ত সিদ্ধুক খুলে গণেশ নিয়ে লুকিয়ে রাখলাম। না হলে ত ও নিয়ে নিত।’

‘ভেরি গুড়’, ফেল্দু বলল। তাঁরপর অন্যান্যের সিকে ফিরে বলল, ‘আমি ক্যাপ্টেন স্পার্ককে গণেশের কথা জিগোস করেছিলাম। তাতে ও বলেছিল গণেশ পাওয়া যাবে না। কাগজ সেটা রয়েছে আঠিকার এক রাজার কাছে। কথাটোর মানে আমি তখন ব্যবহার পারিনি। শেষে বৃক্ষলাঘ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে—পায়তালিশ বছরের প্রৱান টার্নেনের একটা ফিল্ম দেখতে গিয়ে।’

ফেল্দু ধামতেই চারিদিক থেকে—সে কি! আৰু? টার্নেনের ছবি? ইজামি

অন্দেকগ্লো প্রশ্ন একসঙ্গে শোনা গেল। ফেল্দা সর্যাসরি উত্তর না দিলে আবার রুকুর দিকে তাঁকায় বলল, 'ক্যাপ্টেন প্রাক', টারঙ্গানের ছবিয়ে একেবারে শুরুটা কি সেটা মনে করে থাকতে পার তুমি!'

'পারি', বলল রুকু, 'হেঁড়ো-গোল্ডউইন-মেয়ার প্রেজেন্টস—'

'ঠিক কথা—ফিটার তেওয়ারি, দেখুন ত আমরা মেঁয়ে-গোল্ডউইনের খেলা কিছু দেখাতে পারি কিনা।'

তেওয়ারি তার চেয়ারের নিচ থেকে একটা খবরের কাগজের মোড়ক নিয়ে সেটা খুলে তার থেকে একটু অন্তরে জিনিস বায় করে ফেল্দার হিকে এগিয়ে দিল। তার উপরে বিজলীর আড়ের আলোটা পড়তেই বুরুম সেটা একটা জলে নষ্ট হয়ে যাওয়া মাটির তৈরি হাঁ-করা সিংহের মাথা। ফেল্দা মাথাটা হাতে তুলে ধরে বলল, 'এই দেখুন আঁকড়িকার পশুরাজ তথা দুর্গার বাহনের মাথা। এই সিংহের হাঁ-য়ের মধ্যে গণেশ লুকিয়ে রেখেছিল ক্যাপ্টেন প্রাক'। তার ধারণা হিল বিসর্জনের পর গণেশ ভাসতে ভাসতে চলে যাবে সমন্তে, আর সেখানে একটি হাঁক সেটাকে গ্রাস করবে, আর স্লাকই আবার সেই হাঁককে হারপুন দিয়ে মেরে গণেশটাকে পুনরুৎস্থাপ করবে। তাই না, ক্যাপ্টেন প্রাক?'

'তাই ত', বলল রুকু।

'আর মছলিবাবার ল্যান হিল তিনি ঠাকুর ভাসানের আগে নিজে জলে কাঁপ দেবেন। তারপর কিছু দ্রুতভাবে গিয়ে আবার ভূব সৌতারে ফিরে আসবেন ঘাটের দিকে—এসে মৌকোর আড়ালে অপেক্ষা করবেন। তারপর ভাসানের পরম্পরাতে আবার ভূব দিয়ে সিংহের মাথাটি চাঢ় দিয়ে খলে নিয়ে চলে যাবেন মুনশীঘাট আর বাজ্জাটের মাঝামাঝি একটা নির্জন জাহাগার। ততক্ষণে যদন্তলালের বজায়েও এসে যাবে সেইখানে। বাস—বাঁক কাজ ত সহজ।'

উমানাথবাবু বললেন, 'কিন্তু বাবাজী যে দসেরাম দিনে যাবেন, সে ত তার ভঙ্গরাই ঠিক করে দিয়েছিল। আর গণেশ কোথায় আছে সে থবরাই বা বাবাজী জানবেন কী করে? আর যদন্তলালই যা জানবে কী করে?'

'দুটোর উত্তরাই ব্ব সহজ', বলল ফেল্দা। 'তৃতীয়ায় দিনে বাবাজী তার ভঙ্গদের জিগোস করেন এক ধেকে কলের মধ্যে একটা নিম্বর বলতে। বিধারীতি অধিকাংশ উত্তরাই হয় সাত। এটোই নিয়ম। ফলে হয়ে গেল তিনে সাতে দশ—অর্ধেক দসেরা। আর সিংহের মুখে গণেশ লুকোনোর কথাটা ক্যাপ্টেন প্রাক' সবাইকে না বললেও, তার ব্বধু সুরক্ষকে নিষ্পত্তি বলেছিল, তাই না, ক্যাপ্টেন প্রাক?'

রুকু স্মৃতিভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তার ভূব কুঁজকে গেছে। সে হোটে করে আর্থ নেড়ে হাঁ ব্বকিয়ে দিল।

ফেল্দা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শ্বাসান সিৎ সাতিই শ্বাসান সিৎ।'

সুরয়ের পুরো নীম স্বরূপলাল খেঁবাজ। সে অগন্তলালের ছোট ছেলে। যাকে বলে বাপকা হেটে। থাকত মানবালোর কাছে অগন্তলালের দুটো বাঁड়ির একটাতে। ওটায় ফার্মিলি থাকত। অনাটায় থাকত মগনগাল নিজে। সুরয়ই তার বাপকে বুবটা দেয়, এবং তার পরেই অগন্তলাল তার বিহাট চক্রান্তটি খাড়া করে।

‘বিশ্বাসঘাতক!—বলে উঠল রূপু।

এতক্ষণে অৰ্পিকার্বাবু মুখ খুললৈন—

‘সিংহের মাথাটা কে টেরিবলের উপর দোখে দিয়েছে, কিন্তু গণেশ কই?’

ফেলুদা মাথাটকে আবার হাতে তুলে নিল। তামপুর তার হী-করা মূখের ভিতর জাত চৰ্কিয়া টেম দিয়ে যে জিনিসটা বার কৰল সেটা গণেশ নয় হোটেই। সেটা তার অঙ্গুলের জগায় লেগে থাকা চৰ্কিটে একটা সাদা জিনিস।

‘ক্যাপ্টন প্রাক’ গণেশটাকে আটকাতে একটা আশ্চর্য সহজ উপায় বাবু করেছিল।

‘চিকলেট!—বলে উঠল রূপুগীকুমার।

‘হী, চুইঁ গায়’, বলল ফেলুদা, ‘সেই চুইঁ গায়ের খানিকটা এখনেও রংয়ে গেছে, কিন্তু গণেশ আর এখানে নেই।’

ফেলুদার এই এক কথাতেই খোঢ়ানা বাঁড়ির সকলের মুখ কালো হয়ে গেল। উমানাথবাবু কপাল ঢাপড়ে বলে উঠলৈন, ‘তাহলে গত কৈন কী ইল মিস্টার মিস্টির? গণেশই নেই?’

ফেলুদা সিংহের মাথাটা আরেকবার ন্যাময়ে বেঁধে বলল, ‘আমি আপনাদের আশ্চর্য ঠাণ্ডা জল চেলে দেবারে জন্ম আপনাদের এখানে ভার্কিন, মিস্টার বৌধাল। গণেশ আছে। সেটা কোথায় বলার আগে আমি আপনাদের একটি ঘটনার কথা আরেণ কৰিব্বে দিতে চাই। আপনাদের একজন খুব পরিচিত বাঁড়ির খুন্দার কথা। শশীভূতণ পাল।’

‘তাকে ত আর ছেলে মেঝেছে’ বলে উঠলৈন উমানাথবাবু, ‘সেই নিয়েছে সাতি গণেশ?’

‘বাস্ত হবেন না’, বলল ফেলুদা, ‘আমায় কথাটা আগে থেন দিয়ে শুনুন। আমি থা বলতে খাঁচ সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ, এবং সে প্রমাণ আমরা পাৰ বলেই আমারে বিশ্বাস।’

মরের প্রত্যোক্তি লোক আবার স্তম্ভ হয়ে ফেলুদার দিকে দেখছে। সাল-মোখনবাবু আৰ জোৱে হাসছেন না, কিন্তু সব সবয়েই তার মুখে হাস লেগে পড়েছে। আব কেন জীব থাকে আৰে তান হাত দিয়ে নিজেৰ কপালে চাটি আৱছেন।

ফেলুদা বলল, ‘সিংহের মুখের মধ্যে র্যাব গণেশ লুকোন থাকে তাহলে সেটা দেখে ফেলার সবচেয়ে বোশ সুযোগ ছিল শশীবাবুৰ। বিশেষ কো

মেদিন তিনি সিংহের মুখের বাইরে এবং তিনির কাজ করছিলেন সেইদিন। অর্ধাং পঞ্চাং দিন। অর্ধাং মেদিন তিনি ছিল নন। মেদিন আপনারা সশ্রাব বাঁড়ি ছিলেন না মনে আছে কি? তিলোচন বলেছে আপনারা বিক্ষনারের রান্ধিরে আর্তি দেখতে গিয়েছিলেন।'

উমা-শ্রীবাবু মাথা নেড়ে হাঁ বললেন। ফেলুদা বলল, 'আমরা পূর্ণসেবৰ কাজ থেকে জেনেছি যে শশীবাবু মেদিন আবাবে অস্মৰ বোধ করাতে তাঁর কাজ থেবে করে বিকাশবাবুর কাজে থেক চাইতে গিয়েছিলেন। একবা বিকাশ-বাবুই পূর্ণশকে বলেছিলেন। শশীবাবু ওথে নিয়ে বাঁড়ি চলে গান। আমরা তিলোচনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে শশীবাবু যাবাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিকাশবাবুও বেরিয়েছিলেন। তিনি কেন বেরিয়েছিলেন সেটা তাঁকে জিগোস করতে পারিয় কি?'

বিকাশবাবু শাশীর গলায় বললেন, 'এটা জিগোস করাব কারণ কী দ্বাবতে পারছি না। যাই হোক, মিস্টার মিস্টার যে প্রশ্নটা করলেন তার উত্তর হচ্ছে—আমি সিগারেট কিনতে বেরিয়েছিলাম।.. আরো কিছু প্রশ্ন আছে কি মিস্টার মিস্টারের?'

'হ্যাঁ, আছে।—সিগারেট কিনে বাঁড়ি ফিরতে এক ঘণ্টার উপর সময় জাগল কেন আপনার, বিকাশবাবু?'

'তার কারণ আমি গগোর ঘাটে একটু হাওয়া বেতে গোলাম। কোনু ঘটে জানতে চান ত তাও বলোছি। হারিশচন্দ্র। সোনারপুরা বোজের ভাস্তাৰ অশোক মন্দিৰ সঙ্গে সম্বন্ধে দেখা হয়, মিনিট দশক কথা ও হয়। তাকে জিগোস করে দেখতে পারেন।'

'আপনার হারিশচন্দ্র ঘাটে ঘাওয়ার বাপারটা আমি অবিশ্বাস করছি না বিকাশবাবু। আপনার সেখানে ঘাওয়া একটা বিশেব কারণ ছিল। সেটা আমরা আসছি এক্সুনি; তার আগে কাশ্টেন স্পার্কটকে আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। কাশ্টেন স্পার্ক, দুঃখি কি তোমার আর্সিস্ট্যাল্ট খুলে প্রক্ষিতকে বলেছিলে সিংহের মুখে গপেশ লুকিয়ে ঝাখাব কথা?'

'ও ও বিশ্বাসই করোনি', বলল বুকু।

'আনি। সেইজনোই ও সিন্দুক খুলে দেখতে গিয়েছিল স্কুল কথা সত্ত্ব কিনা। যখন দুখল সত্ত্ব, তখন থেকেই ওর লোভ হয় গপেশটোৱ উপর। সেটা আপনিই চলে আসে ওৱ হাতে যখন শশীবাবু গপেশটা পোয়ে বাঁড়িতে আৱ কাউকে না পেয়ে বিকাশবাবুর হাতে সেটা জয়া দিতে চায়। কিন্তু বিকাশ সিংহ ত জিনিসটা এভাৱে পেতে চাননি! শশীবাবু যে পৱেৰ দিনই সব কথা ফাঁস কৰে দেবেন। তাকে থতজ না কৰতে পাৱলে ত বিকাশবাবুৰ উন্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। তাই তিনি শশীবাবুকে ধাওয়া কৰেন। যাবাবে পথে ত্ৰীৰ ক

ভোরাইটি স্টোরস থেকে একটি ছোরা কেনেন। তাই দিয়ে গণেশ মহার অম্বকার
গলিতে শশীবাবুকে নির্মতাবে ইত্যা করেন; তারপর হাঁরাচন্দ্ৰ থাটে গিৰে
বজ্জ্বল ছুরিটা গণেশ—'

‘মিথো! সবৈব মিথো! প্রস্তোকটা কথা মিথো!—বিকাশবাবুৰ এয়কম
অস্তুত চেহারা কোনোদিন দেখব কম্পনো কৰিল। তাৰ চোখ দুটো আৱ কপালেৰ
ৰগ দুটো যেন ঠিকৱে বেঁয়িয়ে আসছে—‘গণেশ যাই আৰি নেব ত সে গণেশ
কোথায়? কোথাই সে গণেশ?’

‘আৱ একদিন পৱে হলে ইয়েত সে গণেশ থাকত ন্তা। আপনি নিষ্ঠাই
মগমলাসকে বিজী কৰে দিতেন। কিন্তু পুজোৰ কটা দিন আপনাৰ বাড়ি থেকে
বেৱোন সম্ভব ইয়নি—তাই আপনাকে গণেশ কৰ্কিয়ে বাধকে হৱেছিল।’

‘মিথো কথা।’

‘তেওয়ারিজী! ফেল্দু দারোগা সাহেবেৰ দিকে হাত বাঞ্ছল। তেওয়ারি
এধাৰ আৱেকটা জিনিস যেল্দুসাৰ হাতে তুলে দিল।

বিকাশবাবুৰ রেডিও।

ফেল্দু রেডিওকে চিত কৰে ব্যাটারিৰ খ্পারিৰ ঢাকনাটা খুলে তাৰ
ভিতৰে হাত ঢুকিয়ে টেনে ধৰ কৰল একটা লম্বা ইৰো-বসানো আড়াই-ইঁপু
সেন্টাৰ গণেশ।

পৰমহুতেই অস্বিকাৰীবাবুৰ বিশাল তালতলাৰ চৰ্টিৰ একটা পাঁটি গিৰে
সজোৱে আছাড় থেল বিকাশবাবুৰ গালে।

সবশেষে শূগলাম গুৰুৰ বিনৰিনে চিঁকাৰ—

‘বিষ্঵াসঘাতক! বিষ্঵াসঘাতক! বিষ্঵াসঘাতক!'

৩

৪

৫

যোৱালয়ৰ বাড়িতে তাৰিক আৱ ভুঁইভোজ ছাড়া আৱ বৈ জিনিসটা
পীওয়ো পেল, সেটা বয়েছে এবন ফেল্দুৰ পকেটে একটো খামেৰ মধ্যে: আমলা
মসনপুৰা ঝোড় দিয়া হৈতে বাড়ি ফিৰাই। লালমোহনবাবুৰ সীম্বিৰ দেশা
ছাটেছে কিনা জানি না। হতে পাৱে ফেল্দুৰ চোখ রাঙানি আৱ আমাৰ চৰ্মটিৰ
চোষে তিনি নিজেকে সামলে বোঝেছেন।

কৰ্মীত্বাৰ ছোটুৱামেৰ পানেৱ দোকানেৰ সামলে থামতে হঠাত আৰু
বেস্যুৱালভাৱে হেসে উঠলেন লালমোহনবাবু।

‘কী হল মশাই, যেল্দু বলল, ‘আপনাকে রাঁচি পাঠাতে হবে নোৰ? এত
বড় একটা ঘটনা আপনাৰ হাসাকৰ বলে ঘনে হচ্ছে?’

‘আৱ দুৱ, মশাই’, লালমোহনবাবু কোনো রকমে হাঁস থামিয়ে বললেন,

‘কী হয়েছে সে তো জানেন না। রহস্য ত্রৈমাণি সিরিজের তেষটি নম্বর ঘটি—
বঙ্গ-হীরক রহস্য—সোন দেশপ্রদ রহস্য তাকে। হিরো একটা
হীরে ধূকিয়ে থাকছে হাঁকিয়া এক কুমীরের প্লাটুর মুখের রহস্য—ভিলেন থাকে
না পায়। ভাবতে পারেন; আমারই দেখা বই আর আমিই কিনা কেল মেরে
গেলাম, আর ফেলি মিস্তির হয়ে গেলেন হিরো!'

ফেলাম কিছুক্ষণ লালমোহনবাবুর স্বরে চেয়ে রইল। আরপর বলল,
‘আপনি ভুল করছেন লালমোহনবাবু। তার চেয়ে যরং বলুন আপনি
আপনার কলমের জোরে এমন একটি রহস্য ফেলছেন যে বাস্তবে তার পামনে
পড়ে ফেলি মিস্তির গোয়েন্দাসির ছেড়ে দেবার উপর হয়েছিল। কাজেই
আপনিই বা হিরো কম কিসে?’

সাত বিকাশ মশালাওয়ালা তবক দেওয়া পানটা চার আঙুলের টেলা দিয়ে
শুধে পুরে লালমোহনবাবু বললেন, ‘যা নলেছেন ভশাই—জটাইর জবাব নেই।’



বাধ্য শয়ের বাস্তু

বোম্বাইয়ের বোম্বেটি

লালমোহন গাঙ্গেলী ওরফে জটিল-র হাতে মিন্টির বাস্তু দেখে বেশ অবাক হলাম। সাধারণত ভদ্রলোক ঘথন আয়াদের বাড়তে আসেন তখন হাতে ছাড়া ছাড়া অরু কিছু থাকে না। মতুন বই বেরোলে বইয়ের একটা প্যাকেটে থাকে অবিশ্য, কিন্তু সে তো বছরে দুবার। আজ একেবারে মির্জাপুর স্টোরের হালের দোকান কল্লোল মিষ্টির ভাস্তারের পাঁচশ টাকা দামের সাদা কার্ড বোর্ডের বাস্তু, সেটা আবার সোনালী ফিতে দিয়ে বাধা। বাস্তোর দুপাশে নীল অঙ্করে দেখা 'কল্লোলস্ট ফাইভ মিল স্টাইলিষ্টস'—মানে পাঁচ-মেশালী মিল্টি। বাস্তু খুললে দেখা হবে পাঁচটা খোপ করা আছে, তার একেকটাতে একেকরকমের মিল্টি। মাঝেরটার থাকতেই হবে কল্লোলের অবিষ্কার 'ডায়মণ্ড'—হীরের মতো পলকাটা রূপোর ত্বক দেওয়া রস ভঁঁড় কড় পাকের সন্দেশ।

এমন বাস্তু লালমোহনবাবুর হাতে কেন? আর ও'র মুখে এমন কল্লোফতে হাসি হাসি ভাবই বা কেন?

‘ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বাস্তু টেবিলে রেখে চেমারে বসতেই ফেলুন্দা বলল, ‘বোম্বাইয়ের স্থুতবরটা বুঝি আজই পেলোন?’

লালমোহনবাবু প্রশ্নটা শুনে অবক হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না, কেবল ভুরু দুটো ওপরে উঠল।

‘কী করে ব্যবলেন, হে হে?’

‘মাইলেন বাজার এক ঘণ্টা পরে ঘথন দেখছি আপনার হাতঘড়ি বলছে সোয়া তিনটে, তার মনেই টাটকা আনন্দের আভিশয়ে ঘড়িটা পরার সময় আর ওটার দিকে চাইতেই পারেন নি।—স্প্রিং গেছে, না দম গেছে?’

লালমোহনবাবু তাঁর নীল ঝাপড়ের খসে পড়া দিকটা রোম্যান কাইদায় বা কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, ‘পাঁচশ চেরেছিলুম; তা আজ ভোরে ঘূঢ় ভাঙতেই চাকর এসে টেলিগ্রাম ধরিবে দিলে। এই খে!'

লালমোহনবাবু পকেট থেকে একটা গোলাপী টেলিগ্রাম ধার করে পড়ে শোনালেন—

‘প্রোডিউসার উইলিং অফার টেন ফর বোম্বেটে প্লাইজ কেবল কনসেন্ট।’ আমি বিম্বাই পাঠিয়ে দিয়ে এলুম—হ্যাপিলি সেলিং বেন্চেটে ফর টেন টেক

ত্রৈসিংস।

‘দশ হাজার।’ ফেল্দার ঘন্টা মাথাটা ভানুবের পর্যন্ত ঢোক গোলগোল হয়ে গেল। ‘কল্পহাজারে গম্প বিক্রি হয়েছে আপনার?’

অটোরুঁ একটা হালকা মস্তিষ্ঠান হাসলেন।

ঠাকুরু হাতে আসেন এখনো। ওটা বস্বে গেলেই প্যাব।

আপনি বস্বে যাচ্ছেন?’ ফেল্দার চেব আবার গোল।

‘শুধু আমি কেন? আপনারাও। আট মাই এক্সপ্রেন্স। আপনি ছাড়া ত এ গম্প দাঁড়াতেই না মশাই।’

কথাটা যে সত্তা সেটা ব্যাপারটা খুলে বললেই বোৰা যাবে।

জটারুর অনেক দিনের স্বপ্ন বে তার একটা গম্প থেকে সিনেমা হয়। বাঙ্গলা ছবিতে পয়সা নেই, তাই হিন্দির দিকেই ও'র বোক বেশি। এবারে তাই কোমর বেঁধে হিন্দি সিনেমার গম্প লেখা শুরু করেছিলেন। বস্বের ফিলম লাইনে লালমোহনবাবুর একজন চেনা লোক আছে, নাম প্লিক বৈষ্ণব। আগে গড়পারেই থাকত, লালমোহনবাবুর দুটো বাড়ি পরে। কলকাতার টালি-গঞ্জে তিনটে ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজ করে রোকের মাথায় বস্বে গিয়ে হাঁজির হয়। সেখানে এখন সে নিজেই একজন হিট ডি঱েক্টর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ অবধি গিয়ে গম্প আর এগোচ্ছে না দৈখে জটারু ফেল্দার কাছে আসেন। ফেল্দার তখন-তখনই লেখাটা পড়ে শুনবা করে—‘মাঝপথে আটকে ভালোই হয়েছে মশাই। এ আপনার প্রত্যক্ষম হত। বোম্বাই নিত না।’

লালমোহনবাবু মাথা চূলকে বললেন, ‘কী হলে নেবে মশাই বলুন ত। আমি ত ভেবেছিলুম খনকতক কারেন্ট হিট ছবি দেখে নিয়ে তারপর লিখব। দুদিন কিউরে দাঁড়ালুব; একদিন পকেটমার হল, একদিন সোয়া বন্টা দাঁড়িয়ে জানলা অবধি পেঁচে শুনলাম হাউস ফস্ট। বাইরে টীকিট ব্র্যাক হাঁজল, কিন্তু বারো টাকা খরচ করে শেষটোর কোড়োপাইরিন থেকে হবে সেই ভয়ে পিছিয়ে গেলুম।’

শেষে ফেল্দাই একটা ছক কেটে দেবে বলল লালমোহনবাবুর জন্য। বলল, ‘আজকাল ডবল রোলের খুব চল হয়েছে সেটা জানেন ত?’

লালমোহনবাবু ডবল রোল কী সেটাই জানেন না।

‘একই চেহারার দুজন নয়েক হয় ছবিতে সেটা জানেন না?’ ফেল্দা প্রশ্ন করল।

‘যাজ ভাই?’

‘তাও হতে পারে, আবার আমার নয় অথচ চেহারায় মিল সেটা ও হতে পারে। একই চেহারা, অথচ একজন ভালো লোক, একজন খারাপ লোক;

অথবা একজন শক্ত-সমর্থ, আর একজন গোবৈচারা। সাধারণত এটাই হয়। আপনি একটি নতুনভাবে এক কাঠি বাঁড়িয়ে করতে পারেন;—একটা ডবল রোলের বদলে এক জোড়া ডবল রোল। এক নম্বর হিরো আর এক নম্বর ভিলেন হল জোড়া, আর দুই নম্বর হিরো আর দুই নম্বর ভিলেন হল আরেক জোড়া। এই দুই নম্বর জোড়া যে আছে সেটা গোড়ায় ফাঁস করা হবে না। তারপর—'

এখানে লালমোহনবাবু বাথা দিয়ে বললেন, 'একটি বেশি জটিল হয়ে যাবে না ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'তিন ঘন্টার মালমঢ়জা চাই। আজকাল মতুন লিয়ামে খুব বেশি ফাইটিং চলবে না। কাজেই গম্প অন্যভাবে ফাঁসতে হবে। দেড় ঘন্টা লাগবে জট পাকাতে, দেড় ঘন্টা ছাড়াতে।'

'তাহলে ডবল-রোলেই কাষ্টিসিদ্ধি হয়ে যাবে বলছেন ?'

'তা কেন ? আরো আছে। নোট করে নিন।'

লালমোহনবাবু স্বীকৃত করে বুক পকেট থেকে জাল খাতা আর সোনালী পেনসিল বার করলেন।

'লিখন—স্মাগলিং চাই—সোনা হীরে গাঁজা চৰস, যা হোক; পাঁচটি গ্লৈচ সিচুরেশন চাই, তার মধ্যে একটি ভক্তিমূলক হলে ভালো; দুটি নাচ চাই; আন দুটিন পশ্চাধ্যাবন দৃশ্য বা চেজ-সিকুয়েন্স চাই—তাতে অন্তত একটি দামী মোটরগাড়ি পাহাড়ের গ্রাম দিয়ে গাঁড়িয়ে ফেলতে পারলে ভালো হয়; অঙ্গীকার্যের দৃশ্য চাই; নায়কের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নায়িকা এবং ভিলেনের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে ভাস্প বা খল নায়িকা চাই; একটি কর্তব্যবোধসম্পন্ন পুলিশ অফিসার চাই; নায়কের ফ্লাশব্যাক চাই; কার্যক বিলিফ চাই; গম্প বাতে কুলে না পড়ে তার জন্য দ্রুত ঘটনা পরিবর্তন ও দৃশ্যাপট পরিবর্তন চাই; বার কয়েক পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে গম্পকে নিয়ে ফেলতে পারলে ভালো, কারণ এক নাগাড়ে স্ট্রিডওর হিস্ব পরিবেশে শুটিং চিত্ত তারকাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।—বুকছেন ত ?'

লালমোহনবাবু ঝড়ের মতো লিখতে লিখতে মাথা নেড়ে হীরু বুকিয়ে দিলেন।

'আর সব শেষে—এটা একেবারে মাল্টি—চাই হ্যাপি এক্সিল। তার আগে অবিশ্বা বার কয়েক কাজার স্টোত বইয়ে দিতে পারলে শেষেটা জমে ভালো।'

লালমোহনবাবু সেদিনই হাত বাথা হাতে গিয়েছিল। তারপর গম্প নিয়ে আড়া দু ঘণ্টার ধন্তাধৰ্মিততে জান হাতের দ্বিতীয় আঙুলে কঙা পড়ে গিয়েছিল। ভাগিন সে সময়টা ফেলুদার কলকাতার বাইরে কোনো কাজ ছিল না—

কেদার সরকারের রাইজনেক খনের তদন্তের ব্যাপারে ওকে সবচেয়ে বেশি দ্বৰ খেতে ইয়েছিল ব্যারাকপুর—কারণ লালমোহনবাবু সম্ভাবে দ্বৰ করে ফেল্দার কাছে এসে ধর্মী দিচ্ছিলেন। তা সবেও জটিলুর বাত্তশ নম্বর উপনাম 'বোম্বাইয়ের বৈমন্তিক' মহালয়ার ঠিক পরেই বেরিয়ে যাবে। আর গুপ্ত ষে-রকম দ্বৰ্তীর্ডিয়েছিল, তা থেকে ছবি করলে আর যাই হোক, সে ছবি দেখে কোজেপাইরিন খেতে হবে না। হিন্দ ছবির মালমশলা থাকলেও তাতে হিন্দ ছবির ছেড়ে-দে-মা-কেদে বাঁচি বাড়াবাঢ়িটা নেই।

পান্ডুলিপির একটা কাপ পুলক ঘোষালকে আগেই পাঠিয়েছিলেন লাল-মোহনবাবু। দিন দশেক আগে চিঠি আসে বে গুপ্ত পছন্দ হয়েছে, আর দ্বৰ শিগগিরই কাজ আরম্ভ করে দিতে চান পুলকবাবু। চিত্তনাটা তিনি নিজেই করেছেন, আর হিন্দ সংলাপ লিখেছেন প্রভুবন গুপ্তে, যার এক একটা কথা নাকি এক-একটা ধারাজো চাকু, সোজা গিয়ে দর্শকের বুকে বিধে হলে পায়না উড়িয়ে দেয়। এই চিঠির উন্তরে লালমোহনবাবু ফেল্দাকে কিছু না বলেই তাঁর গলেপর দাম হিসেবে পাঁচশ হাজার হাঁকেন, আর তার উন্তরেই আজকের টেলিগ্রাফ। আমার মনে ইল পাঁচশ চেয়ে লালমোহনবাবু যে একটু বাড়াবাঢ়ি করেছিলেন সেটা উনি নিজেই দ্বৰতে পেরেছেন।

গরম চারে চুম্বক দিয়ে অধিবোজা চোখে একটা আঃ শব্দ করে লালমোহন-বাবু বললেন, 'পুলক ছোকু সিখেছিল ষে, গুপ্ত বিশেষ চেঙ করেনি; মোটামুটি আমি—ধূতি, আমরা, যা লিখেছিলাম—'

ফেল্দা ইতুলে লালমোহনবাবুকে ধারিয়ে বলল, 'আপনি বহুবচনটা না ব্যবহার করলেই খুশি হব।'

'কিন্তু—'

'আহা! - শেকসপিয়রও ত অনেক গলেপর সাহাধ্য নিয়ে নাটক লিখেছে, তাখলে তাকে কি কেউ কখনো "আমাদের হ্যামলেট" বলতে শুনেছে? কখনো না। উপাদানে আমার কিছুটা কন্ট্রিবিউশন থাকলেও, পাঁচক ত আপনি। আপনার মতো হাতের তার কি আর আমার আছে?'

লালমোহনবাবু কৃত্ত্বাত্মক কল অর্ধধ হেসে বললেন, 'থ্যাকে ইউ সয়ে! — যাই হোক, যা বলছিলাম। কেবল একটি হাত মাইনর চেঙ করেছে গলেপ।'

'কিরকম?'

'সে আর বলবেন না যশাই। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি শুনলেই বলবেন টেলিপার্সি। হয়েছে কি, আমার গলেপের স্মাগলার চুন্দিয়াম ধ্যানধরের বাস-প্রান হিসেবে একটা ত্রুটিমুলক তলা বাড়ির একটা ঝামটের উল্লেখ করেছিলাম। আপনি খুটিমাটির ওপর মজুর দিতে বলেন, তাই বাড়িটা একটা নামও দিয়ে-

ছিলুম—শিবাজী কাস্ত। বোম্বাই ত—তাই ঘহারাষ্ট্রের জাতীয় বীরপুরুষের নামে বাড়ির নামটা বেশ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়েছিল। ওমা, পদ্মক লিখলে ওই নামে নাকি সত্তাই একটা উচ্চ ফ্রাট্যার্ডি আছে, আর তাতে নাকি ওর ছবির প্রোডিউসার নিজেই থাকেন। বলুন, একে টেলিপ্যার্থ ছাড়া আর কী বলবেন?’

‘কুঁ-ফুঁ থাকছে, না বাদ?’ ফেলুদা জিগোস করল।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে এন্টার দ্য ভ্যাগন দেখার পর থেকেই লাল-মোহনবাবুর ঘাথায় ঢুকেছিল যে গল্পে কুঁ-ফুঁ মোকাবৈন। ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বললেন, ‘আলবৎ থাকছে। সেটার কথা আমি আলাদা করে জিগোস করেছিলুম; তাতে লিখেছে ম্যাজ্রাস থেকে স্পেশালি কুঁ-ফুঁ-র জন্য ফাইট মাস্টার আসছে। বলে নাকি হংকং-টেলড।’

‘শুটিং শুরু কবে?’

‘সেইটে জিগোস করে আজ একটা চিঠি লিখছি। জনার পর আমাদের যাবার তারিখটা ফিরু করব। আমাদের—খুড়ি, আমার গল্পের শুটিং শুরু হবে, আর আমরা সেখানে থাকব না সে কী করে হস মশাই?’

ভায়ম্প্তি এর আগেও খেয়েছি, কিন্তু আজকে যতটা ভালো লাগল তেমন আর কোনোদিন লাগেনি।

পরের রবিবার আবার লালমোহনবাবুর আবির্ভাব। ফেল্দু আগে থেকেই টিক করে রেখেছিল ভদ্রলোককে অর্ধেক খরচ অফার করবে, কারণ ওর নিজের হাতেও সম্প্রতি কিছু টাকা এসেছে। শুধু কেস থেকে নয়; গত তিন মাসে ও দুটো ইংয়াজি বই অনুবাদ করেছে—উনবিংশ শতাব্দীর দ্রুজন বিষয়াত পর্ট-টেকের প্রমাণ কাহিনী—দুটোই ছাপা হচ্ছে, আর দুটো থেকেই কিছু আগাম টাকা পেয়েছে ও। এর অগেও অবসর সময় ফেল্দুকে মাঝে মাঝে লিখতে দেখেছি—কিন্তু আদা-নুন থেয়ে লিখতে লাগা এই প্রথম।

লালমোহনবাবু অবিশ্ব ফেল্দুর প্রস্তাৱ এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'থেপেছেন? লেখার ব্যাপারে আপৰ্নি এখন আমাৰ গাইড আৰ্ড গড়ফাদাৰ। এটা হল আপনাকে আমাৰ সম্মান দৰ্শনা।'

এই বলে পকেট থেকে দুটো মেলনের টিকিট বাই করে ডেইবলের উপর রেখে বললেন, 'মঙ্গলবাৰ সকাল দশটা পঁয়তালিশে ফ্লাইট। এক ষষ্ঠী আগে রিপোর্ট টাইম। আমি সোজা দমদমে গিয়ে আপনাদেৱ জন্য ওয়েট কৰব।'

'শুটিং আৱশ্য হচ্ছে কৰে ?'

'বিষদ বাৰ। একেবাৰে ক্লাইম্যাক্সেৰ সৈন। সেই টেন, মোটৰ আৱ ঘোড়াৰ ব্যাপারটা।'

এ ছাড়াও আৱেকটা খবৰ দেবায় ছিল লালমোহনবাবুৰ।

'কাল সন্ধিবেলা আৱেক ব্যাপাৰ মশাই। এখনকাৰ এক ফিলিম প্ৰোডিউসাৰ—ধৰমতলায় আৰ্পস—আমাৰ পাৰ্লিশাৱেৰ কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় কৰে সোজা আমাৰ বাড়িতে গিয়ে হাজিৰ। সেও "বোম্বাইয়েৰ বোম্বেটে" ছৰ্ব কৰতে চায়। বাঙ্গ বাঙলায় হিন্দু টাইপেৰ ছৰ্ব মা কৰলে আৱ চলছে না। গুৰু বিক্রি হয়ে গেছে শৰ্মনে বেশ হতাশ হচ্ছ। বইটা অবিশ্ব উনি নিজে পড়েন নি: ওৱ এক ডাগনে পড়ে ওকে বলেছে। আমি বোম্বাই না যে মাৰে-ৰ গাইড ট্ৰাইন্ডৱা আৱ ফেল্দু মিৰ্জুৱেৰ গাইডেস ছাড়া এ কাজ হত না।'

'ভদ্রলোক বাঙালী ?'

'ইয়েস সনার। বাবেন্দু। সনাল। কথায় পঁচিম টান আছে। বললেন জন্মলপুৰে মানুষ। গামৈ উগ্র পারফিউমেৰ গুৰু। নাক জন্মলে যাস্ব মশাই।

পুরুষ মানুষ এভাবে সেন্ট মাঝে এই প্রথম এক্সপ্রেসিয়েন্স করলুম। যাই হোক, আমি চলে যাচ্ছি শুনে একটা ঠিকানা দিয়ে দিলোন। বললেন, “কোনো অসুবিধে হলে একে ফোন করতে পারেন। আমার এ বন্ধুটি খুব হেল্পফুল।”

কলকাতায় ডিসেম্বরে বেশ শীত পড়লেও বন্ধেতে নাকি তেমন ঠাণ্ডা পড়ে না। আমদের ছোট দুটো স্কটকেসেই সব মানেজ হয়ে গেল। মঙ্গলবার সকালে উচ্চ দৈর্ঘ্য কুয়াশার রাস্তার ওপারে পন্টুদের কাড়িটা পর্যন্ত ভালো করে দেখা আছে না। শেন ছাড়বে ত? আশ্চর্য, নটার মধ্যে সব সাফ হয়ে গিয়ে বক্রকে রোস উচ্চ গেল। তি আই পি রোডে এমনিতেই শহরের ঢেয়ে বেশি কুয়াশা হয়, কিন্তু আজ দেখলাম তেমন বিছু নয়।

এয়ারপোর্টে যখন পেঁচলাম তখন শেন ছাড়তে পাপ্তাশ মিনিট বাকি। লালমোহনবাবু আগেই হাজির। এমন কি বোর্ডিং কার্ডও দেখলাম উকি মারছে পকেট থেকে। বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না, ফেল্বাবু—লম্বা কিউ দেখে ভাবলুম যদি জানলার ধারে সীট না পাই, তাই আগেভাগেই সেরে রাখলুম। এইচ রো—মেথুন হয়ত দেখবেন কছাকাছি সীট পেয়ে গেছেন।’

‘আপনার হাতে গো কী? কী বই কিম্বোন?’

লালমোহনবাবুর বগলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট দেখে আমার মনে হচ্ছিল উনি নিজের ধৈ সঙ্গে নিয়ে আছেন ওখানে কাউকে দেবেন বলে। ফেল্বাবুর প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোক বললেন, ‘কিনব কী মশাই; সেই সামাজি—সেদিন যাব কথা বলেছিলাম—সে নিয়ে গেল এই মিনিট দশেক আগে।’

‘উপহার?’

‘নো সার। বন্দে এয়ারপোর্টে লোক এসে নিয়ে যবে। আমার নাম-যার তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কোন্ এক আস্ত্রীয়ের কাছে যাবে এ বই? তারপর একটু হেসে বললেন, ইঁরে—একটা বেশ আভিভেদারের গন্ধ প্যাচেন না?’

‘পাওয়া মুশ্কিল’, বলল ফেল্বাবু, ‘কারণ ভারত কেমিকালস-এর গুলি-বাহার সেন্টের গন্ধ আর সব গন্ধকে স্লান করে দিয়েছে।’

গন্ধটা আমিও পেয়েছিলাম। সাম্যাল মশাই এমনই সেন্ট মার্কে-য়ে তার স্বাস এই প্যাকেটে পর্যন্ত লেগে রয়েছে।

‘যা বলেছেন স্বার, হাঃ হ্যাঃ’, সায় দিলেন জস্টিস। ‘তবে অনেক সময় শুনিচ এইভাবে জোকে উচ্চটাপালটা ভিনিসও চালান্ত দেক্কে?’

‘সে ত বটেই। বুকিং কাউটারে ত মোটিসই় আগামো আছে যে অচেনা লোকের হাত থেকে চালান দেওয়ার জন্য কোনো ভিনিস নেওয়াটা বিপজ্জনক। অবিশ্বাস এ ভদ্রলোককে টেক্সিকালি ঠিক অচেনা বলা চলে না, আর প্যাকেটটা ও

ৈ বইয়ের সেটা সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখিছ না।'

শ্বেনে তিনজনে সাশাপাশি জয়গা পেলাম না; লালমোহনবাবু আমাদের তিনটে সারির পিছুমে জানলার ধরে বসলেন। ফাইটে বলবার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। কেবল লাউডপ্রীফারে ক্যাপ্টেন দ্বন্দ্ব মখন বলছেন আমরা নাগপুরের উপর দিয়ে যাচ্ছি, তখন পিছন ফিরে দেখি পালমোহনবাবু সীটি ছেড়ে উঠে শ্বেনের স্যাডের দিকটার চলেছেন। শ্বেটার একজন এয়ার হোসটেস ও কে দামিরে উল্টো দিক দেখিয়ে দিতে ভদ্রলোক আবার সারা পথ হেঁটে সোজা পাইলটের দরজা খুলে কক্ষপিটে ঢুকে তক্ষণ বেরিয়ে এসে কিন্তু কেটে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। নিজের সীটে ফেরার পথে আমার উপর ঝুকে পড়ে কানে ফিস্ক ফিস্ক করে বলে গেলেন, 'আমার পাশের লোক-টিকে এক কলক দেখে নাও। হাই-জাকার হলে অশ্চর্য হব না।'

মাথা ঘূরিয়ে দেখে ব্যবসাম জটায়, আজড়েশ্বারের জন্যে একেবারে হনো হয়ে না থাকলে ওরকম নিরীহ, মেই-থ্রুনি মানুষটাকে কঙ্কনে হাই-জাকার ভাবতেম না।

স্যাল্টো কুজে শ্বেন লাপ্টো করার ঠিক আগেই লালমোহনবাবু ব্যাগ থেকে বইটা বার করে রেখেছিলেন। ভোয়েসিটিক লাউঞ্জে ঢুকে আমরা তিনজনেই এদিক ওদিক দেখিছি, এমন সময় 'মিস্টার গাঙ্গুলী?' শুনে ডাইনে ঘৰে দেখি গাঢ় লাল রঙের টেরিনিলনের সার্ট পরা একজন লোক মাদুজী টাইপের এক ভদ্রলোককে প্রশ্নটা করে তার দিকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছে। ভদ্রলোক একটু ধৈন বিরত ভাবেই মাথা নেড়ে মা বলে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও বই হাতে লাল সার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আই অ্যাম মিস্টার গাঙ্গুলী অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম মিস্টার সান্ডাস', এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন জটায়।

লাল সার্ট বইটা নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ধনবাদ জানিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও কর্তব্য সেবে নিশ্চিন্তে হাত কাড়লেন।

আমাদের গাল বোরাতে লাগল আধ ঘন্টা। এখন একটা বেজে কুড়ি, শহরে পেরীচৰতে পেরীচৰতে হয়ে যাবে শ্রায় দুটো। পুরুক ঘোষল গাড়ির নম্বরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই, দেখলাম সেটা একটা গেরুয়া রঙের স্ট্যান্ডার্ড। ফাইভারটি বেশ শোখিম ও ফিটফাট; হিন্দি ছাড়া ইংরেজিটা ও মোটামুটি জানে। কলকাতার তিনজন আচেনা জ্বালের জন্য ভাড়া খাটতে হচ্ছে বলে কোনোরকম বিবৃতির ভাব দেখলাম না। বরং লালমোহনবাবুকে যেরকম একটা সেলাম ঠুকল গোতে মনে হল কাজটা পেয়ে সে কৃতার্থ। ভাইভারই খবর দিল বৈ

শহরের ভিতরেই শালিমার হোটেলে আমাদের পাকার বল্দোবস্ত হয়েছে, আর পুলকবাবু বিকেল সভে পাঁচটাৰ সময় হোটেলে এসে আমাদেৱ সঙ্গে দেখা কৰিবেন। গাড়ি আমাদেৱ জন্ম রাখা থাকবে, আমৰা বখন খুশি যেখানে ইচ্ছা যেতে পাৰি।

ফেল্দা অবিশ্য এখানে আসবাৰ আগে ওৱা অভ্যাস মতো বস্বে সম্বন্ধে পড়াশুনা কৰে নিয়েছে। ও বলে কোনো নতুন জায়গাৰ আসৱ আগে এ জিনিসটা কৰে না নিলে নাকি সে জায়গা দুৱেই থেকে যায়। মানুষৰ হৰেন একটা পৰিচয় তাৰ নামে, একটা চেহারাৰ, একটা চৰিত্ৰে আৱ একটা তাৰ অতীত ইতিহাসে, ঠিক তৰ্মান নাকি শহৱেৰও। বস্বে শহৱেৰ চেহারাৰ আৱ চৰিত্ৰ এখনো ফেল্দাৰ জানা নৈই, তবে এটা জানে যে শালিমার হোটেল হল কেপস কৰ্মানৰে কাছে।

আমাদেৱ গাড়ি, হাইওয়ে দিয়ে গিয়ে একটা বড় রাস্তায় পড়াৰ সঙ্গে সঙ্গে ফেল্দা ভ্রাইভারকে উদ্দেশ্য কৰে বলল—'উয়ো ষো ট্যাঙ্কি হায় না—এম আৱ পি পি কাইভ পি এইট—উস্কো পিছে পিছে চল্লা।'

'কৈ ব্যাপ্তাৰ মশাই?' লালমোহনবাবু জিগোস কৰিবেন।

'একটা সামান্য কৌতুহল', বলল ফেল্দা।

আমাদেৱ গাড়ি একটা স্কুটাৰ আৱ দৃঢ়ে অ্যাম্বাসড়াৰকে ছাড়িবৰ ফিয়াট ট্যাঙ্কিটাৰ ঠিক পিছনে এসে পড়ল। এবাৱ ট্যাঙ্কিটাৰ পিছনেৰ কাঁচ দিয়ে দেখ-লায় ভিতৰে বসা লাল টেরিলিনেৰ সাটে।

একটু যেন বুকটা কেপে উঠল। কিছুই হয়নি, কেন ফেল্দা ট্যাঙ্কিটাৰকে ধাওয়া কৰছে তাৰ জানি না, তবু ব্যাপাৰটা আমাৰ হিসেবেৰ বাইৱে বলেই বেন একটা রহস্য আৱ অ্যাভেণ্টোৱেৰ ছেঁয়া জাগল। লালমোহনবাবু অবিশ্য আজকাল ধৰেই নিয়েছেন যে ফেল্দাৰ সব কাজেৰ মানে জিগোস বৰৱে সব সময়ে সঠিক উন্নত পাওয়া যাবে না; বথাসময়ে আপনা দেকেই সেটা জানা যাবে।

আমাদেৱ গাড়ি দিবিয় ট্যাঙ্কিটাৰকে ঢোকে হৈথে চলেছে, আৱৰাণি নতুন শহৱেৰ রাস্তাখাট লোকজন দেখতে দেখতে চলেছি। একটা জিনিস বলতেই হবে—হিন্দি ছবিৰ এত বেশি আৱ এত বড় বড় বিজ্ঞাপন আৱ কোক্স/শহৱেৰ রাস্তাৰ দৰ্চনি। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ধৰে ঘড়ি ফিরিয়ে হিন্দিৰে সেগুলো দেখে বললেন, 'সবাইয়েৰ নামই ত দেখছি, অৰ্থাৎ কাহুনীকুৱেৰ নামটা যেন ঢোকে পড়ছে না। এৱা কি গুৰু লেখাৰ না কাউকে দিয়ে?'

ফেল্দা বলল, 'গুৰু লেখক হিসেবে নাম ঘাঁটি আশা কৰেন তাহলে বস্বে আপনাৰ জায়গা নয়। এখানে গুৰু লেখা হয় না, গুৰু তৈৰি হয়, মানুষ্যাকচাৰ হয়—হৰেন বাজাৱেৰ আৱ পাঁচটা জিনিস মানুষ্যাকচাৰ হয়। লাক্ষ সাধাৰণ

কে তৈরি করেছে তার সময় কি কেউ জানে?—কোম্পানির নামটা হয়ত জানে। টাকা পাঞ্জেন, বাস্ক, অথর্টি বন্ধ করে বসে থাকুন। সম্মানের কথা ভুলে যান।'

'হ্যাঁ...।' লালমোহনবাবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। 'তাহলৈ মান হল গিরে আপনার বেঞ্জালে, আর বস্বেতে হচ্ছে যান?'

'হ্যাঁ 'কথা', বলল ফেলুন।'

ফেলুন যে-এলাকাটাকে মহাশেখনী বলে বলল, সেটা ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে আমাদের মার্কাম্বাড়া ট্যাঙ্কিটা একটা ভান দিকের বাস্তা থাল। আমাদের জ্বাইভার বলল যে শবলিমার হোটেল যেতে হলে আমাদের সোজাই যাওয়া উচিত।

ফেলুন বলল, 'আপ দাঁয়া চালিয়ে।'

ভান দিকে যাবার মিনিট দু'এক যেতেই দেখলাম ট্যাঙ্কিটা বাঁ দিকে একটা গেটের ভিতর ঢুকে গেল। ফেলুনার নির্দেশে আমাদের গাড়ি গেটের বাইরেই থামল। আমরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নামলাম, আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই হিঁক করে একটা অস্তুত শব্দ করলেন।

কারণটা পরিষ্কার। আমরা একটা বিরাট ঢাঙ্গা ধাঁড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি, তার তিন তলার হাইটে বড় বড় উঁচু উঁচু কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা—শিবাজী কাস্ত্র।

নামটা দেখে আমার এত অবাক লাগল যে, 'কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। এ বে টেলিপার্সের ঠাকুরদাদা !'— বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা চুপ। দেখলাম ও শুন্দু বাড়িটাই দেখছে না, তার আশপাশটাও দেখছে। বাঁ দিকে পূর পূর অনেকগুলো বাড়ি, তার কোনোটাই বিশ্বাস কম না। ডানদিকের বাড়িগুলো নিচু আর প্রুণ, আর সেগুলোর ফাঁক দিয়ে পিছনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

ড্রাইভার একটু ফেন অবাক হয়েই আমাদের হাবভাব লক্ষ করছিল। ফেলুদা তাকে অপেক্ষা করতে বলে সোজা গেটের ভিতর দিয়ে চুকে গেল। আমি আর লালমোহনবাবু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট ভিত্তেক পরেই ফেলুদা বেরিয়ে এল।

'চলিয়ে শালিমার হোটেল !'

আমরা আবার রওনা দিলাম। ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিষ্ঠে বলল, 'খুব সম্ভবত সেভেনিটিন্স জ্বারে, অর্পাং আঠারো তলায়, গেছে আপনার বইয়ের প্যাকেট।'

'আপনি ষে ভেস্কি দেখালেন মশাই', বললেন লালমোহনবাবু, 'এই তিনি মিনিটের মধ্যে অত বড় বাড়ির কোন তলায় গেছে লোকটা সেটা জেনে ফেলে দিলেন ?'

'আঠারোতলায় গেছে কিনা জনবাবুর জন্য আঠারোতলায় ওঠার দরকার হয় না। একতলারে লিফ্টের মাথার উপরেই 'বোর্ড' নম্বর লেখা থাকে। যখন পৌঁছলাম তখন লিফ্ট উঠতে শুরু করে দিয়েছে। শেষ ষে নম্বরটার বাতি জ্বলে উঠল, সেটা হল সতেরো। এবার বুঝেছেন ত ?'

লালমোহনবাবু দাঁঁঘর্শনাস ফেলে বললেন, 'বুঝলুম ত। এত সহজ আপারেট আমাদের মাথায় কেন আসে না সেটাই ত বুঝি না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শালিমার হোটেলে পৌঁছে গেলাম। ফেলুদা আর আমার জন্য পাঁচতলায় একটা ডাব্ল রুম, আর লালমোহনবাবুর জন্য ওই একই তলায় আমাদের উলটো দিকে একটা সিঙ্গল। অম্বাদের ঘরটা রান্তির দিকে, জানাজা দিয়ে নিচে চাইলেই অবিরাম গাড়ির ঝোত, আর সামনের দিকে চাইলে দুটো জ্যাঙ্গা বাড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে সমুদ্র। বন্দে বে একটা গমগমে

খন !

'সে কি !'—আমরা তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম। থেরে হুস্বার্ট অব ন—এই দুটো পর পর জুড়লে অপনা থেকেই যেন শিউরে উঠতে হয়।

'আমি খুব পাই এই আধুনিক্য আগে', বললেন প্লেকবাবু। 'ও বাড়তে ত আমার ক্লেচুলার সাতায়াত মশাই ! মিস্টার গোরেও শিবাজী কাসলেই থাকেন— যারো অস্বীকৃত জ্ঞানে ! সাথে কি আপনার গম্পে বাড়ির নাম চেঞ্চ করতে হবেছে ! অবিশ্য উনি নিজে খুব মাইজ্যার লোক।—আপনারা বাড়ির ভেতরে গেসলেন নাকি ?'

'আমি গিয়েছিলাম,' বলল ফেলুদা, 'লিফটের দরজা অবধি !'

'ওরেল্বাকা ! লিফটের ভেতরেই ত খন ! জাশ স্মাকে হুর্মান এখনে। দৈবতে গুড়া টাইপ। তিনটে নাগাং তাগরাজন বলে ওখানকারই এক বাসিন্দা তিন-তলা ছেকে লিফটের জন্য বেল চেপে। লিফট ওপর থেকে নিচে মেঝে আসে। ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই দেখেন এই অস্ত্র। পেটে ছেরা মেরেছে মশাই ! হরিব্ল ব্যাপার !'

'ওই সময়টায় লিফটে কাউকে উঠতে-টুঠতে দেখেন কেউ ?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'লিফটের আশেপাশে কেউ ছিল না। তবে বিল্ডিং-এর বাইরে দৃঢ়জন ড্রাইভার ছিল, তারা ওই সময়টায় পাঁচ-ছ'জনকে ঢুকতে দেখেছে। তার মধ্যে একজনের গাঁথে লাল সার্ট, একজনের কাঁধে ব্যাগ আর গাঁথে খয়েরির বাণের—'

ফেলুদা হাত তুলে প্লেকবাবুকে থামিয়ে বলল, 'ওই শিউরীয় বাণিটি স্বরং আমি, কাজেই আর বেশ বলার দরকার নেই !'

আমার কাকের ভিতরটা খড়াস করে উঠেছে। সর্বনাশ !—ফেলুদা কি খনের মামলায় জড়িয়ে পড়বে নাকি ?

'এনিওয়ে', আশ্বাসের স্বরে বললেন প্লেক ঘোষাল, 'ও নিরে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনিও না সজুদ্দা। আপনার গম্পে শিবাজী কাসলে স্মাগলার থাকে শিখেছেন, তাতে আর ভয়ের কি আছে বল্দুন। বস্বের কোন্ত অ্যাপর্টমেন্টে স্মাগলার থাকে না ? মিসায় আর কটাকে থরেছে ? এ তো সবে খোস্য ছাড়নো চলছে এখন, শাস্ব পৌছুতে অনেক দৈরি। সাবা শহরটাই ত স্মাগলিং-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে !'

ফেলুদাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তবে সে ভাবটা কেটে গেল আরেকজন জোকের অবিভীক্ষ্য। শিউরীয় টোকার শব্দ হতে প্লেকবাবুই চেরার ছেড়ে 'এই বোধহয় ভিকটর' বলে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। চাকুকের মতো শরীরওয়ালা মাঝারি হাইটের একজন শোক ঘরে ঢুকল।

‘পরিচয় করিয়ে দিই লালদু—ইনি হলেন ভিক্টর পেরুমল—ইংকং-ট্রেনড
কুং-ফু এঙ্গপার্ট’।

ভদ্রলোক দীর্ঘ খোলতাই হেসে আমাদের সকলের সঙ্গে হাস্তশেক
করলেন।

‘ভাঙা ভঙা ইংরিজ বলেন,’ প্লকবাবু বললেন, ‘আর হিন্দি ত বলেই,
যদিও ইনি ধর্মীয় ভাবতের মোক। আর ঈম শুধু কুং-ফু শেখাব না, এ’র
স্টার্টেরও জবাব নেই। যোড়া থেকে চল্লিত প্রনের উপর লাঁকয়ে পড়ার ব্যাপারটা
হিরোর ভাইয়ের মেক-আপ নিয়ে ইনিই করবেন।’



আমার ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল। হাসি-
টার মধ্যে সতিই একটা খোলসা ভাব আছে। তার উপরে স্টার্টম্যান শুনে
ভদ্রলোকের উপর একটা ভক্তিভাবও জেগে উঠল। যারা সামান্য কঠো টাকার
জন্য দিনের পর দিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, আর তার ক্ষম্য ধাহুবা নিয়ে
যায় প্রক্রিয়া-দেওয়া হিরোগুলো, তাদের সামান বলতেই হয়।

ভিক্টর পেরুমল বললেন তিনি শুধু কুং-ফু ই অন্যেন না—‘আই মো
মোকাইর অলসো।’

মোকাইর? সে অবাবের কী? ফেল্দার বেঞ্জান, ও-ও বজল জানে
না; আর লালমোহনবাবুর কথা ত ছেড়েই দিলাম; কারণ তিনি নিজের জেক

ছাড়া বিশেষ কিছু প্রক্রিয়া-টেক্নিক না।

প্রেরণাল বলল, স্নেকাইরি হচ্ছে নাকি এক-রকম ফাইটিং যেটা করার জন্য পা শুন্মো তুষ হতে হাটিতে হয়। এটা নাকি ইংক-এ চালু হয়েছে মাঝ মাস ছয়েক হলু, এবিং জনস্থান জাপান।

‘কিংবা বয়েছে নাকি ছবিতে?’ লালমোহনবাবু যেন কিংবুৎ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। প্রলক ঘোষাল হেসে গাথা নাড়লেন। ‘এক কুৎ-ফু-র টেক্সেই আগে সামলাই। এগারোজন লোককে সকাল-বিকেল ট্রেইনিং দিতে হচ্ছে সেই নতুনবাবের গোড়া থেকে। আপনি ত লিখে থালাস, ধূঁত্ব ত পোয়াতে হচ্ছে আমাদের। অবিশ্ব আপনারা ধৈ শুটিংটা দেখবেন তাতে কুৎ-ফু নেই। এতে দেখবেন স্টার্টম্যানের খেজা।...ক্রাস ছবি হবে আপনার গম্পো থেকে লালুদা—কুছ পরোয়া নেই।’

প্রলক ঘোষাল আর ভিকটুর চালে ঘাবার পর ফেলুদা সোফা হেডে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ট্যাফিলকের শব্দে ঘর ভরে গেল। অবিশ্ব পাঁচতলা ইওয়াতে তার জন্য কথা বলতে অস্বিধা হচ্ছিল না। আসলে আমাদের ক্যারুলই এয়ারকন্ডিশনিং-এর অভোসও নেই, ভালোও লাগে না। বাইরের শব্দ আসুক; তার সঙ্গে থাঁটি বাতাসটাও ত ঢুকছে।

আমালা থেকে কিরে এসে সেফায় বসে ফেলুদা একটু যেন গন্তব্যভাবেই বলল, ‘লালমোহনবাবু, আজডেশ্টারের গম্পটা যেবুকম উপ্প হয়ে উঠছে সেটা বেশ অস্বিশ্বকর। আপনি ওই প্যাকেটটা চালানের ভাব না নিলেই পরতেন। আমি এবিং তখন থাকতাম, তাহলে আপনাকে বারণ করতাম।’

‘কী করি বলুন?’ লালমোহনবাবু কাঁচমাচ হয়ে বললেন, ‘ভদ্রলোক বললেন, আমি এর পর যে গলপটা লিখব সেটা যেন শুরু জন্য রিজার্ভ করে রাখি। তারপরে আর কী করে না বলি বলুন।’

‘বাপারটা কী জানেন? এয়ারপোর্টে ব্যবন সিকিউরিটি চেক হয়, তখন নিয়ম হচ্ছে প্যাসেঞ্জারের কাছে মোড়ক জাতীয় কিছু থাকলে সেটা খুলে দেখা। আপনাকে নিরাহী মনে করে আপনার বেলা সেটা আর করেনি। খুললে কী বেরোত কৈ জানে? ওই প্যাকেটের সঙ্গে যে শুই খুলের সম্বন্ধ নেই তা কে বলতে পারে?’

লালমোহনবাবু গল্পা থাঁকবে মিনিমিন করে বললেন, ‘কিম্বু একটা বইয়ের প্যাকেটে আর...’

‘বই ম্যানেই হে বই তা ত নাও হতে পারে। আংটির মধ্যে বিষ রাখার বাবস্থা থাকত বাজদবাদশাসের আঘাত সেটা জানেন? সে আংটিক শুধু

আংটি বললে কি ঠিক হবে? আংটিও বটে, বিষাধারও বটে!... যাক, আপনার
কর্তব্য যখন নির্বিঘ্নে সারা হয়ে গেছে, তখন আপনার নিজের কোনো বিপদ
নেই বলেই থানে হচ্ছে।

‘বজাহন?’ লালমোহনবাবুর মুখে একক্ষণে হাসি ফুটেছে।

‘বলছি বৈকি’, ফেল্দুদা বলল। ‘আরে আপনার বিপদ মানে ত আমাদেরও
বিপদ। এক সুতে বাঁধা আছি মোরা তিনজনায়। সুতোর টান পড়লে তিন-
জনেই কান্ত।’

লালমোহনবাবু এক ঝটিকাস খাট থেকে উঠে বাঁ পা-টাকে কুঁফুর গল্প
করে শুন্যে একটি লাঁথ মেরে বললেন, ‘স্তু চিয়ারন কর দ; প্রী হাস্কের্টিয়ারস!—
হিপ হিপ—’

ফেল্দুদা আর আর্মি লালমোহনবাবুর সঙ্গে গলা ঘেলালাম—

‘হুৱুৱে!

সম্ভাৰ হটী নামে আমৰা হোটেল থেকে বেৰিয়ে পড়লাম। পাইৰ হেটেল
ঘূৰে না দেখলে নতুন শহৰ দেখা হয় না এটা আমৰা তিনজনেই বিশ্বাস কৰি।
বোধপূৰ, কাশী, দিল্লি, গ্যাংটক—সব জায়গাতেই আমৰা এ জিনিসটা
কৰেছি। বস্বেতেই বা কৰব নো কেন?

হোটেল থেকে বেৰিয়ে ভানুদিকে কিছু দূৰ গোলেই থাকে কেন্দ্ৰস কৰ্ণার
বলে সেখানে একটা দৃৰ্দলত ফাই-ওভাৰ পড়ে। প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড তাগড়াই
আমৰ উপৰ দিয়ে বিজেৰ ঘতো রাস্তা, তাৰ উপৰেও প্র্যাক্টিক, নিচেও প্র্যাক্টিক।
আমৰা বিজেৰ কলা দিয়ে রাস্তা পেৰিয়ে গিবস রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে
চলেছি। ফেল্দা ভানুদিকে দেখিয়ে দিল পাহাড়ৰ গা দিয়ে হ্যাঁগৎ গার্ডনস
ঘাৰৰ রাস্তা। এই পাহাড়ৰ নামই মালাবাৰ হিলস।

মাইলখানেক এগিয়ে যেতে সামনে সমৃদ্ধ পড়ল। আৰ্পস ফেঁত গাঁড়ৰ
স্বোত এড়িয়ে রাস্তা পেৰিয়ে এক কোমৰ উঁচু পাথৰেৱ পাঁচলেৰ ধাৰে
গিয়ে দাঁড়ালাম। পাঁচলেৰ পিছন দিক সমৃদ্ধৰ জল এসে আছড়ে আছড়ে
পড়ছে।

ৰাস্তাটো বাঁদিক দিয়ে সোজা পুৰে চলে গিয়ে গেল হয়ে ঘূৰে শেষ
হয়েছে সেই একেবাৰে দক্ষিণে যেখানেৰ আকাশছৰ্ছিয়া বাঁড়িগুলো ঝপসা
হয়ে আছে বিকেলেৰ পড়ন্ত রোদে। ওই ধন্দকেৰ ঘতো রাস্তাটো নাকি
ম্যারিন ড্রাইভ।

লালমোহনবাৰু বললেন, 'আগলোৱাই বল্দুন আৰ যাই বল্দুন—পাহাড় আৰ
সমৃদ্ধ হিলসে বস্বে একেবাৰে চামিপয়ন শহৰ মশাই।'

পাঁচলেৰ ধাৰি দিয়ে আমৰা ম্যারিন ড্রাইভেৰ দিকে এগোতে লাগলাম।
ৰাঁ দিক দিয়ে পিংপড়েৰ সারিৰ ঘতো গাঁড় চলেছে। কিছুক্ষণ হাঁটাৰ পৰ
লালমোহনবাৰু আৱেকটা মুক্তবা কৰলেন।

'এখানে বোধহয় সি এম ডি এ নেই; আছে কি?'

'ৱাস্তৱ থানাখন্দ সেই বলে বলাচেন ত?'

'এয়াৱপোট' থেকে আসোৱ সময়ই লক্ষা কৰছিলুম যে গাঁড়তে চলেছি,
অগ্র লাজাছি না। অবিশ্বাস্য!'

কিছুক্ষণ থেকেই সমৃদ্ধৰ ধাৰে একটা জায়গায় ভিড় শৰ্ক্ষা কৰাইলাম।

ব্রহ্মন র্বিবার আগামের শহীদ মিনারের নিচে হয়, অনেকটা সেই রকম। আরো কাছে যেতে ফেলুন বলল ভায়গাটাৰ নাম ছোপাট্ট। এখানে রোজই নাকি রথের মেলাৰে হতো ভিড় হয়। সারবাধা দোকান, দেখেই হন ফুচকা বা লেপপুরী বা আইসক্রীম বা ওই জাতীয় কিন্তু বিক্রী হচ্ছে।

তুমে কাছে এসে বুঝলাম আলজে ভুল কৰিন। মেলাৰ হতো মেলা হতো। অর্ধেক বছৰে শহৰ ভেঙে পড়েছে এখানে। লালমোহনবাবু শিংগৱাই রিচ ম্যান হচ্ছেন, তাই ও'র ঘাড় ভাঙতে দোষ নেই। তিনজনে হাতে ভেল-পুরীৰ ঠোঙা নিয়ে ভিড় আৰ হৈছে মেলাড় ছেড়ে এগিবলৈ গিয়ে মনুজ্জীৰ ধারে ধার্মিক উপৰ বসলাম। ঘড়িতে পৌনে সাতটা, কিন্তু এখনো আকাশে গোলাপী রঙ। আগামের হতো অনেকেই বালিৰ উপৰ বসে আৰাম কৱছে। লালমোহন-বাবু খাওয়া শৈষ কৰে হাত নেড়ে একটা সংস্কৃত শ্পেক আওড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন। বী দিকে বসে থাকা সোকজনেৰ মধ্যে কাৰুৰ হাত থেকে একটা ধৰণেৰ কাগজ উড়ে এসে ভদ্রলোকেৰ মুখেৰ উপৰ জেপটে গিয়ে কথা বন্ধ কৰে দিবেছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে নামটা দেখে লালমোহনবাবু সবে 'ইভনিং নিউজ' কথাটো বলেছেন, এমন সময় ফেলুন্দা তাঁৰ হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল।

'নামটা পড়লেন, আৰ তাৰ নিচে হেড-লাইনট' চোখে পড়ল না ?'

আবৰ্যা তিনজনে একসেগে কাগজটাৰ উপৰ বস্কে পড়লাম। হেডলাইন হচ্ছে—'মার্ডাৰ ইন ডাপার্টমেন্ট লিফ্ট', আৰ তাৰ লিচাই হ্যে খন হৱেছে তাৰ হৰি। যাক-- এ তাহলে আগামের সালশার্ট নয়।

ব্যবৰে বলছে খনটা হৱেছে দুটো থেকে আড়াইটোৰ মধ্যে। খনী এখনো ধৰা পড়োনি, তবে পুঁশিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। যে খন হৱেছে তাৰ নাম মঙ্গলমুখী শেষটী। চোৱাকাৰবাৰীদেৰ সঙ্গে যন্ত্র ছিল, বেশ কিছুদিন থেকেই পুঁশিশ খনুজছে। লিফ্টে বেশ হৰুতাৰ্ধন্ত হৱেছিল তাৰও নাকি প্রয়োগ পাওয়া গেছে। কুয়াৰ মধ্যে নাকি এক টুকুৱে কাগজ পাওয়া গেছে ম্তদেহেৰ পাশে। কাগজে একজনেৰ নাম ছিল। নামটা হচ্ছে—

'ও আৰ আৰ আৰ আৰ...'

একটো অস্তুক গোঁড়ানি-টাইপেৰ শব্দ লালমোহনবাবুৰ গলা দিয়েপৰেৱাল। ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে ষেতে পাৱেন ঘনে কৱে আৰি তাড়াতাঁড়ি ও'কে জাপটে ধৰলাম। অবিশ্বা এৱকম কৱাৰ ঘণ্টেট কাৰণ ছিল। ইভনিং নিউজ স্থিত চিৰকুটে লেখা ছিল—'মিষ্টাৰ গাঙ্গলী, ডার্ক, শাৰ্ট, প্রক্ষেপণ মুস্টাশি।'

থবৰটা পড়া শেষ হওয়া মাত্ৰ লালমোহনবাবু ফেলুন্দাৰ হাত থেকে কাগজটা থামচে ছিনিয়ে নিয়ে টুকুৱে টুকুৱে কৱে ছিঁড়ে হাওয়াত উড়িয়ে

বিলেন।

ফেল্দুদা বলল, 'এইম পারিষ্কার সংস্কৃতটীকে আবজ'নায় ভালুয়ে দিলেন?'

ভদ্রলোক অথচো ভালো করে কথা বলতে পারছেন না দেখে ফেল্দুদা এবার ধরকের সুরে থলল, 'আপনার কি ধারণা গোটা শহরের লোক আপনাকে দেখেই বুঝে ফেলবে যে আপনিই হচ্ছেন এই ব্যক্তি?'

লালমোহনবৰ্বু এতেও সান্দেহ পেলেন না। কোনরকমে যোক গিলে বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু—এর মানেটা বুঝছেন ত? কে খুন করেছে বুঝছেন ত?'

ফেল্দুদা বেশ কয়েক সেকেণ্ড চিপ করে একদম্পৰ্য্যে লালমোহনবৰ্বুর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, 'লালদা, তার বছর আমার সংসগ্র-লাভ করেও মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে শিখলেন না।'

'কেন, কেন—লাল শাট—?'

'লাল শাট' কী? কাগজটা লাল শাটেরই হাত থেকে লিফ্টে পড়েছে সেটা ধরে নিলেও তাতে কী প্রভাগ হচ্ছে? তার মানেই যে সে খুন করেছে তার কী প্রমাণ? আপনার কাছ থেকে প্যাকেট পাবার পর তার সঙ্গে আপনার সংপর্ক শেষ—এটা ত ঠিক? তাহলৈ কাগজটোরও তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। লিফ্টে ওঠার সময় সেটা পকেটে রয়ে গেছে দেখে সে সেটা লিফ্টেই ফেলে দিল—এমন ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি?'

লালমোহনবৰ্বু তবুও ঠান্ডা হলেন না। 'আপনি যাই বলুন, লাশের পাশে যখন আমার নাম আর ডেস্ক্রিপশন মেখা কাগজ পেয়েছে, তখন আমার চৰম ভোগান্তি আছে—এ আমি পষ্ট দেখতে পাইছি। রাস্তা একটাই। টুকু ত আর চুল গজাবে না, হাইটও বাজাবে না, আর কমপ্লেকশনও চেঞ্চ হবে না। আছে এক গোঁফ। আপনি যাই বলুন, এ গোঁফ আর্য কালই হাওয়া করে দেব।'

'আর হোটেলের লোকেরা কী ভাববে? তাই কি আর ইভিনিং নিউজ পড়োন ভেবেছেন? খুনের খবর শতকরা নয়বাই ভাগ লোকে পড়বে, মানবের স্বভাবই ওই। আমার ধারণা আপনি গোঁফ ছাঁটলে দ্রুতিটা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা, আরো দেখি করে আপনার উপর পড়বে।'

আকাশের লালটা বখন দুগন্মী হয়ে শেষে পাঁখুটের দিকে যেতে শুরু করেছে, পশ্চিমের চেরা যেয়ের ফাঁকে শুক্রতারাটা পুনের মারিন ভুট্টাইভের হাজার আলোর মালার সঙ্গে একা পাল্লা দিতে শিয়া ধূকপূক করছে, তখন আমরা উঠে পড়ে গা থেকে বালি ঝেড়ে আবার মানুষ আর দোকানের ভিজ্জ পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা টান্কি ধরে হোটেলযান্ত্রো ছলাম।

রিসেপশন কাউন্টারে চাবি চাইবার সময় দেখলাম লালমোহনবাবু হাতটা খেদিকে বাড়ালেন, মুখটা তার উলটোদিকে পুরুয়ে রাখলেন। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, উলটোদিকে লাখিতে বস সাতজন দেশী-বিদেশী সোকের তিনজনের হাতে ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ডের সামনের পাতাতেও খনের খবর আর মৃতদেহের ছবি। খবরের মধ্যে টেকে বেঁটে গুঁড়ে রঙ-হরলা মিষ্টার গাঙ্গুলীর উল্লেখ নেই এ হতেই পারে না।

লালমোহনবাবু শেষ পর্যন্ত আর গোফটা কামাননি। রাত্রে ঘৃম হয়েছিল কিনা জিগ্যেস করাতে বললেন ততবারই চোখ চূলে এসেছে ততবারই মনে হয়েছে ও'র ঘরটা লিফ্টের মতো ওঠানম্বা করছে, আর তার ফলে তন্দু ছুটে গেছে।

প্রস্তুকবাবু কাল রাত্রেই ফোন করে বলেছিলেন আজ সকাল দশটায় এসে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে আবেন। আমরা আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পেডার রোড দিয়ে খানিকদূরে হেঁটে একটা পানের দোকান থেকে দিকি ছিটে পান কিনে পোনে নটায় হোটেলে চুক্তেই কেমন কেন একটা চাপা উচ্চেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

কাবুণ আর কিছুই না, পূর্ণশ এসেছে। একজন ইনস্পেক্টর গোছের দোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, হোটেলের কর্মচারী একটা ইঞ্জিন করতেই তিনি ঘূরে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন। ইনস্পেক্টরের চাহনিতে যাদও কোনো হৃত্তির ভাব ছিল না, পাশে একটা খট শব্দ শুনে বুরুলায় লালমোহনবাবুর দুটো হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে।

ইনস্পেক্টর হাসিগুল্মে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা শান্তভাবে লালমোহনবাবুর পিঠে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বুরুয়ে দিল—নার্টাস হবেন না, ঘাবড়াবার কিছু নেই।

‘ইনস্পেক্টর পটবর্ধন। সি আই ডি থেকে আসছি। আপনি মিস্টার গাঙ্গুলী?’

‘হাঁয়েস।’

এই রে, লালমোহনবাবু, ইংরিজি-বাংলা গুলিয়ে ক্লেচেন।

পটবর্ধন ফেলুদার দিকে চাইলেন।

‘আপনারা—?’

ফেলুদা পকেট থেকে ওর প্রাইভেট ইনভেন্টিগেটের লেখা কার্ডটা বার করে দিল। পটবর্ধন সেটা পড়ে ফেলুদার দিকে একটা জিজ্ঞস দ্রষ্টি দিলেন।

‘মিটার? আপনিই কি এলোরার সেই মৃত্তি চুরির—?’

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে মাথা নেড়ে হাঁ বলল।

‘ব্ল্যাড ট্ৰ মীট ইউ সার। হাত বাঁড়িয়ে বললেন পটবর্ধন। ইউ ডিড

‘এ ভৈর গুড় ক্ষয় দেয়াৰ !’

ফেলুদার বন্ধু বলে লালমোহনবাবুৰ থাত্তিৰ বেড়ে গেল ঠিকই, কিন্তু জেৱাৰ হাত থেকে তিনি রেহাই পেলোন না। কথা হল হোটেলৰ মানেজৰেৰ ঘৰে বসে।

পটবৰ্ধন যা বললেন তাতে জানলাম, যে মৃতদেহেৰ গায়ে নাকি অনেক আঙুলৰে ছাপ পাওৱা গেছে, তবে খুনী এখনো ধৰা পড়োনি। কিন্তু একজন লাল শাটে পৰা লোক যে অৱায়পোট থেকে শিবাজী কাস্ট্ৰ-এ এসেছিল সেটা প্ৰলিখ বাব কৰেছে টাৰ্কিওয়ালাটাৰ সন্ধান বাব কৰে। প্ৰলিখেৰ ধাৰণা এই লালশাটই খুনী এবং তাৰ পকেট থেকেই চিৰকুটণি বৈৱিয়েছে। লালমোহন-বাবুৰ কথা শুনে অৰ্বাচ্ছা পটবৰ্ধনেৰ ধাৰণা আৰো বন্ধুমূল হল। বললেন, এটা বুৰুজেই পাৰ্বতীলাম যে সোকটা গাঙ্গুলী নামে কাউকে ঘীট কৰতে গিয়েছিল এয়াৱপোটে। আমৰা গতকাল সকাল থেকে দৃশ্যমূলেৰ অধ্যে বত শ্বেল সাম্পটাত্ৰজ্জে নেমেছে তাৰ প্ৰত্যেকটাৰ প্যাসেজীৱ লিস্ট দেখে ক্যালকৃটা ঝাইটে গাঙ্গুলী নামটা পাই। তাৰপৰ এখানেৰ প্ৰত্যেক হোটেলে খৌজ কৰি। দেখলাম শালিয়াৰ হোটেলে দৃশ্যমূলে এসেছেন মিস্টার এল গাঙ্গুলী।’

পটবৰ্ধনেৰ আসল হেটো জ্যানাৰ ছিল সেটা হচ্ছে এই ব্যাপৱে লালমোহন-বাবুৰ ভূমিকটা কী; অৰ্ধাং ওই কাগজে তাৰ নাম আৱ চেহাৱাৰ বৰ্ণনা থাকবে কেন। লালমোহনবাবু মিস্টাৰ সান্যালেৰ ব্যাপৱটা বলাতে পটবৰ্ধন বললেন, ‘হ্যাঁ ইঞ্জ দিস সান্যালে? হাউ ওয়েল ডু ইউ নো হিম?’

লালমোহনবাবু যা বলবাৰ বললেন। সান্যালেৰ ঠিকানা বিশেষ কৰাতে বাধা হৱেলৈ বলতে হল উনি জানেন না।

সবশেবে ইন্দোপেক্টৰ পটবৰ্ধন ঠিক ফেলুদার ঘৰ্তো কৰেই সাবধান কৰে দিলেন লালমোহনবাবুকে। বললেন, ‘ঠিক এইভাৱেই নিৰীহ নিৰ্দীশ লোকেৰ হাত দিয়ে অক্ষকাল চোৱাই মাল পাচৰ হচ্ছে। কাঠমণ্ডু থেকে কিছু দামী ফণিমূল্কে গোদেশে এসেছে বলে আমৰা থবৰ পেয়েছিলি। শুনছি তাৰ মধ্যে নাকি মানসাহেবেৰ বিখ্যাত নওলাৰ্থা হারও আছে।’

সিপাহী বিদ্রোহেৰ সময় একজন মানসাহেবৰ ব্যক্তিপৰিত বিবৃত্যান্ধ ঝুঁকেছিল বলে ইতিহাসে পঢ়াছি। পটবৰ্ধন সেই মানসাহেবেৰ কথা বলছিল কিনা জানি না।

আমৰে বিশ্বাস এই পাকেটটাতেও কোনো চোৱাই নাল ছিল, বললেন পটবৰ্ধন। যে গাঙে এটা কলকাতা থেকে পাঠিয়েছে, তাৰই বিৰুদ্ধ গ্যালের কেউ থবৰ পেয়ে শিবাজী কাস্ট্ৰেৰ আশেপাশে ঘূৰিষূৰ কৰাছিল। সেই লোকই লালশাটকে আক্ৰমণ কৰে, ফলে লালশাটেৰ হাতে তাৰ মৃত্যু হৰ।’

লালমোহনবাবু ধরেই বিয়েছিলেন যে তাঁর নাম লেখা কাগজ পুলিশের হাতে পড়তে ওঁ'র হয় ফাঁ'র মা-হয় ধাবজ্জীবন স্বীপান্তর হবেই। কেবল কয়েকটা উপদেশ-কাক্ষ শুনে ছাড়া পোয়ে যাওয়াতে ভুলোকের চেহারায় নতুন জেলা এসে গেল।

পুরুকবাবু দশটা বলে এলেন প্রায় এগারোটাই। পুলিশের বাপারটা শনে বললেন, 'আর বলবেন না—কাল কাগজ দেখেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছে। লালমুকুর সঙ্গে নাম ডেন্সিপশন সব যিলো ষাক্ষে অথচ পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্য।'

সানালের ঘটনাটা শনে বললেন, 'কোন সানাল বলুন ত? আই সান্যাল? মাৰ্বাৰি হাইট, চোখদুটো একটু বসা, ঘূর্তনিতে খাঁজ কাটা?'

'ঘূর্তনি ত দৈর্ঘ্যনি ভাই। দাঢ়ি আছে। বোধহয় আগে বাখতেন না।'

'আমি দু'বছর আগের কথা বলছি। একই লোক কিনা জানি না। বোঝেতে হিল কিছুদিন। ছবিও প্রোডিউস কৰেছিল খান দু'এক। মাৰ খেয়েছিল— বন্দুৰ মনে পড়ে।'

লোক কিৱুকুনি?

'সে খবুৰ জানি না লালমুকু, তবে বদনাম শৰ্টনিনি কখনো।'

তাহলে বোধহয় কাগজের প্যাকেটে কোনো গোলমাল নেই।

'দেখুন লালমুকু, আজকাল নেহাঁ প্লাগলি-টাগলি হচ্ছে বলে, নইলে আমরাও ত এককালে অনেক অচেনা লোকের হাত থেকে জিনিস নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কই, কোনদিন ত কোনো গোলমাল হয়নি।'

যে গাড়িটা কাল ব্যবহার কৰেছিলাম, সেটাতেই আমরা চারজনে মহালক্ষ্মীর ফেমাস স্ট্রাইঞ্জেল গিরে হাঁজিৰ' হলাম। গাড়ি থেকে নামবাবি সময় পুলকবাবু বললেন, 'আগামী কালের শৰ্টটি-এ ট্রেনের বাপারটায় রেল কোম্পানিৰ লোক-দেৱ সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। খবুৰটা পৈয়েই প্রোডিউসাৰ রাঁকিৰেৰ শ্বেন থারে কলকাতা থেকে চলে এসেছেন। চলুন, আপনাদেৱ সঙ্গে অলাপ কৰিষ্যে দিচ্ছি।'

'কালকৰে শৰ্টটি হবে ত?' লালমোহনবাবু গল্পায় আশক্তাব স্বীকৃতি।

'শৰ্টটি-এৰ ফুদাব হকে লালমুকু, ঘাৰড়াইয়ে মৎ।'

আমরা একটা টিনেৰ ছাতওয়াজা কুৱখানার ঘৰেৱ মজো বিৱাট ঘৰে গিৱে চুকলাঘ। এখানেই শৰ্টটি শয়। আৱ আজ এখানেই চলেছে কুঁ-ফুৰ প্রেইনিং। একটা প্ৰকান্ড গদিৰ উপৰ ভিকটৰ পেৰমলোৱ নিৰ্দেশে একদল লোক লাগাছে, পা ছাঁড়ছে, আঞ্চাড় থাক্ষে। গদি থেকে হাত দশেক দু'বৰে একটা বেতেৰ চেৱাৰে

বসে আছেন একজন বছর প্রস্তাবিজ্ঞপ্তির ভদ্রলোক।

‘আলাপ করিয়ে দিই। বলমেন পুলকবাবু, ইন্ন হজেন আমদের ছাঁবির প্রয়োজন মিঃ গোরে... মিস্টার গাঙ্গুলী, স্টোরি রাইটার—মিস্টার মিশন, আর—তোমার মামটা কী ভাই?’

‘তপ্পেশরঞ্জন মিশন।’

মিঃ গোরের দাঙ দুটো আপেলের মাতো, খাবার ঠিক আৰুৰে একটা চকচকে টোক, আৰ চোখদুটো সামান্য কঢ়। ভুঁড়িটো নিশ্চয়ই ইদানীঁ হৱেছে, কাৰণ শৰ্থ কৰে এত টাইট জামা কেউ পৱে না। পুলকবাবু অলোপ কঁঠে দিয়ে হাঁপ্যা, কাৰণ কালকেৰ শৰ্টিং-এৰ নাৰ্কি অনেক তোড়জোড় অছে। বলে গোলেন, ‘নেড়টায় ফিরছি লালদা; আমাৰ সঙ্গে লাঙ্গ থাক্ষেন আপনৱা।’

গোৱে আমদেৱ থৰে খাতিৰটাতিৰ কৰে চেৱাৰ আনিয়ে বসতে দিলেন। নিজে লালমোহনবাবুৰ পাশে বললেন, ‘আপনি এলেন বলে আমি থৰে থৰ্দীশ হলাম।’

‘সেকি আপনি ত দিবি বাঙ্গলা বলেন।’

লালমোহনবাবু বোধহয় তাঁৰ দশ হাজাৰ পাঁচাশ কথাটা ভেবেই একটু বেশ বুলে তাৰিফ কৰলেন।

আমাৰ ফাদাৱেৰ বিজনেস ছিল ক্যানিং প্রুটীটো। প্ৰি ইয়াৱেস আই ওয়্যাঞ্জ এ স্ট্ৰাইচট ইন ডম বক্সে। দেন ফাদাৱেৰ ডেথ ইল, আৰ্হি আকেকলোৱে কাছে চলে এলাম বুম্বই। সে তখন ধেকেই আই আগ হিয়াৱ। লোকিন ফিলিম লাইনে দিস ইজ মাই ফাস্ট ভেনচাৰ।’

গোৱে বাঙ্গলা জানেন দেখেই বেঁধুৱ লালমোহনবাবু বেশ উৎসাহেৰ সঙ্গে সাম্যাল থেকে শৰ্বৰ কৰে আজকেৰ পুলিশেৰ কেৱা অৰ্থি সহ ঘটনা ভুলোককে বলে ফেললেন। তাতে মিঃ গোৱে চৰকচ্ছ শব্দ কৰে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, ‘আজকাল কাউকে বিমোয়াস কৰা যায় না মিস্টার গাঙ্গুলী। আপনি এমিনেন্ট রাইটার, আপনাৰ হাতে চোৱাই আল পাচাৰ হবে ভাৰতে শৰ্ম্ম জাগে।’

এবাৰ ফেলদা ও যোগ দিল কথায়।

‘আপনি ত শিবাজী কাস্তে ধাকেন বলে শুনলাম।’

‘হৈ। দুয়াস হল আছি। হৰিৰ্বল মাৰ্ট্টাৰ। ইভনিং ফ্লাইটে এসেছি আমি। ধাৰ্ড কিৰেছি রাত ইগারটা। আট দাট টাইম অলসো কেজোৱ ওয়াজ এ বিগ ভাউড ইন দ্য প্রুটীট। হাই-রাইজ বিল্ডিংমে থুন্থুন্থুনি হোলেমে বছে হচ্ছে।’

‘ইয়ে—সেভেনটাইনথ কোৱে কে ধাকক জানেন?’

‘সেজেন্টিনথ.. সেজেন্টিনথ...’ ভদ্রলোক মনে করতে পারলেন না। ‘আমার চিনা আদায়ি এক হ্যাথ এইটথ মে—এন সি মেহতা; আউর দে। এ ভক্তির ভাজিফদারণ মাই ফ্ল্যাট ইজ অন ট্রায়েলফথ ফ্লোর।’

ফেল্দুদা আর কোনো প্রশ্ন করল না। যিঃ গোরেণ্ড দেখলাম উঠি-উঠি ভাব। বললেন বহুৎ ব্যামোহীয় প্রোডাকশন, সব সময় কিছু মা কিছু কাঞ্জ লেগেই থাকে। তাছাড়া কালকের শুটিংট। সতিই এলাহি ব্যাপার। মাথেরান স্টেশন থেকে ভাড়া করা ট্রেন বাংড়ালা আর লোনার্জিলির মাঝামাঝি লেভেল-ক্রসিং-এ আসবে। যিঃ গোরে মাথেরানেই থাকবেন, কারণ রেল কোম্পানিকে পরিসাকার্ডি দেওয়ার ব্যাপার আছে। একটা প্ররোচনা আমলের ফাস্ট-ক্লাস কামরা থাকবে ট্রেনে, যিঃ গোরে সেই কামরায় চেপেই শুটিং-এর স্যাগাম আসবেন। আমি খুব খুশি হব বাদি আপনারা আমার সঙ্গে এসে লাগ্প করেন। আপনারা ভেঙ্গিট্রিরয়ান কি?’

‘নো নো, নন নন’. বললেন জালমোহনলাবু।

‘হোয়াটি উইল ইউ হ্যাভ? চিকেন জু ইটন?’

‘চিকেন হ্যাভ ইয়েসটারডে। মাটনই হোক ট্রামজ্যো; কী বলেন ফেল্দুবাবু?’

‘কথ্যস্তু, কলল ফেল্দুদা।

ফেল্দুদা মিস্টার গোরের সব কথাই শুনছিল, কিন্তু ভাবিই ফাঁকে ফাঁকে ওর চোখটা যে বারবার কুঁ-ফুর দিকে চলে ধাঁচ্ছিল মেটা আমি লক্ষ করছিলাম। ভক্তির প্রেরুমলের ধৈর্য আর অধ্যাবসায় দেখে সতিই অবাক হতে ইয়। বোবাই যাচ্ছে ব্যাপারটাকে নিখন্ত না করে সে ছাড়বে না। ব্যাবা শিখছে তাদের মধ্যে দ্ব-একজন দেখলাম রাঁতিমত তৈরি হয়ে গেছে।

প্রেরুমলকেও দেখছিলাম কাজুর ফাঁকে ফেল্দুদার দিকে দেখছে। ফেল্দুদার চাহনিতে তারিফের ভাবটা বোধহয় তাকে উৎসাহিত করছিল। গোরে চলে থাবার পর প্রেরুমল ফেল্দুদাকে ইশারা করে কাছে আসতে বলল। ফেল্দুদা হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল্লে উঠে এগিয়ে গেল।

‘আইরে মিস্টার মিশ্যা—ড্রাই কিজিয়ে—ইটস নট সো ডিফিকাল্ট।’

বাকি যাবা মেনিং নিচ্ছিল তাবা গাদি ছেড়ে সরে গেল। প্রেরুমল একটা ছোট লাফের সর্পে অস্তুত ভাবে ডান পা-টা মাথা অর্ধাধ তুলে সোজা সামনের দিকে ছিটকে দিল। পায়ের সামনে কেউ থাকলে নির্ধার ধরাশায়ী হত। ফেল্দুদা গাদির উপর উঠে পাঁচ-ছ বার ছোট লাফ দিয়ে খরাঁরটাকে তৈরি করে নিল। প্রেরুমল ফেল্দুদা থেকে হাত চাবেক দ্বারে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমার দিকে ছৈড় পা।’

প্রেরুমলের জানার কথা নয় যে এনটার দ্য ফ্ল্যাগন দেখাব পর থেকে মাস

কয়েক ধরে প্রায়ই সকালে ফেল্দু আমাদের বৈষ্ণবখানায় কুং-কুর ঢঙে ইতু
পা ছোড়া অভেস করেছে। ফুটি ছাড়া এবং পিছনে আর কোনো উদ্দেশ্য
ছিল না ঠিকই, কিন্তু পা ছোড়ার কারণাটা রূপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ওয়ান-টু-গ্রী বলাৰ সংগে সংগে ফেল্দুকু ডান পা-টা হোৱাইজ্যালভাৰে
বিদ্যুম্বেগে সামনেৰ দিকে ছিটকে গেল, আৱ সংগে সংগে পেৱমলেৰ শৰীৰটা
পিছনে ছিটকে গিয়ে আহাড় হেলো গাঁথৰ উপৰ—থাসিও আঁই জান যে
ফেল্দুৰ পা তাৰ গায়ে খাগেনি।

আৱপৰ এইভাৱে পাঁচ মিনিট ধৰে চলল ভিত্তিৰ পেৱমল আৱ প্ৰদোৱ
মিস্ত্ৰীৰ কুং-কুৰ জেমন্ট্ৰিশন। আগাৰ দ্বিতীয় চলে বাঁচল পেৱমলৰ
সকাৰেদদেৱ দিকে—দেড় মাস ধৰে লাফ কৰে যাদেৱ জিভ বেৰিয়ে এসেছে।
এটা দেখে ভালো লাগল খে হিংসাৰ চেয়ে প্ৰথংসাৰ ভাৰটাই তাৰে মুখে বেশি
প্ৰকাশ পাচ্ছে। পাঁচ মিনিটৰ শেষে যখন দ্বজনে হাঁজশোক কৰে পৱন্পৱেৰ
পিঠ চাপড়াচ্ছে, তখন সকাল হাততালি দিয়ে উঠল।



দুর্জন নামাদ প্লকবাবু আৰু সংলাপ-সেখক ছিড়ুৰন গুপ্তেৰ সঙ্গে আমৰা শুৱৱলিৰ কপাৰ চিমৰি বেঢ়োৱাশ্চে লাভ খেতে চুকলাম। দেখে আলে হয় তিলধৰাৰ জায়গা নেই, কিন্তু প্লকবাবু আমাদেৰ জন্য একটা টোবিল আগে খেকেই 'রিজার্ভ' কৱে রেখেছেন।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমাদেৰ ছৰ্বিৰ নামটা কৈ হজে ভাই প্লক ?' নামেৰ কথাটা আৰ্বিশা ক্ষমাৰণ অনেকবাৰ মনে হৱেছে, কিন্তু জিগোস কৱাৰ স্থূলগোটা আসেন। 'বোম্বাইয়েৰ বোম্বেটে' নাম যে থাকবে না সেটা আমিও আন্দাজ কৰেছিলাম।

'আৰ বলবেন না লালদা', বললেন প্লকবাবু। নামে নিয়ে কি কম হুঝজত গেছে? যা ভাবি ভাই দেখি হৱ হয়ে গেছে, না হৱ অনা কোনো পার্টি রেজিস্ট্ৰেশন কৱে বসে আছে। গুপ্তেজকে জিগোস কৰুন না কন্ত বিনিময় বজানী গেছে ও'ৱ নাম ভেবে থার কৱতে। শেষটোয় এই তিনদিন আগে—যা হয় আৰ কি—হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক !'

'হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক ? ছৰ্বিৰ নাম হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক ?' লো-ভোল্টেজ গলাৰ ম্বয়ে জিগোস কৱলেন জটাবু।

প্লকবাবু হো-হো কৱে হেমে চারিদিকেৰ টোবিলেৰ লোকদেৰ মাথা আমাদেৰ দিকে ঘৰিৱে দিয়ে বললেন, 'মাথা খোপ লালদা ? ও নামে ছৰ্বি চলে ? আমি ইন্সপৰেশনেৰ কথা বলুছি। জেট বাহাদুৰ !'

'আৰ ?'

'জেট বাহাদুৰ। বাসতাম হুইড়িৎ পড়ে থাবে আপনাৰা থাকতে থাকতেই। ভেৰে দেখুন---আপনাৰ গম্পেৰ এৰ চেয়ে ভালো নাম আৱ পুঁজে পাৰেন না। অ্যাকশন, স্পৰ্ট, প্ৰিস—জেট কথাটাৰ মধ্যে আপনি সব পাৰেন। প্লাস বাহাদুৰ। নাম আৰ কাস্টিং-এৰ জোৱেই অল সার্কিটিস সোজত !'

লালমোহনবাবু হাসিৰ ভোল্টেজটা যেম বাজতে গিয়ে কথে গেল। বোধ-হয় ভাৰছেন—শুধুই নাম আৰ কাস্টিং? গম্পেৰ কি তাহলে কোনো দামই দেই?

'আমোৰ কোনো ছৰ্বি কি আপনাৰা দেখেছোন লালদা ?' বললেন প্লকবাবু। 'তীৰদাঙ্গটা হজে লোটাসে। আজ ইভিনং শো-এ দেখে আসনো। আমি

ম্যানেজারকে থগে দেব—তিনির্বাম সার্কেলের টিকিট রেখে দেবে। ভালো ছবি--জুরিলি করেছিল।'

আমরা প্লেকবাবুর কোনো ছবি দেবিন। লালমোহনবাবুর স্বাভাবিক কারণেই কৌতুহল ছিল, তাই যাব বলেই বলে দিলাম। বল্বেতে চেনাশোনা না থাকলে সম্মে কাটিবে তারি মুশাকিল। গাঁড়টা আমাদের কাছেই থাকবে—তাকে বললেই শোটাসে নিয়ে বাবে।

আবার মাঝখানে রেস্টোরাণ্টের একজন লোক প্লেকবাবুকে এসে কী জানি বলল। প্লেকবাবুর যৈ এখনে যাতায়াত আছে সেটা তোকার সময় ওয়েস্টারদের মধ্যে হাসি দেখেই বুঝেছি। হিট ডিবেকটারের এ শহরে ব্যব থািতুৰ।

প্লেকবাবু কঢ়াটা ধূলেই লালমোহনবাবুর দিকে ফিরলেন।

'আপনার টেলিফোন জালন্দা।'

লালমোহনবাবু ভাঁগিস পেলাগুয়ের চামচটা মুখে পোরেন মি. তাহলে নিষ্ঠাং বিষয় বৈতেন। এ অবস্থায় চমকানোটা কেবল খ্যালিকটা পেলাগু চামচ ধুকে ছিটকে টেবিলের চাসরে পড়ার উপর দিয়ে গেল।

'হিন্টার গোৱে ডাকছেন', বললেন প্লেকবাবু। 'হয়ত কিছু গুড় নিউচ থাকতে পারে।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যে টেলিফোন সেবে এসে লালমোহনবাবু আবার কাঁটা-চামচ হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'চারতের সময় ভদ্রলোকের বাঁড়তে যেতে বলালেন। কিছু অর্থপ্রাপ্তি আছে বলে মনে হচ্ছে—হে হে।'

তার মাঝে আজ বিকেলের মধ্যে লালমোহনবাবুর প্রকটে দশ হাজার টাকা এসে যাবে। ফেল্দা বলল, 'এর পরের দিন লাষ্ট আপনার ঘাড়ে। আর কপার-ট্পার বল, একেবারে গোল্ডেন চিমীন।'

রূমালি রূটি, পোলাও, নারগিসি কোফ্তা আর কুলপী খেয়ে ষথন রেস্টোরাণ্ট থেকে বেরেলাম তখন প্রায় পৌনে তিনটে। প্লেকবাবু আর হিন্টার গুপ্ত স্ট্রাইও চলে গেলেন। সংলাপ এখনো কিছু লিখতে বাকি আছে। প্রতেকটা সংলাপ শান্তির লিখতে হয় তো। তাই নাকি সময় লাগে, বললেন প্লেকবাবু। গৃহেজী চৰুটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন। জদুলোক সংলাপ লিখলেও নিজে সংলাপ খুবই কম বলেন সেটা জন্ম করলাম।

আমরা পান কিনে গাঁড়তে উঠলাম। 'শালিমার?' ড্রাইভার ডিগোস কুরল।

ফেল্দা বলল, 'ব্যব এসে গেটেওয়ে অফ ইন্ডিয়া নং দুঃখে সাত্ত্বা যাস্ত না।—চালিয়ে তাজমহল হোটেলকা পাস।'

'বহুৎ আচ্ছা।'

ড্রাইভার বুঝেছিল আমাদের কোনো কাছ নেই, কেবল শহর দেখাব ইচ্ছে।

তাই সে দিন্য ঘৃণাপ্রাপ্তি ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, ক্লোরা ফাউন্টেন, টেলিভিশন স্টেশন, প্রিস্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখিয়ে সাড়ে তিনটে নামাদ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে পোঁছল। আবরা গাড়ি থেকে নামলাম।

পিছের আবরা সাগর, তাতে গুপ্ত দেখলাম এগারোটা ছোট বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে রাস্তাটা পেল্লায় চওড়া। বাদিকে গেটওয়ের দিকে মৃৎ করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ছত্রপতি শিবাজী। জানপাশে দাঁড়িয়ে অসহে প্রথমী-বিশ্বাস স্কার্জমহল হোটেল, বার ভিতরটা একবার দেখে না যাওয়ার কোন মানে হয় না, কারণ বাইরেটা দেখেই আমাদের চক্ৰ চড়কগাছ।

ঠাণ্ডা লাবিতে ঢুকে ঢোক একেবারে টেরিয়ে গেল। এ কোন দেশে এলাম রে বাবা! এত রকম জোতের এত লোক একসঙ্গে কখনো দোঁধিন। সাহেবদের চেয়েও দেখলাম আবরদের সংখ্যা বেশি। এটা কেন হল? ফেলুদাকে জিগ্যেস করতে বলল, এবার বেরুট যাওয়া নিষেধ বলে অবৰবৱা সব বোম্বাই এসেছে ছুটি জোগ করতে। পেত্রোসের দৌলতে এদের ক আর পুরসার অভাব নেই।

মিনিট পাঁচক পায়চারি করে আবরা আবার গাড়িতে এসে উঠলাম। যখন শিবাজী কাস্টেলের সিফ্টের বেল টিপছি তখন ঘাড়তে চারটে বেজে দু মিনিট।

ট্রেইন্স্কথ ক্লোর বা ক্লোডলায় পোঁছে লিফ্ট থেকে বেরিয়ে দৈর্ঘ্য তিন দিকে ভিন্নভাবে দূরজ। মাঝেরটার উপর লেখা জি গোরে। বেল টিপতে ডার্দি-পর্যা বেয়াবা এসে দূরজ থুলে দিল।

‘অল্দন আইয়ে।’

বৃক্ষলাম গোরে সাহেব চাকরীকে আগেই বলে রেখেছিলেন আমাদের কথা।

ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোককে ঢোকে দেখাব আগো তার গলা পেলাম—‘আস্তুন, আস্তুন।’

এই বার দেখা গেল একটা সবু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে তিনি হাসিম্বুখে অগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে।

‘হাউ ওয়জ দি লাঙ্গ?’

‘ভেরি ভেরি গুড়’ বললেন জটারু।

ভদ্রলোকের বৈঠকখানা দেখে তাক লেগে গেল। আমাদের কলকাতার বাঁড়ির পুরো এক তলাটাই এই ঘরের মধ্যে ঢুকে থায়। পশ্চিম সিকটায় সারবাঁধা কাঁচের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্রের এক-একটাই দাম ইতুতা দ্ৰ’ তিনি হাজার টাকা, ত্যাছাড়া মেঘে-জোড়া কাপেটি, দেয়ালে পেন্সিল, সিলিং-এ বাড়-স্টুন—এসব ক আছেই। একদিকে দেয়াল-জোড়া বৃক্ষগুলকে দামী দামী বইগুলো এত ককৰকে যে দেখলে মনে হয়

বৃক্ষ এইমাত্র কেনো।

আমি আর ফেল্দু একটা পুরু গান্দিওয়ালা সোফাতে পাশ পাশ বসলাম, আর আমাদের ডানপাশে আরেকটা গান্দিওয়ালা চেয়ারে বসলেন লালমোহনবাবু। বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশাল কুকুর এসে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তিনজনের দিকে মাথা দ্বিরিয়ে দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। ফেল্দু হাত ধাঁড়িয়ে তুঁড়ি দিতে কুকুরটা ওর দিকে এগিয়ে এল। ও পরে বলেছিল যে কুকুরটা জাতে হল গ্রেট ডেন।

‘ডিউক, ডিউক!'

কুকুরটা একার ফেল্দুকে ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মিঃ গোরে



আমাদের বাসয়ে দিয়ে একটু ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, এখার হাতে একটা খাম নিয়ে ঢুকে লালমোহনবাবুর অন্ত পাশের চেয়ারে বসলেন।

‘আমি আপনার বেপারটা রেডি করে রাখব ক্ষেবেছিলাম,’ বললেন মিঃ গোরে, ‘কিন্তু তিনটা ছোঁক ফল এসে গেল।’

ভদ্রলোক খামটা লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। এনের জোরে হাত কাঁপা বন্ধ করে লালমোহনবাবু সেটা নিয়ে তার ভিতর থেকে টেনে বাঁচ করলেন একস্তম্ভ একশো টাকার নোট।

‘গীর্ণাত কৰিবো জিন,’ বললেন মিঃ গোরে।

‘ছিলবো?’

আবার ভাবার গণ্ডগোল।

‘গীর্ণবেন আজিবৎ। দেৱাৰ শুভ বি ওৱান হাস্ত্রেজ নোটস দেৱাবু।’

বে সময়ে লালমোহনবাবু গোমা শেষ কৰলেন, তাৰ মধ্যে কুপোৱা টি-সেটে আমাদেৱ জন্য চা এসে গেছে। খেয়ে বুঝলাম একেৰাবে সেৱা দাঙ্গিলিং টি।

‘আপনাৰ পৰিচয় আভিতক মিলল না’, গোৱে থললেন ফেলদুৰ দিকে চেয়ে।

ফেলদুৰ বলল, ‘মিষ্টাৰ গাণ্ডুলীৰ ফেস্ট—এই আমাৰ পৰিচয়।’

‘নো স্যুৱ’, বললেন গোৱে, ‘দাট ইজ মট এনাফ। ইউ আৱ নো অৰ্ডিনাৰি পাৱসন—আপনাৰ চোখ, আপনাৰ ভঙ্গস, আপনাৰ হাইট, ওয়ক, বডি—নাথী ইজ অৰ্ডিনাৰি। আপনি হামাকে যদি নাই বলবেন তো ঠিক আছে। লেকিন মিষ্টাৰ গাণ্ডুলীৰ দেশত যদি বলেন, উভো হামি বিসোয়াস কৰব না।’

ফেলদুৰ অল্প হেসে চায়ে চৰ্মক দিয়ে প্ৰসংগটা চেঞ্চ কৰে ফেলল।

‘আপনাৰ অনেক বই আছে দেখৰছি।’

‘হী—হাট আই ডোল্ট বৈড় দেম! উসব কিতাৰ বনালি ফৱ শো। তাৱাপোৱ-ওয়ালা দুকানে বেগুলাৰ অৰ্ডাৰ—ঢান গড় বৰু দ্যাট কাষস আউট—এক কপি হামাকে পাঠিয়ে দেয়।’

‘একটা বালা বইও চলে এসেছে দেখৰছি।’

ফেলদুৰ চোখ বটে। ওই সারি সারি বিলিতি বইৰেৰ মধ্যে পনেৱ হাত দূৰ থেকে ধৰে ফেলেছে বে, একটা বই বাংলা।

মিঃ গোৱে হেসে উঠলেন। ‘শুধু বাংলা কেন মিঃ মিষ্টাৰ, হিন্দি, মারাঠী, গুজুৱাটি, সব আছে। আমাৰ এক আদমি আছে—বালা হিন্দি গুজুৱাটি তিন ভাষা জানে; ওই তিন ভাষায় নভেল পড়ে হামাকে সিন্পসিস কৰে দেয়। মিঃ গাণ্ডুলীৰ কিতাৰ কে-ভি আউটলাইন পঢ়িয়েছি আছি। ইউ সি. মিষ্টাৰ মিষ্টাৰ, ফিল্ম বানানেকে লিয়ে তো—’

ঘৰে টেলিফোন বেজে উঠেছে। মিঃ গোৱে উঠে গোলেন। দুবজাৰ পাশে একটা তেপায়া টেবিলে বাঁধা সাদা টেলিফোন।

‘হ্যালো...হী...হোক্ত অন!—আপন্যাৰ টেলিফোন, মিষ্টাৰ গাণ্ডুলী।’

লালমোহনবাবুকে বাব বাব এভাবে চমকাতে হচ্ছে—আশা কৰি তাতে ওই

হাট-চাটের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

‘প্লকবাবু কি?’ টেলিফোনের দিকে যাবার পথে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন। ‘মো স্যার’, বললেন মিঃ গোরে। ‘আই ভোক্ট মো দিস পারসন।’ ‘হ্যালো।’

ফেল্দা আভচোধে দেখছে লালমোহনবাবুর দিকে।

‘হ্যালো...হ্যালো...’

লালমোহনবাবু ভাবাচাকা ভাব করে আমাদের দিকে চাইলেন।

‘কেউ বলছে না কিছু।’

‘লাইন কাট গিয়া হোগা,’ বললেন মিস্টার গোরে।

লালমোহনবাবু শাথা নাড়লেন। ‘অন্য সব শব্দ পাঁচ্ছ টেলিফোনে।’

এবার ফেল্দা উঠে গিয়ে লালমোহনবাবুর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে নিল।

‘হ্যালো, হ্যালো...’

ফেল্দা শাথা নেড়ে ফোন রেখে বলল, ‘ছেড়ে দিয়েছে।’

‘আশচর্য’, বললেন লালমোহনবাবু, ‘কে হতে পারে বলুন ত?’

‘ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, মিস্টার গাঙ্গুলী’, বললেন মিঃ গোরে। ‘বোম্বাই শহরে এইরকম হামেশা হয়।’

ফেল্দার দেখাদেখি আমরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহন-বাবুর পকেটে এত টাঙ্কা বলেই রোধ হয় বহস্যাজনক ফোনের ব্যাপারটা ও কে তটো ভাবাল না। বেশ নিশ্চিতভাবেই ভদ্রলোক পরের কথ্যটা বললেন মিঃ গোরেকে।

‘আমরা আজ প্লকবাবুর ফিলিয় দেখতে পাঁচ্ছ লোটাসে।’

‘হাঁ, হাঁ যাবেন বৈধি। ভেরি গুড ডি঱েকটাৰ প্লকবাবু। জেট বাহাদুর ভি বকস অফিস হিট হোগা ভৱুৱ।’

দুরজার মুখ পর্যন্ত এলেন মিঃ গোরে। ‘ভোক্ট ফৱদেট আবাউট লাঞ্চ ট্ৰায়ৱো। প্রোনসপোর্ট আছে ত আপনাদেৱ সঙ্গে?’

আমরা আশ্বাস দিলায় যে সকাল থেকে ব্রান্ট অবধি গাড়িৰ বাবুকো করে দিয়েছেন প্লকবাবু।

বাইরে বেরিয়ে এসে লিফটের বেজতে টিপে ফেল্দা বলল, ‘মানি কাকে বলে দেখলেন ত লালমোহনবাবু?’

‘দেখলাম কি হশাই, তাৰ খানিকটা ত আমাৰ পকেটেই রয়েছে।’

‘নাসা, নাসা। লাখ টাকাত এদেৱ কাছে নাসাৰ টেকাটা দিয়ে খাসি লিখয়ে নিল না সেটা দেখলেন ত? তাৰ মানে আপনার পকেটটা কালো হয়ে গেছে

কিম্বু। অর্থাৎ এই অংশের অন্ধকারে পদাপর্ণ শুরু।¹⁹

ঘড়াং শব্দে লিফ্টটা উপরের কোনো জ্বেল থেকে নেমে এসে আমাদের সামনে প্রাপ্তি।

‘সে আগ্রান্তি ষাহী বল্দন ফেলবাবু, পকেটে টাকা এলো তা সে কালোই হোক, আরু—’

ফেল্দুদা লিফ্টে ঢোকার জন্য দরজা খুলেছিল, আর তার ফলেই জটায়ের কথা বন্ধ।

লিফ্টের ভিতর থেকে এক বলক উপ্ত গন্ধ। গুলবাহার সেন্ট। এ গন্ধ আমরা তিনজনেই চিনি; বিশেষ করে লালমোহনবাবু।

চিপ্ চিপ্ বুকে ফেল্দুদার পিছন পিছন লিফ্টে চুকে গেলাম।

আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

‘গুলবাহার সেন্ট মিঃ সান্যাল ছাড়ও ভারতবর্ষের অনেকেই নিশ্চয়ই ব্যবহার করে।’

ফেল্দুদা কথাটার জবাবের বদলে গম্ভীরভাবে সতের নম্বর বোতাম টিপ্প। আমরা আরো পাঁচতলা ওপরে উঠে গেলাম।

অন্যান্য ভুলার মতোই সতেরো নম্বরেও তিনখানা ঘর। বী দিকের দরজার জেখা এইচ হেক্সথ। ফেল্দুদা বলল, জার্মান নাম। জন দিকের দরজার জেখা এন সি মানসুখার্ন। নির্ধার্ণ সিন্ধি নাম। মারবানের দরজায় কোনো নাম নেই।

‘ফ্লাট ধানিঃ, বললেন লালমোহনবাবু।

‘নাও হতে পারে,’ বলল ফেল্দুদা। ‘সবাই দরজায় নাম লাগায় না। ইন ফ্যাট, আমার বিশ্বাস এ ফ্লাটে লোক রয়েছে।’

আমরা দ্রুজনেই ফেল্দুদার দিকে চাইলাম।

‘যে কলিং বেলের বোতাম ব্যবহার ইয়ে না, তাতে ধূলো জমে থাকা উচিত। অথচ এটা ভুলো করে কাছ থেকে দেখুন, আর অন্য দ্রুটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।’

কাছে গিয়ে দেখেই বুঝলাম, ফেল্দুদা ঠিক বলেছে। দিব্য চকচক করছে বোতাম, ধূলোর লেশমাত্র নেই।

‘টিপ্পেন নাকি?’ কাপ্য গলায় প্রশ্ন করলেন জানমেহনবাবু।

ফেল্দু অবিশ্বা বোতাম টিপ্প না। তার বদলে যেটা করল, সেটা আরো অনেক বেশি তাঙ্গব ব্যাপার।—মাটিতে উপড় হয়ে স্টোন শ্বেত নাকটা লাগিয়ে দিল দরজার নিচে আধ ইঞ্চি ফাঁকটাতে। তারপর বার দুয়েক জোরে নিশ্বাস টেনে উঠে পড়ে বলল, ‘কড়া কফির গন্ধ।’

তারপর যেটা করল, সেটা অশ্বুত। লিফ্ট ব্যবহার না করে আঠারো তলা

থেকে সৰ্বভু ধরে নামতে শুনু কুল। প্রতোক তলাতেই থেমে প্রায় আধ মিনিট
ধরে দুরে দুরে কী যে দেখল তা ওই জানে।

সব সেৱে নিচে থখন নামলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ।

বেশ কুকতে পারছি দে বস্বে এসে আমরা একটা পাঁচালো রহস্যের মধ্যে
জড়িয়ে পড়েছি।

‘আপনাকে একটি জেরা করলে আপনার আপন্তি হবে না অশা করি।’

কথটা বলল ফেলুন্দা, লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য করে। মিনিট দশক হলো শিবাজী কাস্ট থেকে ফিরেছি—রিসেপশনে থকর পেরেছি যে এই আধ বছটা আগে—তার মানে যখন আমরা শিবাজী কাস্টের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন—লালমোহনবাবুর একটা ফোন এসেছিল; কে করেছিল তা জানা নেই।

‘আসলে প্লকই বাবুবাবু করছে,’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘প্লক ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।’

এখন আমাদের ঘরে বসে ফেলুন্দার প্রশ্নটা শুনে লালমোহনবাবু বললেন, ‘প্লিশের জেরাতেই যখন ফাইং কলারসে বেরিয়ে এলুম, তখন আর আপনার জেরায় কী আপন্তি থাকতে পারে?’

‘আচ্ছা, যিঃ সাম্যালের প্রথম নামটা ত আপনার জানা নেই।’

‘না অশাই, ওটা জিগ্যেস করা হ্যানি।’

লোকটার একটা পরিষ্কার বর্ণনা দিন ত। আপনার বইয়ে হেরকম আধা-থাঁচড়া বর্ণনা থাকে সেরকম নন।

লালমোহনবাবু গলা থাকবিবে ভুবন কুটকোলেন।

‘হাইট...এই ধরন গিয়ে—’

‘আপনি কি একটা মানুষের হাইটটাই প্রথম দেখেন?’

‘তা তেমন তেমন জন্ম্বা বা বেঁটে হলে—’

‘ইনি কি খুব জন্ম্বা?’

‘তা অবিশ্য না।’

‘খুব বেঁটে?’

‘না, তাও অবিশ্য না।’

‘তাহলে হাইট পরে। আগে ঘুঁথ বলুন।’

‘স্মার্থবেলায় দেখেছি; আমার বাইরের ঘরের বাল্বটা আবার চাঁচল পাওয়ারের।’

‘তাও বলুন।’

‘চওড়া মুখ। মেখ আপনার—ইয়ে, চোখে চশমা; দাঢ়ি আছে, চাপ দাঢ়ি, গোফ আছে—দাঢ়ির সঙ্গে জোড়া—’

‘ফ্রেন্ডকাট ?’

‘এই মেরেছে। না, তা বোধ হয় না। অল্পপর সঙ্গেও জোড়া।’

‘তারপর ?’

‘কাঁচাপাকা মেশানো চূল। ডান দিকে—না না, বাঁ দিকে সিঁপি।’

‘দাঁড় ?’

‘পুরিষকার। ফল্স-টীথ কলে ত ঘনে হল না।’

‘গল্যার স্বর ?’

‘আঝাৰি। মানে, গোটা না সুন্দৰ না।’

‘হাইট ?’

‘মাঝাৰি।’

‘তত্ত্বজোক আপনাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন না ? ব্যবেৰ ? বলোছিলেন অস্ত্ৰবিধি হলৈ একে ঘোন কৰবেন—বেশ হেল্পফুল ?’

‘নথেছেন ! বেমালাম ভূলে গোসলাম ! আজ যখন পুলিশ জোৰা কৰল তখনও বলতে ভূলে গোলাম !’

‘আমাকে বললেই চলাবে।’

‘দাঁড়ান, দেখি।’

লালমোহনবাবু মানিবাগ থেকে একটা ভৌজকুৰা নীল কাগজ কার করে ফেল্দুদাকে দিলেন। ফেল্দুদা সেটা খুব মন দিয়ে দেখল, কারণ শেখাটা মিঃ সান্যালের নিজেৰ। তারপৰ কাগজটা আবার ভাঁজ করে নিজেৰ বাগেৰ মধ্যে রেখে দিয়ে বলল।

‘তোপ্সে, নম্বৰটা চা তো—ট্ৰাইভ প্ৰি ফোৱ ওয়ান এইট।’

আমি অপারেটোৱকে নম্বৰ দিয়ে দিলাম। ফেল্দুদা ইংৰাজিতেই কথা বলল।

‘হ্যালো, মিস্টাৰ দেশাই আছেন ?’

অজ্ঞা ফ্যাসাদ। এই নম্বৰে মিঃ দেশাই বলে কেউ নাকি থাকেই না। যিনি আকেন তাঁৰ পদবী পারেখ, আৱ গত দশ বছৰ তিনি এই নম্বৰেই আছেন।

‘লালমোহনবাবু, ফেল্দুদা ফোনটা রেখে বলল, ‘স্যানালকে আপনাৰ নেকস্ট গাল্প বিকৃতি কৰার আশা ছাড়ুন। লোকটি অত্যন্ত গোলমেঘে এবং আমাৰ বিশ্বাস আপনি যে প্যাকেটটি বয়ে অনন্তেন সেটিও অত্যন্ত গোলমেঘে।’

লালমোহনবাবু মাথা চূলকে দৌৰ্ঘ্যবাস কেলে বলাজোন, ‘সত্তা বলতে কি ঘণ্টাই, লোকটিকে আমাৰও কেন জানি বিশেষ সুবিধেৰ কুলে মনে হয়নি।’

ফেল্দুদা হুমকি দিয়ে উঠল।

‘আপনাৰ ওই কেন জানি কথাটা আমাৰ ঘোটাই ভালো আগে না। কেন সেটা আনতে হৰে, বলতে হবে। চেষ্টা কৰে দেখুন ত পারেন কিনা।’

লালমোহনবাবুর আবিষ্য ফেলদোর কাছে ধূমক খাওয়ার অভ্যাস আছে। এটা ও জানি যে উলিসেটা ঘাইশ্ব করেন না, কারণ ধূমক থেয়ে থেয়ে ওঁর লেখা থে অনেক ইমপ্রেছ করে গেছে, সেটা উলিন নিজেই স্বীকার করেন।

লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। 'এক নম্বর লোকটা সোজাসুজি মন্ত্রের সিকে তাকিয়ে কথা কলে না। দ্বিতীয় নম্বর, সব কথা অত গঙ্গা নাম্বিয়ে বঙার কৰী দুর্বকার তাও জানি না। যেন কোনো গোপন পরামর্শ করতে এসেছেন। তিনি নম্বর...'

দৃশ্যের বিষয়, তিনি নম্বরটা থে কী সেটা লালমোহনবাবু অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না।

সাড়ে ছ'টায় সোটাসে ইভনিং শো, তাই আমরা ছ'টা মাগান্ট উঠে পড়লাম। আমরা মানে আমি আর লালমোহনবাবু। ফেলদো বলল বাবে না, কাজ আছে। বামগের ভিতর থেকে ওর সবুজ নোটেবইটা বেরিয়ে এসেছে, তাই কাজটা থে কী সেটা ব্যবহার কৰিস না।

ওয়ার্নিং ফিরে বেতে হল আমাদের, কেননা সেখানেই স্লোটাস সিনেমা। লালমোহনবাবুর বৈশ নার্টিস অবস্থা: পুরুকবাবু কেমন পরিচালক সেটা 'তীরলাজ' ছবি দেখেই ঘালুম হবে। বললেন, 'তিনটে ছবির যখন পর পর হিট করেছে, তখন একেবারে কি আর প্রয়োক-থ হবে? কী বল জপেশ?'

আমি আয় কী বলব? আমি নিজেও ত ঠিক ওই কথাটা ভেবেই মনে জোর আনছি।

পুরুকবাবু, মানেজারকে বলতে ভেলেন নি: রয়েল সার্কলে তিনটে সীট আমাদের জন্য রাখা ছিল। এটা ছবির রিপিট শো, তাই হলে এমনিভেই অনেক সীট থালি ছিল।

ইন্টারভ্যালের আগেই ব্যবহার পারলাম যে 'তীরলাজ' হচ্ছে একেবারে সেন্ট পার্সেণ্ট কোডোপাইরিন-মার্কা ছবি। এর মধ্যেই অধিকারে বেশ কয়েকবার আমরা দৃশ্যমনে পরস্পরের দিকে মৃদ্ধ চাওয়াচাওয়ি করেছি। হাসি পাঁচ্ছিল, আবার দেই সঙ্গে জেট বাহাদুরের কী অবস্থা হবে, আব তার ফলে জটায়ুর কী অবস্থা হবে সেটা ভেবে কষ্টও হাঁচ্ছিল। ইন্টারভ্যালে বাতি জুললে পর লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'গড়গারের ছেলে তুই আবাদিন এই করে চলে পাকালি?' তারপর একটা শ্যাপ দিয়ে আমার দিকে ফিরে দিললেন, 'কি পৰ্যোব পাড়ায একটা করে ধিয়েটাৰ কৰত: বলদুৰ মনে পড়ছে বি কম ফেল: —তাৰ কাছ থেকে আৱ কী আশা কৰা ঘাস বল ত?'

ইন্টারভ্যালের শেষে বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হল ছেড়ে বেরিয়ে এসাম। ভৱ ছিল, পুরুকবাবু, বা তাৰ দলের কেউ যদি বাইরে থাকে; কিন্তু সে-

রাক্ষ কাউকে দেখলাম না ।

‘ধৰ্ম জিগোস করে ত বলে দেব ফাস্ট’ ব্রাস। পকেটে করবরে নোটগুলো
না থাকলে মনটা সত্তাই ভেঙে যেত তপেশ।

গাঁড়টা হাউসের সামনেই উচ্চোদিকের ফ্লটপাথে পার্ক করা ছিল। লাল-
মোহনবাবু সেদিকে না গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে এক তোঙা ডাস্হেট, দু’
প্যাকেট মাংঘারামের বিস্কুট, ছটা কমলালেবু অরো এক প্যাকেট প্যারিয়া লজগুস
কিনে নিলেন। বলজেন, হোটেলের ঘরে বসে বসে হঠাৎ হঠাৎ খিদে পায়, তখন
এগুলো করে দেবে।

দৃঢ়নে দৃঢ়ত বোঝাই প্যাকেট নিয়ে গাঁড়তে উঠলাম, আর উঠেই বাই
করে মাথাটা ঘূরে গেল।

গাঁড়ির ভিতরে গুলবাহার সেন্টের গন্ধ।

অ্যাসার সময় ছিল না; এই দেড় ঘণ্টার মধ্যে হয়েছে।

‘মাঝা বিম কিম করছে তপেশ,’ বলজেন লালমোহনবাবু। ‘এ ভূতের উপন্থৰ
ছাড়া আর কিছুই না। সান্যাল থুন হয়েছে, আর তার সেশ্টমাথা ভূত আমাদের
ঘাড়ে চেপেছে।’

আমার মনে হল—ঘাড়ে ময়, গাঁড়তে চেপেছে; কিন্তু সেটা আর বললাম
না।

ড্রাইভারকে জিগোস করাতে সে বলল, সে বেশিরভাগে সময় গাঁড়তেই ছিল,
কেবল মিনিট পাঁচকের জন্য কাছেই একটা রেডিও-টেলিভিশনের দোকানের
সামনে দাঁড়িয়ে ফ্ল খিলে হায় গুলশন গুলশন দেখেছে। হ্যাঁ, গন্ধ সেও পাচ্ছে
ইয়াক, কিন্তু গাঁড়ির ভিতরে কী করে এমন গন্ধ হয় সেটা কিছুতেই তার মগজে
চুক্ষে না। ব্যাপারটা তার কাছেও একেবাবেই অজ্ঞ।

হোটেলে ফিরে এসে কথাটা ফেল্দাকে বলতে ও বলল, ‘রহস্য যখন জাল
বিস্তার করে, তখন এইভাবেই করে লালমোহনবাবু। এ না হলে জাত-রহস্য হয়
না, আর তা না হলে ফেল্দাকি মিস্ত্রীর মিস্তজ্জপূষ্ট হয় না।’

‘কিন্তু—’

‘আমি জ্ঞান আপনি কী প্রশ্ন করবেন লালমোহনবাবু। না, কীবৰা এখনো
হয়নি। এখন শুধু জালের কারেকটারটা বোঝার চেষ্টা করছি।’

‘তুমি বৰাবৰেছিলে বলে মনে হচ্ছে?’—আমি ধীঁ কলেঁ-কফ্ট গোলেন্দা-মার্কা
প্রশ্ন করে বসলাম।

‘সাবাস তোপ্সে। তবে হোটেল থেকে বেরোইলৈ। এটা নিচে রিসেপশনেই
দিল।’

ফেল্দার পাশে একটা ইঞ্জিনার এয়ার লাইনসের টাইমটেবল ছিল। সেটা

দেখেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম।

‘দেখছিলাম কাঠমুকু থেকে কটা ফ্লাইট কলকাতায় আসে, আর কখন আসে?’

কাঠমুকু বলতেই একটা জিনিস ফেলে দাকে জিগোস করার কথা মনে পড়ে গেল।

‘ঝাজুক, ইনসেপ্টর পটবর্ধন যে নানা-সাহেবের কথা বলেছিলেন, সেটা কোন নানাসাহেবে?’

‘ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নানাসাহেবই বিশ্বাত।’

‘হিনি কিপাহী বিদ্রোহে বৃটিশদের সঙ্গে লড়েছিলেন?’

‘লড়েওছিলেন, আবার তাদের কাছ থেকে আবাককার ভনা দেশ ছেড়ে পালিয়েওছিলেন। হাজির হয়েছিলেন গিরে একেবারে কাঠমুকু। সঙ্গে ছিল যমুনা ধনবর—ইন্দ্রজিৎ হৌরে আর মুক্তেয় গাঁথা একটি হার—আর নাম নওলাথা। সেই হার শেষ পর্বত চলে যায় নেপালের জং বাহাদুরের কাছে। তার পরিবর্তে জং বাহাদুর দুটি গ্রাম দিলেছিলেন নানা সাহেবের স্ত্রী কাশী-বাইকে।’

‘এই হার কি সেপাল থেকে চূরি হয়ে গেছে নাকি?’

‘পটবর্ধনের কথা শুনে ত তাই মনে হয়।’

‘আমি কি এই হারই পাচার করে বসলুম নাকি ঝশাই?’ লালমোহনবাবু তারস্বরে চেঁচিয়ে প্রশ্নটা করলেন। ফেলে দাক, ভেবে দেখন। ইতিহাসে হৌরের অক্ষরে লেখা থাকবে আপনার নাম।’

‘কিন্তু...কিন্তু...সে তো তাহলে ব্যাস্থানে পৌছে গেছে। সে জিনিস দেশ থেকে বাইরে যায় কি না বায় সে ত দেখবে পুলিশ। আপনি কী নিয়ে এত ভাবছেন? আপনি নিজেই কি এই শহাগলারদের—’

ঠিক এই সময়ই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আর লালমোহনবাবুর দিকেই ওটা ছিল বলে উনি তুলে নিলেন।

‘হ্যালো—হাঁ, আমে ইয়েস—স্পীকিং।’

লালমোহনবাবুরই ফোন। বোধ হয় পুলকবাবু। না, পুলকবাবু না। পুলকবাবু এমন কিছু বলতে পারেন না যাতে লালমোহনবাবুর ঘুথ অতটা হাঁ হয়ে যাবে। আর টেলিফোনটা কাঁপতে কাঁপতে কান থেকে পরিছয়ে আসবে।

ফেলে দাক ভদ্রলোকের হাত থেকে ফেলেন্টা নিয়ে একবার কানে দিয়ে বোধহয় কিছু না শুনতে পেয়েই সেটাকে ব্যাস্থানে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করল, ‘সান্যাশ কি?’

মাথা নেড়ে হাঁ বলতেও বেন কষ্ট হল ভদ্রলোকের। বুকলাশ যাস্লগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে না।

‘কী বলল?’ আবর ফেল্দু।

‘বলল—’ লালমোহনবাবু গা-বাড়া দিয়ে মনে সাহস আনার চেষ্টা করলেন।

বলল—‘মু-মুখ খুললে পেপ্র-পেট ফাঁক করে দেবে।’

‘যাক—ভালো কথা।’

‘আৰা!—বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ফেল্দুর দিকে চাইলেন লাল-মোহনবাবু। আমার কাছেও এই অবস্থায় ফেল্দুর হাঁপ ছাড়াটা বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছিল। ফেল্দু বলল, ‘শুধু গুলবাহারের গম্বুজ হচ্ছিল না। কুর হিসেবে ওটা বড় পলকা। এমনকি লোকটা সাত্য করে বসে এসেছে না অন্য কেউ সেচ্চেটা ব্যবহার করছে, সেটাও বোঝা যাচ্ছিল না। এখন অন্তত শিশুর হওয়া গেল।’

‘কিন্তু আমার পেছনে খাগড়া কেন?’

মরিয়া হয়ে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

‘সেটা আনলে ত বাজিমাত হয়ে যেত লালমোহনবাবু। সেটা ভানুর অন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে।’

লালমোহনবাবু ভিনারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না, কারণ তাঁর নাক একদম খিদে সেই। ফেল্দুদা বলল তাতে কিছু এসে যাবে না, কারণ দৃশ্যের কপার চিমনিতে পেট পুজোটা ভাঙলাই হয়েছে। সেতা বলতে কি, আমদের মধ্যে লালমোহনবাবুই সবচেয়ে বেশি খেয়েছিলেন।

আওয়ার পথ গতকাল ভিনজনেই বেরিয়ে গিয়ে পান কিনেছিলাম। আজে লালমোহনবাবু কিছুতেই বেরোতে চাইলেন না। বললেন, ‘ওই ভিড়ের মধ্যে কে যাচ্ছে মশাই? সান্যালের লোক নির্ধার হোটেল এস্ত করতে, বেরোলৈ চাকু।’

শেষ পর্যন্ত ফেল্দুদাই বেরোল, লালমোহনবাবু আমদের ঘরে আমার সঙ্গে বসে রইলেন। আর বারবার থাঁচ বলতে লাগলেন, ‘কী কুক্ষণেই বইয়ের প্যাকেটটা নিয়েছিলাম।’ কর্মে বর্তমান সংকটের মূল কারণ থাইজতে থাইজতে ‘কী কুক্ষণেই হিন্দি ছবির জন্য গৃহপ লিয়েছিলাম’, আর সব শেষে ‘কী কুক্ষণেই রহস্য উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম’ পর্যন্ত চলে গেলেন।

‘আপনার এক শুতে ভয় করবে না ত?’ ফেল্দুদা পান বিলি করে জিশ্যেস করুল। লালমোহনবাবু কোনো উচ্চবাচা করছেন না দেখে ফেল্দুদা আশ্বাস দিয়ে বলল, ‘আমদের ঘর থেকে বেরিয়েই প্যাসেজের ধরে একটা ছোট্ট ঘর আছে দেখেছেন ত? ওখানে সব সময় বেঁচাবা থাকে। হোটেলে সামারাত কেউ না কেউ জেগে থাকে। এ তো আর শিবাজী কাস্ল না।’

শিবাজী কাস্ল নামটা শুনে লালমোহনবাবু আরেকবার শিউর উঠলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে সাহস এনে দশটা নাগাত গুড়নাইট করে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সারাদিন বস্বে চৰে বেড়ানোর চেয়েও প্লকবাবুর ছবির অর্ধেক দেখে অনেক বেশি কাহিল লাগছিল, তাই জটায়ু চলে যাবার মিনিট দশকের অধোই শুরু পড়লাম। ফেল্দুদা যে এখন শেবে না সেটা জানি। ওর নোটবুকটা থাটের প্যাশেই টেবিলের উপর রাখা রয়েছে, সারাদিন খেপে খেপে তাতে অনেক কিছু সেখা হয়েছে, ইয়ন্তে আরো কিছু জেখা হবে।

আমি অনেকদিন চেষ্টা করেছি রাত্রে বিছানায় শয়ে চোখ বজে থেকাল আর্থতে ঠিক কোন সময় ঘট্টটা আসে, কিন্তু প্রতিবারই পরদিন সকালে উঠে

বুঝেছি ঘুমটা কখন জানি আমার অজ্ঞানতেই এসে গেছে। আজও কখন ঘুমিয়েছি সেটা তের পাইনি। ঘুমটা ভালুক দুরজ্ঞায় ঘন ঘন ধীকা, আর সেই সঙ্গে বোতাম টেপের চাঁ শব্দে। উঠে দীর্ঘ ফেলুদার লাম্প তখনে জ্বলছে আর বালিশের পাশে রাখা আমার ঘুড়তে বলছে পৌনে একটা। ফেলুদা দরজা খলতেই হুগড়ি দিয়ে প্রবেশ করলেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু হাঁপালেও তিনি যে খব ভয় পেয়েছেন সেটা কিন্তু মনে হল না, আর যে-কথাটা বললেন ঘরে ঢুকেই, সেটাও ভয়ের কথা নয়।

‘কেলেক্টরীরসাম বাপার মশাই!'

‘আগে যাটে এসে বসন’, বলল ফেলুদা।

‘দ্বি মশাই, বসব কি—এই দেখন—কাটম্বুর কী মহাঘূর্ণ ধনরত্ন আমার হাত দিয়ে পাচার করা হচ্ছিল।’

লালমোহনবাবু ফেলুদার সামনে যেটা এগিয়ে ধরলেন সেটা একটা বই। ইংরিজি বই, আর নামকরা বই; লালসভাউনের মোড়ের দোকানে একটা রাখা ছিল সেদিনও দেখেছি। বইটা হল শ্রীঅর্বিম্বের জ্ঞেন দ্য লাইফ ডিভাইন।

ফেলুদারও চেখ কগালে উঠে গেছে।

‘তার উপর আবুর বাঁধাইয়ের গণগোল’, বললেন লালমোহনবাবু। ‘প্রথম টিশ প্লাটের পর কয়েকটা পাতা পরম্পরের সঙ্গে সেঁটে আছে। এ বই না দেখে কিনলে ত পুরো টাকাটা ডেড লস্ মশাই। পাঁড়চোৰীর বাইন্ডার এরকম কাঁচা কাজ করবে ভাবতে পারেন?’

‘তাহলে সেদিন কী দিলেন লালসাটের হাতে?’ জিগোস করল ফেলুদা।

‘জানেন কী দিলুম. ভাবতে পারেন? আমার নিজের বই মশাই, নিজের বই!—বোম্বাইয়ের বোম্বেটে! পুরুককে ত পান্তুলিপির কাপি পাঁঠৰেছিলুম, তাই এবার ভাবস্থ এক কাপি ছাপা বই দেব—উইথ মাই ব্রেসিংস আ্যান্ড মাই অটোগ্রাফ। আরো তিন কাপি রয়েছে এখনো আমার বাগে, প্রতোকটি ব্রাউন কাগজে মোড়া। আমার ভুক ত সারা ইন্ডিয়াতে ছাড়িয়ে রয়েছে—তাই ভবলুম, বয়ে যাচ্ছি, যদি এক-আধজনের সঙ্গে অলাপাটালাপ হয়ে থার, তাই স্লে এনেছিলুম, আর তারই একটা কাপি—হোঁ হোঁ হোঁ হোঁ।’

এত হীলকা লালমোহনবাবুকে অনেকদিন দেখিনি।

বইটা হাতে নিয়ে নেজেচেড়ে ফেলুদা বলল, ‘কিন্তু সাম্যাত্মক টেলিফোনে দৃশ্যক দিল সেটা কী বাপার? এর সঙ্গে লাইফ ডিভাইন-খল খাজে কি?’

লালমোহনবাবু এতেও দমলেন না।

‘কে বলল সাম্যাত? টেলিফোনে অন্ত গলা ছেন্না থায় মাকি? কোনো উটকো বদমাস রাস্মকতা করছে হয়ত। বোম্বাইতে যদি তীরন্দাজ ছবি ছিট

হতে পারে ত সবই স্বত্তে পারে।'

'আর গাড়িতে পড়লবাহার সে-টে ?'

'ওটা ওই প্লাইভেলাই মাথে। কিরকম টেরির বাহার দেখেছেন ? শৌখীন লোক। ধুৱা পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে স্বীকার করলে না।'

'তাহলে আর কী, নিশ্চলে ঘুমোন গিয়ে।'

ক্ষে আর বলতে। মাথাটা ধরেছিল বলে ব্যাগটা খুলেছিলুম কোড়ো-প্লাইরিনের জন্য, আর তাতেই এই হাইভোলেটেজ আবিষ্কার। যাক, রহস্য শখন মিটেই গেল, তখন আপনিও বরং একটু আধ্যাত্মিক বিধ্বংশ অধ্যয়নে মনো-নিবেশ করুন। বইটা রেখে গেলুম। গুড নাইট।'

লালমোহনবাবু চলে গেলেন, আর আমি আবার জারগায় এসে শুল্পাম।

'মে লোক অর্বাবদের বইয়ার বদলে জটায়ুর বই পেল তার মনের অবস্থা কী হবে ফেলুন ?'

'খেপচূরিয়াস', বালিশ মাথা দিয়ে বলল ফেলুন। মাথার পিছনের বাঁতুটা ও জবালিয়েই রাখল। দেখে হাসি পেল ফেলুন তার সবুজ নোটবই সরিয়ে রেখে অর্বাবদের লাইফ ডিভাইনের পাতা ওলটাল।

আমারে বিশ্বাস ঠিক ওই সময়টাতেই আমার চোখ ঘুমে বশ হল।

বন্দে থেকে পুরো বাবাৰ পথে খান্ডালা আৰ লোনাউলিৱ মাঝেছাধি একটা লেভেল কুসঁ-এৱে কাছে আমাদেৱ ষেতে হবে শৃঙ্খল দেখতে। ছবিৰ এগাৰোটা ক্লাইম্যাস্টেৱ শেষ ক্লাইম্যাস্ট দশা তোলা হবে আজ। একদিনে কাজ শেষ হবে না, পৰ পৰ আৱো চাৰিদিন ষেতে হবে সবাইকে। আহৰণ ঠিক কৰেছি আজ হানি ভালো লাগে তহলে বাকি ক'নিমও যাৰ। টেলটা এই পাঁচদিনই পাওয়া যাবে, প্রতিদিনই ঠিক একটা থেকে দৃঢ়ো—অৰ্থাৎ এক হণ্টাৰ জন। ডাকাত-দলেৱ যোড়া আৰ হিৱোৱ লিংকন কন্তুৱিটিবল থাকবে সামাদিনেৰ জন। ভিলেন ইঞ্জিন ড্রাইভারেৱ জায়গা দখল কৰে ট্ৰেন চালিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই ট্ৰেনেৰই একটা কামডায় হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে হিৱোইন আৰ তাৰ কাকা। মোটৱে কৰে হিৱো ট্ৰেনেৰ উন্দশে ধাওয়া কৰছে। এদিকে হিৱোৰ ষে হাঙ্গ ভাই—ধাকে ছেলেবেলায় ডাকাতে ধৰে নিয়ে গিয়েছিল, আৱ যে, এখন কিন্তেই ডাকাত—সে আসছে যোড়া কৰে দখল নিয়ে ট্ৰেনটাকে আঢ়াক কৰবে বলে। মোটৱে হিৱো এসে পৌছানৰ প্ৰায় সংখে সংখেই ডাকাত ভাই যোড়া থেকে চলান্ত ট্ৰেনে জাফিয়ে পড়ে। এঞ্জিনেৰ ভিতৱ ফাইট হয়, ভিলেন-ড্রাইভার থতম হয়। সেই সময় মোটৱে কৰে হিৱো এসে পড়ে, আৱ তাৰপৰ... বাকি অশ রূপালী পৰ্দায় দেখিবেন। আসলে শেষটা নাকি তিনৰকম ভাৱে জেলা হবে, তাৰপৰ পৰ্দায় দেখে যেটো দৰিশ ভালো লাগে সেটা বাধা হবে।

প্ৰকৰণৰ সকালে তিন মিনিটেৰ জন্য ট্ৰে মেৰে গেছেন। আমাদেৱ ধাৰণ্যা সব ঠিকঠক জেনে বপলেন, 'লালমা, আপনাকে দেখেই বুৰতে পাৱছি তীৰম্বাজ আপনার খুব ভয়ো লেগেছে।'

আসলে লাজমোহনবাৰ, সকাল থেকেই বাস্তিৱেৰ ঘটনাটা ভেবে ক'নে ক'জো আপন হনে হেসে ফেলাইলেন: প্ৰকৰণৰ সামনে সেই হাসিটাই বৈঞ্জনিকে পড়েছিল। এখন প্ৰকৰণৰ কথা শুনে আৱো জোৱে হেসে বললেন, 'ওঃ—গড়পাৱেৰ ছেলে—তুমি দ্বাৰালে ভাই—হ্যাঃ!'

ফিরতে রাত হবে, তাই ফেল্দা বলল হাত-বাগগলো সংখ্যে নিয়ে নিতে, কালকৈৰ কেনা: কমপ্লাজেন, বিস্কুট, লজপ্টস ইত্যাদি ভিতৰ বাগে ভাগ কৰে দেওয়া হল, আৱ লালমাহনবাৰ ক্যাশ দশ হাজাৰ টাকা মানেজাৱেৰ তিম্বাৰ সিলদুকে রেখে রাসিদ নিয়ে নেওয়া হল। 'ক'নি জানি বাবা,' উদ্দলোক বললেন,

ফিলিহের ডাকাতের খলে আসল ডাকাতও বে ঢুকে পড়বে না এক-আঢ়া
তার কী গ্যারান্টি?

ফেলুন্দু মুকামে একবার বেরিয়েছিল, বলল ওর সিগারেটের পটক নার্কি
ফ্রাইডেক, যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাছাকাছির মধ্যে নাও পাওয়া যেতে পারে।
ও মুঝার দশ মিনিটের মধ্যে আমরা ব্রহ্মা দিলাম। আজও দেখলাম
গুরুত্বতে গুলবাহারের গুরু কিছুটা রয়ে গেছে।

বন্দে থেকে থানা স্টেশন প্রায় পাঁচিশ কিলোমিটার। সেখান থেকে রাস্তা
ডাইনে ঘূরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে পুণ্যর দিকে চলে গেছে। এই রাস্তায়
আশি কিলোমিটার গেলেই খান্ডালা। আজ দিনটা ভালো, আকাশে টুকুরা
টুকুর। যেব হাওয়ার তেজে তরতুর করে ভেসে চলেছে, তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক
দিয়ে রোদ বেরিয়ে বেস্বাই শহরটাকে বায় বার ধূরে দিচ্ছে। প্লাকবাবু
কলে গেছেন শুটিং-এর জন্য এটা নার্কি আইডিয়াল ওয়েদের। লালমোহনবুর
অবিশ্বাস আজকে সব কিছুই ভাস্তা লাগছে। থালি খলি বললেন, 'বালেত
শাবার আশি মিটে গেল মশাই। বাসে সোক ব্লুলে না সেটা লক্ষ্য করেছেন?
কে—কী সিভিক সেন্স এদের!'

থানা পেটিছতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এখন সোয়া নট। হাতে সময় আছে,
তাই আমরা তিনজন আর ড্রাইভার স্বরূপসাল একটা চারের মোকাবের সামনে
গাড়ি দাঁড়ি করিয়ে এলাচ দেওয়া চা খেয়ে নিলাম।

থানা ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমরা ওয়েপটোর্ন ঘাটস-এর
পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি। টেনলাইন আর এখন আমদের পাশে নেই; সেটা
থানার পরেই উত্তরে ঘূরে চলে গেছে কলাপ। কলাপ থেকে আবার দক্ষিণে
ঘূরে সেটা মাথেরান হয়ে ঘূরে পুণ্য, মাঝপথে পড়বে আমদের লোতেল ভুসং।

পথে লালমোহনবুর গলায় কমলালেবুর বিচি আটকে গিয়ে বিষম জগ্না
ছাড়া আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফেলুন্দার মনের অবস্থা কী সেটা ওর মুখ
দেখে বোঝা যাচ্ছে না। ও গন্ডোলীর মানেই যে চিল্লত, সেটা ফেলুন্দার বেলায়
ঘাটে না এ আমি আগেও দেখেছি।

সাড়ে দুরোটা মাগাদ খান্ডালা ছাড়িয়ে মাইল থামেক হেতেই সামনে দূরে
রাস্তার ধারে একটা জয়গায় মনে হল যেন মেলা বসেছে। তারপর মনে ইল,
মেলায় গুত গাড়ি থাকবে কেন? আরো কাছে যেতে গাড়ি আর মানুষ ছাড়া
আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল, সে হচ্ছে মেঢ়া। এবাবে ব্রহ্মলোক ভিড়টা অসলে
হচ্ছে জেট বাহাদুরের শুটিং-এর দল। সব গিলিয়ে অন্তত শ'খানেক লোক,
শাক্রপাঁটুরা ক্যামেরা আলো রিফ্লেক্টর সতরাণি—সে এক এলাহি ব্যাপার।

আমাদের গাড়িটা একটা আশ্বাসান্তির আর একটা ধাসের মাঝখানে একটা

ফাঁক পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে থেঁথে গেল। আমরা নমোর সঙ্গে সঙ্গেই প্লক-বাবু এগিয়ে এলেন—তাঁর মাথায় একটা সাদা ক্যাপ আর গলায় ঝুলোন একটা দুরবীনের মতো ঘন্ট।

‘পুজ মর্নিং! সব ঠিক হ্যায়?’

আমরা তিনজনেই শাথা নেড়ে ইয়েস জানিয়ে দিলাম।

শনুন—মিট্টির গোরের ইনপ্রোকশন-উনি যাথেরানে আছেন বেখান থেকে ঢেন আসছে। রেল কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে কথাখাতা আছে; কিছু পেমেন্টও আছে বোধহৃষ। উনি টেনের সঙ্গেই চলে আসবেন, অথবা মোটরে করে আসবেন। আপনারা ছেন্ট এলেই খবর পেয়ে যাবেন। যোট কথা, উনি আসুন বা না আসুন, আপনারা ফাস্ট ক্লাসে উঠে পড়বেন। অল ক্লিয়ার?’

‘অল ক্লিয়ার,’ বলল ফেল্দু।

বোম্বাইয়ের যিন্ম সাইন যে এত বাঙালী কাজ করে এটা আমার ধারণা ছিল না। তার মধ্যে কেউ কেউ হে ফেল্দুকে চিমে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য কৰি? কামেরাম্যান দাশু ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হতেই তার চোখ ঝুঁচকে গেল।

‘মিস্ট্রি? আপনি কি ডিটেক—?’

‘খরেছেন ঠিক, কিন্তু যেপে রাখুন,’ বলল ফেল্দু।

‘কেন মশাই? আপনি ত আমাদের প্রাইভেট সেবারে এলোরার মুক্তি চুরিয়ে ব্যাপারটা—’

ফেল্দু আবার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভদ্রলোককে থামাল।

দাশুবাবু এবার গলা নামিয়ে বললেন, ‘আবার কোনো তদন্ত-টেস্ট করছেন নাকি এখানে?’

‘অজ্ঞে না’, ফেল্দু বলল, ‘কেন বেড়াতে এসেছি আমার এই বন্ধুরির সঙ্গে।’

দাশু ঘোষ একুশ বছর বয়েতে থেকেও নিয়মিত বাঙলা উপন্যাস পড়েন, এমন কি জটায়ুর বইও পড়েছেন দ্রষ্টিন্তে। এ দৃশ্যে অবিশ্বাস উনি ছাড়া আরো দুজন কামেরাম্যান কাজ করছেন; তাঁরা অবঙ্গালী। প্লকবাবুর চাকুরিল আসিস্টান্টের দ্রুজন বাঙালী। যাঁরা আকতিং করবেন তাঁদের মধ্যে অবিশ্বাস কেউই বাঙালী নেই। অজ্ঞেন মেরহোঢ়া ছাড়া আর আছেন ভিজেনবেশী মিকি। শুধু মিকি; পদবী করবার কয়েম না। বোম্বাইয়ের উচ্চিতা ভিলেনের মধ্যে টপ, একসংগে সাইটিশাট ছবি সই করেছেন, যদিও তাঁর মধ্যে উন্নাপুশ্টার গাপ্পো চেঞ্জ করে ফাইটের সংখ্যা কমাতে হচ্ছে। ডাগো/জেস্ট বাহ্যদূর-এ মাত্র চারটে ফাইট, না হলো প্লকবাবু, আর যিষ্টার গোবেজেকও মাথা ছুলকোতে হত।

এসব খবর জামাদের দিলেন প্রোডাকশন মানেজার সুমিশ্রন বাস। ইনি



উত্তরাধিকার লোক, অনেকদিন ব্যবহৃত রয়েছেন, তবে এ ছবিটা হয়ে গেলেই নাকি কটক ফিরে গিয়ে নিজে উত্তরাধিকার পরিচালনা করবেন।

ফেল্দা ইতিমধ্যে হাটতে হাটতে চলে গেছে অস্রেকটা জটিলার দিকে। সেখানে ডাকাতের দলকে মেক-আপ করে পোশাক পরানো হচ্ছে। একজন ডাকাতের সঙ্গে ফেল্দাকে দীর্ঘ ধার্চিং করতে দেখে একটা অবাক হয়েই এগিয়ে গেলাম। তারপর ডাকাতের গলা শুনে দ্বীপলভ—ওম, এ যে কুং-ফু এক্সপার্ট ভিকটর পেছুমল। হিরোর যমজ ভাইয়ের মেক-আপ করা হয়েছে তাকে। ছুটিস্ত ষোড়া থেকে লাফিয়ে চল্লিত প্রেমের ছাতে পড়তে হবে, তারপর ছাটা কামরার ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে একেবারে এঁঞ্জিনে পেঁচাই ভিলেন-বেশী দিকিকে ঘারেল করতে হবে। তারপর হিরো আর তার বিশ-বছর-ব্যান্ডেখা ডাকাত-বনে-যাওয়া ভাইয়ের হয়ে হাই-ভোলেটেজ সংঘর্ষ।

লালমোহনবাবু এই এলাহি বাপার দেখে কেমন জানি চুপ মেরে গেছেন, যাদিও তবে দেখলে তাঁর ফ্রার্ট হবার কথা, কারণ তাঁর গল্পকে ঘিরেই এত

হৈ-হল্লা। বললেন, 'একটা গম্প লিখ এতগুলো লোককে এত হ্যাঙ্গাম এত পারিশ্রম এত খরচের মধ্যে ফেলিছ এটা ভাবতে একটা পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছে তপেশ। এক এক সময় নিজেকে রীতিমত শিক্ষালী বলে মনে হচ্ছে। মাঝে যারে আবার গিলটি মনে হচ্ছে; আবার সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে যে এরা দেখককে কোনো সম্মান দেয় না। কটা লোক এখানে জটারুর নাম জানে সেটা বলতে পার ?'

আমি সান্ধুনা দেবার জন্য বললাম, 'ছবি যদি হিট হয় তাহলে নিচেরই জানবে !'

'আশা কৰি !'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লালমোহনবাবু।

বেসর ডাকাতের মেক-আপ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে চেপে ছটোছুটি আবস্ত করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো একটা বিশাল বট-গাছের তলায় ভর্ডা হয়ে ছিল। গুণে দেখলাম সব শুধু নটা।

মিনিট খানেকের মধ্যেই নীল কাচ তোলা একটা প্রকাণ্ড সাদা লিংকন কনভার্টিবল গাড়িতে হিরো আর ভিলেন এসে হাজির হল। হিরোইনের দরকার লাগবে না, কারণ ত্রেনের কামরায় বন্দী অবস্থায় তার শুটগুলো নাকি স্ট্রাইকে তোলা হবে। সেটা এক হিসেবে ভালো। এই দুই প্রৱৃষ্ট তারকা গাড়ি থেকে নামতেই চারিদিকে মা শোরগোল পড়ে গেল, হিরোইন থাকলে না জানি কী হত।

সুদৰ্শনবাবু চা এনে দিয়েছিলেন, আমরা খাওয়া শেষ করে পেয়ালা ফেরিত দিচ্ছ এমন সময় বাজখাই গলায় লাউডস্প্রিকারের হাঁক শেনা গেল—'ত্রেন কামিৎ ! ত্রেন আতি হ্যায় ! এভরিবাডি রেডি !'

বৃক্ষ-ক্ষেত্রের সঙ্গে কালো ধৌঁঁলা ছাড়তে আটটা বোঁগি সমেত পুরোন টাইপের এঞ্জিনটা বখন লেভেল কুসং-এর কাছে এসে দাঁড়াল তখন দ্বিতীয়ে ঠিক একটা খাজতে পাঁচ হিন্ট। ফাস্ট ক্লাস কামরা যে মত একটীই, আর সেটা ও যে পুরোন ধাঁচের, সেটা দূর থেকেই দ্বৰতে পারছি। অন্য কামরা-গুলোতে থাথেরান থেকেই প্যাসেজার বিসিরে দেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে ছেলেমেয়ে বৃক্ষবৃক্ষী স্বরকৃতি আছে। তেন প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গেই পুরুক্বাবুর ব্যস্ততা একবারে স্পতমে চড়ে গেছে। তিনি একবার এ কামেরা থেকে শু কামেরায় ছুটে যাচ্ছেন, একবার হিরো থেকে ভিলেন, একবারে এ-আসিস্ট্যান্ট থেকে ও-আসিস্ট্যান্ট। লালমোহনবাবু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, 'না মশাই, শুধু টাকা দিয়ে ছবি হব না এটা বোকা যাচ্ছে।'

হিরোর গাড়ি রেইড, কালো চশমা পরে স্টেরোরিং ধরে বসে আছে অর্জুন মেরহেত্তা, পাশে তার নিজের মেক-আপমান আর দৃঢ়ন ছেকরা টাইপের লোক, বোধহয় চামচা-টামচা হবে। অর্জুনের সামনে একটা হৃজখোলা জীপে তেপারা স্টাম্পের উপর কামেরাও রেজি। ভিলের সমেত ডাকাতের দল ঘোড়ার পিটে আগেই এগিয়ে গেছে। তারা চলন্ত তেন থেকে সিগনাল পেলে একটা বিশেষ পাহাড়ের বিশেব জায়গা থেকে নেমে এসে তেনের পাশে পাশ দৌড় আরম্ভ করবে। ভিলেন নিকিকে দেখলাম পুরুক্বাবুর একজন সহকারীর সঙ্গে এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাদের কী করা উচিত ঠিক ধূরতে পারছি না। কারণ মিঃ শ্যোরের দেখা নেই। শিশি তেনেই এসেছেন কিনা সেটা ও ধূরতে পার্য্যে না।

ভিড় পাল্লা হয়ে গেছে অথচ আমাদের দিকে কেউ আসছে না দেখে লালমোহনবাবুর উসখস্ট্রনি আরম্ভ হয়ে গেল। বললেন, 'ও ফেলুবাবু, এরা কি ভুলে গেল নাকি আমাদের?'

ফেলুবা বলল, 'একটিই মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা; কথা হতো সেটাতে গিয়েই তো উচিত অমাদের। দেখি আরো দু হিন্ট।'

দু হিন্টের আগেই, এঞ্জিন থেকে দুটো ই-ইসল শোনা গেল, আর হস্ত মুহূর্তেই সুদর্শন দাশের হাঁক।

'এই যে, আপনারা চলে আসুন, চলে আসুন!'

আমরা হাতে বাগ নিয়ে দৌড় দিলাম। সুদৰ্শনবাবু আমাদের ফাস্ট ক্লাশের দরজা অবধি পেঁচে দিলেন। বললেন, 'আমি ত কিছুই জানতাম না। এইম্যাট একজন স্লোক এসে থবু দিলে—বললে গোরে সাহেব জাধবপুর মধেই এসে পড়বেন। প্রথম শটের পর টেন আবার এইখানেই ফিরে আসবে।'

কামরায় উঠে দেখি একটা বেঁশের উপর একটা বড় জলের ফ্লাম্ব, আর সাফারি রেস্টোর্যান্টের নাম লেখা চারটে সাদা কাগজের বাজ্জ। অর্ধাং আমাদের লাগ্ত। এত বাস্ততার মধ্যেও ড্রুলেকের যে অশ্চর্ষ খেয়াল সেটা স্বীকার করতেই হবে।

আরেকটা হাইসেলের সঙ্গে একটা বাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা তিনজনে ঝানাজান দিয়ে বাইরের কান্ডকারখানা দেখবার জন্য তৈরি হলাম। একেবারে নজুন অভিজ্ঞতা, তাই মনে একটা বেশ রোমাঞ্চ ভাব হীচ্ছল।

গাড়ি কুমশ স্পীড নিচ্ছে। ডান পাশ দিয়ে রাস্তা দেছে, সেদিকের বেঁশতেই বসেছি আমরা তিনজন। বাঁদিকে পাহাড় পড়বে, অর্ধাং সেটা হল ডাকাতের দিক। ডান দিকটা হিরোর দিক।

আরো একটু স্পীড বাড়ার পর ডান দিকের রাস্তা দিয়ে প্রথমে ক্যামেরা সঙ্গে জীপ, তারপর হিরোর গাড়ি আসতে দেখে গেল। এখন অবিশ্য হিরো ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। ক্যামেরার মুখ্যটাও যে তার দিকেই ঘোরানো সেট। ব্যবতে পারলাম। যিনি ছবি তুলছেন তিনি ছাড়া আরো তিনজন স্লোক রয়েছেন, তার মধ্যে একজন হল প্লকবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে হাতে একটা চোঙা নিয়ে তার ভিতর দিয়ে হিরোকে 'ডাইনে তাকাও' 'বাঁয়ে তাকাও' ইত্যাদি নির্দেশ দিচ্ছে।

আর দূর্টো ক্যামেরার একটার সঙ্গে প্লকবাবু রয়েছেন—সেট। রয়েছে টেলেপ্রিই একটা ক্যামেরার ভিতর। তৃতীয় ক্যামেরাটা রয়েছে টেলের পিছন দিকের শেষ কামরার ছাতে।

হিরো তেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছে না। দেখে আমর মনটা দয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুন্না বলল ওটা ছবিতে নাকি জোরেই হলে হবে, কারণ ক্যামরাকুল্পস্পীড করিয়ে শুটটা নেওয়া হচ্ছে।

'তাছাড়া অতটা আস্তে ভাৰছিস ততটা আস্তে কিন্তু খালেছ'না গাড়িতা, কারণ আমাদের টেলটাও ত ছলেছে সঙ্গে সঙ্গে, আর চলেছে মেশ জোরেই।'

ঠিক কথা। এটা আমার খেয়াল হয়নি।

কিছুহিংগের মধ্যে ক্যামেরা আর হিরোর গাড়ি আমাদের ক্যামরা ছাড়িয়ে চলে গেল। পুরোন কামরা, তাই ঝানালার গুরুদ নেই; গলা খাড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ফেলুন্না বাধা দিয়ে বলল, 'জট কাহাদুর হাবি



দেখতে গিয়ে ঘাঁদি পর্দায় দোখস তুই গলা বাঁজিয়ে শৃঙ্খিং দেখছিস, সেটা কি
খুব ভালো হবে।'

লোভ সংবরণ করে উলটো দিকের জনালার ধারে বসব কলে সৌচি ছেড়ে
মাঁজিয়েছি, ঠিক সেই সময় নাকে গম্ভীর এল।

ফেল্দা দেখি আর আমার পাশে নেই। তার দ্রুত বাথরুমের দরজার
দিকে, সে এক লাফে উলটোদিকে চলে গেছে, তার ভাল হাত কোটের পকেটে।

বন্দুক বার করে লাভ নেই মিস্টার মিস্টার। অলরেডি একটি রিভলবার
আপনার দিকে পর্যন্ত করা রয়েছে।'

এবার দেখলাঘ পাহাড়ের দিকের দরজাটা খুলে গেল। একজন লোক হাতে
একটি রিভলভার নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দরজার ঘুর্খেই দাঁজিয়ে রইল।
একে কি দেখোছ আগে? হ্যাঁ—এইত সেই লাঙ্সস্টার! কিন্তু আজ এর পেঁচাক
অন্ত, আর চেহারায় যে হিস্তি ভাব দেখছি সেটা সেদিন এয়ার পোটে দেখিন।
আজ এই অবস্থায় দেখে ব্যর্থ লোকটা একেবারে নিখাদ খুনে। তার হাতের
রিভলভারটা তাগ করা রয়েছে সোজা ফেল্দার দিকে।

এবার বাথরুমের দরজাটা অল্প ফাঁক অবস্থা থেকে পুরো খুলে গেল, আর
সেই সঙ্গে কান্দাটা গুলবাহরের গাঢ়ে ভরে গেল।

'সান...সান...'

লালমোহনবাবুর শরীর কুকড়ে ছোট হয়ে গেছে।

'আন্যান্যাই বটে?' বললেন আগন্তুক, 'আর আপনার সঙ্গেই আমার আসল
দরকার, যিঃ গাঙ্গুলীঁ। বইয়ের প্যাকেটটা নিশ্চয়ই ফেলে রেখে আসেননি।
যাগেটা খুলন, খুলে বার করে দিন। না-দিলে কী ফল হবে সেটা আর নাই
বললাম।'

'প্যা-প্ৰ-প্যাকেট...'

'কী প্যাকেটের কথা বলছি ব্যবহেন নিশ্চয়ই। আপনারই বই আপনার
হাতে নিশ্চয়ই তুলে দিয়ে আসিনি সেদিন এয়ারপোর্টে। বাবু কর্নেল, বাবু
কর্নেল?'

'আপনি ভুল করছেন। প্যাকেট ও'র কাছে নেই, আমার কাছে।'

তেনের শব্দের জন্য সকলেকেই চোচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, কিন্তু ফেল্দার
গম্ভীর গলা চাপা অবস্থাতেই তেনের শব্দ জ্বাপয়ে সন্ধ্যালোকে কানে পৌঁছেছে,
কারণ চশমার পিছনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো জলে উঠৰ্য।

লাইফ ডিভাইনের একগুলো প্যাতা নষ্ট করে আপনার ঐশ্বর্য কিছু বাঢ়া
কি?—ফেল্দার গলার স্বর এখনো ধীর, কথাগুলো হ্যাপা।

'নিম্নো', গুড়াটার দিকে আড় দ্রুতি দিয়ে খসখসে গলায় বললেন সান্যাল,

ইয়ে আমি কোই তি প্রত্যেক করনেসে ইনকো খতম কৱ না...হাত তুলে রাখন,
মিষ্টার মিস্টার !

‘আপনার প্রত্যেক একটি বেশ হয়ে থাকে না কি ?’ ফেল্দার বলল। ‘আপনি
হে জিনিসটি আইছেন সেটা পেলেই ত আর আমাদের ছেড়ে দেবেন না। খতম
আমাদের প্রয়োন্তেই করবেন। কিন্তু টেন থামলে পর আপনার কী দশা হবে
সেটা কেবে দেখেছেন ?’

চৰির ইঞ্জি! দাঁত বের করে বিত্রী হিসে বললেন মিঃ সান্যাল। ‘আমাকে
আর কে ছেনে বলুন ! এত প্যাসেজার রয়েছে টেনে, তার মধ্যে হিসে যতে
পারব না ? আপনাদের লাখ পড়ে থাকবে, আমি বাইরে বেরিবে অন্য কলমার
চল যাব। তৈরি ইঞ্জি, ইঞ্জিন্ট ইট ?’

ফেল্দার সঙ্গে অনেক ব্যক্তি সংকটের মধ্যে পড়ে আমার সাহস কেড়ে
গিয়েছে ঠিকই কিন্তু একটা কারণে এই ‘মহুর্তে’ সাহস আনন্দ অনেক চেষ্টা
সত্ত্বেও বার কান্ত আমার সমস্ত শরীর ঠাপ্পা হয়ে আঁক্কল। কারণ আর কিছুই
না—ওই নিম্নো ! এরকম একটা নিষ্ঠার ব্যনে তেহারা গমেপাই পড়া যাব। কাহারার
বন্ধ দুরজায় টেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের ফিনফিনে ফুলকাঁঠি করা শাটেটা
খোলা জানলা দিয়ে আসা হাওয়াতে ফ্রেক্ষুর করছে, তাম হাতটা টেনের
বাঁকুনিতে দৃঢ়েনেও রিভলভারটা ঠিকই ফেল্দার লিকে তাগ করা রয়েছে।

সান্যাল এক পা এক পা করে এগিয়ে এলেন। নাক জুলে থাকে সেন্টের
গাথে। সান্যালের দ্বিতীয় ফেল্দার ব্যাগের দিকে। এয়ার ইন্ডিয়ার বাগ, ফেল্দার
সামনেই সিটের উপর রাখা। লালমোহনবাবুর কী অবস্থা জানি না, কারণ
তিনি এখন আমার পিছনে। টেনের আওয়াজের মধ্যেও ওঁর হাঁপানির টানের
মতো নিষ্বাসের শব্দ শূন্তে পাঁচ্ছ।

টেন ছেটে চলেছে। তার মানে শুটিংও হয়ে চলেছে নিশ্চয়। মিঃ গোরে
কী পাঁঘাতিকভাবে আমাদের ডোবালেন সেটা উনি জানেন কি ?

সান্যাল সীটে বসে বাজ্টার ক্যাচ টিপলেন। ঢাকনা খুলল না। বক্সে
চাবি সাগানো।

‘চাবি কোথায় ? এটোর চাবি কোথায় ?’

মিঃ সান্যালের সমস্ত মৃত্য অসহিষ্ণু রাখে কুচকে গেল।—‘কোথায় চাবি !’

‘পকেটে।’ শাস্তভাবে জবাব দিল ফেল্দা।

‘কোন্ পকেটে ?’

‘ডান।’

আমি জানি ওই পকেটেই ফেল্দার রিভলভার।

সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন। রাগে ফুলছেন তিনি। কয়েক মহুর্ত যেন

কিংকর্তব্যাবিহৃত। তারপর—

‘ভূমি এসো!—আমার দিকে ফিরে গর্জিয়ে উঠলেন মিঃ সানাম।

ফেলুদাও আমার দিকে চাইল। ইঁগিতে বুবলায় সে আমাকে সান্যালের আদেশ পালন করতে বলছে।

বখন ফেলুদার দিকে এগাছি, তখন প্লানের শব্দ ছাড়া আরেকটা শব্দ কানে এল। ঘোড়ার খুরের শব্দ। এর মধ্যে কখন বে বাঁদিকে পাহাড় এসে গেছে তা খেয়ালই কৰিন। ফেলুদার পকেটে যখন হাত ঢোকাচ্ছি তখন দেখলাম



পাহাড়ের গা দিয়ে ধূলো উড়িয়ে ডাকাতের দল নামছে।

রিজ্জুভাইর পাশে হাতড়তেই চাবি ঠেকল হাতে।

‘দিয়ে দে।’

আমি চাবি দিয়ে দিলাম মিঃ সানামকে। ফেলুদার হাত দ্বটা এখনে মাথার উপর।

সান্যাল বাজ্জুর তালায় চাবি লাগিয়ে দেওয়ালেন। বাজ্জু খুলে গোল। লাইফ

ভিভাইন উপরেই রাখ্য। কান্ত থেকে বই বৈরিয়ে এল।

জানালার ঠিক খাইরেই ঘোড়ার খূর। একটা নয়—অনেকগুলো—তীব্রবেগে
নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ছুটে চলেছে ছেনের সঙ্গে প্যান্ট দিয়ে।

সান্দেশ স্টাইল হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা উলটিয়ে যেখানে পেঁচালেন
তার কান্তে আর উলটোন থায় না। করিশ সেগুলো প্রস্পরের সঙ্গে সাঁট।
এবার উলটোনের বদলে সান্দেশ একটা অন্তর্ভুক্ত কাজ করলেন। পাতার মাঝখানটা
খুঁটিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে ফেললেন, অন্য ফেলতেই তার তলায় একটা চৌকো
খেপ বৈরিয়ে পড়ল। পাতাগুলোর মাঝখানটা একসঙ্গে কেটে ফেলে খোপটা
তৈরি করা হয়েছে।

খোপের ভিতর দ্রষ্টি দিতেই সান্দেশের মূখের অবস্থা দেখবার হতো হল।
উনি ভিতরে কী আশা করেছিলেন জানি না, এখন বেরোল থান আগ্রেক
সিগারেটের পোড়া টুকরো, ডঙল থানেক পোড়া দেশলাই আব বেশ খানিকটা
সিগারেটের ছাই।

‘কিছু মনে করবেন না,’ বলল ফেলুদা, ‘গোটাকে ছাইদান হিসাবে ব্যবহার
করার জোড় সান্দেশে পারলাম না।’

এবার সান্দেশ এত জোরে চাঁচালেন যে মনে হল সমস্ত ত্রেন ওর কথা
শুনে ফেলবে।

‘বেয়াদাবির আর জাহুগা পাওনি? ভেতরের অসল জিনিস কোথায়?’

‘কী জিনিসের কথা বলছেন আপনি?’

‘স্কাউন্টেল!—তুঁহি জান না কিসের কথা বলছি?’

‘মিচেলই জানি, তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।’

‘কোথায় সে জিনিস?—আবার গার্জিয়ে উঠলেন মিঃ সান্ডেশ।

‘পকেটে।’

‘কোন্ পকেটে?’

‘বী পকেটে।’

ডাক্যাতের দল এখন জানালার ঠিক খাইরে, কারণ পাহাড় আরো কাছে চলে
এসেছে। ধূলো এসে ঢুকছে আবাদের কাশবায়।

‘ইউ দেয়ার।’

আমি জানি আমর উপর আবার হ্বকুম হবে।

‘হী করে দাঁড়িয়ে আছ কি—যাও, হাত তোকাও।’

আবার আবদেশ মানতে হল।

এবার পকেট থেকে যে জিনিস বেরোল তেমন জিনিস আমি কোনোদিন
হাতে ধরিবান। ইঁরে আর ঘূর্ণে দিয়ে গীথা এই আশচ্য হাব রাজা-বাদশাদের

হাতেই মানার !

‘দাও শুটা আমাকে !’

মিঃ সান্যালের চেয়ে জব্লজব্ল করছে, কিন্তু এবার রাগে নয়, উলাসে, লোভে !

আমার হাত সান্যালের দিকে এগিয়ে গেল। ফেলুদার হাত মাথার উপর তোলা। জালয়াহনবাবুর মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ বেরোছে। ডাকাতের দল—

দড়াম্ব !

একটা ভারি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামরাটা যেন একটু কেঁপে উঠল, আর তার পরেই দেখলাম নিম্নো কামরার মেঝেতে গড়গাঁড় দিয়েছ, কারণ একজোড়া পা জানালা দিয়ে চুক্তে সটোন সঙ্গোরে জাধি হোরেছে তার গায়ে ! ফলে নিম্নোব হাতের রিভলভার ছুটে গিয়ে সিলিং-এর বাতির কাচ চুরমার করে দিল, আর সেই সঙ্গে ফেলুদারও হাতে বিদ্যুম্বেগে চলে এল তার নিজের রিভলভার !

এবারে পাহাড়ের দিকের দুরজাটা আবার খুলে গেল, আর সেই দুরজা দিয়ে ডাকাতের বেশে যিনি চুকলেন তাকে আমরা তিনজনেই খুব ভালো করে চিনি।

‘থ্যাক ইউ, ভিক্টর,’ বলল ফেলুদা।

বিজ্ঞানালয় সৈটের উপর যসে পড়েছেন। এবাব কাপুলিটো বাগের নয়, ভয়ের, কারণ তিনি জানেন তিনি জন্ম, তাঁর আই পালবোর পথ নেই।

এদিকে শুটিং-এ গুড়গোল ব্যবে কেউ নিষ্ঠাই চেন টেনে দিয়েছে, কারণ টেনটা বেভাবে থামল সেটা চেন টানলেই হয়।

থামার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেরগোল শন্তে পেলায়। একই লোকের নাম থেরে অনেক চীৎকার করছে।

‘ভিক্টর! ভিক্টর! কেথার গেল, ভিক্টর?’

প্লেকবাবুর গল্প। যত গুড়গোল ত ভিক্টরকে নিয়েই, কারণ তার লাফিয়ে পড়ার কথা ছাতে, আর সে কিনা সোজা এসে চুক্তে আমাদের কামরায়।

ফেলুদা: দুরজৎ খন্দে যথ বার করে প্লেকবাবুকে ডাকলেন।

‘এই যৈ ঘশাই, এদিকে।’

তদুসিকে ইতোমত হয়ে আমাদের কামরায় উঠে এলেন। দেখে মনে হল তাঁর শেষ অবস্থা, কারণ শুনেছি এই দ্বন্দ্বের একটা শটে গুড়গোল হওয়া মনে প্রাপ্ত শিশ হাজার টাকা জলে যাওয়া।

‘থামার কী, ভিক্টর? তোমার কি ঘাপা থারাপ হয়ে গেল নাকি?’

আপনার দ্বিতীয়ে জেট বাহাদুর আখ্যা একমাত্র ভিক্টর পেরুমলই পেতে পারে প্লেকবাবু।

‘তার মাসে?’ প্লেকবাবু অবাক হয়ে দেখলেন ফেলুদার দিকে। তার ব্যালাকালে ভাবটার মধ্যে এখনো ধূখেট পরিমাণে বিরক্তি মেশানো রয়েছে।

‘আর স্বাগতারের পাটটা পরমেশ কাপুরকে না দিবে আপনার একে দেওয়া উচিত ছিল।’

‘কী সব উলটোপালটা বকছেন? ইনি কে?’ প্লেকবাবু মিঃ সান্যালের দিকে চেয়ে জিগোস করলেন।

ইতিমধ্যে ডানদিকের রাম্ভায় দৃঢ়ো নতুন গাড়ির আবর্ত্য হয়েছে—একটা পুরুষ জীপ আর একটা প্লেকবাবু। জীপটা আমাদের কামরার পাশেই এসে থামল। তার থেকে নামলেন ইন্সেপ্টর পটবর্ধন।

এইবাব প্লেকবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা মিঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে পিয়ে দুই টানে তাঁর দাঢ়ি আর গোফ, আর আরো দুই টানে তাঁর পরচুলা আর

চশমাটি খুলে ফেলে দিয়ে থাল—

‘আপনার গোথকে গুলবাহারের গুরুত্বও টেনে খুলে ফেলতে পারলে খুঁশ হতাম মিস্টার গোরে, কিন্তু শুই একটি ব্যাপারে ফেলু মিস্টারও অপরাধ।’

* * *

‘প্রোডিউসার মিসায় ধরা পড়লে ছবি বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা আপনাকে কে বললে লালুদা?’

প্রশ্নটা করলেন প্লকবাব। লালমোহনবাব, কিছুই বলেননি, কেবল ঘাঁড় গোঁজ করে গুরুত্বের হয়ে বসে ছিলন; যদিও এটা ঠিক যে গুরুত্বের হবার একটা করণ হল জেটি বাহাদুরের ভূবিষাণ সম্বন্ধে চিন্তা।

‘জেটি বাহাদুরকে কেউ রুখতে পারবে না লালুদা,’ বললেন প্লকবাব। ‘গোরে চুলোয় ধাক, গোঁজের ধাক, হাজতে ধাক, যেখানে খুঁশি ধাক,—প্রোডিউসার ত আর বস্বতে একটা নয়। চুনি পাখ্তালি ত এক বছর থেকে আমার পেছনে লেগে আছে—দেখুন আপমারা ধাকতে ধাকতেই নতুন বানারে আবার কাঞ্চ আরম্ভ হয়ে গেছে।’

আজকের শ্রেণি অবিশ্বাসীয় দেড়টায় বন্ধ হয়ে গেছে। গোরে আর নিম্নোক্ত হাতে ইতকড়া পড়েছে, নানাসাহেবের নওনাথা হার প্লিশের জিম্মায় ঢলে গেছে। আজ যে একম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা ফেলুদা আগেই বুঝেছিল, আর তাই ও সকালে সিগারেট কিনতে যাবার নাম করে ইনস্পেক্টর পটবর্ধনের সঙ্গে দেখা করে প্লিশের ব্যবস্থা করে এসেছিল। গোরে নাকি এককালে একটানা ধারো বছর কলকাতায় ছিল, শুধু তন বস্কি নয়, সেল্ট জেভিয়ার্সেও পড়েছে—তাই বাংলাটা সে জালোই জানে—যদিও বস্বতে সে মচুরাচুর হিল্ড, ময়াঠী আর ইংরেজিটাই ব্যবহার করে।

আমরা বসে অচি খান্ডালা ডাকবাংলোর করান্দার। চমৎকার পাহাড়ে আসুগা, বাতাসে রৌপ্যমত ঠাপ্পার আবেজ। বস্বের অনেকেই নাকি খান্ডালায় চেঞ্চে আসে। সাফারির মাটেন দো পেঁয়াজি আর নান খাওয়া হয়ে গেছে, আগেই, এখন বিকেজ সাড়ে চারটে, তাই তা আর পকৌড়া থাক্কে সকলো।

আমদের টেবিলে আমরা তিনজনই বসেছি। প্লকবাবে, ফ্রিলেন একক অহমদের সঙ্গে, এইমাত্র উঠে ফেরহোগার টেবিলে উঠে গেলো। অর্জুন মেরহোগার একটি খেন খনময়া ভাব; তার একটা করণ হুরত এই যে, আজকের হিয়ো ইচ্ছে নিঃসন্দেহে প্রদোষ মিস্টার। ইতিমধ্যে স্কেলেকেই ফেলুদাৰ সই নিরে গেছে, এমনকি ভিলেন মিকি পৰ্যন্ত।

সেকেন্ড হিরো অ্যাভিকটর পেরুমল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ফেল্দুনা ভিকটরকে আগে প্রেক্ষেই তালিম দিয়ে রয়েছিল। বলোছিল—ঘোড়া নিয়ে যখন দ্রুনের ধারে পৌঁছাব, তখন ফার্স্ট ক্রাস কাগরার দিকে একটু চোখ রেখো। গোপমালাটোলে সোজা দরজা দিয়ে ঢুকে এসো, ফেল্দুনার দ্রুত ঘাথার উপর ড্রেস দেখেই ভিকটর ধরে ফেলেছে গুড়গোলের ব্যাপার। আশ্চর্য, এত বড় একটা-কাজ করেও তাৰ কোন তাপ-উত্তপ্ত নেই। সে এইই মধ্যে আবার বাংলোৱা দামনের ভাটে তাৰ লোকজন নিয়ে ওয়ান-ট্ৰু-প্ৰী কুৰু কুৰু অভাস শুৰু কৰে দিয়েছে।

‘কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি—’

লালমোহনকুমাৰ এই একক্ষণে প্রথম মুখ খুললেন। ফেল্দুনা তাঁৰ ঘূৰ্খের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ‘ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আপনি এখনও যেই তিমিৰে সেই তাই ত ?’

অটোয়ু একটৈ গেৱেচাৰা হাসি হেসে মথা লেড়ে হাঁ বোঝাপেন।

ফেল্দুনা বলল, ‘আপনাৰ মহেৰ অৰ্থকৰ দূৰ কৰা থৰ কঠিন নহ। তাৰ আগে গোৱে লোকটাকে একটু বুঝতে হবে, তাহলেই তাৰ কাৰ্যকলাপটা বোঝগম্য হবে।

‘প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে সে আসল স্মাগলার, কিন্তু তেক ধৰেছে সম্ভাস্ত ফিল্ম প্ৰোডিউসারেৰ। আপনাৰ গল্প থকে সে ছৰি কৰছে। গল্পে আপনি শিবাজী কাস্তে স্মাগলারৱা থকে বলে লিখেছেন। স্বভাবতই গোৱে তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে। তাৰ মনে প্ৰশ্ন জাগে—আপনি শিবাজী কাস্ত সম্বন্ধে কল্পনা কৰি জানেন, কাৰণ সে নিজে স্মাগলার আৰ তাৰ বাস-স্থানও শিবাজী কাস্ত। এইটৈ জানৱৰ ছন্না সে সামাল সেজে আপনাৰ বাঁড়ি গিয়ে হাজিৰ হৱ। আপনাৰ সেজে আলাপ কৰে সে দেখক যে উয়েৰ কোনো কাৰণ নেই। আপনি অতাৰ্থ নিৱাই নিৰ্দিষ্ট মানুৰ এবং শিবাজী কাস্ত-এৱ ব্যাপারটা আপনাৰ কাছে একেবৰোই কাল্পনিক। সেই সময় তাৰ মাথাৰ আসে আপনাৰ হাত দিয়ে বইহৈৰ পাককেটে মণ্ডলাখা হার পাচার কৰৱ আই-ডিয়া। মাজটো গোৱে পাঠাইছিল তাৰই এক গাঙ্গেৰ মোককে—যে থৰ সম্ভবত থকে শিবাজী কাস্তেৱই স্মৰণৰ নম্বৰ উপাৰ দুনিম্বৰ ছান্নাটো। আপনি যদি ধৰা পড়েন, তাহলে দোষ দেবেন সাম্যালকে, গোৱৰকে নহ—তাই ত ? অৰ্থাৎ সাম্যালকে থাড়া কৰে গোৱে নিজে থাকছে সেফসাইডে।

এদিকে হয়ে গেল গুড়গোল। আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকাৰ হাবেৰ বদলে চালান কৰে বসালেন আপনাৱই পাঁচটাকা দয়নৰ বই। সেই বইহৈৰ পাককেট নিয়ে সাজসাট অৰ্থাৎ নিম্নো শিবাজী কাস্তেৱ লিফট দিয়ে উঠাইল সতেৱ

তঙ্গায় ; সেই সময় গোরেরই কোন প্রতিষ্পত্তী গ্যাণ্ডের লোক নিম্নোকে আক্রমণ করে প্যাকেট আদায় করার জন্য। নিম্নো তাকে খুন করে প্যাকেট অথাস্থানে চালান দিয়ে গা ঢাকা দেয়। এবিকে প্যাকেটে যে হার নেই সে খবর পেতেই গোরেকে চলে আসতে হল। দে ত ব্যবেছে কী হয়েছে। তার এখন দুটো কাজ করতে হবে। এক, হার ফিরে পেতে হবে ; দুই, আমাদের খতম করতে হবে। তার একমাত্র ভরসা বে আমরা লাইফ ডিভাইনের রহস্য ভেদ করে হারটো প্র্লিশের হাতে জমা দিইন। গোরে এসেই ব্যবল থে সান্যালের পুনরাবৃত্তাবের প্রয়োজন হবে। সান্যালই যখন মালটা পাঁঠিয়েছিল, তখন সান্যালকেই সেটা পুনরুৎস্থার করতে হবে, তাহলে গোরের নিজের উপর কোন সন্দেহ পড়বে না।'

‘কিন্তু গুলবাহার—’

‘বলছি, বলছি—সব বলছি। গুলবাহার মেন্টের ব্যবহারটা গোরের শঁয়ু-জনি বুম্বির আশ্চর্য উদাহরণ। এটাৰ জন্য মে কলকাতা থেকেই টৈরি হয়ে ছিল। সান্যাল মানেই গুলবাহার, আৱ গুলবাহার মানেই সান্যাল—এ ধৰণটা অন্তত আপনাৰ মনে ব্যবহৃল হয়ে গিয়েছিল—তাই নয় কি?’

‘হাঁ—তা একৰকম হয়েছিল বৈকি।’

‘বেশ। এবাব মনে করে দেখন—সোদিন গোরে আমাদেৱ বৈঠকখানায় বাসিয়ে কিছুক্ষণেৰ জন্য ঘৰ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—ভাৰতী যেন আপনাৰ জন্মে টোক আনতে গিয়েছে—কেমন?’

‘ঠিক।’

‘সেই ফাঁকে লিফ্টে চুকে সু’কৈটো গুলবাহার মেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া কি খুব কঠিন ব্যাপার? উপৰ থেকে নিচ পৰ্যন্ত সব ক’টা তলা শু’কেও ব্যথন কোনো মেন্টের গন্ধ পেলাম না, তখনই ব্যৰজায যে গন্ধটা বয়েছে শুধু লিফ্টেৰ ভিতৰ। অৰ্থাৎ সেটা হচ্ছে মানুষেৰ গা থেকে নয়, এসেছে মেন্টেৰ শিশি থেকে। ঠিক সেইভাবেই লোক লাগিয়ে লোটাস সিনেমাৰ সামনে গাড়িৰ জনলা দিয়ে হাত বাঁড়িয়ে কঢ়েক ফুটো সেট গাড়িৰ সিটে ছিটিয়ে দেওৱা ও অতি সহজ ব্যাপার।’

ফেলদা বুঁধিয়ে দিলে সত্ত্বাই সহজ। লোমোহনবাবুও যে ব্যাপৰটা ব্যবেছেন ততে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তাৰ মুখে হাঁসি ফুটছে না দেখে বেশ অবকে লাগল। সেটা বেশ শেষ পৰ্যন্ত পুঁজকৰাবুৰ একটা কথায় ফুটবে সেটা কী কৰে জানব?

চা শেষ কৰে যখন শহরে ফেরার প্রতিক্রিয়া চলছে, স্বৰ্গটা পাহাড়েৰ পিছনে নেমে ধাগুয়ায় হঠাৎ ঠাপ্ডা বেড়ে আৰো আৰো বেশ কাঁপুনি লাগিয়ে

দিছে, তখন দোধি পঞ্জীকৰণ আমাদের দিকে বাস্তভাবে এগিয়ে আসছেন।

‘সাল্মান, জেট-আইডুরের বিজ্ঞাপন পড়ছে শুরুবার—কিন্তু তার আগে একটা বাপার জ্ঞেনে নেওয়া দরকার।’

‘কৰী শুধুর ভাই?’

‘আশ্বার কোন নামটা যাবে—আসল না মকল?’

‘মকলটাই আসল ভাই,’ একগাল হেসে বললেন লালমোহনবাবু, ‘বানান হবে জে এ টি এ গোই ইউ।’

॥ শেষ ॥

১৩ কেও

(গাঁথাপুর মারগুজ)

গোসাইপুর সরগুম

‘গোসাইপুরে আপনার চেনা একজন কে থাকেন না?’ রহস্য-রোমাঞ্চ শুগনার্পক জটায়, ওরফে লালমোহন গঙ্গালীকে জিগেস করল ফেল্দু।

আমরা, প্রী মাস, কেটিয়ারস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্মৃতি হাটতে হাটতে একেবারে গঁথার কারে পেপীডে গেছি। প্রিনসেপ ঘটের কাছে যে গোস্বজ-ওয়ালা দরটা আছে সেটার মধ্যে বসে চানাচুর আর গঁথার হাওরা আছি। সময় হচ্ছে বিকেন পাঁচটা, তারিখ অক্টোবরের তেরই। আমদের সামনেই জলের মধ্যে একটা বয়া ভাসছে, সেটার ব্যবহার কী সেটা। লালমোহনবাবুকে বুঁবায়ে বিবে ফেল্দু প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক বললেন, ‘আছে বৈ কি। তুলসী-বাবু। তুলসীচূরণ দাশগুপ্ত। এথিনিয়ামে অঙ্ক আর জিয়োগ্রাফি পড়াতেন। রাঙ্গা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে থাকতেন, এখন রিটায়ার করে চলে গেছেন গোসাইপুর। ওখানে পৈতৃক বাড়ি আছে। ভদ্রলোক ত কৃত্যার আমাকে থাকার জন। লিখেছেন। আমার বিশেষ স্তুতি জানেন ত? নিজেও পঞ্চ-টল্প লেখেন, হোটেরে জন্য। সন্দেশ গোটা দুই বেরিয়েচে।—কিন্তু হঠাৎ গোসাইপুর কেন?’

‘গুরুন থেকে একটা চিঠি এসেছে। লিখেছেন জীবনলাল মালিক। শ্যাম-লাল মালিক, তস্য পুত্র জীবনলাল। বৎশ-পরিচয় তৃতীয় খণ্ড খুলে দেখলাম গোসাইপুরের চৰিদৰে ছিলেন এই মালিকবা।’

ফেল্দু থামল। কারণ একটা জাহাজ প্রচেড় তোরে ভৌ দিয়ে উঠেছে। আজই সকালে গোসাইপুরের চিঠিটা এসেছে সেটা জানি। ধীরও তাতে কী লেখা ছিল জানি না। চিঠিটা পড়ে ফেল্দু একটা চারমিনার ধারায়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলাম।

‘কী লিখেছেন ভদ্রলোক?’ লালমোহনবাবু জিগেস করলেন।

‘লিখেছেন তাঁর পিতাকে নাকি কেহ বা কাহারা ইতো করার সংকল্প করেছে। আমি গিয়ে যাদি ব্যাপারটার একটা বিনার করতে পারি তাহলে উনি বিশেষ কৃত্য বোধ করবেন, এবং আমাকে উপর্যুক্ত পারিপন্থিক প্রবান্ব করবেন।’

‘চলন না মশাই’, বললেন লালমোহনবাবু। ‘বেশ ত ঝাড়াঝাপটা এখন: আমার নতুন বই বেরিয়ে গেছে। আপনার হাতেও ইমাইয়েট কিছু সেই, স্বাক্ষর হিল্স-দিল্লি ত অনেক হল, এবার স্বাক্ষরদলের জন্য পল্লীগ্রামে বন্দ

কী? কাছেই সেগুলোইচিতে শুনিচ বিরাট মেলা হয় এই সময়টাতেই। চলন সার, বেরিস্টা পাঁড়ি।'

'ও'দের বাড়িতে নাকি থাকার অসুবিধে আছে, তাই মাইল টিনেক ন্যৰে শ্রীপুরে কোনু এক চেনা বাড়িতে আমার ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। সাইকেল বিক্রয়তে খাতাবাত। আমার মনে হচ্ছিল গোসাইপুরেই থাকতে পারলে সুবিধে হত। তাই আপনার বন্ধুটির কথা জিজ্ঞেস করলাম।'

'আমার বন্ধু উইল বি ডাম লাইড। আর আপনি যাচ্ছন শুনলে ত কথাই নেই। উনি আপনার দারুণ ভন্ত।'

'আর কার কার ভন্ত সেটা জেনে মিহি।'

লালমোহনবাবু এই খোঁচা-দেওয়া প্রশ্নটাকেও সিরিয়াসলি নিয়ে বললেন। 'জগদীশ বোসের নাম করতে শুনিচ এককালে, বলতেন অত বড় মনীষী পুর্থৰীতে লেই; আর গোবৱবাবুর কাছে যেধেয় ছেলেবেলা কুস্তী শিখেছে; আর—'

'আর, ওই যথেষ্ট।'

* * *

গোসাইপুর সেতে গেলে কাটোয়া জংশনে নেমে বাস ধরতে হয়। কাটোয়া থেকে সাত মাইল; তার মানে বড় জ্বের আধ ঘণ্টা। শ্যামলাল তসা পুরু জৈবনলালকে ফেলুন্দা লিখে দিয়েছিল আগরা আসছি বলে, আর বনেছিল গোসাইপুরেই আমাদের থাকার স্থেবস্ত হয়েছে। এবিকে তুলসীবাবু স্টাইলের চিঠি পাওয়া পারে উন্তর দেন। শুধু বৈ খুশ হয়েছেন তা নয়, লিখেছেন 'গোসাইপুর সাহিত্য সংব' ফেলুন্দা আর লালমোহনবাবুকে একটা জয়েন্ট সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করতে চাই। লালমোহনবাবুর একেবারেই আপন্তি ছিল না, কিন্তু ফেলুন্দা কঢ়াটা শুনেই চোখ বাঁওয়ে বলল, 'দেশে জাইয়ে বন্ধ হয়ে গেলে গৈয়েলদার হাঁড় জড়ে না। কী অবস্থায় কাজ করাই সেটা বুঝতে পারছেন? এতে আমার সংবর্ধনার কী আছে মশাই? আর বলে দিন যে আমার পরিচয়টা দয়া করে বেল গোপন রাখেন, নইলে তদন্তের বরোটা বেজে থাবে।'

লালমোহনবাবুকে বাধা হয়েই আদেশ পালন করতে হল। স্বে এটা লিখলেন যে সংবর্ধনা নিতে ও'র নিজের কেন্দ্রে কথা নেই। এই অনুষ্ঠানের কথা কেবেই বোধহয় উনি নৈল স্টোর চিকলের কাজ করা একটা মলমলের পাঞ্জাবী সংগে নিলেন।

তুলসীবাবু জানিয়ে রেখেছিলেন যে গোসাইপুর পথে চোকবার মুখে যোগেশের হৃদার দোকানে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। সেখান থেকে তাঁর বাড়ি দশ মিনিটের ছাঁটা পথ।

কাটোয়া থেকে বাস ধরে গোসাইপুর যাবার পথে একটা পালকি দেখে বৈশ অবাক লাগল। ফেলুদা আর লালমোহনবাবুও দেখলাম যাড়ি ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখল পালকিটাকে। 'কোন্ সেগুলিতে এসে পড়লাম মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু, 'গোসাইপুরে বিজলি পৌছেতে ত? এতটা অজ্ঞ পাড়াগাঁ বলে ত আমার ধারণা ছিল না।'

বাসের কণ্ডাকটার যোগেশের দোকানের নাম জানে, তাকে বলা ছিল। ঠিক জনপ্রিয় চেরা গলায় 'গোসাইপুর, গোসাইপুর!' বলে দুটো চীৎকার দিয়ে বাস থামিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল। যে ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন তিনি যে একমাত্র ইন্দুলম্বস্টার ছিলেন সেটা আর বলে দিতে হয় না। ভদ্রলোকের হাতে তাঁশ্প-মারা ছাতা, পায়ে বাউল কেড়স জুতো, চোখে চশমা, পরনে হাফ পাঞ্জাবী আর খাটো করে পরা ধূতি, আর বগলে একটা মাঝাতার অঘেলের পুরোন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন। ফেলুদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভদ্রলোক হেসে চোখ টিপে বললেন, 'আপনার আদেশ পালন করিচি—কোনো চিন্তা নেই। আপনি হলেন ট্রাইস্ট, হোল লাইফ ক্যানাড়ার কাটিয়েছেন, মেশে ফিরে পাড়াগাঁ দেখার শৰ্থ হয়েছে।' ভাবলুম আপনি যদি তদন্তের ব্যাপারেই এসে আকেন, তাহলে তজ্জসীর জন্ম এখনে-সেখনে ঘাপটি মারতে হতে পারে, কাজেই সেফ সাইডে থাকা ভালো। ট্রাইস্টদের উপর কৌতুহল থাকে সেটা সকলেই জানে।'

'আপনার বাড়িতে ক্যানাড়া সম্বন্ধে তথ্যওয়াজা কই আছে আশা করি? ফেলুদা হেসে বলল।

'কোনো চিন্তা নেই,' আবার বললেন তুলসীবাবু। তারপর লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আর গাগুলী ভাবা, তোমাকে কিন্তু একটু বাকি পোষাতে হচ্ছে, তরশু অর্থাৎ শুক্রবার, আমাদের নিউ প্রাইমারি স্কুলে একটা ফাঁশন আয়োজ করিচি। সুরেশ চাকলাদাৰ উকীল প্রোয়োহিত করবেন। কিছু না—একটু মাচ গান, দুটো আবৃত্তি, দুটো ভৱণ এই আর কি। আমাদের পোষ্টম্যান্টার হাঁরিহরের ছেলে বলদেব ভজলো ছীব আৰে, সে একটা মানচিত্ লিখছে। ভাষাটা অবিশ্বাস হে হে, আঘাত।'

'অসংকারের আবার বেশি বাড়াবাড়ি—' কাচা ঝুলতার কিসে জানি ঠোকর খাওয়াতে লালমোহনবাবুর কথা শেষে হল না। কিন্তু বাকিটো ব্যৱে নিয়েই তুলসীবাবু বললেন, 'তা এসব ব্যাপারে একটু ত বাড়াবাড়ি হবেই। আর

তোমার মতো সাক্ষেত্রজ্ঞ অপর আর কটা এসেছে বল এখনে। সাপ্ট
এসিটিল পরীক্ষিত ক্যাটেজো—তাও সিকস্টিটি সেভনে।

ফেলদ্বা ব্রহ্মজি, 'আসবাৰ পথে একটা পার্শ্বিক দেখজাই। এদিকে এখনো
পার্শ্বিক কৰ্মজীব হয় নাকি ?'

'কৰ্মজীব পার্শ্বিক ?' তুলসীবাবু হাতার বাঁজিতে একটা বাছুরকে পৰি থেকে
সৱিজ্ঞে বললেন, 'আপনি বিগত ষষ্ঠিগুৱাই কোন্ট জিনিসটা চান বলুন। পাইক-



বয়ক-দাঙ ? পাৰেন। হ'লকোবৰদার ? পাৰেন। টানা-পাথা ? পাৰেন।
লম্প-পিদিম-পিলম্বজ ? পাৰেন।—'

'কিন্তু এখনে ত ইলেক্ট্ৰিসিটি আছে দেৰছি।'

'সব জায়গাতেই আছে, কেবল যেখানে সব চাইতে বেশি থাকাবে কথা সেই-
খেনেই নেই।'

'কোথায় মশাই ?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন কৰলেন।

'মঞ্জিকদেৱ বাঁজি।'

আমরা তিনজনেই অবাক হয়ে ভগ্নলোকের দিকে চাইলাম।

‘মালিক মানে শ্যামলাল মালিক?’ ফেলুন্দা জিগোস করলে।

‘ওই একটিই ত মালিক গোসাইপুরে। এখেনকার জমিদার ছিলেন শুরা। দুর্ভিল মালিকের নামে বাবে গুরুতে এক ঘাটে জল খেত। শ্যামলাল তাঁর ছেলে। জমিদারি উচ্ছেদ হবার পর কলকাতায় গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবসা করে বিস্তর টাকা কারিগুলি। একদিন অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের সূইচ জ্বালতে গেস্টেল, সূইচ বোর্ডে একটা খোলা তার ছিল, তাতে হাত লেগে যাব। এ সি কারেণ্ট মশাই, হাত আঁটকে গিয়ে হলস্প্ল বাপাই। হাসপাতালে ছিল বেশ কিছুদিন। বেরিয়ে এসে ব্যবসা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে গোসাইপুরে চলে আসে। এসেই ইলিক্ট্রিক কানেকশন কেটে দেয়। শুধু সে ইলে না হয় তবু বোঝা যেত। সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সব কিছু বাতিল করে দিয়েছে। চুরুট ছেড়ে গড়গড়া ধরেছে; ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করে না; ট্যুবাসের বদলে দাঁতন। ইংরিজি বই যা ছিল বাড়িতে সব বেচে দিয়েছে, নিজের গাড়িটা বেচে দিয়েছে, তার জ্বারগায় পালাক হয়েছে। একটা পুরনো ভাঙ্গা পালাক বাড়িতেই ছিল, সেটাকে সারিয়ে নিয়েছে, তার জ্বা চারটে বেহারা বহাল হয়েছে। বিল্ডিং ওষুধ যা ছিল সব নর্দমায় ফেলে দিয়েছে; অখন ওনালি কবরেজি। ফাঁকতালে তারক কবরেজের ক্ষপাল ফিরে গেছে। আরো কত কী যে করেছে তার হিসেব নেই। এখেনে যখন এসেছেন তখন আলাপ হবে নিশ্চয়ই; তখন সব জানতে পারবেন।’

‘আলাপ না হয়ে উপায় নেই?’ বলল ফেলুন্দা। ‘আমি এসেছি শুরু ছেলের কাছ থেকে তলব দেয়ে।’

‘হ্যাঁ, তা ছেলে ক’দিন হল এসেছে কটে। কিন্তু রহস্যটা কী?’

‘শ্যামলাল মালিককে খন করার চেষ্টা চলেছে বলে কেন্তো খবর আপনার কানে এসেছে কি?’

তুলনীকাব্দ কথাটা শব্দে বেশ অবাক হলেন। ‘কই তেমন কিছু খুনিনি। তা খন করার কথাই যদি বলেন, তার জন্যে বাইরের লোকের দরকার কী? থারেই ত রয়েছে।’

‘কিরকম?’

‘ওই যিনি আপনাকে তলব দিয়েছেন, তার সঙ্গে বলপের ত বনিবন্দি নেই একদম। এখেনে এলেই ত অগভীরাটি হয়। অবিভিট আমি জীবনলালকে দেৰ দিই না। শুরুকম উল্লেখ কৈয়ালৰ বে বাপের, তাকে কোন্ত ছেলে মানবে বল্ব। জীবনলালকে ত এসে ওই বাড়িতেই থাকতে হয়। ওই ভূতের বাড়িতে গাথে ঠিক রাখা কুবৰ ঘূর্ণিল।’

এক বিষে জমিজটেপর তুলসীবাবুর কেঠাবাড়ি, বড় সব বস্তি নাকি প্রায় একশো। ব্যাপ্তাকুদ্র দুজনেই মোজারি করতেন, পাঁড়ো ঠাকুরাই বানিয়েছেন। তুলসীবাবুর স্তৰী কলকাতাতেই আরা গেছেন। একটি ঘেরের বিয়ে হয়ে আছে, তার স্বামী জোহানকুড়ের বাবসা করে আজিয়গশে। দুই ছেলের একজনের সাইন পের্পটিং-এর বাবসা আছে কলকাতায়, আরেকজন প্রথমের সেলসম্যান। এখনে তুলসীবাবু একাই থাকেন।—‘তবে কী জানেন, পাড়া গাঁরে একা থাকে হয় না। এখনে সবাই প্রস্পরের খোঁজবৰু রাখে, বোজই দেখা হয়, মেলামেশাটা অনেক দোশ।’

বিকেজ চারটে নাগাত তুলসীবাবুর বাড়িতে পেঁচে হাত ঘুথ ধূঁয়ে প্রথমেই চারের আয়োজন হল। ফেলুদা সঙ্গে ভালো চা এনেছিল, কারণ ওই একটা বাপারে ও সাতই খন্তর্থন্তে। অবিশ্য সে চা সকলেই খেলো, আর তার সঙ্গে চিঁড়ে-মারকেল। জোগাড়-ষল্য করল তুলসীবাবুর চাকর গল্প।

একজোর দুটো ঘরের একটাতে তুলসীবাবু নিজে থাকেন, দোতলার ছাতে একটা বড় দ্বা, তাতে তিনটে তত্ত্বপোষ পেতে আবাসের জন্য বস্তুবস্তু করা হয়েছে। এ দ্বা নাকি তুলসীবাবুর ঘোয়েজামাই তাদের ছেলেপুলে নিয়ে বছরে একবার করে এসে থেকে যায়।

চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, ‘আমাকে কিন্তু একবার ওই বিজলৈহীন বাড়িতে ঘেরে ইবে জীবনবৰ্ষের সঙ্গে দেখা করতে। ওকে লিখে জানিয়েছি যে সাড়ে পাঁচটা নাগাত যাব।’

তুলসীবাবু বললেন, ‘তা বেশ ত, আমি পেঁচে দেবখন। হলিকবাড়ি পাঁচ-সাত ফ্রিনিটের পথ। তবে গাঙ্গালীভাস্তাকে আমি ছাড়িচ নে। আজ সম্বৰেজো কিছু জোক আসবে আমার এখনে। একটু সদালাপ করতে চান সাহিত্যকের সঙ্গে। ফ্রিনির ফশাই ঘটাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবেন ত?’

‘কেন বলুন ত?’

‘একবার আআরামবাবুর ওখানে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই। উনি গোসাইপুরের একটি অ্যাপ্টোকশন।’

‘আজ্ঞাবামবাবু?’

‘আসল নাম অবিশ্য হ্যানেন ভটচার। আজ্ঞা-টাঙ্গা নিয়ে চৰ্চা করেন তাই এখানকার কয়েকজন নাম দিয়েছে আজ্ঞাবাম। আমি দিইনি কিন্তু! আমার ধারণা ভদ্রলোকের মধ্যে সতীই ইয়ে আছে।’

আজ্ঞা নিয়ে চৰ্চাটা রে কী সেটো আর জিগোস করা হল না। কারণ ঠিক তখনই আবার দেখতে পেলাম পালকিটাকে। আমরা ঘাটীরের দাওয়াকে

বসে চা-চিংড়ে খাচ্ছিম, সামনেই রান্তা, আর সেই রান্তা দিয়েই পাল্কিটা আসছে। এবার দেখতে পেলাম বৈ ভিতরে একজন লোক বসে আছে।

‘আরে, পাল্কিতে জীবনবাব, বলেই মনে হচ্ছে! বললেন তুলসীবাবু। ভিতরের ভূমিলোক পাল্কির দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি মারছিলেন। বেহারা-গুলো ঠিক গল্পে বেরকম পড়া যায় সেইভাবে হৃষ্ণম শব্দ করতে করতে এগোচ্ছল, এমন সময় শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাল্কিটাও থেমে গেল।

পাল্কি মাটিতে নামতেই তার ভিতর থেকে একজন বছর পঞ্চাশিরের ভূমিলোক বেশ কষ্ট করে বাইরে বেরিয়ে আরে পানিকটা কষ্ট করে উঠে



দাঁড়ালেন। সমস্ত বাপারটা বেমানাম, কারণ ভূমিলোকের প্যাটেকলাকাতিয়া চেহারা, গায়ে বুশ শাট আর টেরিলিনের প্যান্ট।

‘মিস্টার পিসিউ? ফেলদার দিকে এগিয়ে এসে হাঁস-হাঁস করলেন ভূমিলোক।

‘আজ্জে হাঁ।’

আমার নাম জীবনলাল হাঁসিক।’

‘বুঝেছি। ইনি আমার বৃক্ষ মিনিটের গাঙ্গুলী, অর এ ইল আমার অন্দুভুতে ভাই তাঙ্গু তুলসীবাবুর সঙ্গে বোধহয় আপনার পরিচয় আছে!’

জীবনবাবু পালকিটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘আমার বাড়ি মিনিট পাঁচকের হুটো পথ। আসবেন একবারটি? আপনাদের চা খাওয়া হয়েছে? একটু কথা ছিল।’

জালমোহনবাবু রয়ে গেলেন, আমি আর ফেল্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে মঞ্চিক-বাঁড়ি বাঁচ্চা দিলাম। রাস্তা ছেড়ে একটা বাঁশ-বনে ঢুকে বুঝলাম এটা শ্টেকাট। জীবনবাবু বললেন, ‘কলকাতায় একটা টেলিফোন করার দরকার ছিল, তাই স্টেশনে যেতে ইল।’

‘পালক ছাড়া গাঁত নেই বুঝি?’

জীবনবাবু ফেল্দুর দিকে আড়কাখে চেয়ে বললেন, ‘আপনাকে তুলসী-বাবু বলেছেন বুঝতে পারেছি।’

‘হাঁ, বলছিলেন ইলেক্ট্রিক শকের পরিণাম।’

‘পরিণামটা গোড়ায় এত ভয়াবহ ছিল না, আক্ষেশটা ছিল শুধু ইলেক্ট্রি-সিটির বিরুদ্ধে। এখন কী দাঁড়িয়েছে সেটা আমাদের বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবেন।’

‘আপনি এখনে প্রাপ্তি আসেন?’

‘দুমাসে একবার। আমাদের একটা ব্যবসা আছে, সেটা এখন আমাকেই দেখতে হয়। সেই নিয়ে কথা বলতেই আসি।’

‘তাহলে বাবসায় এখনো ইনটারেস্ট আছে আপনার ব্যবার?’

‘মোটেই না। কিন্তু আমি সেটা চাই না। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি যাতে উনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।’

‘কেন্তো আশা দেখছেন কি?’

‘এখনো না।’

ফলিক বাড়িও যে অনেকদিনের পুরোনো সেটা বলে দিতে হব না, তবে মেরামতের দর্শন বাড়িটাকে আর পোড়ো বলা চলে না। প্রাসাদ না হলেও, অট্টালিকা নিশ্চয়ই বলা জলে এ বাড়িকে। ফটক দিয়ে চুকে ভাইনে একটা বাঁধানো পুরুর, বাড়ির দুপাশের ফাঁক দিয়ে পিছনে গাছপালা দেখে মনে হয় ওদিকে একটা বাগান রয়েছে। পাঁচিলটা মেরামত হয়নি, তাই এখানে শুধুমাত্র ফাটেল ধরেছে, কয়েক জানুগায় আবার দেয়াল ভেঙ্গেও পড়েছে।

ফটকে একজন দারোয়ান দেখলাম যার হাতে সড়কি আর চাল দেখে মনে হল কোনো ঐতিহাসিক নাটকে নামার জন্য তৈরি হয়েছে। সদর দরজার পাশেই ঠিক ওই রুকমই হাসাকর পোষাক-পরা একজন করফুদাঙ্গ জীবন-বাবুকে দেখে এক পেঞ্জাবী সেলাম টুকু। এই থমথমে পরিবেশেও এই ধরনের সব অবিশ্বাস্য বাপার দেখে হাস পাঞ্জল।

আমরা একতলাটেই বৈঠকঘানায় ফজলের উপর বসলাম। ঘরে চেয়ার নেই। দেয়ালে বা ছাঁবি আছে সবই হয় দেবদেবীর, না হয় পৌরাণিক ঘটনার। দেয়ালের আলমারির একটা তাকে গোটা দশক বাঞ্গলা বই দেখলাম, বাঁকি তাকগুলো মনে হল খালি।

‘আপনাদের পাখা লাগবে কি? তাহলে দাস্তকে জাঁগয়ে দিই।’

এক্ষণে লক্ষ করিন, এবার দেখলাম মাথার উপর ঝলকওয়ালা ডবল-মাদুর একটা কাঠের ডান্ডা থেকে বলেছে, আর ডান্ডাটা বলেছে সিলিং-এ দুটো আংটা থেকে। ডান্ডা থেকে দড়ি বেরিয়ে বাঁ দিকের একটা দরজার উপর দেয়াল ফুড়ে বারান্দায় চলে গেছে। এই হল টানা-পাখা, যেটা টানা হয় বারান্দা থেকে, আর হাঁওয়া হয় ঘরে। অক্তোবর মাস, সবথে হয়ে এসেছে, তাই গরম নেই; পাখার আর দরকার হল না।

‘এটা কী জানেন?’

জীবনবাদু অলেমারিটা খুলে তার থেকে একটা গামছা টাইপের চারকোণা কাপড় বার করে ফেল্দাকে দেখালেন। সেটার বিশেষত এই যে তার এক-কোণে গেরো দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা পাথরের টুকুজো।

গামছাটা হাতে নিয়ে ফেল্দাক ভুঁতকে খেল। সে পাথরের উচ্চে দিকের কোণটা হাতে নিয়ে গামছাটাকে বার কয়েক শূলো ঘূরিয়ে বলল,



‘তোপসে, উঠে দাঁড়া তা !’

আমি দাঁড়ালাম আর সেই সঙ্গে ফেলুন্না ও দাঁড়াল আমার থেকে হাত তিনেক দ্বারে ! তারপর গামছা হাওয়ায় ঘূর্ণয়ে হাতে ধরা অবস্থাতেই জাল ফেলার ঘত্তে করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দিকটা আমার গলায় পেঁচিয়ে গেল ।

ঠগী !' আমি বলে উঠলাম।

ফেলুন্দাই বলেছিল এককালে আমাদের দেশে ঠগীদের সন্দৰ্ভাগীর কথা। তারা ঠিক এইভাবে পথচারীদের গলায় ফাঁস দিয়ে হাঁচকা টানে তাদের থেকে করে সর্বস্ব লুট করে নিত।

ফেলুন্দা অবিশ্বাস গামছা ধরে টান দেয়ান। সে তক্ষণ প্যাচ থেকে নিয়ে ফরাসে বসে বলল, 'এ জিনিস আপনি কোথায় পেলেন ?'

'আব রাজির বাবার ঘরের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল কেউ ?'
'কবে ?'

'আমি আসার কয়েকদিন আগে।'

'এত পাহাড়া সত্ত্বেও এটা হয় কি করে ?'

'পাহাড়া ?' জীবনকাব্দি হেসে উঠলেন। 'পাহাড়া ত শুধু পোষাকের বাহারে মশাই, মানুষগুলো ত সব গেঁয়ো ভূত, কুঁড়ের হস্ত। আর তারাও ত বুঝতে পারে বাবুর ভীমরতি ধরেছে। কাজ যা করে সে ত শুধু নাম কা ওঁঁস্টে। নেহাঁ বাড়িতে জাকাত পড়েনি তাই, নইলে বোৰা যেত কার দোড় কতদুর !'

'এ বাড়িতে আর কে কে থাকেন জানতে পারি কি ?'

'বাবা ছাড়া আর আছেন আমার বিদ্যু ঠাকুর। তিনি প্রাচীন আমলের লোক তাই দিব্য আছেন। তাছাড়া আছেন ভোলানাথবাবু। একে থাজার সরকার বলতে পারেন, যানেজার বলতে পরেন—বাবার ফাইফরমাস খাটা, দেখাশোনা করা, সবই ইনি করেন। বাবার অস্থি-বিস্থি হলে কবিরাজ ডাকতে হয়, সেটিও ইনিই করেন। কোনো কাজে শহরে যাবার দরকার হলেও ইনিই থান। বাস—এছাড়া আর কেউ নেই। অবিশ্বাস চাকর আছে; একটি রান্নার লোক, দুটি দারোয়ান, একটি এমনি চাকর--এয়া বাড়িতেই থাকে। পাল্কির লোক আর পাঞ্চাশাশ্বালো কাছেই গ্রাম থেকে আসে।'

'এই ভোলানাথবাবু কোথাকার লোক? ক'দিন আছেন ?'

'উনি এই গ্রামেরই লোক। আমাদের প্রজা ছিলেন। বাপ-ঠাকুর্দু চাষ-বাস করত। ভোলাবাবু নিজে ইস্কুলে পড়েছেন, বেশ বুঝিমুঝি ছিলেন। এখন বসস বাটের কাছাকাছি।'

'উনি কি আপনার পিতামহ ?'

ফেলুন্দা দেয়ালে একটা ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করল। বিরাট এক জোড়া পাকলো গোঁফ নিয়ে এক জমিদার বী হাত শেবত পাথরের টেবিলের উপর রেখে তান হাতে একটা রংপোয় বাঁধালো লাঠি খরে চেরারে বসে আছেন। দেখলেই হলে হয় যাকে বলে দোর্প্পত্তাপ।

‘হ্যাঁ, উনিই দুর্লভি সিংহ।’

‘যার নামে বাস্তু গর্বতে এক ঘাটে জল খেত?’
জীবনবাবু হেসে উঠলেন।

‘মাঝ অধিশ্য এককালে থাকলেও, ঠাকুরদার আমলে ছিল না ; তবে হ্যাঁ, জাকুসাইটে জমিদার ছিলেন ঠিকই। এবং দুশ্মফুলি অত্যাচারী।’

একজন ছকর একটা টেলে করে একটা পেয়ালা আর দুটো গেজাসে কী ঘৰে নিয়ে এল।

‘তাহলে চান্দের পাট উঠিয়ে দেন নি আপনার বাবা?’

‘আলবৎ দিয়েছেন। এটা অধিশ্য চা না, কফি। আমার নিজের একটি কাপ এবং একটিন নেসক্যাফে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসি। সকাল সন্ধে এক তলায় বসে থাই। তাই আপনাদের জন্য গেজাস ; কিছু মনে করবেন না।’

‘মনে করব কেন? এ তো খাঁটি আদ্রাজি সিসটেম। কোমলা বিলাসে এই-ভাবে কাঁসার পাত্রে খেয়েছি কফি।’

দোতলা থেকে মাঝে মাঝেই একটা ঘটাস্ ঘটাস্ শব্দ পাচ্ছিলাম ; সেটা যে কিসের শব্দ সেটা ফেল্দুদার প্রশ্ন থেকে ব্যবহৃত পারলাম।

‘আপনার বাবা বৃক্ষ খড়ম ব্যবহার করেন?’

জীবনবাবু একটু হেসে বললেন, ‘সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?’

‘এই ঠগীর গাঁথা ছাড়া আর কী থেকে আপনার ধারণা হল বে আপনার বাবার জীবন বিপর্য?’

জীবনবাবু এবার তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ফেল্দুদকে দিলেন। তাতে গোটা গোটা পেনসিলের অক্ষরে লেখা—

‘তোমার প্রব্রহ্মবের পাপের প্রায়শিত্ত স্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অতএব প্রস্তুত থাক।’

‘এটা এমেছে তৈ অঞ্চলীয়, আমি আসার আগের দিন। পোশ্ট করা হয়েছিল কাটোয়া থেকে। এখান থেকে যে-কেউ গিরে ডাকে ফেলে আসতে পারে।’

‘কিছু মনে করবেন না—প্রব্রহ্মবের পাপটা কী সে বাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারলে সুবিধে হত।’

‘ব্যবহৈ তো পারছেন,’ বললেন জীবনবাবু, ‘একটা জমিদার বংশের ইতিহাসে অন্যায়ের ত ক্রতৃকম দ্রষ্টব্য থাকতে পারে। কোন পাপের কথা বলছে সেটা কী করে বলি বলুন। আমার ঠাকুরদাদা দুর্লভ মালিকই ত ক্রতৃকম অত্যাচার করেছেন প্রজাদের উপর।’

‘এটা পেরে প্রলিপি ব্যব দিলেন না কেন?’

‘দুটো কারপে’, একটু ভেবে বললেন জীবনবাবু। ‘এক, এখানে আপনাকে কেউ চিনবে না, তাই ফেনোক হৃষ্টি দিছে সে সাবধানতা অবলম্বন করার অভ্যন্তর তাঁগুলি অনুভব করবে না। দুই, পূর্ণিশ এলে প্রথমে আমাকে সন্দেহ করবে।’

আমরা দুজনে জিজ্ঞাসা, দ্রষ্টিতে চাইলাম ভদ্রলোকের দিকে। জীবনবাবু বলে চললেন, ‘বাবার এই অস্তুত পরিবর্তনের পরে থেকে আমার সঙ্গে তাঁর আর বনিবন্দনা নেই। আমরা শহরে মানুষ, বিজ্ঞানের অবদানগুলো অত সহজে বর্জন করা আমাদের চলে না মশাই। এটা ঠিক যে ইলেক্ট্রিক শকের ফলে বাবা মানবিক শকও পেরেছিলেন সাংঘাতিক। ঘটনাটা ঘটে পাঁচ বছর আগে। আমি আর বাবা অপিস থেকে ফিরে একসঙ্গে বৈষ্টকখানায় ঢুকি। অন্ধকারে দাঁত জবাজতে গিয়ে স্লাইচবোর্ড একটা খোলা তারে বাবার হাত আটকে ফায়। বাইরেই ছিল মেইন স্লাইচ, আমি দৌড়ে গিয়ে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অফ করি। তবু, কেন জানি বাবার ধারণা হয় যে আমি বাপারটা আরো ভাড়াতাড়ি করতে পারতাম। সেই তখন থেকেই। যাই হোক, এখানে এসেই কথা কাটাকাটি হয়। এব্যার ত রেগে গিয়ে একটা জনসন্ত কেরোসিনের লাম্প ছাঁড়ে ফেলে দিই। তার ফলে ফরাসে আগ্নেয়-টাপুন থেরে হৃদস্থূল ব্যাপার। পাড়াগাঁতে খবরটা ঝটে ঘৰ। তারপর থেকে সবাই জানে শ্যাম মালিকের সঙ্গে তার ছেলের সাপে-বেউলে সম্পর্ক। কাজেই ব্রহ্মতেই প্রয়েছেন কেন পূর্ণিশ ডাকিনি। অবিশ্ব আপনাকে ডাকাতু আরেকটা কারণ হল আপনার খ্যাতি। আর আমার বিশ্বাস একজন আধুনিক শহরে লোক সহস্যাটা আরো ভালো ব্রহ্মতে পারবে।’

নেসকাফে শেষ হয়ার আগেই ঘরে ল্যাম্প চলে এসেছে। ওপরে পাঁচালিও বন্ধ হয়েছে। জীবনবাবু, বললেন, ‘আপনি বাবার সঙ্গে কি একবার দেখা করতে চান?’

‘সেটা হলে মন্দ হত না।’

আমরা ফরাস ছেড়ে উঠে পড়লাম।

সামান্য কটো ল্যাম্প-লাঞ্চলের আলোয় এত বড় বাড়ির অনেকগুলি যে অশ্বকার থেকে যাবে তাতে আর আশ্চর্ষ কী? সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় জীবনবাবু পকেট থেকে ছোট্ট একটা টে’ বার করে জেবজে-বললেন, ‘এটা ও লুকিয়ে আনা।’

শ্যামলাল মালিক তাঁর নিজের ঘরে ফরাসে বলে ‘স্টার্কিশায় টেস দিয়ে গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে বসে আছেন। জীবনবাবু, আর নিচের ছবির দ্রুতবাবু, এই দুজনের সঙ্গেই ভদ্রলোকের চেহারার মিল আছে। হয়ত

এই চেহারার দুর্ভিল মহিলার গোফ জুড়ে দিলে এইকেও ডাকনাইটে কলে মনে হয়। এই অবস্থায় তাঁখে ভয় করে না, যদিও কথা বললে গলার গম্ভীর স্বরে মনে হয় রাগজে, ভয়ের হতে পারে।

‘আপনি এবার আশ্বন’, গম্ভীর গলায় বললেন শ্যামলাজবাবু। শাকে ফখাটি বল্পা হল তিনি ফরাসের এক কেবে কিসে হিসেন। জীবনবাবু তাকে কবিরাজ তারক চুরবতী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রোগা ডিগ্রিগে চেহারা, ঘন ভুরু নিচে নাকের উপর পুরু কাচের চশমা, নাকের নিচে এক-জোড়া পুরু গোফ। তারক চুরবতী নমস্কার করে দুর থেকে বেরিয়ে গেলেন।



‘গোরেন্দা দিয়ে কী হৈ?’ শ্যামলাল মালিক ছফলদার পরিচয় পেয়েই বিরক্তভাবে প্রশ্ন করলেন। ‘এই চুক্ষের কিনারা গোরেন্দার কম্বো নয়। আমার শত্রু আমার ঘরেই আছে একথা দুর্ভিল মালিকের আমা বলে দিয়েছেন। সে কথা কাশেজ লেখ আছে আমার কাছে। আমা শিকলেজ। জ্যান্ত মানুষ সাহেবী কেতাব পড়ে তার চেরে বেশ জানবে কী করে?’

জীৱনবাবু, দেখলাম কথাটা শুনে কেমন জ্ঞান থক্কত খেঁজে গেলোন।
বুঝলাম তিনি ঘটেনাটা জানেন না।

‘আপনি কি মুক্তি ভোকার্যের বাড়তে গিয়েছিলেন?’

‘আমি ধাৰ কেন? সে এসেছিল। আমি তাকে ডেকেছিলাম। আমাকে
এইভাবে বিব্রত কৰছে কে সেটা আমার জন্মার ছিল। এখন জেনোছ?’

জীৱনবাবু গম্ভীৰভাবে বললেন, ‘কৰে এসেছিলেন মুক্তিকবাবু?’

‘তুমি আসার অগেৰ দিন।’

‘কই তুমি ত আমাকে বলানি।’

শামলালিবাবু কোনো উত্তৰ দিলেন না। তিনি কথাৰ ফাঁকে ফাঁকে
স্মানে গড়গড়া ঢেলে চলেছেন। ফেলুদা বলল, ‘দুর্ভ মাঝিকেৰ আস্থা কী
লিখে গেছেন সেটা দেখা যাব কি?’

ডুঁজোক ঘূৰ্খ থেকে গড়গড়াৰ নল পৰিয়ে লাল চোখ কৰে ফেলুদার
দিকে চাইলেন।

‘তোমার বয়স কত হল?’

ফেলুদা বয়স বলল।

‘এই বয়সে এত আল্পৰ্থী হয় কি কৰে? সে লেখার আধাৰিক ঘৃণা
জান তুমি? সেটা কি ষাকে-তাকে দেখাৰ্থে জিনিস?’

‘আমৰা আপ কৱবেন,’ ফেলুদা খৰ শান্তভাবেই বলল, ‘আমি শুধু
জানতে চেয়েছিলাম আপনার সংকট থেকে কোনো ঘৃষ্ণিৰ উপায় আপনার
পৱলোকনত পিণ্ড ঘলেছেন কিনা।’

‘সেটাৰ জন্য কাগজটা দেখাব কী দৰকাব? আমাকে জিগোস কৱলোই
ত হয়। ঘৃষ্ণিৰ উপায় একটাই—শত্রুকে বিদায় কৰ।’

কয়েক মুহূৰ্ত সবাই চুপ। তাৰপৰ ধীৰকষ্টে জীৱনলাঙ্গ বললেন,
‘তুমি তাহলৈ আমায় চলে যেতে বলছ?’

‘আমি কি তোমাকে আসতে বলেছি কোনোদিন?’

জীৱনবাবু দেখলাম ছাড়াৰ পাত্ৰ নন। বললেন, ‘বাবা, তুমি আমার
চেয়ে ডেজানাথবাবুৰ উপৰ বেশি আস্থা বাধছ, বোধহৱ তাৰ পাইদায়িক
ইতিহাসটা ভুলে যাচ্ছ। ভোলানাথবাবুৰ ব্যব খাজনা দিতে জৈৱ কৰায়
দুর্ভ মাঝিকেৰ জোক গিয়ে তাঁৰ ঘৰে আগন লাগিয়ে দিয়েছিল। আৱ—

‘মৰ্ব! মালিকঘণাই দাঁত বিচৰে বলে উঠলেন। ইজোনাথ তখন
ছিল শিশু। ঘটনার ষাট বছৰে সে প্রতিশোধ নোৰে আমাকে হত্যা কৰে?
এমন কথা শুনলে জোকে হাসবে সেটা বুঝতে পাৰছ নন?’

আমৰা আৱ বসলাম না। চলুন, আপনাদেৱ পেশৈছে দিয়ে আসি,’ বাইৱে

এসে বললেন জীবনবাবু। 'আপনারা শটকাট চিনে ফিরতে পারবেন না।'

ফটক থেকে ফেরিয়ে এসে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে ডেকে এসে আমি ফটক থেকে ফেরিয়ে চাইনি। আপনাকে যে-ভবে অপমানিত হতে হল আমার মধ্যে ফেরিতে চাইনি।'

ফেরিয়েদাদের এসব ব্যাপারে লজ্জাবোধ থাকে না জীবনবাবু।' বলল ফেরিয়ে। 'এখনে এসে আমার আদৌ আপশোষ হচ্ছে না। এ নিয়ে আপনি চিন্তাই করবেন না। আমার কেবল আপনার সম্বন্ধেই ভাবনা হচ্ছে। একটা কথা আপনার বোৰা উচিত। ইম্রাক চিঠি পড়ে ভোলানাথবাবুর কথা মনে কথা আপনার বোৰা উচিত। ইম্রাক চিঠি পড়ে ভোলানাথবাবুর কথা মনে কথা আপনার বোৰা উচিত। হচ্ছে বলেই কিন্তু সন্দেহটা আরো বেশি করে আপনার উপর পড়ছে।'

পুরুষ গামছা আর চিঠি বখন আসে তখন ত আমি কলকাতায়, মিস্টার মিস্টিক।'

ফেরিয়ে একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে বলল, 'আপনার যে কেনো অন্দের নেই গোসাইপের সেটা কী করে জানব জীবনবাবু?'

'আপনিও আমাকে সন্দেহ করছেন?' শুক্রনো ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন জীবনবাবু।

'আমি এখনো কাউকেই সন্দেহ করছি না, কাউকেই নির্দেশ করছি না। তবে একটা কথা আমি আপনাকে জিগ্যেস করতে চাই। ভোলানাথবাবু কিরকম লোক?'

জীবনবাবু এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'অত্যন্ত বিশ্বস্ত। এটা স্বীকার না করে উপর নেই। কিন্তু তাই বলেই কি আমার উপর সন্দেহ পড়বে?' শেষ প্রশ্নটা ঝরিয়া হয়ে করলেন জীবনবাবু। ফেরিয়ে বলল, 'জীবনবাবুর বাবু, এখন আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। এবং আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। এ ছাড়া আপনারও এ ছাড়া উপায় নেই। অপরাধীকে রাখলে করার বাস্তা আমার জানা নেই। বিস্তু যে নির্দেশ তাকে আমি বাঁচাবই।'

এতে জীবনবাবু আশ্বস্ত হলেন কিনা সেটা অধিকারে তাঁর মৃত্যু না দেখে দোষা গেল না।

বাঁশবনটা ঝুঁটিয়ে আসার মুখে ফেরিয়ে একটা প্রশ্ন করল জীবনবাবুকে। 'আপনার বাবা ত খড়ম ব্যবহার করেন; খলি পায়ে হাঁটাহাঁটি করেন কি কখনো—বাড়ির বাইরে?'

বাঁড়ির ভিতরেই করেন না কখনো, ত বাড়ির বাইরে! এটা অবিশ্য নতুন কিছু নয়। চিরকালের ব্যাপার।'

'পায়ের তলায় যেন মাটি দেখলাম। তাই জিগ্যেস করছি। আরেকটা

কথা—উনি মশারির ব্যবহার করেন না?’

‘নিশ্চয়ই। এখানে সবাই করে। করতেই হয়। কেন বলুন তা?’

‘আপনি বোধহয় ল্যাম্পের আলোর ঠিক ব্যবহার পারেন নি; ওর সর্বাঙ্গে অসংখ্য মশার কামড়ের চিহ্ন।’

‘তাই বুঝি?’ বুঝলাম জাবনবাবু খেয়াল করেননি। সত্তা বলতে কি আমিও করিনি। ‘কিন্তু বাবা ত মশারির ব্যবহার করেন। মশারির ত সাহেবদের জিনিস না, ওতে আপনির কী আছে?’

‘তাহলে বোধহয় ফুটো আছে। একটু দেখবেন তা।’

তুলসীবৰু, আৰ জটায়ু, আমাদেৱ জন্ম অপেক্ষা কৰাইলেন ; এতক্ষণে ইশেক্ষিক লাইটে এসে ফেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। লালমোহনবাবু, বললেন, 'তাৰতে পাৱেন, এই গৰ্ভগ্রামে প্ৰায় বিশ জনেৱ মতো লোক পাওয়া গেল যাৱা আমাৰ ফিফ্টি পাৱসেণ্টেৱ বেশি বই পড়েচে ? অৰ্বিশা সবাই যে কিমে পড়েচে তা নয় ; সিক্সটি ফাইভ পাৱসেণ্ট ইস্কুলেৱ লাইব্ৰেৰ থেকে নিয়ে পড়েচে। যাৱা কিমেচে তাৰা এমে বাইৱে সহি নিয়ে গেল !'

তুলসীবৰু, ফেলদুকে বললেন, 'আপনাৰ অপেক্ষাতেই বসে আছি। একবাৰ আৰামামেৱ দৰ্শনটা কৰে নিন। বাদুড়েকালী না হয় কাল দেখা যাবে !'

'সেটা আৰাৰ কী ?'

'গোসাইপুৰেৱ আৱেকটি আঞ্চলিকশন। আপনাৱা যে বাঁশবন দিয়ে এলেন, তাৰই ভেতৱে একটি দৃশ্যো বছৰেৱ পুৱৰেন পোড়ো মন্দিৰ। বিশ্বাস নেই। বহুদিন থেকেই বাদুড়েৱ বাসা হয়ে পড়ে আছে। একবালে খুৰ জাঁকেৱ মন্দিৰ ছিল !'

'ভদ্ৰলো কথা, আপনাৰ এই আৰামবাবুটি এ-গাঁয়েৱই লোক ?'

'না, তবে রয়েছেন এখানে অনেকদিন। বছৰ দৱেক হল ভদ্ৰলোকেৱ এই ক্ষমতা প্ৰকাশ পায়। তাৰাড়া জ্যোতিষও জ্ঞানেন। খুৰ নাম-ডাক। কলকাতা থেকে লোক এসে হাত-টাত দেখিয়ে যায় !'

'পৱসা মেন ?'

'তা হয়ত নেন। কিম্তি এখানেৱ কাৰুৰ কছ থেকে কোনোদিন কিছি নিয়েছেন বলে শুনিনি। আৰা নামান সেম আৰ শুকুৰে : আজ শুধু দৰ্শনটা কৰিবলৈ আনব !'

ফেলদু দৰ্শনেৱ ব্যাপাৰে দেখলাই কোনো আপৰ্যু কৱল না। কাৰণ পৰিষ্কাৰ : সে বুঝেছে মণেন ভটচায় এখন তদন্তেৱ সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আমাৰা বৈৰিয়ে পড়লাম।

বাইৱে গাছপালাৰ ফাঁক দিয়ে এবাড়ি-ওবাড়িৰ বিজলী-আলো দেখা গেলো অন্ধকাৰটা বেশ জমজমাট। চাঁদ এখনো ওঠেনি। খীঁৰি পাঁচা শোল সব ছিলয়ে মনে হাঁচল এখানে শ্যাম মালকেৱ পালকি আৰ কেৱোসিন লালপই

মানায় বেশি। লালমোহনবাবু বললেন এর চেয়ে রহস্যময় আর রোমাঞ্চকর পরিবেশ তিনি আর দেখেন নি। বললেন, 'যে-উপন্যাসটোর ছক কেতোচ সেটা গোয়াটেমালায় ফেলব তা বচলুম, এখন দেখছি গোসাইপুর প্রেফারেন্স।'

'তাও ত ঠগীর ফাঁস্টা দেখেন নি, তাহলে ব্যক্তেন রোমাঞ্চ কাকে বলে।'

'সে কী বাপার মশাই?'

ফেলুন সংক্ষেপে ঘটলাটা বলল। ইঞ্জিন চিঠির কথাটাও বলল: তুলসী-বাবু ইন্দুবা করলেন, 'ঐগেন ভট্টাচার্য শব্দ আস্বা অনিয়ে ওই কথাটৈ বলে থাকে যে মঙ্গল বাড়িতেই রয়েছেন শায়ম মঙ্গলকের শত্ৰু তাহলে সেটা মানতেই হবে। আপনার সব্বা গাঁ চেয়ে বেড়ানোৱ দুরকার নেই।'

আমি মনে মনে বললাম—তুলসীবাবুর ভঙ্গির পাত্রের মধ্যে আরেকজন জৈবক পাত্রয়া গেল—আস্বারাম ইগেন ভট্টাচার্য।

ইগেনবাবুর বাড়িতেও দেখলাম ইলেক্ট্রিসিটি নেই। বোধহয় আবছা অলোক আস্বা সহজে নামে তাই। ভদ্রলোকের চেহারাটা বেশ চোখে পড়ার মতো। দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। পাতলা চুলে পাক খোনি, শব্দও চোখের কোলে আর থৃত্যনির নিচে চাহড়া কুঁচকে গেছে। নাক, চোখ, কপাল, পাতলা ঠেঁটি, গায়ের রং সবই একেবারে কাশির চোলের পর্ণমুক্তির মতো। মানে যাকে বলে মার্কা আরা বাঘুন। পায়ের গুলি দেখে মনে হল ভদ্রলোক এখন না হলেও এককলে প্রচুর হেঁচেছেন।

বিজলি না থাকলেও এখনে চেয়ার টেবিলের অভাব নেই। ভট্টাচার্য মশাই নিজে তত্ত্বপোষে বসে আছেন, সামনে তিনটে টিনের আর একটা কাঠের চেয়ার ছাড়া দুপাশে দুটো বেঁচে রয়েছে। ডান দিকের বেঁশতে একজন বছর পাঁচশোর ছেলে বসে একটা পুরোনো পাঁজির পাতা উলঠাচ্ছে। পরে জেল-ছিলাম ও ইগেনবাবুর ভাগমে নিয়ানন্দ, আস্বা নামানোৱ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করে।

তুলসীবাবু ভট্টাচার্য মশাইকে ঢিপ্প করে একটা প্রশ্ন করে আমাদের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'কলকাতা থেকে এসেন এখা। আমার বন্ধু। নিয়ে আলাম আপনার কাছে। গোসাইপুর কাকে নিয়ে গৰ্ব করে সেটা এদের জন্মাউচিত নয় কি?'

ইগেনবাবু ঘাড় তুলে আমাদের দেখে চেয়ারের দিকে দেখিয়ে দিলেন। আমরা তিনজনে বসলাম, তুলসীবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইগেনবাবু হঠাত টান হয়ে পদ্ধাসন করে বসে ছিঁকে থানেক চোখ বুজে চুপ করে রইলেন। তারপৰ সেই অবস্থাতেই বললেন, 'সন্ধানশী বন্ধুটি কোন জন?'

আমেরা সবাই চুপে ফেল্দার চোখ কুচক পেছে। লালমোহনবাবু
বললেন, 'আজ্জে ওই সামে ত কেউ—'

তুলসীবাবু প্রাপ্তি আগুল দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

'গুদেজু ছেন্দু মিশ্র আমার নাম,' হঠাতে বলে উঠল ফেল্দা। সত্তাই ত!—
প্রসোধ ঘামে সন্ধা, চন্দ্র হল শশী, আর মিশ্র হল বন্ধু!

ভট্টাচায় মশাই চোখ দ্বলে ফেল্দার দিকে মুখ ঝোরালেন। তুলসীবাবু
দৈখ বেশ গৰ্ব-গৰ্ব ভাব করে ফেল্দার দিকে চেয়ে আছেন।

'বুঝলে তুলসীচৰণ,' বললেন ভট্টাচায় মশাই। 'কিছুদিন পৰে আৱ
আমাৰ প্ৰয়োজন হবে না। আমাৰ নিজেৰ মধেই তুম্হে দিকাল দৰ্শনৰে শান্তি
জাগজে বলে অনুভব হচ্ছে। অৰ্বিশ্য আয়ো কয়েক বছৰ জাগবে।'

'ও'ৱ পেশাটা কী বল্বু ত! তুলসীবাবু ফেল্দার দিকে দৈখিয়ে প্ৰশ্নটা
কৰলেন। ইতিমধ্যে একজন বাইরেৰ লোক এসে ঢুকেছে, তাৰ সামনে ফেল্দা
যে গোয়েন্দা এই ব্যৱৰটা বৈধিয়ে পড়লে যাবটৈ ভাল হবে না।

'সেটা আৱ বলাৰ দৱকাৰ নেই,' বলল ফেল্দা। তুলসীবাবুও নিজেৰ
অস্বাধৰণতাৰ বাপারটা বুঝে ফেলে জিভ কেঁটে কথা থুরিয়ে বললেন, 'শুকুৰ-
বাৰ অৱেকবাৰ আপনাৰ এখানে নিয়ে আসব ও'দেৱ। আজ কেবল দৰ্শনটা
কৰিয়ে গেলাম।'

মুগাইকবাৰুৰ চোখ এখনো ফেল্দার দিকে। একটি হেসে বললেন,
'সুকু সাল শস্যৰ কাজে এসেছেন আপৰ্নি, এ কথা বললে আপৰ্নি ছাড়া
আৱ কেউ বুঝবে কি? আপৰ্নি অকাৱণে বিচলিত হচ্ছেন।'

ভদ্ৰলোকেৰ কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইৱে এসে ফেল্দা বলল, চতুৰ লোক।
এ'ৰ পসাৰ জমবে না ত কাৱ জমবে?'

'সুকু সাল শস্য কী মশাই?' লালমোহনবাবু জিগেস কৰলেন।
'সৰ্বজ্যো শশী বন্ধু ত তাৰে আনেক কষ্টটি বুঝলাম—তাৰে আপৰ্নি নিজেৰ নামটা
বললেন বলো।'

'সুকু হল অণ, সাল—দম্তা স—হল সন, আৱ শস্য হল ধান। তিনে
মিলে—'

'অনুসন্ধান!' লালমোহনবাবু ক্লাপ দিয়ে বলে উঠলেন, 'লোকটা শুধু
গণনা জানে না, হেয়ালিও জানে। আশৰ্য্য!'

কে হেন এদিকেই আসছে—হাতেৰ লণ্ঠনটা দেলাৰ ঘলে তাৰ নিজেৰ
ছায়াটা সারা রাত্তা ঝাঁট দিতে দিতে এগিয়ে আসছে! তুলসীবাবু হাতেৰ
টৰ্চ তুলে তাৰ মুখে ফেলে বললেন, 'ভট্টাচায়েৰ ওখামে বুঝি? কী বাপাৰ,
ঘন ঘন দৰ্শন?'

ভদ্রলোক একটু হে হে ভাব করে কিছু না বলে আমাদের পাশ কাটিবে চলে গেলেন।

‘ভোলানাথবাবু,’ বললেন তুলসীবাবু, ‘ভট্টাচ মশাইয়ের লেটেস্ট ভস্ত ! আবো একাদশ ও’র বাড়িতে গিয়ে কর জান আজ্ঞা নামিয়েছেন।’

বাতে তুলসীবাবুর দাওয়ায় বসে তিনরকম তরকারি, মুগের ডাল আর ডিমের ডালনা দিয়ে দিবিয়া ভোজ হল। তুলসীবাবু বললেন যে এখানকার টিউবওয়েলের জলটায় নাকি ঘূর খিদে হয়।

ধাওয়া-দাওয়া করে বাইরের দাওয়ায় বসে তুলসীবাবুর কাছে ও’র মাস্টারি জীবনের গচ্ছ শুনে যখন দোকানের শুভে এলাম তখন খড়ি বথে সাড়ে মটা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মাঝরাত্রি। আমরা মশারির সমেত বিছানাপত্র সব নিয়ে এসেছিলাম ; ফেলদু বলক্ষণ গুড়েমস মেঝে শোবে, মশারির দরকার নেই। আমি লক্ষ্য করেছি গত দেড় ঘণ্টায় ও একবার কেবল গঙ্গার বান্দার প্রশংস্য ছাড়ি আর কোনো বন্ধা বসেনি। এত চট করে ওকে চিন্তার ডুবে যেতে এর আগে কখনো দেখিনি। লালমোহনবাবু বললেন ও’র সংবর্ধনার স্পীচটা তৈরি করে রাখতে হবে, তাই উনি একটা লাঠি চেয়েছেন, কারণ দরে বাস্তি জৰালিয়ে রাখলে আমাদের ঘূরে ব্যাপত হবে।

আমি বিছানায় শূরে ফেলদুকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

‘তেমার নাম আর পেশা কী করে বলে দিল বল ত ?’

‘আমার মন্তব্য অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে ওটাও একটা রে তোপসে। তবে অনেক লোকের অনেক পিকাউলার ক্ষমতা থাকে যাই কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।’

লালমোহনবাবু বললেন, ‘আমাকে এভাবে স্লেফ ইপনোর কুল কেন বলুন ত ?’

‘সারা গাঁয়োর লোক আপনাকে অভিধন্তা দিতে চলেছে, আর একটি লোক আপনার নামে হেয়ালি বাধ্য না বলে আপনি গুস্তক পড়লেন ?’

‘তাহলে বোধহয় আমার নাম থেকে হেয়ালি হয় না তাই।’

ফেলদু স্টো ধোয়ার রিং ছেড়ে বলল, বক্তব্যণ শুন্ধকরণ মদীপাশে থাহা বিধিসে প্ররুণ—কেমন হ’ল ?’

‘কিঙকম, কিরকম ?’ মলে উঠলেন লালমোহনবাবু, ফেলদু এত গস্ত করে ছড়চো বলেছে যে দুজনের কেউই ঠিকহত ধরনক পারিনি। ফেলদু আবার বলল—‘বক্তব্যণ মদীপাশে থাহা বিধিল হুণ !’

‘দাঁড়ান, দাঁড়ান.....বক্তব্যণ লাল, আর মুশকরণ—’

‘মোহন !’ আঘি ক্ষেপিষে দলে উঠলাম।

ইয়েস, সালামহাম—কিন্তু গাঙ্গুলী ?—ওহো, নদী হল গাঁও আৱ গুলি
বিধলে মৱণ—তাৰি, বিলিয়ান্ট মশাই ! কী কৱে যে আপনাৱ মাথায় এত
আসে জনি মা ! আপনি থাকতে সংবৰ্ধনাটা আমাকে দেওবাৱ কোন মানেই
হয় ন্যূনজলো কথা, স্পীচটা তৈৱী হলে একটু দেখে দেবেন ত ?

প্রতিদিন সকালে গ্রামটা ঘুরে দেখে আমরা জাগরণী ক্লাবের বাড়িতে সিল্বারজল্দোলা নাটকের রিহার্সাল দেখতে গেলাম। ফেলুদা অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের ক্যানেভিয়ান থিয়েটার সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। সেখানেই আলাপ ইল গোসাইপুরের একমাত্র মুক্তাভিনেতা প্রণীয়াবের সঙ্গে। বললেন শুক্রবার বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর আট দেখিয়ে যাবেন। 'দেখবেন স্যার, ফ্লাট হাতের উপর সিঁড়ি দেয়ে ওঠা দেখিয়ে দেব, অড়ের মধ্যে মানুষের অভিযান কিরকম হয়, স্যাড থেকে ছ'রকম জেঞ্জের ঘণ্ট্যে দিয়ে হ্যাপিতে নিয়ে যাওয়া সব দেখিয়ে দেব।'

বিকেলে সেগুনহাটির মেলা দেখতে গেলাম। সেখানে নাগরদোলায় চড়ে, চা চিকেন কাটলেট আর রাজভোগ খেয়ে, স্পাইডার লেডির বীভৎস ভেল্কি দেখে, সাড়ে তেরো টাকার খচ্চো জিনিস কিনে গোসাইপুর যখন ফিরলাম তখন ছটা বাজে। আকাশে আলো আছে দেখেই বোধহয় ফেলুদা বলল একবার অল্পিকবাড়িতে জীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করে ষাবে। তুলসীবাবু বললেন বাড়ি গিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

সদর দরজায় পেঁচানোর আগেই জীবনবাবু বেরিয়ে এলেন ; বললেন ও'র ঘরের জানালা দিয়েই অনেক আগেই আমাদের দেখতে পেয়েছেন। তারপর ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে নতুন কালো খবর নেই। 'আপনাদের বাগানটা একটু দেখতে পারি?' 'নিশ্চয়ই,' বললেন জীবনবাবু, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

বাগানটা অবিশ্য ফুলের ক্ষণান নয়, এখানে বেশীর ভাগই বড় বড় গাছ আর ফলের গাছ। ফেলুদা ঘুরে ঘুরে কৌ দেখছে তা ওই জানে! একবাস্তু এক জায়গায় থেমে মাটিটার দিকে রেন একটু বেশিশুণ ধরে দেখল। এরই ফাঁকে আবার গাঁপিক বাড়ির দোতলার পিছনের বারান্দা থেকে 'কে বে, কে ওখানে?' বলে জীবনবাবুর ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন। তাতে জীবনবাবুকে আবার উঠলে চেঁচিয়ে বলতে হল, 'কেউ না ঠাকুমা—আমরা।' 'ও, তোরাহ!' উত্তর দিলেন ঠাকুমা, 'আমি রোজই ঘেন দৰ্দি কাঢ়া ধূৰ করে খুখনে।'

'আপনার ঠাকুমার দ্রুঁটিশঙ্ক কেমন?' ভিত্তে কবল ফেলুদা।

'খুবই কম,' বললেন জীবনবাবু, 'এবৎ তার সঙ্গে মাননিমই শুধুণশক্তি।'

‘বাগান এমনিতে বোঝহয় তেমন দেখাশোনা হয় না?’

‘ওই ভোলানাথবুরু থা দেখেন।’

‘আজ্জে লোকখাকে এদিকে?’

‘রাত্রেই আঢ়া আৱাপ! রাত জেগে বাগানে টুহল দেৰে এৱা?’

‘সন্দেহজনক তালা দেওয়া থাকে আশা কৰি?’

‘খটি ভোলানাথবাবুৰ ডিউটি। তবে আমি থাকলে আমিই চাবি বন্ধ কৰি, চাবি আমার কাছেই থাকে।’

‘ভোলানাথবাবুৰ সঙ্গে আলাপ হয়নি; তাঁকে একবার ডাকতে পাৰেন?’

ভোলানাথবাবুকে দিনেৱ আলোৱ দেখে মনে হল তিনি শহুৰে লোকেৰ মতো ধৰ্মত সাঁই পৱলেও তাৰ চেহারায় এখনো অনেকখানি তাৰ পৰ্বপৰূষেৰ ছাপ বায়ে গেছে। যালি শা কৰে ঘাটে নিয়ে হাতে লাঙল ধৰিয়ে দিলে খুব বেমানান হয়ে না। আমিয়া বাড়িৰ সামনে বাধনো পুকুৱেৰ ঘাটে বসে কথা বললাম। বৰ্ষাৰ জলে পুকুৱ প্রায় কানায় কানায় ভৱে আছে আৱা পুকুৱ ছৱে আছে শালুকে। নবীন বলে একটি চাকৰকে লেবুৰ সন্ধিত আনতে বললেম জীবনবাবু। চারিদিক অস্তুত রকম নিস্তথ, কেবল দূৰে কোথেকে জানি চি চি কৰে শোনা যাচ্ছে ট্র্যানজিস্টোৱে গান। খটা না হলে সত্তাই ঘেন মনে হত আমিৱা কোন আদিকালো ফিৰে গেছি।

‘মগাঞ্জিবাবু, আপনাদেৱ বাড়িতে একবারই এসেছেন?’ ভোলানাথবাবুকে জিগোস কৰলুম।

‘সম্প্রতি একবারই এসেছেন।’

‘আৱ আগে?’

‘আগেও এসেছেন কয়েকবার। কাটোয়া খেকে আষাঢ় আসে মদন গোসইৰ দল এলো, তখন মগাঞ্জিবাবুই তাদেৱ নিয়ে এসে কৰ্তাৰকে কেলন শুনিয়ে যান। এমনিতেও বাবু কয়েক একা আসতে দেখেছি; মনে হয় কৰ্তাৰ একটা কুণ্ঠি ছাকে দেবাৰ কথা বলেছিলেন।’

‘সে কুণ্ঠি হয়েছে?’

‘আজ্জে তা বলতে পাৰব না।’

‘এবৱ যে এলেম, তাৰ বাবস্থা কে কৱল?’

‘আজ্জে কৰ্তাৰ নিজেৰও ইচ্ছা ছিল, আৱ কৰিবৱেজ ফশাইও বলকেন, আৱ—আজ্জে আশি বলেছিলাম।’

‘আপনার ত বাতাসাত আছে ভট্টাচায় বাড়িতে?’

‘আজ্জে হাঁ।’

‘ভাস্তি হয়?’

ভোলানাথবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেল।

‘আজ্জে কী আর বলব বললুন। আমার মেঘের নাম ছিল লক্ষ্মুৰ্ণি, বেমন নাম তেমনি মেঘে, এগুরোৱ পড়তে না পড়তে লেন্টেচোয় চলে গেল। মগোজ্জবাবু শুনে বললেন, সে কেমন আছে জানতে চাও তার নিজের কথায়?’

ভোলানাথবাবু অন্ধকারে দ্রুতির খুঁটে চোখ মুছলেন। তারপর সামলো নিয়ে বললেন, ‘সেই মেঘেকে নামিয়ে আনলেন ভট্টাচায় মশাই। মেঘে বললে ভগবানের কোলে সে সুখে আছে, তার কোনো কষ্ট নাই। অথবা বললে না অবিশ্যা, কাগজে লেখা হল। সেই খেকে.....’

ভোলানাথবাবুর গলা আবার হবে গেল। ফেলুদা ব্যাপারটাকে আর না বাড়িয়ে বলল, ‘এ বাড়িত আস্তা নামানোর সময় আপনি ছিলেন?’

‘ছিলাম, তবে ঘরের মধ্যে ছিলাম না, দরজার বাইরে। ভেঙ্গে কেবল কর্তা-মশাই আর ভট্টাচায় মশাই আর নিয়ানন্দ ছাড়া কেউ ছিলেন না। মা ঠাকুরুন যেন জ্ঞানতে না পারেন এইটে বলে দিয়েছিলেন কর্তামশাই, তাই দরজায় পাহাড়া থাকতে হল।’

‘তাহলে আপনি কিছুই শোনেন নি?’

‘আজ্জে দশ মিনিট থানেক চুপচাপের পর এধূ সরকারের বাঁশ বনের দিক থেকে যখন শেঘাল ডেকে উঠলো সেই সময় যেন কত মশাইয়ের গলায় শব্দলম্ব—কেউ এলেন, কেউ এলেন? তারপর আর কিছু শুনিনি। সব হয়ে যাবার পর ভট্টাচায় মশাইকে নিয়ে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিবে আসি।’

সবৰেত খাওয়া শেষ করে একটা চারিমিনাৰ ধৰিয়ে ফেলুদা বলল, ‘দ্বিতীয় মাজিকের লোক আপনাদের হয়ে অগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সে কথা মনে পড়ে?’

ভোলানাথবাবুর উক্তির এলো ছোটু দ্রুতো কথায়।

‘তা পড়ে?’

‘আপনার মনে আঝোশ নেই?’

ফেলুদাকে এধৰনের ধাক্কা-মারা প্রশ্ন করতে আগেও দেখেছি। ও বলে এই প্রশ্নের প্রশ্নের বিআকৃশন থেকে নাকি আনেক কিছু জানা যায়। ভোলানাথবাবু জিভ কেঁটে মাথা হেঁট করালেন। তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ থেকে বললেন, ‘এখন মাথাটা ঠিক নেই তাই, নইলে কর্তামশাইয়ের গতো মন্ত্র কৃষ্ণন হয়?’

ফেলুদা আর কোন প্রশ্ন কৰল না। ভোলানাথবাবু একজুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, ‘যদি জন্মাতি দেন—আমি একটু ভট্টাচায়-মশাইয়ের বাড়ি যাব।’

ফেলুদা বা জীবনবাবুর কোন আপত্তি নেই জেবে উদ্বলেক চলে গেলেন। জীবনবাবু একটু উস্থস্থ কৰছেন দেখে ফেলুদা বলল, ‘কিছু বলবেন কি?’

‘আপনি কিছুটা অগ্নির হলেন কিনা জানাব আশছ হচ্ছে।’

বুবলাম ভদ্রলোকের সম্বন্ধে বিশেষ চিহ্নিত।

ফেল্দা বলল, 'তোলানাথবাবুকে বেশ ভালো লাগল।'

জীবনবাবুর ঘৰে শৰ্করায়ে গেল। 'তার মানে আপনি বলতে চান—'

'আপি মিশ্রই বলতে চাই না আপনাকে আমার ভালো লাগে না। আমি বলতে চাই শৰ্করা দু-একটা খটকার উপর নিভ'র করে ত বুব বেশী দুর পঞ্জেশ যায় না—বিশেষ করে দেই খটকাগুলোর সঙ্গে যখন ঘৰ থাপারটার কোনো সম্পর্ক' পওয়া যাচ্ছ না। এখন যেটা দুরকার মেটা হল কোনো একটা ঘটনা, যেটা—'

'কে রে, কে ওখানে ?'

ফেল্দাৰ কথা থেমে গেল, কাৰণ ঠাকুৰ চেঁচিয়ে উঠেছেন। আওয়াজটা এসেছে বাড়িৰ পিছন দিক থেকে। চৰ্বিদিক নিষ্ঠভূত বলে গলা এত পরিষ্কাৰ শোনা গেল।

ফেল্দা দেখলাম হৃষ্টৰ মধো সোজা বাগানেৰ দিকে ছুটছে। আমৰাও তাৰ পিছৰ নিলাম। লালমোহনবাবু এতক্ষণ পুকুৰেৰ দিকে ডাকিয়ে গুনগুন কৰে গান গাইছিলো : তিনিও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে দিলেন ছুট।

তিনটে টের'ৰ আলোৰ সাথায়ে আমৰা বাগানে গিয়ে পেঁচলাম। ফেল্দা এগৰে গেছে, সে পশ্চিমেৰ পাঁচিলৱ গড়ে একটা ধসে যাওয়া অংশেৰ পাশে দাঁড়িয়ে বাইবে টের' কেলে রয়েছে। 'কাটকে দেখলোন ?' জীবনবাবু প্ৰশ্ন কৱলোন।

'দেখলাম, কিন্তু চেনাৰ মতো স্পষ্ট নয়।'

আধৰণ্টা ধৰে হশাৰ বিনৰিন্দনি আৱ কমড় আৱ ঝিৰিবৰ কান ফাটলো শক্ষেৰ মধো সাৰা বাগান চয়ে যেটা পাওয়া গেল সেটা একটা চৱম রহস্য। সেটা হল বাগানেৰ উত্তৰ দিকেৰ শেষ মাথায় একটা গাছেৰ গুড়িৰ পাশে একটা সদা-খেঁড়া গৰ্ত। তাৰ মধো যে কৰী ছিল বা কৰী থাকতে পাৰে সে বাপাৰে জীবন-বাবু, কোনৰকম আলোকপাত কৱতে পাৱলোন না। লালমোহনবাবু অবিশ্বা সোজাস্বজি বললোন গৃহ্ণণ, কিন্তু জীবনবাবু বললোন তাঁদেৱৰ বংশে কাৰ্য্যন-কালোও গৃহ্ণণ সম্বন্ধে কোন কিংবদন্তী ছিল না। ফেল্দা যে কথাটা বলল সেটাও আমৰা কাছে পুৱোপূৰি রহস্য।

'জীবনবাবু, আমৰা এনে হচ্ছে আমৰা এই ঘটনাটোৱ জন্য অপেক্ষা কৰছিলাম।'

আমৰা কিছুক্ষণ হল যাওয়া-দাওয়া সেৱে অমাদেৱ ঘৱে এসে বসোছি। আজ বেশ কাহিল লাগছে : বুৰতে পাৰছি অন্ধকাৰে বনবাদাত্তে ঘোৱাটা সহজ কাজ নয়। আগৱ আৱ লালমোহনবাবুৰ পাৰে বেশ কয়েক জায়গায় ডেটল দিতে হয়েছে। কাৰণ আগোছাৰ শব্দে কঠো-বোপও ছিল বেশ কৱেক্টা।

banglabooks কী যেন হিঁজিবিজি লিখছে। লালমোহনবাবু একটা হাই অর্থেক
তুলে থেয়ে গেলেন, কারণ ফেলন্দা একটা প্রশ্ন করেছে—লালমোহনবাবুকে
নয়, তুলসীবাবুকে। তুলসীবাবু আমাদের জন্য পান নিয়ে চুক্তিহনে।

‘তুলসীবাবু, আপনি বাদ একজন মহৎ লোককে একটা জোক ঠকনো
ফন্দ বাস্তলে দেন, সে-জোক বাদ সে ফন্দ কাজে লাগায়, তাহলে তাকে কি
আর মহৎ বলা চলে?’

তুলসীবাবু ভাবাচাকা ভাব করে বসলেন, ‘ওরে বাবা, আমি মশাই এসে
হেয়ালি-টেয়ালিতে একেবারেই অপটু। তবে হাঁ, মহৎ লোক অত নিচে
নামবেন কেন? নিশ্চই নামবেন না।’

‘বাক্,’ বলল ফেলন্দা, ‘আমি ঘৃণি ইলাম জেনে যে আপনি আমার সঙ্গে
এক মত।’

একেই ত পাঁচালো রহস্য, সেটাকে ধোঁয়াতে কথা বলে ফেলন্দা আরো
পেঁচিয়ে দিচ্ছে, আমি তাই ও নিয়ে আর একদম চিন্তা না করে মশারির ভিতর
চুক্তাম। কিন্তু চিন্তা করব না ভাবলেই কি আর মন থেকে চিন্তা পালিয়ে
যায়? আমার নিজের মনেই যে প্রশ্ন জমা হয়েছে একগাদা। শ্যামলালবাবুর
পায়ে কাদা কেন? কে পাঠিয়েছে ঠগীর ফাস আর হুমকি চিঠি? ঠাকুমা
কাকে দেখে চেঁচালেন আজকে? বাগানের গর্তে কী ছিল? আমার উত্তর
লেখা কাগজ দেখালেন না কেন মিলিকমশাই?.....গতকালের মতো আজও
বিছানায় পড়তে ঘৰ্মিয়ে পড়েছিলাম, কেবল তফাংটা এই যে গতকাল
এক ঘৰ্মে রাত কাবার, আর আজ চোখ খুলে দোখ তখনও অন্ধক্যুর।

আসলে ঘৰ্মটা ভেঙ্গেছে একটা চীৎকারে। সেটার জন্য দায়ী বোধহৱ লাল-
মোহনবাবু, কারণ তিনি খাটের উপর খসে আছেন মশারির বাইরে, সামনের
খেলো জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের
উপর, আর স্পষ্ট দেখছি তাঁর চোখ গোল হয়ে গেছে।

‘বাপ্রে বাপ্র, কী স্বশ্ন, কী স্বশ্ন! বললেন লালমোহনবাবু।

‘কী দেখলেন আবুর?’ আমি জিগোস কৱলাম।

‘দেখলুম আমার ঠাকুরদা হরিমোহন গাঙ্গুলীকে.....একটা সংবর্ধনা
সভা, তাতে ঠাকুরদা স্পৰ্চ দিলেন, তারপর আমার গুল্মুম্বুজালা পরিয়ে দিয়ে
বললেন, এই দাখ, কেমন রোমাঞ্চকর মালা দিলাম কেকে—আর আমি দেখছি
সেটা ফুলের মালা নয় অপেশ, সেটা—ওরেবাসুকুর বাস—সেটা খুদে খুদে
রস্তবর্ণ নৱমুণ্ড দিয়ে গাঁথা।’

‘এমন চৰ্কাৰ ভাস্ক কুহতে আপৰিন এই সব উভয়ট স্বৰ্ণ দেখছেন?’

আশ্চৰ্য! ফেলদুৰেছে তাৰ খাটে নেই সেটা এতক্ষণ খেয়ালই কৰিবিন। সে ছাতেৰ দৰাজা দিয়ে ঘৰে এসে চৰকল ; বুলাম সে যোগব্যায়াম কৰিছিল। যাক, তাইজে স্মৰণ হয়ে গেছে।

‘কৰ্ত্তা কৰ্ত্তাৰ বলনুন।’ বললেন লালমেহনবাৰু, ‘আপনাৰ এই বৰ্তবৰণ আৱ আঘাতে আৱ সংবৰ্ধনা মিলে এমন জগৎখুড়ি হয়ে গেছে আমাৰ মধ্যে।’

আমৰা উঠে পড়সাম ! তুলসীবাৰু, কি এখনো ঘৰমেছেন? ছাতে এসে দোখ পৰি দিকটা নথে ফৰসা হয়েছে, তাৰ ফলে চাঁদেৰ আলোটা ফিকে লাগছে। দুভিনটে তাৰা এখনো পিটি-পিটি কৰছে, কিন্তু তাদেৰ মেয়াদত আৱ বৈশিষ্ট্য নোৱ। দাতন দিয়ে একপোৱামেট কৰিব বলে কিছু নিমেৰ ডান ভেঞ্চে রেখেছিলম—ফেলদুৰা বলে দোকনেৰ যে কোঠো টুথপ্রাশ আৱ পেস্টেৰ চেয়ে দশ গুণে বেশী ভাল—তাৰই একটা চিবিয়ে রেডি কৰিছ, এমন সময় শুনলাম পৰিপ্রাহি চৰ্কাৰ।

‘মিস্ট্ৰি মশাই! মিস্ট্ৰি মশাই !’

ভোলানাথবাৰুৰ গলা। আমৰা দৃশ্যাভ কৱে নিচে গিয়ে হাজিৱ হলাম। ‘সৰ্বনাশ হয়ে গেছে?’

ভোৱেৰ আকাশে ভজনোকেৱ ফ্যাকাশে ঘূৰি আৰো ফ্যাকাশে লাগিছিল। ‘কি হয়েছে?’ ফেলদুৰা দৌড়ে গিয়ে জিগোস কৱল।

‘কাল রাত্তিৱে বাড়তে ডাকাত পড়ে সব লণ্ডভণ্ড। সিন্দুক খালি। কৰ্ত্তাৰ মশাইয়েৰ হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখেছিল। আঘাকেও বেঁধেছিল, সকলৈ ছোটবাৰু এসে খলে দিলেন। আপৰিন শিগ্ৰি আস্বন।’

শ্যামলাল মঞ্জিক জ্বরে হননি বটে, কিন্তু তাকে যেভাবে দুঃঘটা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়েছিল তাতে তিনি বেশ টস্কে গেছেন। ফ্যালফ্যাল কাঁচের সামনের দিকে চেয়ে বসে আছেন ফরাসের উপর, কেবল একবার মাঝে বিড়াবড় করে বলতে শুনলাম, 'বাঁধাসি বাঁধি ত মেরে ফেলাল না কেন?' এবিকে তাঁর সিন্দুর যে ফাঁক সেটা কি তিনি খেয়াল করেছেন?

ফেলদা প্রথমে শ্যামলালবাবুর ঘরটা ত্বর ত্বর করে দেখল। শুধু সিন্দুরকটাই খোলা হয়েছে, আর বার ঘেমন টেম্বনাই আছে। চাঁবি থাকত নাকি ভদ্রলোকের বালিশের নিচে। ভোলানাথবাবু দেতেলাতেই শোন, তাঁকে ঘৰের মধ্যে আঠাটোক করে হাত-পা চোখ-মুখ বেঁধে ফেলেছে ডাকাত। ওই ধারণা যে অন্তত দুজন লোক ছিল। ঢাকর নবীন নাকি সরারাত নাকে ত্বেল দিয়ে ঘুমিয়েছে। দুজন পাইকের মধ্যে একজন ছলে গিয়েছিল সেগুলহাটি শান্তা দেখতে, আবেকজন তার ডিউটি ঠিকই করছিল, দুঃখের বিষয় ডাকাত মাথায় লাঠি মেরে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে অকেজো করে দিয়েছিল। সামনের দরজা বন্ধই ছিল, কাজেই মনে হয় খিড়কির পাঁচিল টপকে পিছনের বারান্দা দিয়ে ঢুকেছিল। ঠক্কামাকে কিছু জিগ্যেস করে লাভ নেই, কারণ তিনি আকেন বারান্দার উত্তর প্রান্তে তিনটে অকেজো ঘরের পরে শেষ যাবে।

পনের মিনিট হল এসেছি, কিন্তু এখনো জীবনবাবুর দেখা নেই। ভোলানাথবাবু আমাদের সঙ্গেই ছিলেন, ফেলদা তাঁকে বলল, 'জীবনবাবু কি আমাদের সঙ্গে কথা না বলেই পুলিশে দ্বন্দ্ব দিতে গেলেন নাকি?'

ভোলানাথবাবু আমতা আমতা করে মাথা নেড়ে বললেন, 'আজ্জে আমাকে দলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তার পরে ত.....,

ফেলদা এবার ছাটুল সিঁড়ির দিকে, পিছনে আমি আর লালমেঝুন্দুবাবু। উঠোন পেরিয়ে সোজা খিড়কি দিয়ে বাইরে বাগানে হাজির হলাকে। এখনো ভাল করে সূর্য ওঠেনি। অল্প কুয়াশা ও যেন রয়েছে, কিন্তু জমে থাকা উন্ননের ধৈয়া। গাছের পাতাগুলো শিশিরে ভেজা, পাতার সিঁচে ঘাস ভেজা। পাঁচ ডাকছে—কাক, শ্যালিক, আর আরেকটার নাম জানিন না।

আমরা বাগানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রবেক্তে থেমে গেলাম।

দশ হাত দূরে একটা কাঠাল গাছের গুড়ির ধারে নীল পাঞ্জাবী আর

পায়জ্ঞামা পরা একজন জ্ঞানী পড়ে আছে। ওই পোশাক আমি চিনি; ওই চট্টোও চিনি।

ফেলুদা এবিষয়ে গিয়ে কছ থেকে দেখেই একটা আতঙ্ক আৱ আক্ষেপ দেশানো খন্দে করে পিছিয়ে এল।

‘ওঁবেশ্বরী!'

বাস্তুমোহনবাবু আঙুল দিয়ে কিছু দ্বারে ঘাটিতে একটা জ্যোগার পরেন্ট করে কথাটা বললেন।

‘আমি। দেখেছি।’ বলল ফেলুদা, ‘ওটা ছোবেন না। ওটা দিয়েই জীবন-বাবুকে খন্দ ফুরা হয়েছে।’ খোপের ধারে পড়ে রয়েছে কোণে পাথর বৈধ একটা গামছা।

তোলানাথবাবুও বেরিয়ে এসেছেন, আৱ দেখেই বুঝেছেন কী হচ্ছে। ‘সর্বনাশ’ বলে মাঝায় হাত দিয়ে প্রায় যেন ভিৰামি লাগার ভাব কৱে তিন হাত পেছিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

‘এখন বিচার হলে চলবে না তোলানাথবাবু, আপনি চলে বাব ভদ্রলোকের সঙ্গে। এখানে পুলিশের ঘাটিতে গিয়ে ব্বৰু দিন। দৱকার হলে শহুর থেকে দারোগা অসবে। কেউ যেন লাখ বা গামছা না খুরে। কিছুক্ষণ আগেই এ কীভিত্তি হয়েছে। সে লোক হয়ত এখনো এ তলাটৈই ভাবে। আৱ—ভালো কথা—মালিকমশাই যেন খন্দের কথাটা না জানেন।’

ফেলুদা দৌড় দিল পশ্চিম দিকের পাঁচিল লক্ষ্য কৱে, সঙ্গে সঙ্গে আহিয়।

এ দিকের পাঁচিলের একটা জ্যোগা ধন্দে গিয়ে দিবিয়া বাইরে যাবার পথ হয়ে গেছে। আমরা দুজনে টপকে বাইরে গিয়ে পড়লাম। ফেলুদার চোখ চারিদিকে ঘূরছে, এমনীক জৰ্মিৰ দিকেও। আমরা এগিয়ে গেলাম। একশো গজের মধ্যে অন্য কোনো বাড়ি নেই, কাৰণ এটা সেই শট্টকাটের বৰ্ণবন। কিন্তু ওটা কী? একটা ভাঙা মন্দিৰ। নিশ্চয়ই সেই বাদুড়ে কালী মন্দিৰ।

মন্দিৰের পাশে একজন লোক, আমদেৱ দিকেই এগিয়ে আসছেন। কৰিবাজ বৰ্সিক চকৰতাৰ্হী। ‘কী ব্যাপার? এত সকালে?’ ভদ্রলোক জিগোস কৱলেন।

‘আপনি ব্বৰু পান নি বোধহৱে?’

‘কী ব্বৰু?’

‘মালিক মশাই—’

‘আঁ! কৰিবাজের চোখ কপালে উঠে গেছে।

‘আপনি যা ভয় পাচ্ছেন তা নয়। মালিক মশাই স্মৃথি আছেন, তবে তার বাড়িতে ভকাত পড়েছে। আৱ জীবনবাবু খন্দ হয়েছেন—তবে এ খবৰটা আৱ মালিক স্মাইকে দেবেন না।’

রাস্কবাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেলেন। আমরাও কেবার রাস্তা ধরলাম;
খুন্দি পালিয়ে গেছে।

পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকে এগিয়ে যেতেই তিনি নব্বর বিস্ফোরণ।
আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। একি স্বপ্ন না সত্য? কাঠাল গাছের নিচটা
এখন খালি।



জীৱনবাবুৰ লক্ষণ উধাও।

বেংপেৰ পাখতেকে ঠগৰ্টিৰ ফাঁসোও উধাও।

লালমেছনৰাবু একটা গোলমু গাছেৰ পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক কৰে
কাঁপছেন। কোনোৱকমে ভদ্ৰলোক ম্যাথ খুললেন।

‘ভজ্জনাথবৰু পুপ—পুলিশে খবৰ দিতে গেলেন, আমি আপনাদেৱ
পুলিশতে এসে দৰিথ...’

‘এসে দেখলৈন লাশ নেই?’ ফেল্দা চৰ্চিয়ে জিগ্যেস কৰল। ‘না!’

ফেল্দা আবাৰ দৌড় দিল। এবৰ পশ্চিমে নয়, পৰে।

পৰেৰ দেয়ালে ফাঁক নেই, কিন্তু উভয়ে আছে। কালকৈৰ সেই গত—
আজ দেখলাম সেটা একটা আম গাছেৰ নিচ—আৱ পিছনেই ফাঁক। বড় ফাঁক,
প্রায় একটা ফটক বললেই চলে। আৰ্য আৱ ফেল্দা বাইবে বেৰোপাম।

মশ হাতেৰ মধ্যেই একটা পুকুৰ, জলে টৈট্যুৰ। এই পুকুৱেই যে ফেলা
হৱেছে লাশ ততে সন্দেহ নেই।

আমৱা কিৱে গিয়ে পিছনেৰ সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠলাম দোতলায়।

‘ও জীৱন, ও বাবা জীৱন!—ঠাকুৰা চ'চাহেন—‘এই যেন দেখলাম
জীৱনকে, গেল কোথায় ছেলেটা?’

গাজ জোবড়ানো, চূল হোট কৰে ছাঁটা, ধান পৱা আশি বছৱেৰ বুড়ি,
যোলাটে চশমা পৱে বিশেৱ ঘৰ হৰড়ে বারান্দাৰ এদিকে চলে এসেছেন।
আয়াশদন গলা শুনেছি, আজ প্ৰথম দেখলাম ঠাকুমকে। ফেল্দা এগিয়ে গেল।
‘জীৱনবাবু একটু বৰিৱয়েছেন। আমৱাৰ নাম প্ৰদোষ মিছ। আপনাৰ কৌ দৱকাৰ
আমাকে বলতে পাৱেন।’

‘তুমি কে বাবা?’

‘আমি জীৱনবাবুৰ বন্ধু।’

‘তোমাকে ত দৰিথনি।’

‘আমি দৰ্দিন আগে এসেছি কলকাতা থেকে।’

‘তুমিও কলকাতাৰ থাক?’

‘আজ্জে হ্যাঁ। কিছু বলাৰ ছিল আপনাৰ?’

বুড়ি হঠাৎ যেন খেই হাঁটিয়ে ফেললেন। ধাঢ় উঁচু কৰে কিছুক্ষণ এদিক
ওদিক চেয়ে বললেন, ‘কৌ বলাৰ ছিল দে আৱ মনে নেই বাবা, আমৱাৰ বন্ড
ভোলা মন যৈ।’

আমৱা ঠাকুমকে আৱ সহয় দিলাম না। তিনজনে গিয়ে চূকলাম শ্যাম-
লালবাবুৰ ঘৰে।

য়াসিকবাবু ইতিমধ্যে এসে হাজিৱ হৱেছেন; তিনি শ্যামলালবাবুৰ মাড়ী

ধরে বসে আছেন।

‘জীবন কোথায় গেল?’ এখনো কেবল জানি অসহায় ভাব করে কথা বলছেন ভদ্রলোক। বুঝলাম রাসিকবাবু জীবনবাবুর মৃত্যু সংবাদটা শামলাল-বাবুকে দেননি।

‘আপনি ত চাইছিলেন তিনি কলকাতায় ফিরে যান,’ বলল ফেলুদা।

‘ও চলে গেল! কিসে গেল? পাল্বিকতে?’

‘পাল্বিকতে ত আর সবটুকু যাওয়া যায় না। কাটোয়া থেকে প্রেন ছাড়া গতি নেই। গরুর গাড়ি বা ডক গাড়িতে যাওয়া আজকের দিনে যে সম্ভব নয় সেটা নিশ্চয়ই বোবেন।’

‘তুমি আমকে বিদ্রূপ করছ?’ শামলালবাবুর গলাত যেন একটু অভিমানের স্বর।

‘শুধু আমি কেন?’ ফেলুদা বলল, ‘গ্রামের সবাই করে। আপনি যা করছেন তাতে আপনার ত নয়ই, কারুরই লাভ বা মঙ্গল হচ্ছে না। আপনার নিজের কী হল সেটা ত দেখিলেন। সড়কীর বদলে বন্দুকধারী একজন ভালো পাহারাদার থাকলে আর এ কান্ডটা হত না। বৈদ্যুতিক শক্তির চেয়ে এ শক্তি কি কিছু কম হল? যে-বৃগ চলে গেছে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না যাইকমশই।’

আশচর্ম, আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক তেলেবেগুনে জবলে উঠবেন, কিন্তু সেটা হল না। ফেলুদার কথার উভয়ে একটি কথাও বললেন না তিনি, কেবল একটা দীর্ঘশব্দস ফেলে চুপ করে রইলেন।

মুখ্যের চেহারা কী হয়েছে দেখেছেন ?'

জালমোহনবাবু উত্তপ্তে বসে হাতে তাঁর দাঁড় কামানোর আয়নাটা নিয়ে তাতে নিজের খৰ দেখে মন্তব্য করলেন। ও'র মুখের বা অবস্থা, আমাদের সবলেই তাই।

'গোসাইপুরের ওই একটা ঝুঁয়াক', বললেন তুলসীবাবু। 'এটার বিহুর আপনাদের আগে থেকেই ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত ছিল।'

'আপনি গোসাইপুর বলছেন, আশি বলব মুল্লিক বাঁড়ির বাগানে, বললেন লালমোহনবাবু। 'ওইটোই হল ইশার ডিপো।'

দ্বপ্ররের খাওয়া শেষ করে আমরা দোতলায় আমাদের ঘরে এসে বসেছি। প্রসিদ্ধ এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। ফেলুদা এভাবে গুরু মেরে গেছে কেন ব্যবতে পারছি না। আমার বিশ্বাস জীবনবাবুর খুন্টা ওর কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে ওর ক্যালকুলেশনে সব গুণগোল হয়ে গেছে। আর ডাকাতই বাদি খুন্টা করে থাকে, তাহলে তদন্তের মজাটা কোথায় ? ডাকাত ধরার রাস্তা ত পুলিশের দের বেশি ভালো জানা আছে ; সেখানে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা আর কী করতে পারে ?

দরোগা স্থাকর প্রামাণ্যক ইতিমধ্যে ফেলুদার সঙ্গে এসে কথা বলে গেছেন। তিনি ফেলুদার মাঝ শুনেছেন, তবে ফেলুদার উপর খৰ একটা ভাঙ্গি ভাব আছে বলে মনে হল না। বিশেষ করে জীবনবাবুর লাশ লোপাট হয়ে যাওয়াতে তিনি রীতিমত্ত্বে বিরক্ত।

'আপনারা স্থাকর ডিটেকটিভ,' বললেন স্থাকর দাঙেগা। 'তাদের দেখেছি কাজের মধ্যে সিসটেমের কোনো বালাই নেই। আরেকজন দেখেছি আপনার মতো গণেশ দস্তপুর্ত—তার সঙ্গে একটা কেসে ঠোকাঠুকি লাগে। যেখানে দরকার অ্যাকশনের, সেখানে চোখ কুঁচকে বসে ভাবছে। কী যে ভাবছে তা মা গজাই জানে। অবার যেখানে কাজ করছে, তার পেছনে কোনো চিন্তা নেই। লাশটা শব্দন দেখলেন পড়ে আছে, আর সোটাকে ছেড়ে বাঁদি যেতেই হৰ ত একটা লোককে পাহারায় বসিয়ে যেতে পারলেন না ? এখন আমাদের ওই পেছনের প্রকৃতের জলে জান ফেলতে হবে। আর তাতে যদি বাঁড়ি না ওঠে ত তেবে দেখুন—এই গাঁয়ে এগারটা প্রকুর, তার মধ্যে একটাকে দীর্ঘ বলা চলে !

আর তাতেও র্ষদি না হয় তাহলে... এ সবই কিন্তু আপনার নেগালজেন্সের জিন্য।'

ফেল্দু পুরো ঝালটা হজম করে উল্লে একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে সুধাকর দারোগাকে আরো উস্কে দিল।

'আপনি প্রেতাঞ্চায় বিশ্বাস করেন ?'

দারোগা কিছুক্ষণ অবক্ষ হয়ে ফেল্দুর দিকে চেয়ে থেকে যাথে নেড়ে বললেন, 'আপনার পিরিয়াস বলে খাতি আছে শুনেছিলাম, এখন দেখিছ সেটোও ভুল।'

ফেল্দু বলল, 'কথাটা জিগোস করলাম কারণ আপনারা র্ষদি খুনী ধরতে না পারেন তাহলে আমাকে ঘুঁগাকে ভট্টাচৰের শৱণাপঞ্চ হতে হবে। তিনি প্রেতাঞ্চা শামাতে পারেন। আমার ঘনে হচ্ছে জীবনলাগের আঞ্চাই জীবনলাগের খুনীর সঠিক সন্ধান দিতে পারেন।'

'আপনি নিজে তাহলে হোপ্পেস ফীল করছেন বলুন।'

'বুনের তদন্ত আমার সাথের বাইরে সেটা স্বীকার করছি।' বলল ফেল্দু, 'কিন্তু ডাকাতের হাতে হাতকড়া পরাতে পারব বলে আমার বিশ্বাস আছে।'

সুধাকরবাবুর যে ফেল্দুর উপর আশ্চর্য কর কর সেটা তাঁর পরের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম।

'আপনি ডেড বাডি আৰ জ্যান্ত বাডি কুফাই কুরতে পারেন আশী কৰি? গলায় ফাঁস দিয়ে টান মারলে ঘুঁথের কী কী পরিবর্তন হয় সেটা জানা আছে আপনার?'

ফেল্দু ঠাণ্ডা ভাবেই উন্নতো দিল।

'সুধাকরবাবু, আমার যখন প্রলিশে চাকরি নেবার কোনো বাসন্য নেই, তখন আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা আমার মর্জির ব্যাপার। প্রলিশের উপর নির্ভর না করে যখন আমি প্রেতাঞ্চার কথা কলাই তখন বুঝতেই পারছেন আমার সদম্ভের রাস্তাটা একটু স্বতন্ত্র।'

'ভোলানাধবাবু, সম্পর্কে' আপনার ঘনে কোনো সন্দেহের ভাব মেঝে?'

'মিশচয়ই আছে। আমার সন্দেহ হয় আপনারা দিগ্বিন্দিক বিবেচনা না করেই ভদ্রলোকের হাতে হাতকড়া পরাবেন, কারণ তাঁর প্রবৰ্প্রবৰ্ষের যে জীবন-বাবুর প্রবৰ্প্রবৰ্ষের ঘোঁষণার লাঞ্ছিত হয়েছিলেন সে খবর হয়ত আপনাদের কানে পৌঁছেছে। কিন্তু সেটা করলে আপনারা প্রারম্ভিক ভুল করবেন।'

সুধাকর দারোগা সশঙ্কে হেসে মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ফেল্দুর দিকে চেরে চুক্ত চুক্ত করে আক্ষেপের শব্দ করে বললেন, ঘৃণ্যক্ষিল হচ্ছে কি জানেন, আপনারা বেশি ভেবে সহজ জিনিসটাকে জটিল করে ফেললেন।

কেসটা জলের মতো প্রতিক্রিয়া।

‘আপনাদের জান্মফেলা প্রকৃতের জলের মতো?’

ফেল্দুরু ধোঁচা অগ্রাহ করে দায়োগ্য বলে লেলেন, ‘আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারতেন কেন ভোলানাথবাবুর কথা বলছি। ডাক্তাত এবং খন মুকুটের জন্ম সে দায়ী। এ ডাক্তাত ঘরের লেকের কাজ সে তো বোঝেই আছে। আসল ডাক্তাত হলে সিল্দুক ভঙ্গত-চারি দিয়ে খুলত না। ভোলানাথ টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল, পিছনের বাগান দিয়ে, খন করবার কোনো অভিপ্রায় ছিল না তার। জীবনবাবু ঘূর্ম ভেঙ্গে টের পেয়ে তাকে ধাওয়া করেন; ভোলানাথ খন করতে বাধ্য হয়। তারপর সলেহ ঘাতে না পড়ে তাই আপনাদের খবর দিতে আসে। ভোলানাথ বলেছে ডাক্তাত তাকেও বেঁধে রেখেছিল, জীবনবাবু এসে তার বাঁধন খোলে। এ কথা যে সত্তা তার প্রমাণ কই? এর ত কোনো সাক্ষী নেই।’

‘সিল্দুকের টাকা তাহলে কোথায় গেল সুধাকরবাবু?’ ফেল্দু গম্ভীর-ভাবে জিগেস করল।

‘সে-টাকাও খনজতে হবে,’ বললেন সুধাকরবাবু। ‘জাপ পেলে পর আমরা ভোলানাথবাবুকে জেরা করব। তখন সব স্বরস্ব করে বেরিয়ে পড়বে।’

আমার কিন্তু সুধাকরবাবুর কথাগুলো বেশ মনে ধরল; কিন্তু ফেল্দু কেন আমল দিচ্ছে না? দায়োগ্য থখন মিহি দিয়ে নামছে তখনই কেন সে বলতে গেল, ‘আজ সন্ধিয়া জীবনলালের আঞ্চা নামানো হবে মণ্গাঙ্কবাবুর বাড়িতে। এলে ঠিকৰন না।’

তুলসীবাবুর দেখলায় একমাত্র চিন্তা কালকের সংবর্ধনা হবে কিম্বা সেই নিয়ে। রহস্যের কিম্বা না হলে, খনীর হতে হাতকড়া না পড়লে, নিশ্চয়ই হবে না, কারণ গ্রামের লোকের সংবর্ধনা সভায় বোগ দেবার উৎসাহই হবে না। লাজয়েহনবাবু, অবিশ্য মেনেই নিয়েছিল যে মালা আর মানপত্র ফস্কে গেল, আর স্পষ্টিটা মাঠে মারা গেল। হয়ত নিজেকে সামনা দেবার জন্মই বললেন, ‘আমরা মশাই রহস্য বেচে থাই; বাস্তবিক একটা খাঁটি রহস্যের সামনে পড়লে সেইটৈই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্নকার।’

মুখে এটা বলা সত্ত্বেও লক্ষ্য করছি উনি বার বার নিজের অজানত বিড় বিড় করে স্পীচের ছাইন খেছেন, আর বলেই নিজেকে সামলে নিচ্ছেন।

‘মণ্গাঙ্ক জটাখ্য কেন, বাড়িতে ধাকেন বলতে পারেন?’

প্রশ্নটা এসে তুলসীবাবুর বাড়ির দরজায় বাইরে থেকে।

‘এই শুরু হল,’ বললেন তুলসীবাবু। ‘সোম আর শুক্ৰে এ উপনূব লেগেই আছে, আৱ বাস্তায় প্রথম বাড়ি বলে আমাকেই এ বৰ্কি পোয়াত্তে

হাত

ভদ্রলোক জানালা দিয়ে নিচের দিকে ঢেয়ে বললেন, 'আরো তিনটে বাড়ি
পরে ডান দিকে।'

ফেল্দু বলল, 'আমরা আস্তু বলে খবরটা পাঠিয়ে দিতে পারলে ভালো
হত। আর বলবেন কিউয়ে দাঁড়াতে পারব না। আমাদের আত্মাক প্রাইয়-
রিটি দিতে হবে।'

তুলসীবাবু বোধহীন এই প্রথম বুরঙ্গে যে ফেল্দু বাপারটা সম্বন্ধে
সত্তাই সিরিয়াস। তাঁর ঘুরের ভাব দেখে ফেল্দু বলল, 'আমরা একার
কাজ ফুরিয়ে গেছে তুলসীবাবু। এখন ভট্টাচার্য মশাইরের সাহম্য ছাড়া
এগোতে পারব না।'

ফেল্দু অনেক সময়ই বলে যে মনের দরজা খোলা রাখা উচিত, বিশেষ
করে আজকের দিনে; কারণ যোজাই প্রমাণ হচ্ছে যে এমন অনেক ঘটনা
প্রত্যবীতে ঘটে যার ক্যান্স বৈজ্ঞানিকেরা জানে না, অথচ জানে না বলে
সেটাকে উভয়েও দিতে পারছে না। এই যেমন সেদিন কাপড়ে বেরোল যে
ইউরি গেলুর বলে এক ইহুদী যুবক চোখের চাহনির জোরে পাঁচ হাত দুর
থেকে বৈজ্ঞানিকের হাতে ধরা কাঁটা চামচ বেঁকিয়ে ফেলেছে। এ ঘটনা চোখের
সামনে দেখছে আরো একজন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক, আর দেখে তারা না
পারে কারণ বলতে, না পারে উভয়েও দিতে। অগাঞ্জিবাবুর ক্ষমতাও কি
এই ধরনের?

তুলসীবাবু বললেন, 'সাড়ে পাঁচটা বাজে; চলুন আমি আপনি একসঙ্গে
গিয়ে ওঁকে ঝিকোয়েস্টো করি, তাহলে জোরটা বেশ হবে।'

ফেল্দু উঠে পড়ে বলল, 'তোরা বরং একটু বেড়িয়ে আয় না।'

আমার নিজেরও এক ঘরে বেশিক্ষণ বসে থাকতে ভালো লাগছিল না,
জালমোহনবাবুর বলছিলেন গোসাইপুরের শরৎকালের বিকেলের তুগনা নেই,
তাই ফেল্দুর বেরোন্নৰ সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও দৃঢ়ন বৌরো পড়লাম।

মুক্তির আগে যখন এসেছিলাম, তখন একবক্তু মনে হয়েছিল গ্রামটাকে; আজি আমার মনে হচ্ছে আরেক রকম। তার কারণ মন বলছে এই সুন্দর প্রায়ের কোনো একটা গোপন জাগুগায় গলায়-ফাঁস-দিয়ে-মরা মানুষের লাখ লুকিয়ে আছে। হঠাত যদি দেখি—

নাঃ—ওসব ভাবব না। তাহলে বেড়ানো মাটি হয়ে যাবে।

কিন্তু বাঁশ বনের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে আলো কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাহসটা আবার কমে গিয়েছিল। সেটাকে বাজিয়ে দিল মুক্তাভিনেতা বেগীমাধব।

‘আরে, আমি যে আপনদের বাড়িই যাচ্ছিলাম। বললাম না শুনুনবাবু বিকেলে এসে অভিনন্দন দেখিয়ে যাব !’

‘কী করি বল ভাই !’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘এমন একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে সে কী জানতাম ? এর পরে আর আকাটিৎ দেখার মুড় থাকে ? তুমই বল !’

‘তা বা বলেছেন স্যার। তা আপনারা ক’দিন আছেন ত ?’

‘হ্যাঁ, তা দিন তিনেক ত আছিই।’

‘এ দিকে চলেন কোথায় ?’

‘কোনাদিকে যাওয়া যায় তুমই বল মা।’

‘বাদুড়ে-কলী দেখেছেন স্যার ? স্পতাকুল শতাব্দীর টেম্পল। এখনো কিছু হাতের কাজ রয়ে গেছে দেয়ালে। চেলুন দেখিয়ে দিছি।’

আমি যে সকালে দেখেছি মন্দিরটা সেটা আর বললাম না। সত্তা বলতে কি, তখন যা মনের অক্ষম্য ছিল তাতে হাতের কাজটাখ তোখে পড়েনি।

মিনিট জিনেক যেতেই মন্দিরটায় পেঁচে গেলাম। এখানে সকালেই আসা উচিত। সম্মেলনো গা-টা একটু বেশি ছম্বছম্ব করে। পাশেই আবার একটা বটগাছ। তার একটা কুর্দির মন্দিরের চুড়োটাকে আঁকড়ে ধরে খুল ফাটিয়ে দিয়েছে।

‘এইখনটায় বলি হত সার’, বটগাছের গুড়ির পাশে একটা জায়গা দেখিয়ে কলম বেগীমাধব।

‘বলি ?’ লালমোহনবাবু কাঁপা গল্পের জিগোস করলেন।

‘নৱবলি, স্যার! গোসাইপুরের ডাকাত ওয়ার্ল্ড ফেমাস নেদো ডাকাতের ইতিহাস পড়েননি? ওই নিয়েই ত আপনার একটা রহস্য-রোমাঞ্চের বই হয়ে থাক। তেতরটা দেখবেন? ট্র্চ আছে?’

তেতরটা এবং মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে।

‘তেতর?’ ধরা গলায় বললেন লালমোহনবাবু। ‘ট্র্চ ত আর্নিনি ভাই! শুনিচি বাদুড়-টাদুড়...’

‘বাদুড়ের ত এখন ইঁভিনিং এক্সকারশন স্যার। এইত সবে চুরতে বেরিয়েছে। বাদুড় দেখতে চাইলে—’

‘না ভাই, চাই না। বরং না দেখাটাই বাধ্যনীয়।

‘চলে আসন্ন স্যার। মাচিস জেবলোছি। একটা বিড়ি ধরালুম স্যার। কিছু মাইন্ড করবেন না ত?’

‘নো নো ভাই, মাইন্ড কী, সুই পাঁচটা বিড়ি একসঙ্গে ধরাও না।’

বেণীমাধব বিড়ি ধরিয়ে জবলত দেশলাইট মন্দিরের দরজার জায়গায় ধরল, আর অগ্নি এক লাফে আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে চলে এল। লাল-মোহনবাবু চারবার ‘জী-জী-জী-জী’ বলে খেয়ে গেলেন।

জীবনবাবুর মৃতদেহ! মন্দিরের ভিতরে থামের আড়ালে নীল পাঞ্চাবী আর সাদা পায়জামার খানিকটা উঁকি মারছে। সকালে হাতে ঘড়ি ছিল, এখন নেই।

‘এই দেখন, কে কাপড় ফেলে গেছে?’

বেণীমাধব দিবা এগিয়ে ঘাঁচলেন, বেধহয় কাপড়গলো উত্থাপ করে তার মালিককে ফেরত দিতে, লালমোহনবাবু তব সার্টের কোনা থামচে ধরে বললেন, ‘ওটা ল-লাশ! পুশ-পুশ, পুশ, পুলিশের ব্যাপার।’

ম্রকান্তিনেতা লাশ শুনেই শুক মেরে গিয়েছিলেন—এইবার দেখলাম তার অভিনয়। অবশ্য থেকে শুরু করে এক ধাপে আতকে পেঁচে তিনি দীপ্তিরে দিলেন কথা না বলে কী করে পিট্টান দেওয়ার অভিনয় করতে হয়। আমরাও আর অপেক্ষা না করে এই বিভীষিকাময় পরিবেশ থেকে ঘূরে জোরে-হেটে বাঁকুমুখে রওনা দিলাম।

ফেল-বা দেখলাম ফিরে এসেছে। বলল, ‘অমন ফ্যাকাশে মেরে গোঁজিস কেন? চটপট রেডি হয়ে নে। পনের মিনিটের মধ্যে আজ্ঞা নামবে।’

লালমোহনবাবু ফেল-দাকে দেবেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বললেন, ‘একটা ইম্পরাটর ডিসকভারি করে এলুম। অবিশ্ব একা নয়, সুজনে। জীবনবাবুর লাশ পড়ে রয়েছে বাদুড়ে কালীর মন্দিরে। পুর্ণসূর্যকে জানাবেন, না ধূঁজতে দেবেন?’



আমি জানতাম স্বাক্ষর দারোগাকে আলমোহনবাবুর মোটেই পছন্দ ইর্বিন, তাই খুজতে দেবেন। ফেল্দু বলল, 'মান্দ্রের ভেতরে গেস্লেন?'

'নো স্যার। লাশ ত হ্যাঙ্গল করা বারণ, তাই আর যাইনি। তবে বিষ্ণু ডাউট জীবন মঞ্জুক।'

'ঠিক আছে। স্বাক্ষরবাবু এসছিলেন একটু আগে। বোধহীন ভট্চায হশায়ের শোনে আসছেন। তখন পথরটা দিয়ে দিলেই হবে।'

দশ মিনিটের মধ্যে আশুরা রশনা দিয়ে দিলাম। তুলসীবাবু বললেন যে একবার উকীলবাবুর বাড়ি থেকে চট করে ঘুরে আসতে হবে। কালকের অনুষ্ঠানটা যে ভেন্টে ঘেতে পারে সেটা ও'কে জানানো দরকার।

যামার পথে ফেল্দু বলল যে ম্গাঞ্জবাবু নাকি জীবনলালের আত্মা নামানোর ব্যাপারে আপনি দুরের কথা, রীতিমতো আগ্রহ দেখিয়েছেন। বাইকে থেকে আরে জন তিনেক লোক এসেছেন, তাদের বাইরে বাসমে রেখে আগে অংশদের কাজটা করে দেবেন।

ম্গাঞ্জবাবুর ঘরে আজ তত্ত্বপোষের বদলে রয়েছে একটা কাঠের টেবিল, আর সেটাকে ঘিরে টিন আর কাঠে মেশানো পাঁচটা চেরার। এই একটাতে বসে আছেন ম্গাঞ্জ ভট্চার। টেবিলের মাঝখানে রয়েছে একটা পিনিম, আর তার পাশেই একটা কাগজ আর পেনসিল। এ ছাড়া ঘরে করেছে দুটোর বদলে একটা বেণিং, আর দুটো মোড়। বেণিংতে বসে আছে ভাগনে নিত্যানন্দ।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসলাম, একটা খালি রইল তুলসীবাবুর জন্য।

‘তুলসীচরণের জন্য অপেক্ষা কৰব কি?’ প্রশ্ন করলেন ম্গাঞ্জবাবু।

‘পাঁচ মিনিট দেখা ষেতে পারে,’ বলল ফেল্দু।

‘আমি জানতাম। সেইদিন আপনাকে দেখেই উপলব্ধি হয়েছিল যে আমার ক্ষেত্রে আবার আসতে হবে।’ ভদ্রলোকের গলাটা এই অধিকার ঘরে গমগম করছে। ম্গাঞ্জবাবু বলে চললেন, ‘বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। পরলোকগত আমার সঙ্গে যোগস্থাপন হল এই বিশেষ জ্ঞানের শেষ জ্ঞান। সূত্রাং যারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তারা এই বিশেষ জ্ঞানকে হৈয় জ্ঞান করে না।’

জ্ঞান জ্ঞান করে এই ধ্যানখানানী আর ভালো লাগছিল না। ভদ্রলোক এবার আরম্ভ করলেই পারেন।

‘আপনারা সকলেই পরলোকগত জীবনলালকে প্রতাক্ষ করেছেন, এবং তিনি সব্বা মৃত। এই দুই কারণে আভকের অধিবেশনের চূড়ান্ত সাফল্য আমি আশ্ব করি। আমা এখনো নরলোক হতে পরলোকে উত্তীর্ণ হবার অবকাশ লাভ করেনি। অনেক পার্থির বর্ধন ঘট্ট করে তবে আমা উত্তীরণ। জীবনলালের আমা এখনো আমাদের পরিপাশের বিদ্যমান। সে আমার আবাহনের অপেক্ষায় আছে। সে জামে আমি তাকে ডাকলে পাব, আমি জানি তাকে ডাকলে তুমি আসবে। জীবনলালের আমা শ্রিকালজ্জ, অবিনশ্বর। জলে স্থলে অক্তরীক্ষে তার অবাধ গতি। আমা এই কক্ষে তার অবাধ গতি। আমা এই লেখনী হবে তারই সেখনী। তারই জ্ঞান, তারই উপলব্ধি, তারই বিশ্বাস, বল্ট হবে তারই ভাষায় আমা এই লেখনীর সাহায্য।’

এবার ফেল্দুর ঘৃণ্য খ্লল। এ অবস্থায় কৃষ্ণ বলা ওর পক্ষেই সম্ভব, কেননা আমার গলা শুকিয়ে পেছে, আর আমার বিশ্বাস লালমোহনবাবুরও।

‘আপনি কী লিখছেন সেটা জানার জন্য সকলেরই কৌতুহল হবে, অথচ

আমি ছাড়া আর সকলেই টেবিলের উজ্জ্বল দিকে বসেছে, লেখা পড়া সম্ভব নয়। আমি যদি সকলের স্মৃতিখন্ডে পড়ে দিই তাতে আপনার আপোনা আছে কি ?

‘কেনের আপোনা নেই?’ বললেন মুগাঙ্কবাবু, ‘আপনি স্বচ্ছেই লেখা পড়ে শুন্নিরে দিতে পারেন। আপনার জিজ্ঞাসা ত একটাই, নয় কি ?’

‘তিনটে—ডাকাতের পরিচয়, দুনীর পরিচয় এবং কখন কৌ ভাবে খুনটা হয়?’

‘উভয়,’ বললেন মুগাঙ্কবাবু।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেও তুলসীবাবু এলেন না দেখে মৃগাঞ্জকবাবু কাজ আরম্ভ করে দেওয়া স্থির করলেন। মনে মনে বুবলাম—তুলসীবাবু এ জিনিস অনেক দেখেছেন, তাঁর পুরোটা না দেখলেও চলবে।

‘অনুগ্রহ করে আপনাদিগের প্রত্যেকের হস্তম্বয় অঙ্গুলি প্রসারিত করে এই টেবিলের উপর স্থাপন করুন।’

কাঠের টেবিলে হাতগুলো ঝাখার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা টক্ টক্ শব্দ শুনুন হল সেটা আর কিছুই না, লালমোহনবাবুর কাঁপা আঙ্গুল টেবিলের উপর তবলার বোল তুলে ফেলছে। ভয়েসাক দাঁতে দাঁত কেপে হাত স্টেডি করলেন।

মৃগাঞ্জকবাবুর চোখ বন্ধ, টেটি মড়ছে। চারিদিক একেবারে নিপত্তি বলেই বুবলাম উনি ফিস্ ফিস্ করে একটা শ্লাক আওড়াচ্ছেন।

এক মিনিট পরে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এবারে যাকে ইঁরিভিতে বলে ডেথলি সাইলেন্স। পিদিমুর শিখা কাঁপছে, আর তার চার পাশে ঘূর ঘূর করছে তিনটে ফাঁড়িং। ঘরের চারিদিকের দেয়ালে চারটে মানুষের ছায়া থার থার করে কাঁপছে। আড়চোখে ফেলদোর দিকে চেয়ে তার মনের অবস্থা কিছু বুবতে পারলাম না। চোয়াল শব্দ, চোখের পাতা প্রায় পড়ছেই না, দ্রুত খটান মৃগাঞ্জকবাবুর দিকে। মৃগাঞ্জকবাবু, নিজে যেন প্যাথরের ঘূর্ণি। এর মধ্যে কখন যে পেনাসিলটা তার হাতে চলে গেছে জানি না। সেটা এখন খাতার সামা পাতার উপর ধরা, শিসের ডগাটা টেকে রয়েছে কাগজের সঙ্গে।

এবার মৃগাঞ্জকবাবুর টেটিটে কাঁপুনি আরম্ভ হল। কপালে বিল্দ বিল্দ ঘাম। আমার পাশে আবার তবলার বোল শুনুন ইয়েছে, এখন আওন্তুজটা রাঁচিমত তৌতিক বলে মনে হচ্ছে। অনেকেরই এ অবস্থার এভয়েস্থাত কাঁপতে পারে, যদিও আমার কাঁপছে শুধু বুক।

‘জীবনলাল, জীবনলাল, জীবনলাল.....’

তিনবার পুর পুর অর্ডি আস্তে উচ্ছারণ হল নামটা। শুগাঞ্জকবাবুর টেটিটা নড়ল কি না তাও ভালো করে বুবতে পারলাম না। ‘আসেছেন? আপনি এসেছেন?’

প্রশ্ন এল আমাদের চমকে দিয়ে আমাদের পিছন থেকে। এইবারে বুবলাম

নিত্যানন্দের ভূমিকাটা কৃষি। ম্গাঞ্জকবাবু নিজে এই অবস্থায় কথা বলেন না। হয়ত বলা সম্ভবই নয়। 'এসেছি।'

ফেল্দুর গান্ধীর খাতায় লেখা হয়েছে, ফেল্দু সেটাই পড়ে বলেছে।

আমার চোখ ম্গাঞ্জকবাবুর হাতের দিকে গেল। পিছন থেকে প্রশ্ন এল, 'তুমি কেমনের আছ?'

'কিছুই'—পড়ে বলল ফেল্দু।

'কতগুলি প্রশ্ন তোমাকে করা হবে, সেগুলোর জবাব দিতে পারবে? পেনসিল নড়ল।

'পারব'—পড়ে বলল ফেল্দু।

'সিন্দুক খুলে টাক নিল কে?' 'আমি!'

'তোমাকে যে হত্যা করল, তাকে দেখেছিলে?' 'হ্যাঁ!'

'চিনেছিলে?' 'হ্যাঁ!'

'কে সে?' 'বাবা।'

কিন্তু কী ভবে খন্টা করা হল সেটা আর জানা হল না, কারণ প্রশ্নটা হবার সঙ্গে সঙ্গে 'এতেই হবে' বলে ফেল্দু উঠে দাঁড়াল। তাঁরপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোপ্সে, ওই লণ্ঠনটা অন ত—দরজার বাইরে রাখা রয়েছে। আলো বস্ত কম।'

আমি ভাবাচাকা, লণ্ঠনটা এনে গাঁথিলের উপরে রাখলাম।

ফেল্দু ম্গাঞ্জকবাবুর সামনে থেকে কাগজটা তুলে নিল। তাঁরপর উচ্চরণগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, ম্গাঞ্জকবাবু, আমার ঘনে ইচ্ছে আপনার এই আস্ত্রটি এখনো ঠিক ত্বকালজ্জ হয়ে উঠতে পারোন, কারণ প্রশ্নাত্তরে কতগুলো গোলমাল পাওছি।'

ম্গাঞ্জকবাবু কঠিনে করে ফেল্দুর দিকে চাইলেন, যেন এক চাহনিতে ফেল্দুকে ভস্ম করবেন। ফেল্দু তাঁকে তাশাহা করে বলল চলল, 'বেরন, তাঁকে জিগোস করা ইচ্ছে সিন্দুক খুলে টাক্কা নিল কে, উচ্চর ইচ্ছে—'আমি'। কিন্তু সিন্দুকে ত টাক্কা ছিল না ম্গাঞ্জকবাবু।'

ম্যাঞ্জকের মতো ম্গাঞ্জকবাবুর ঘূর্খ থেকে ক্রোধের ভাবটা চলে পিয়ের সেধানে দেখা দিল সংশ্রে। ফেল্দু বলল, টাক্কা ছিল না বল্ছি এই কারণে যে সিন্দুক খুলেছিল ঝীবনলাল নয়, খুলেছিল প্রদোষ চন্দ্ৰ মিন্দ। অবিশ্য ঝীবনব্যবহু এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনিই মাঝে তিনির দরজা খুলে আমাকে ঢুকতে দেন, তিনিই বলে দেন যে তাঁর খবার বালিশের তলায় থাকে সিন্দুকের চাবি; তোলানাপ্তব্যবহু আর শামসলব্যবহুকে বাঁধার ব্যাপারেও অবিশ্য তিনি আমাকে সাহায্য করেন। যাই হোক, সিন্দুকে টাক্কার বদলে

ছেটা ছিল সেটা হল—

ফেলুদা পকেট থেকে আরেকটা কাগজ বের করল। এটাও থাতার কাগজ, এটাতেও পেশিস দিয়ে লেখা।

‘এই কাগজটাই,’ বলল ফেলুদা, ‘শ্যামলালবাবুর কাছ থেকে চোরে আমি পাইনি। এটার প্রয়োজন হয়েছিল এই কারণেই যে মৃগাঙ্কবাবুর সতত সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছিল, আর সেটা হয়েছিল একেবারে প্রথম দিনের সাক্ষাতের পরেই। আমার সঙ্গে জালাপ হবার পরম্পরাতেই তিনি ভাল করলেন যে আমার নাম এবং পেশা তিনি অলৌকিক উপায়ে জেনে ফেলেছেন। আমলে এগুলো কিন্তু তাঁকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন তুলসীবাবু। তাই নয়, তুলসীবাবু?’

তুলসীবাবু এর মধ্যে কখন যে অন্ধকারে ঘরে ঢুকে শোড়ায় বসেছেন তা দেখিনি। ভদ্রলোক ফেলুদার কথায় ভারি অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করে বললেন, ‘মাকে আপনার মনে, ইঁরে, যদি একটি ভঙ্গিমা জাগে...’

ফেলুদা তাঁকে ধায়িয়ে বলল, ‘দোষ আমি আপনাকে দিচ্ছি না তুলসীবাবু। আপনি ত আর নিজেকে মহৎ প্রতিপক্ষ করার চেষ্টা করেন না। হিন্তু ইনি করেন। যাই হোক, এই ভঙ্গিমার গন্ধ পেরেই আমি কাগজটা পেতে ব্যবহার করিব। আমার আশা ছিল শ্যামলালবাবু সম্পর্কে কয়েকটা খট্কার উত্তর আমি এই কাগজে পাব।’

পিছিয়ের আলোচনাও বুঝতে পারলাম মৃগাঙ্কবাবুর কপাল বেয়ে গেছে। ফেলুদা কাগজটা আলোয় ধরে বলল, ‘দুর্ভ ফীলিকের আশা এই কাগজে তাঁর ছেলের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নগুলো মুখে করা হয়েছিল, তাই এতে লেখা নেই; কিন্তু উত্তরগুলো থেকে প্রশ্নগুলো অনুমান করা যায়। আমি উত্তরের পাশে পাশে সেগুলো লিখেছি, এবং সেই ভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি; আমার ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন মৃগাঙ্কবাবু।’

মৃগাঙ্কবাবুর দ্রুত নিষ্পাসে প্রদৰ্শনের শিখা কোপে কেঁপে উঠছে। ফেলুদা পড়া আরম্ভ করল—

‘এক নম্বর প্রশ্ন—আমার শব্দে কে? উত্তর—যারেই আছে।

সৈ কি আমার মৃত্যু কামনা করে—না। তবে কী চায়?—চোরা। টাকা রক্ষার উপায় কি?—সিদ্ধুকে রেখে না। কোথায় রাখব?—মুক্তির নিচে। কোন খানে?—বাগানে। বাগানের কোথায়?—উত্তরে। উত্তরে যেকোথায়?—আম গাছের নিচে। কোন অংশ গাছ?—বৃদ্ধালোর ফাটলের ধারে।’

ফেলুদা এবার হাতের কাগজটা চোরলের উপর বের করে বলল, ‘শ্যামলালবাবুর পায়ের তলায় মাটি এবং শায়ে মশার কাষড় দেখে মনে হয়েছিল তিনি কোনো

কারণে বাগানে গিয়ে সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়েছেন। আজ জানি, তিনি এই কাগজের—অর্দেক ম্গাঞ্জকবাবুর—নির্দেশ অনুযায়ী সিন্দুক থেকে টাকার বাস্তু বার করে স্টেটিতে প্রত্তে গিয়েছিলেন। টাকা লুকিয়ে রাখার এই প্রাচীন পন্থা শ্যামলালবাবুর মনৎপূর্ত হবে এটা মগাঞ্জকবাবু ব্যবেছিলেন। এই টাকার উপর ম্গাঞ্জকবাবুর লোভ অনেক দিনের, কিন্তু বিশ্বস্ত ভোলানাথ যান্দন অঙ্গেন তান্দন সিন্দুকের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন ভোলানাথবাবুর উপর শ্যামলালের সন্দেহ ফেলে তাকে হটানোর। সেটা সফজ হয়নি। কিন্তু সেই সময় আশ্চর্য সংযোগ এসে যায়। শ্যামলালবাবু নিজেই ম্গাঞ্জকবাবুকে ডেকে পাঠান আস্তা নামানোর জন্য। ম্গাঞ্জকবাবু তাঁর আশ্চর্য বৃদ্ধি বলে এক চিলে দ্বাই পাখি ধারেন; শ্যামলালের ঘরের লোককেই শ্যামলালের শত্ৰু করে দেন, এবং টাকার বাস্তু সিন্দুক থেকে বার কাঁড়িয়ে বাগানে আনান। সেই বাস্তু কাল সন্ধ্যাবেলা—'

একটা শব্দ শুনে পিছন ফেরে দৈর্ঘ্য ভাগ্নে বেঁচি ছেড়ে দৱজাৰ দিকে একটা লাফ হেৱেছে। কিন্তু বৰ থেকে বেৱোন আৱ হল না কারণ দুটো শক্ত হাত তাকে বাধা দিয়েছে। এবাব হাতেৰ মালিক ভাগ্নে সংযোগ ভিতৰে ঢুকলেন। আৱেন্দ্বাস—এ যৈ সুধ্যাকৰ দারোগা! দারোগা বললেন, 'বাবুটা পেয়েছি ফিস্টাৰ মিস্তিৰ; একটা ট্রাঙ্কেৰ মধ্যে কাপড়েৰ নীচে বাধা ছিল। অনীশ—দাও ত।'

একজন কনস্টেবল একটা পটীলেৰ বাস্তু নিৰে ঘৰে ঢুকে সেটাকে টেবিলেৰ উপৰ রাখল।

'এৰ ডালা ত ভেঙ্গেই ফেলা হয়েছে দেখছি,' বললা ফেলুন্দা।

বাবু খুলতে লাগল আৱ পিদিমেৰ আলোয় তাজা তাজা একশো টাকার নোট দেখেই বুবলায় এত টাকা আৰি একসঙ্গে কখনো দেখিনি।

'কিন্তু খুন?' হঠাৎ চীৎকাৰ কৰে উঠলেন ম্গাঞ্জকবাবু। 'খুন কৰল কৈ? খুন ত আমি কৰিনি।'

'খুন একজনই কৰেছে ম্গাঞ্জকবাবু!—ফেলুন্দাৰ গলা হেন থাপখোলা তলোয়াৰ—এবং তাৰও নাম প্ৰদোষ চন্দ্ৰ মিঠ। খুন হয়েছে আপনাৰ ভণ্ডামী, আপনাৰ শয়তানী, আপনাৰ লোভ। এৰ কোনোটাই জাৰ কোনোদিনও মাথা তুলতে পাৱবে না, কাগল সকলেই জানবে যে আপনি আজ অপৰ্ব ক্ষমতাবলে একটি জীবন্ত বাণ্ডিৰ আঝাকে পৱলোক থেকে ডেকে এনেছেন আপনাৰ এই ঘৰে—অ্যাসন, জীবনবাবু।'

এবাব পিছন নয়, সামনেৰ দৱজা দিয়ে ঢুকলেৰ জীবনলাল ঘঁষিক। তাকে দেখেই ম্গাঞ্জকবাবু যে কথাটা বলে আত্মনাদ কৰলেন, সেটা লালহোহনবাবুৰ

বিশ্বাস 'হা হতোহস্তি', কিন্তু আমি যেন শুনলাম 'হায়! হাতে হাতকড়া!'

* * *

অবিশ্য হাতে হাতকড়া পড়েছিল ঠিকই। সুধাকরবাবু শুধু একটা অভিধোগ করলেন ফেলুদাকে—'মিছিমিছি দুটো পুকুরে জাল ফেলালেন আমাদের দিয়ে!'

'কী বলছেন সুধাকরবাবু?' বলল ফেলুদা, 'জীবনবাবু খন হয়েছে এ ধারণা সকলের মনে বস্থমূল না হলে ম্গাঙ্কবাবুর উপত্যুক্তি হাতেনাতে ধরব কী করে?'

জীবনবাবু খনের ব্যাপারটা শুধুই ম্গাঙ্কবাবুকে সারেশ্বতা করার জন্য। একেবারে প্ল্যান করে ভাঁওতা। এদিকে আমি আর ফেলুদা, আর ওদিকে লালমোহনবাবু ও তোলানাথবাবু চলে যাওয়া মাত্র ভদ্রলোক বাগান থেকে উঠে বাড়িতে ফিরে গিয়ে দোতলার পিছন দিকের একটা গুদোম ঘরে গা ঢাক্কা দেন। যাবার পথে ঠিকুমা দেখে ফেলেছিলেন, কিন্তু সেটা ফেলুদা ম্যানেজ করে। আজ সন্ধিয়ার তিনি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ম্গাঙ্কবাবুর বৈঠকের শেষে আত্মপ্রকাশ করবেন বলে। সেই সময় বাঁশ বনে দূর থেকে আমাদের দেখে বাদুড়ে কালীঘর্ষণীরে চুক্তে মড়া সেজে পড়ে থাকতে হয়।

বাঁশে খাবার সময় তুলসীবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে ফেলুদাকে বললেন, 'আপনি আমার উপর অসম্ভুচ্ছ হন নি ত?'

'অসম্ভুচ্ছ?' বলল ফেলুদা, 'আপনি আমাকে কতটা হেল্প করেছেন জানেন? লোকটা সেদিন আমার নাম নিয়ে হেঁয়ালি না করলে ত শুরু ওপর আমার সন্দেহই পড়ত না! আমার ত আপনাকে ধনাবাদ দেওয়া উচিত।'

আজ জীবনবাবু আমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'আমি বেরোবার আগে বাবাকে প্রণাম করে এলাম।'

'কী মনে হল?' জিগোস করল ফেলুদা।

'তাঙ্গৰ বনে গেলাম।' বললেন জীবনবাবু। 'আমার মাথায় হাত দুলিয়ে জিগোস করলেন ব্যবসা কেমন চলছে।'

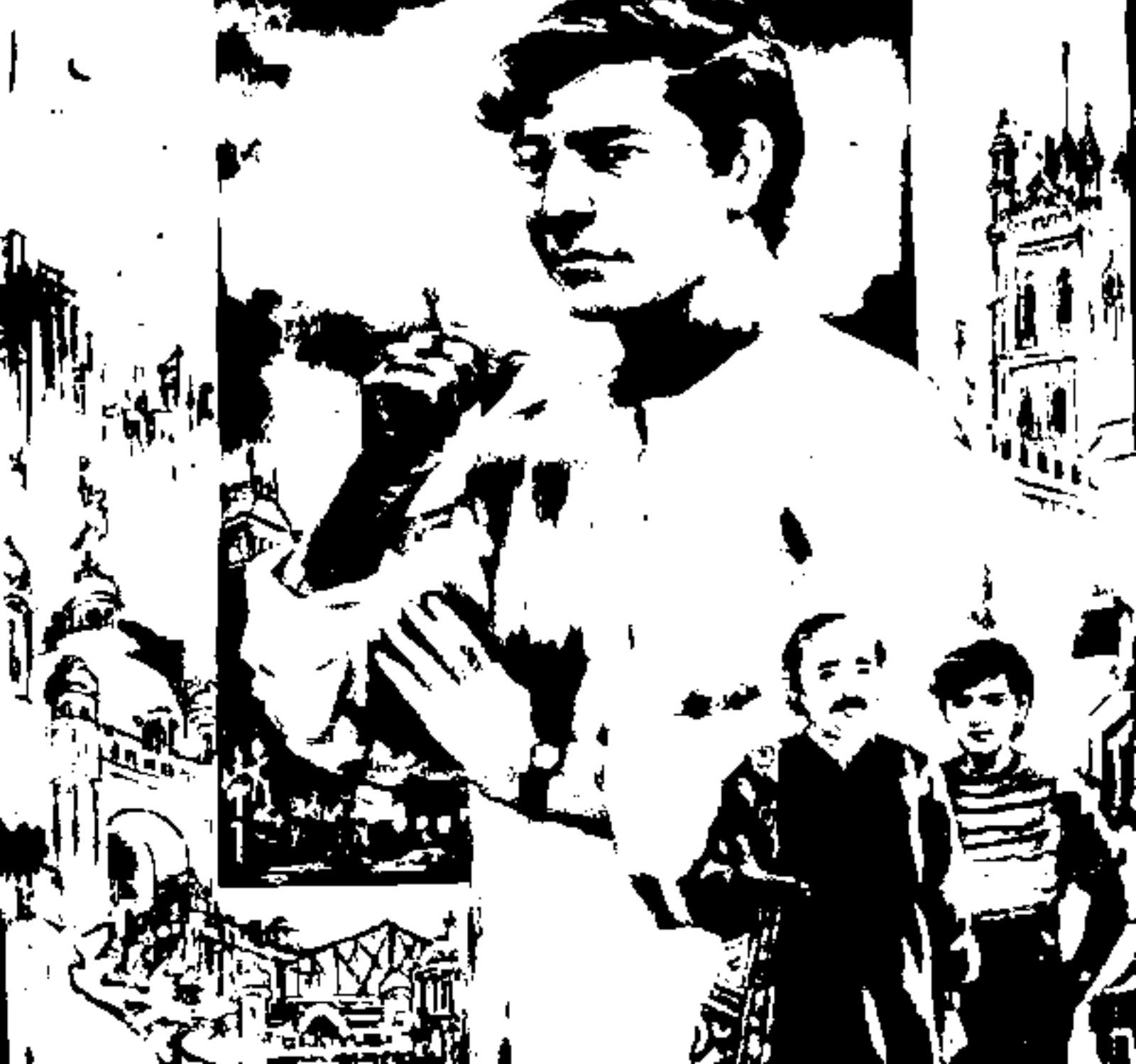
লালমোহনবাবু একস্কণ মাছের মাড়ো চিবোচ্ছিলেন বক্সেকিং থেকে নি। এবার তুলসীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে কলকাতা ইয়েটা—?'

'হচ্ছে বৈকি। এখন ত আর কেনে বাধা নেই।'

ভেরি গুড়। আমার ইয়েটা শুরোড়ি আছে।'

গোরহানে সাবধান

সত্যজিৎ রায়



গোরস্থনে সাধনাল

॥ ১ ॥

রহস্য-রোমাঞ্চক উপন্যাসিক কাটায় শুরুকে লালমোহন গাঙ্গুলীর সেখা গুরু থেকে বাস্তৱ ফিল্ম পরিচালক পুণক ঘোষালের তৈরি ছবি কলকাতার প্যারাডাইজ সিনেমায় ঝুঁঝিলি করার ঠিক তিনি দিন পরে বিকেল বেলা উৎকট সারেগামা হুর্ম বাজিয়ে একটা সেকেন্ড হাস্ট মার্ক টু আস্বাসজর গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা জানতাম যে লালমোহনবাবু একটা গাড়ি বেলার ডাল করছেন, কিন্তু ঘটনাটা যে এত চট করে হটে থাবে সেটা ভাবিনি। অবিলিখিত যে গাড়িই কেলা হয়েছে তা নয়; তার সঙ্গে একটি ছাইভারও বাখা হয়েছে, কারণ লালমোহনবাবু গাড়ি চাপাতে জানেন না। এখনকী শেখার ইচ্ছটাও নেই। একখাটি তিনি এতবার আমাদের এলেজেন যে, শেষটায় একদিন যেভুলকে বাধা হবে তিনেস করতে হল, 'কেন হ্যাঁই, শিখবেন না কেন?' তাতে লালমোহনবাবু বলসেন যে, বছর পাঁচেক আগে নাকি এক বন্ধুর গাড়িতে শিখতে আসত করেছিলেন। দু দিন শিখে থার্ড দিনে একটি চমৎকার গজের প্রট মাধায় নিয়ে ফার্স্ট শিয়ার থেকে সেকেন্ড শিয়ারে যেতে গাড়িটা এমন হাঁচকা মারলে যে প্লটের যেই বেশপূর্ণ হাওয়া। 'সে-আপমোস আমার আজও যাইনি মশাই।'

সামা শাটি আব খাকি পান্ট-পুরু ড্রাইভার নেমে এসে দরজে খুলে নিতে লালমোহনবাবু একটা ছোট লাফ দিয়ে ঝাঙ্কায় নামতে দিয়ে ধূতির কোঁচায় পা আটকে খানিকটা বেসায়াস হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না। হেঙ্গুদা কিন্তু গঁষাঁর। তিনজনে ঘরে এসে বসার পর

সে মুখ খুলল।

‘আপনার ওই বিটকেল হৰ্ণতা পাসটারে সাধারণ, সঙ্গ হৰ্ণ না-লাগানো পর্যন্ত রঞ্জনী সেন রোডে ও-গাড়ির প্রবেশ নিষেধ।’

জটাখু জিভ কাটলেন। ‘আমি জানতুম ব্যাপারটা একটু বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি; যখন ডিমনস্ট্রেট করলে না?—ওখন পোড় সামলাতে পারলুম না।—জাপানি, জানেন তো?’

‘কান-বাটি নি হাঁড়-জালি’, বলল ফেলুন। ‘আপনার উপর হিন্দি ফিল্মের প্রভাব এন্টা যাটিকি পড়বে সেটা ভাবতে পারিনি। আর রংটাও ইকুয়াজি পীড়াদারক। মাত্রাজি ফিল্ম-মার্কী।’

লালমোহনবাবু কাতরভাবে হাত জোড় করলেন। ‘দোহাই মিস্টার মিশির! হৰ্ণ আমি কালই চেঞ্চ করছি, কিন্তু মংটা রাখতে দিন। প্রিন্টা বড় সুন্দিৎ।’

ফেলুন হাজ হেডে পিয়ে চায়ের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল, পালমোহনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ‘ওটা এখন বাদ দিন; আসো চলুন একবারটি ৮কর মেরে আসি। আপনাকে আর তসেশবাবুকে না-চৰ্জলো অবধি আমার ঠিক স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে না। বলুন কোথায় যাবেন।’

ফেলুন আপত্তি করল না। একটু ভেবে বলল, ‘তোপ্সেকে একবার চার্নকের সমাধিজ দেখিয়ে আমি ভাবছিলাম।’

‘চার্নক? জব চার্নক?’

‘না।’

‘তবে? চার্নক আরও আছে নাকি?’

আরও নিশ্চয়ই আছে, তবে কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা চার্নক একজনই।’

‘তাই তো—মানে...’

‘তার নাম জব নয়, জোব। জব হল কাজ, চাকরি; আর জোব হল নাম। যে ভুলটা আর পাঁচজনে করে সেটা আপনি করবেন কেন?’

এখানে বলে রাখি ফেলুনার স্টেটেস্ট নেশ্বা হল পুরনো খণ্ডকাজ। ফ্যালি লেনে একটা খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ও যখন জানল বে ফ্যালি হচ্ছে অসলে ফাঁসি, আর এই অকলেই দুশ্শা বন্ধৰ আসে নিন্দুমারের ফাঁসি হয়েছিল, তখন থেকেই নেশ্বাটা ধরো। গুড় তিন মাসে ও এই

নিয়ে যে বড় বই পড়েছে, ধ্যাপ দেখেছে, ছবি দেখেছে তার ইমত্তা নেই। অবিশ্বি এই সুযোগে আমারও অনেক কিছু জান। হয়ে বাছে, আর তার বেশির ভাগটা হয়েছে ভিজ্জোরিয়া মেমোরিয়াল দুটো দুপুর খাটিয়ে।

ফেলুনা বলে বিলি-আগার তুলনার কলকাতা খোকা-শহর ইলেও এটাকে ডিক্রি দেওয়া যেতেই ঠিক নয়। এখানে তাঁরমহল নেই, কৃতুবহিনার নেই, খোখপুর-জুসলমীরের মতো কেজো নেই, বিশ্বাসের গালি নেই—এ সবই ঠিক—কিন্তু তেবে দ্যাখ তোপসে— একটা সাহেব মশা মাছি সাপ ব্যাক কন-বাদাকে ভরা মাটের এক প্রান্তে গজার ধারে বসে ভবল এখানে সে কুঠির পতন করবে, আর দেখতে দেখতে কন-বাদাক সাফ হয়ে গিয়ে সেখানে দালান উঠল, রান্তা হল, রান্তার ধারে লাইন করে গ্যাসের বাতি বসল, সেই রান্তায় ঘোড়া ছুটল, পাখি ছুটল, আর একশো বছর যেতে না যেতে গড়ে উঠল এমন একটা শহর যার নাম হয়ে গেল সিটি অফ প্যালেসেজ। এখন সে শহরের কী হিয়ি হয়েছে সেটা কথা নয়; আমি বলছি ইতিহাসের কথা। শহরের নামের নাম পালটে এরা সেই ইতিহাস ঝুঁকে ফেলতে চাইছে—কিন্তু সেটা কি উচিত? বা সেটা কি সম্ভব? অবিশ্বি সাহেবরা তাদের সুবিধের জন্যই এত সব করেছিল, কিন্তু কি না করত, তাহলে ফেলু মিডির এখন কী করত তেবে দ্যাখ। ছবিটা একবার করলা করে দ্যাখ—তোর ফেলুনা—অসেক্টজ্ব মিত্র, প্রাইভেট ইনভিসিগেটর—যাদ শৈঘ্রে কলম পিশাহে কেন্দ্র জিমিদারি সেবেজাপ, যেখানে ফিল্ম প্রিস্ট বললে বুঝবে টিপসই।

বিবিড়ি বাগ—যার নাম হিল ডালহৌসি কোকার—যে ডালহৌসি আমাদের দেশে লাটিসাহেব হয়ে এসে গণপপ্র রাজ্য শিলেছে, আর সেই সঙ্গে প্রথম রেলগাড়ি আর প্রথম টেলিগ্রাফ চালু করেছে—সেই বিবিড়ি বাগে সুলো বজরের পুরনো সেটি জন্ম চার্টের কম্পাউন্ডে কলকাতার প্রথম ইটের বাড়ি জোব চার্নকের সমাধি মেঝে লাজমোহনবাবু বদিও কলকাতা 'প্রিসিস', আঘার কিন্তু মনে হল সেটা আকাশে ঘেঁষের ফলঘটা আর সেই সঙ্গে একটা গুরু-গুরুর গর্জনের জন্য। সমাধির পাশে একটা মার্বেলের ফলকের লিকে কিছুক্ষণ চেয়ে

থেকে তপ্তভূক বললেন, 'এ তো দেখছি জোগত নয় মশাই—
জোবাস্ ব্যাপার কী বলুন তো ?'

'জোবুপ হল জেনের ল্যাটিন সংস্কৃত', কলন ফেলুনা। 'পুরো
জেনেটাই স্যাটিনে সেটা বুঝতে পারছেন না ?'

'ল্যাটিন-ল্যাটিন জানি ন মশাই; ইংরিজি নয় এটা বুঝতেই পারছি।
নামের উপর ডি ও-এম লেখা কেন ?'

'ডি-ও-এম হচ্ছে ভিন্নুস অর্নিউল মার্জিসেন। অর্ধাং উভয়
সকলের কর্তা। আর তার নীচে যে কথাগুপ্তে বলেছে তার একটার
প্রতি আপনার ধূটি আকর্ষণ করি। Marmore। মর্মর-সৌধ জানেন
তো ? সেই মর্মর আর এই মারমোরে একই ডিনিস—মার্বল। আর
আরও মজা হচ্ছে এই যে, মর্মর কথাটা সংস্কৃত নয়, ফারসি। অর্ধ
সৌধ হল সংস্কৃত। এইভাবে সংস্কৃত-ফারসি সংস্কৃত-আরবি আমরা
পিছি জোড়া লাগিয়ে চলিয়ে দিই। ফেন, শকাপরাধৰ্ম। শুন হল
সলাহ—অর্ধাং পরামৰ্শ, ফারসি কথা: পরামৰ্শ সংস্কৃত। বা
কাপড়পত্র—আগজ আরবি, পত্র সংস্কৃত। তারপর আধাৰ—'

ফেলুনার দেক্কতার শেষ হল না, কারণ কথা নেই বলে নেই উচ্চ
এমন এক ধূলোর কড় (জটায়ু বলছেন 'প্রজ্ঞাপক') যেখন আমি আর
কোনওদিন দেখিনি। আমরা পড়ি-কি-মরি করে শালমোহনবুর সবুজ
অ্যাম্বাসাড়ের শিখে উচ্চাম, আর জ্ঞাইভার হরিপদবাবু গাড়ি ছুটিয়ে
দিলেম এসপ্লানেভের নিকে। এই প্রথম দেখলাম ধূলোর অন্য
অক্টোব-খুড়ি—শহিদ মিনারটা আর দেখা হচ্ছে না। হাওয়ার তেজ
কত বুঝতে পারছি না। কারণ গাড়ির কাঁচ ভুলে দেওয়া হচ্ছে। তবে
এটা দেখলাম যে, চানাচুরওয়ালারা বে সকল লোক বেজের মোঢ়ার
বজ্জে প্রাচীনের উপর তাদের জিনিসপত্র রাখে, তাই একটা গাড়ের
মাটের দিক থেকে শূন্য দিয়ে প্রাক খেতে খেতে উভে এসে আমাদের
তিক সামনে একটি চলঙ্গ ভবল ভেকায়ের দেওতনায় আছড়ে পড়ে
প্রক্ষেপেই আবার হাজা পেয়ে কার্জন পার্কের নিকে উড়ে গেল।

পার্ক ট্রাইটের কাছাকাছি এসে দেখি টাম বক, কারণ একটা দেবদাক
গাছ কেবল লাইনের উপর পড়েছে, ফেলুনার ইচ্ছে হিল আমাদের পার্ক
ট্রাইটের পুরনো গোরহুলটা দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু সেটা আর এই

অড়ের জন্য হল না। যদি যেভাব তা হলে হচ্ছে একটা ঘটনা চেমের শামনে দেখতে পেতাম—যেটার বিশ্ব পর্যাদন সবাসে কাপতে বেরোপ। চলিশে জুনের এই প্রলয়ের ঘড়ে (উইল্ড লেসিটি এয়ান হান্ড্রেড প্রাচু হার্টিং ইন্ডি কিলোমিটার্স পর আগোর) সাতিৎ পার্ক স্ট্রিট গোমতানে একটা গাছ তোকে পড়ে মাঝেন্দ্রনাথ বিহার নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে প্রজ্ঞতরভাবে জন্ম করে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আওয়া হয়। অবিষ্ট তিনি সঞ্চাবেলা এই আদিকালের গোরহানে কী করছিলেন সে অবরু কাগজে পেঁথেন।

॥ ২ ॥

পুরদিন সকাল আর দুপুরের ঝর্ণেকটা বাদ্দাৰ উপর দিয়েই ছেল। ফেলুন কোথেকে ভালি একটা ১৯৩২ সালৰ কালকাতা জ্যান হান্ডোৱাৰ মাপ জোগাড় কৰেছে; দুপুরে পিচুড়ি আৱ ভিম ভজা থেৱে পান মুখে পুৱে একটা চাৰমিনাৰ ধৰিয়ে ও আপটাৱ ভাজি বুল। সেটাকে মাটিতে বিহুৰ জন্য টেবল চেয়ে সব টেলে দেয়ালৰ গায়ে পাগিয়ে দিয়ে মেঝেৰ মাখাখানে ছ-ছুট বাই ছ-ছুট জায়গা কৰতে হল। ম্যাপেৰ উপৰ হামাঙ্গড়ি দিয়ে অমুৰা কলকাতাৰ রাস্তাহাটি দেখছি, ফেলুন বখচে 'বজনী সেন বুঝিস না, এ অকল্পটা তখন জাহল,' এইন সময় জটাহু এলেম। আজ আৱ ধূশি-পাঞ্জাবি মহ, গাঢ় নীল তেৰিকটৈৰ পাট আৱ হলদে ধূশ শাট। 'ছিয়াগুৱটা গাছ পড়েছে কলিকেৰ ঘড়ে' চুকেই ঘোষণা কৰলৈন ভদ্রলোক। 'আৱ আপনাৱ কথা রেখেছি মশাহি, এখন আৱ হৰ্ণ শুনলে হিমি ফিল্মৰ কথা মনে পড়বে না।'

আজ তাড়া নেই, তাই চা থেয়ে বেয়মো হল। ছিয়াগুৱটা গাছ পড়াৱ থকৰ কাগজে পড়ে বিশ্বাস হয়নি, বিস্তু পার্ক স্ট্রিট হেকে নিতেৰ চোখ উনিশটা গাছ বা গাছেৰ ডাল পড়ে থাকত দেখলাম, তাৱ মধ্যে সাদান এভিনিউতেই তিনটৈ। গুণ গো এৱ ঘন্যে কৃত ভাসপালী সৱিয়ে যেলা হয়েছে কে আনো।

গোৱহানেৰ গেটেৰ সামনে যখন পৌছলাম (এখনে আসছি স্টো

ক্ষমান্ব টিটে আপন ফেলুনা আমাদের ক্লেনি) তখন ভট্টচুর দিকে
চেয়ে দেখি তাঁর স্বাভাবিক ফুর্তি ভাবটা হল একটু কম। ফেলুনা তাঁর
দিকে জিজেসু দ্রষ্টি দিতে ভগ্নলোক বললেন, ‘একদার এক সহেবকে
করত দিতে দেখেছিলুন—ফটিওক্যুন— রাঁচিতে। কাঠের বাল্টা গর্জে
নামিয়ে যখন তাঁর উপর চাবড়া চাবড়া খাটি কেলে ন সে এক
বীভৎস শব্দ হলোঁ।’

‘সে শব্দ এখানে শোনার কোনও সম্ভাবনা নেই,’ বলল ফেলুনা। ‘এই
গোরস্থানে গত সোমাশো বছরে কোনও স্বতন্ত্রিকে সমাধিষ্ঠ করা
হলোঁ।’

গেট দিকে চুক্তিতেই ভাইনে দারোয়ানের ঘর। দিনের বেলা সে-কেউ
এ গোরস্থানে চুক্তে পারে, তাই দারোয়ানের বেঁহুর বিশেষ কোনও
কাজ নেই। ‘তবে হ্যাঁ?’ বলল ফেলুনা। ‘একটা কাপারে একটু রজর
যাথেত হয়—যাতে সমাধির গা থেকে কেউ মার্বেলের ফলক ধূলে না
নেয়। তলো ইটালিয়ান মার্বেল বাজারে বিক্রি করালে বেশ দু পয়সা
আসে।—দারোয়ান।’

দারোয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এগ। দেখে বলে দিতে হয় না সে
বিহারের পোক; বৈনিটা হনে হয় মনের পুরেছে মুখে।

‘কাল এখানে একজন বাঙালিদারু কথম হয়েছেন—মাথায গাছ
পড়ে?’

‘হ্যাঁ বাবু।’

‘সে জায়গাটি দেখা যাব?’

‘উয়ো রাঙ্গাসে সিঁথি চলিয়ে যান—একদম এস্ত তক। বাঁয়ে
শুমগেই দেখতে পাবেন। অভিতকৃ পড়া হয়া হ্যাঁ পেড়।’

অবুরা তিনজন ঘাস-গজিয়ে-যাওয়া দীঘানো বাঙালিটি দিয়ে এগিয়ে
গেলাম। দু দিকে সমাধির সারি—তার এক একটা বারো-চোন্দ হাত
উঁচু। কাটিয়ে কিছু দূরে একটা সমাধি প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু।
ফেলুনা বপেল, তুটা খুব সন্তুষ্ট পঞ্চিত উইলিয়াম জোন্স এর সমাধি,
ওর চেয়ে উঁচু সমাধি নাকি কলকাতায় আর নেই।’

প্রতোকটা সমাধির গায়ে সাদা কিংবা কাজো মার্বেলের ফলকে
মৃতেক্ষিতের নাম, জন্মের তারিখ, আর মৃত্যুর তারিখ, আর সেই সঙ্গে

আরও কিছু সেখা। কয়েকটা বড় ফলকে দেখপাই অল্প কথায় জীবনী
পর্যন্ত সেখা রয়েছে। বেশির কাথ সমাধির চীজের আড়া,
বীচে চওড়া খেকে উপরে সরু হয়ে উঠেছে। লালমোহনবাবু
সেগুলোকে বেলেন বোরখাপরা ভূত। কথাটা খুব খারাপ বলেননি,
বিদিও এ ভূতের নড়চড়ার উপায় নেই। এ ভূত প্রহরী ভূত; মাটির নীচে
কমিনবসি হয়ে যিনি শুরে আছেন তাকেই যেন গার্ড করছেন এই ভূত।
'এই সূজগুসোর ইংরিজি নামটা খেনে রাখ তোপ্সে। একে এসে
ওবেলিক।' লালমোহনবাবু বার পাঁচক কথাটি অন্তভুরে নিশেন। আমি
বী-দিক ভাল-দিক চোখ ঘোরাচ্ছি আর ফলকের নামগুলো টিক্কিয়ে
করছি - গ্যাকসন, গ্যটস, শ্যোলন, লায়কিন্স, গিমস, ওল্ডহাম...।
মাঝে মাঝে সেখানে পাশাপাশি একই নামের বেশ কয়েকটি সমাধি
রয়েছে - বোধ্য যাছে সবাই একই পরিবারের খেকে। সবচেয়ে
আগের তারিখ যা এখন পর্যন্ত চোখে পড়েছে তা হল ২৮ শে জুলাই
১৭৭৯। তার মানে ফরাসি বিপ্লবেরও বারো বছর আগে।

রাস্তার শেষ মাধ্য পৌছে ঝুঁকতে পারলাম গোবৰ্হনেট। কত বড়।
পার্ক ট্রিটের ট্রাফিকের মুক এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফেনুল পরে
বলেছিল, এখনে নাকি দু হাজারের বেশি সমাধি আছে।
লালমোহনবাবু পোরার স্কুলপার রেডের বিকটায় গোবৰ্হনের
গুড়ে-সাগা একটা ফ্ল্যাটবার্ডের দিকে দেখিয়ে বলেলেন, উকে লাখ টাকা
দিলেও নাকি উনি খালনে থাকবেন না।

গাছ যেটা জেনেছে বলে কাগজে বেরিয়েছে, সেটা আসলে
শাখা-প্রশাখা সমেত একটা প্রকাণ আম গাছের ভাল। সেটা পড়েছে
একটা সমাধির বেশ খালিকটা খবস করে। এ ছাড়াও আরও অনেক
ভালপালা চরিসিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

আমরা সমাধিটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

এটা অনাঙুলোর তুলনায় পেটে, লালমোহনবাবুর কাথ অন্ধি
আসবে বড় জোর। বোধ্য যায় এমনিতেই সেটাৰ অবস্থা বেশ কাহিল
ছিল। যেদিকে ভালের লা লাঙ্গেনি সেদিকটাৰ খণ্টল ধৰে চৌচিৰ হয়ে
আছে, পলেতারা খসে ইট বেরিয়ে আছে। যা সাগার দুর্বল ষেত
পাথরের ফলকটাৰ ভেঙেছে; তার খালিকটা সমাধিৰ গায়ে এখনও

গোপনো আছে, বাকিটি খাট-মশ টুকরো হয়ে যাম্বের উপর পড়ে আছে। কিন্তু হয়ে চারিদিকটা এমনিতেই জলকাদার ভরা, কিন্তু এখানে যেন কামটা অনেক আগের চেয়ে একটা মেশি। 'অস্তর্য', বললেন গান্ধীজোহনবাবু, 'তাত্ত্ব কথটা কিন্তু এখনও সমাধির গায়ে কেসে আছে।'

'শুধু গত নয়,' বলল যেনুনা, 'তার নীচে সকলের অংশ দেখতে পাওয়েন নিশ্চয়ই।'

'ইসে। কোন এইটি ফাইভ—তারপর ভাজা। বোবাই যাচ্ছে এই গুড় হল আপনার সেই সিংহ সকলের কর্তা র গুৰু।'

'তাই কি!'

যেনুনা অশ করে তার স্থিকে চাইলাম। তার ভুঁরু কুচকোলো। বলল, 'আপনি অন্য সমাধিগুলো বিশেষ যেন দিয়ে দেখেননি দেখছি। দেখুন না এই পাশেরটার দিকে।'

পাশেই আরেকটা বড় সমাধি রয়েছে। তার ফলকে লেখা—

To the Memory of
Capt. P. O'Reilly, H. M. 44th Regt.

who died 25th May, 1823 aged 38 years

'কন্ধ করল, নামের নীচেই আসছে সাম-তারিখ। বেশির ভাগ কস্তুরী তাই। আর, গড় কথটা অন্য কোনও ফলকে দেখলেন কি?'

কেন্দুনা দিকই বলেছে। এই পর্যন্ত আসার মধ্যে আরি নিজেই অস্ত ত্রিশটি ফলকেরা সেখা পড়েছি, কিন্তু কেনওটাতেই গত দেখিনি।

'তার মানে বললেন, গত হল মৃত্যুজ্ঞির নাম?'

'গত করলো নাম হয় বলে আবুল মনে হল না, যদিও ঈশ্বর বা তৃষ্ণাম নামটা হিন্দুদের মধ্যে আছে। পক্ষ করল, মাথ-এর ডিং-গুরু বা দিকে ইঞ্জি-খানক খাঁক দেখ যাচ্ছে—অর্থাৎ যাঁ-দিকে তের পাশে গায়ে কেনও অস্ত ছিল না। কিন্তু ডি-গুরু ডান দিকটার ছাঁক আছে কিনা বোকা বলেছে না। যারপ সে জায়গার পাথরটা তেজে পড়ে গেছে। আমার ধারণা এটা যার কবর তার পদ্মনির প্রথম তিনটে অস্তর হল ডি ও ডি; যেমন ৭৬ ফ্রি বা পতার্ড।'

'কে তো পাথরের টুকরোগুলো তাড়ে করে পাশেপাশি—'



লালমোহনবাবু কথাটা বলতে থলতে ভাঙ্গা ডালপালাৰ উপর নিয়ে সমাপ্তিত দিকে এগিয়ে তার ধারে পৌছোতেই হঠাৎ সড়াৎ করে শানিকটা নীচৰ দিকে লোৱে গোলেন। গতে পা পড়লে যেমন হয় ঠিক তেকনি। কিন্তু ফেনুদা ঠিক সময়ে তার স্বাহা হাত দুটি বাড়িয়ে তাঁক থপ্প করে ধৰে টেনে তুলে শক্ত জমিতে দাঁড় কৰিয়ে নিল। বাপারটা কৰ্তৃ ওখনে গৰ্ত হল কী করে? 'কেমন যেন খটকা লাগছিল,' বলপ ফেনুদা, 'ভাঙ্গল আমগাহ, অগচ আমপাত্তাৰ সঙ্গে জাম-কাঁচাল কী কৰেছে তাই ভাৰছিলাম।'

লালমোহনবাবু এৰলিভেই গোৱানে এসে একটু ক্ষম মেৰে গিয়েছিলেন, তাৰ উপৰ এই ব্যাপৰ। প্যান্টেৰ ধূলো বাড়তে বাড়তে 'এ একটু লাড়াবাড়ি মশাই' বলে ভুলোক একপাশে সৱে গিয়ে আধাদৰে দিকে পেলু কৰে বোৰহয় নিজেকে সামলাবাৰ চেষ্টা কৰলেন।

'তোপসে—খুব সবধানে ডালপালাওলো সৱা তো।'

আমি আৱ ফেনুদা গৰ্ত বাঁচিয়ে জায়গাটা পৰিষ্কাৰ কৰতেই বেশ বোৰা গেল কৰৱেৰ পাশ্টায় হাত ধানেক গভীৰ খালোৰ মতো নায়েছে। সেজা আগৈই ছিল, না সম্পত্তি কেউ বুঁড়ে কৰেছে সেটা ফেনুদা বুঁৰে ধাকলেও, আমি বুৰুলাম না।

কেন্দুলা এবাৱ মাৰ্বেলেৰ টুকৰোজলাৰ মন মিলে। দু জনে মিলে এগাৱোটা টুকৰো ভড়ো কৰে মিলিট সংশ্ক ঘাসেৰ উপৰ জিগ-স প্যাজল খেলে সেওলোকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলাম। তাৰ ফলে কিনিসটা এইৱকম দাঁড়াল—

Sacred to the Memory of
THOMAS—WIN

Obi. 24th April—8, AET. 180—

'গড়ড়ইন', বলপ ফেনুদা, টমাস গড়ড়ইনেৰ পুণ্যস্মৃতিৰ উদ্দেশ্যে। ত বি টি হল "ওবিটুস" অৰ্থাৎ মৃত্যু, আৱ এই টি হল "এইটাটিস" অৰ্থাৎ ব্যবস। এখন কথা হচ্ছে—'

'ও মশাই!'

জটায়ু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে আমাকে বেশ চমকে দিলেন। যুৱে

দেখতেই ভদ্রলোক একটা টেকে চেপেটা কালো জিনিস আমাদের
দিকে তুলে ধরে দলবেল, 'সাইরিপ টাকায় পুরুষের জিমের
হবে কি ?'

‘কী পেলেন ওটা ?’

আমরা দু জনেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

সালমোহনবাবুর বাঁহাতে একটা কালো মানিবাগ, আর তান হাতে
ডিন্টে দশ, একটা পাঁচ, আর একটা দু টাকার লোট। টাকা আর ব্যাগ
মুটেরই অবস্থা বেশ শোচনীয়। ভদ্রলোকের ডয়া কেটে পিয়ে এখন
একটা বেশ মারলিস্ ভবে; দেশ বুঝতে পারছেন যে, ফেলুদাৰ জন্য
একটা ভাল ফু জোগড়ে করে দিয়েছেন।

ফেলুদা বাগটা খুলে খাপগুলোর ভিতর যা ছিল সব যান কয়ল।
চার রকম জিনিস বেরোল খাপ থেকে। এক নম্বর—এক গোছা
ভিজিটিং কার্ড, যাতে ইংরিজিতে লেখা এন এব বিশ্বাস। ঠিকানা
টেলিফোন মেই। ফেলুদা বলল, ‘দেখছেন খবরের কাগজের কাও—
নরেন্দ্রনাথকে মরেন্দ্রনাথ করে দিয়েছে।’

মুই নম্বর হচ্ছে দুটো খবরের কাগজের কাটিং। একটাতে এই সাতখ
পার্ক প্রিটে গোরস্থান প্রথম যন্ত্র শুল্ল তার খবর, আর আরেকটাতে
আজকাল যাকে শহিদ মিনার বলি, সেই অকটারলোনি মনুমেন্ট তৈরি
হবাব খবর। আর মামে দুটো কাগজের টুকরোই দেড়শো-বুশো বহুমের
পুরনো। ‘বিশ্বেস যশাই এত আঠিল কাগজের কাটিং কোথেকে জোগাড়
করলেন জানতে ভারী কোতুহল হচ্ছে—’ ভজবা করল ফেলুদা।

তিনি নম্বর হচ্ছে পার্ক প্রিটের অঙ্গফোর্ড বুক কোম্পানির একটা
বাবোঁ টাকা পঞ্চাশ পয়সার ক্যাশমেয়ো; আর চার হল এক টুকরো
সাধা কাগজ, যাতে প্রট পেনে ইংরিজিতে কয়েকটা পাইল লেখা।
লেখার মাথামুক্ত বুবলাম না, যদিত ভিক্টোরিয়া নামটা পড়তে
পেরেছিলাম।

‘অকটারলোনি মনুমেন্ট নিয়ে যে একটা লেখা দেখলুম সেমিন
কাগজে’, হঠাৎ বলে উঠলেন সালমোহনবাবু, ‘আর যদুর হনে পড়ছে
লেখকের পদবি ছিল বিশ্বাস। হাঁ—বিশ্বাস। কারেষ্ট।’

‘কোনু কাগজ ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল;

‘হয় “জেপ্টো” না হয় “বিটিঅপ্টো”। ঠিক খলে পড়ছে না। আটি বাড়ি গিয়ে চেক্ট করব।’

জটায়ুর স্মরণশক্তি তেজন নির্ভরযোগ্য নয় বলেই বোধ হয় ফেলুদা এ বাপারে আর কিছু ন বলে সাদা কাগজের লেখাটি তার নিজের চেটিবুকে বিপি করে নিয়ে আসল কাগজ আর অন্য জিনিসগুলো মানিব্যামে তরে স্টেট প্রেসেট নিয়ে নিল। তারপর মিনিট পাঁচেক ধরে কবরের আশপাশতা ভাল করে দেখে অফেণ্ট পুটো জিমিস পেচে সেন্টেলোও পকেটে পুরল। সে-পুটো হচ্ছে একটা ব্রাউন রঙের কোটের দেহায় আর একটা সেতিকে যাওয়া যেসের বই।—‘চল, দারোয়ানের সঙ্গে একবার কথা বলে বেরিয়ে পাঢ়ি। আবার দেখ করল।’

‘যাপটা কি ফেরত দেবেন?’ কিশোর করলেন লালমেহমদাবু।

‘আবিশ্বা। কেন, হসপাতালে আহে খোঁজ করে কাল একশার যাব।’

‘আর সে-লোক যদি মরে গিয়ে থাকে?’

‘সেই অনুমতি করে তো আর তার প্রপাতি আবাসাং করা যাব না। সেটা নীতিবিকল্প।—আর সহিতিশ টাকায় প্রুফকে ডিনজনের চা স্যাল্টউইচের বেশি কিছু হবে না, সুতরাং আপনি ডিনারের আশা ত্যাগ করতে পারেন।’

আমরা আবার উলটোমুখে দুরে কবরের সারির মাঝখানের পথ দিয়ে পেটের দিকে এগোতে লাগলাম। ফেলুদা গুরুর। এরই ফাঁকে একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়েছে। এমনিতে ও সিগারেট অনেক কমিয়ে দিয়েছে। কিছু রহস্যের গুরু পেলে নিজের অঙ্গাঙ্গেই মাঝে সাকে সাদা কাটি মুরে চপ্পে ঘাস।

আর্ধেক পথ দ্বারা পর সে হঠাৎ থামল বেল সেটা তৎক্ষণাং পুরাতে পারিনি। তারপর তার চাহনি অনুসরণ করে একটা জিমিস দেখে আমার হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিবিটাও এক পলকের জন্য থেঁথে গেল।

একটা গঙ্গাজগতী সমাজি—যার ফলকে গৃহবাসির নাম রয়েছে মিস মারগারেট টেল্লার—তার ঠিক সামনে যাসে পড়ে থাকা একটা পুরনো ছাঁটের উপর একটা সিকিখাওয়া জুলগু সিগারেট থেকে সক্ষ কিন্তের হচ্ছে হোলা কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠেছে। যাই হবে

বলেই বোধ হয় বাতাসটা বন্ধ হয়েছে, না হলে খৌরা দেখা যেত না।

ফেলুনা এগিয়ে গিয়ে দু ইঞ্জি লম্বা সিগারেট। তুলে নিয়ে মন্তব্য করল, ‘গোশ ফ্রেক।’ জটায়ু বলল, ‘বাঁড়ি চলুন।’ আরি বলাম, ‘একবার বুঝে দেখব পোকটা এবনও কৈছে কিনা?’

‘সে বলি থাকত’, বলল ফেলুনা, ‘তাইলে সিগারেট হাতে নিয়েই থাকত; কিংবা হাত থেকে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিড়ে নিত। আধখাড়ো অবস্থায় এভাবে ফেলে যেত না। সে পোক পালিয়েছে, এবং বেশ ব্যঙ্গভাবেই পালিয়েছে।’

দারোঘান ঘরে ছিল না। মিনিট তিনেক অলেক্ষা বকার পর সে পঞ্চিম দিকের একটা বোপের পিছন থেকে বেরিয়ে দেলতে দুলতে এগিয়ে এসে বলল, ‘আভি এক চুহাকে খত্ম কর দিয়া।’

বুবলাম, ওই বোপের পিছনে চুহার সংকার সেবে তিনি কিমছেন, ফেলুনা কাজের কথার চলে গো।

‘যার উপর গাছ পড়েছিল তাকে জখম অবস্থাট প্রথম দেখল কে?’

দারোঘান বলল যে সেই দেখেছিল। গাছ পড়ার সময়টা সে গোবহানে ছিল না, তার নিজের একটা শার্ট উড়ে গিয়েছিল পার্ক স্টিটে, সেটা উকার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ত্যাপারটা দেবে। দারোঘান ভদ্রসোকের মুখ চিন্ত, কারণ উনি নাকি সঞ্চারি আরও কয়েকবার এসেছেন গোবহানে।

‘আর কেউ এসেছিল কাজকে?’

‘মাসুম নেহি বাবু। হাম বদ সৌভকে দিয়া, উস টাইমমে তো আভিন কোই নেহি ধো।’

‘এইসব সমাধির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে তো?’

ওটা দারোঘান অঙ্গীকার করল না। আমারও মনে হচ্ছিল দে এই গোবহানের চেয়ে তাল লুকোচুরির জায়গা বোধ হয় সারা কলকাতার আর একটিও নেই।

নরেন বিশ্বাসের অবস্থা দেখে দারোঘান রাস্তায় বেরিয়ে এসে এক পথচারী সাহেবকে খবরটি দেয়। বর্ণনা থেকে মনে হল সেটা জেডিয়ার্সের ফাদার-টেলার হতে পারে। তিনিই নাকি ড্যাঙ্কি ডাকিয়ে নরেন বিশ্বাসকে হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন।

‘আজ একটু আগে’ কাউকে আসতে দেখেছিসে ?’

‘আভি ?’

‘হ্যাঁ ?’

না, দারোঘান কাউকে আসতে দেখেনি। সে গেটের কাছে ছিল না।
সে শিয়েছিল চুহার জন্ম নিয়ে ওই বোপচুটির পিছনে। ওটা যেনে
দিয়েই তর কান্ত শেষ হয়নি, কারণ একটু পিপাসার প্রদোভন হয়ে
পড়েছিল।

‘আত্মে তুমি এখানে থাকো ?’

‘হ্যাঁ বাবু। সেবিন রাতকো তো পহুঁচেকা কোই জরুরৎ নেই
হোতা। তব কে মারে কোই আতঙ্কি মেই। পহলে সোয়ার সারকুলার
রোড সাইডে শিশুয়ার টুটা থা, সেক্ষেত্রে আজকাল রাতকো কোই নেই
আতা সম্ভটারিমে।’

‘তেমনার নাম কী ?’

‘বুরমসেও।’

‘এই নাম।:

‘সামাজ বাবু।’

দারোঘানের হাতে দু টাকার নেটে উঁজে দেৰার ফল অবিশ্বি
আমরা পুরে পেয়েছিলাম।

॥ ৩ ॥

‘গড়উইন... ? টমাস গড়উইন... ?’

সিধু ক্ষ্যাঠার কশালে ই-টা আজি পড়ে গেল।

সিধু ক্ষ্যাঠাকে আমি বলি বিশ্বকোষ, ফেল্দুদা বলে শুনিধর। দুটোই
ঠিক। একবার যা পড়েন, একবার যা শেনেন—মনে ধরলে ভোলেন
না। ফেল্দুদাকে মাঝে মাঝে ওর কাছে আসতেই হয়। যেমন আজকে।
ভোরে উঠে ইটাতে বেরোন সিধু ক্ষ্যাঠা লেকের বারে। মাইল দু-এক
হেক্টে বাড়ি ফিরে আসেন সাজে ইটার অধ্যে। ধূটি হলো বাস নেই;
হাতা নিয়ে বেরোবেন। বাড়ি ফিরে সেই যে তত্ত্বাবেশের উপর যাসেন,
এক আম-খাওয়া ছাড়া ওঠা নেই। সামনে একটা ডেস্ক, তার উপর থই,

ম্যাগাজিন, বকয়ের কাগজ। জেখেন না। চিঠিও না, খেপার হিসেবও না, কিন্তু না। খালি পড়েন। টেলিফোন নেই। আমাদের সঙ্গে যেজায়েগ করার দরকার হলে চাকর জোর্জিনকে দিয়ে বলে পাঠান; দশ মিনিটে সে কথা পেঁচে যায়। বিয়ে করেননি; বড়-এর কলে বই নিয়ে ঘর করেন। বলেন, আমার সৎসার, আমার শ্রী পুত্র পরিবার। আমার ভাস্কার মাস্টার সিস্টার মাদার ফাস্টার, সবই আমার যই। পুরনো কলকাতা সহজে ফেলুন্দার উৎসাহের জন্য সিঁড় জাঁঠাই বকলকটা নারী। তবে সিঁড় জাঁঠা শুধু কলকাতা না, সারা বিশ্বের ইতিহাস জানেন।

দুধ-ছাড়া চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে সিঁড় জাঁঠ; গড়তাইন কপাটা আরও দু বার আওড়ানেন। তারপর বললেন, ‘গড়তাইন নামটা ফস্কুলে বললে প্রথমটা শেলির অভয়ের কথাই মনে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে এসেছে এমন একটা গড়তাইনও ছিল বটে; কেন বছরে মারা গেছে বলেন?’

‘আঠারো শ্রে অটোরা।’

‘আর জন্ম?’

‘সতেরো শ্রে অটোশি।’

‘হ্যাঁ, তা হলে এই গড়তাইন হতে পারে বটে। আটচলিশেই বোধ হয়, বিহু উন্পঞ্চাশে, ক্যালকাটা মিডিউটে একটা জেবা বেরিয়েছিল। টিমাসের মেরে। নাম শার্লি। না না—শার্লট। শার্লট গড়তাইন। তার বাপ সহজে লিখেছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে।... ওবেববাস্ট। সে তো এক শাঙ্কার কাহিনী হে কেলু।—অবিশ্বিত শেষ জীবনের কথা লেখেনি শার্লট। আর সেটা আরি জানিও না; কিন্তু সোজায় ভারতবর্ষে এসে তার কীর্তিকলাপ—সে তো একেবারে গভীর মতো। তুমি তো জখনো গেছো?’

ফেলুন্দা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। বালশাহি আঁটির ব্যাপারে প্রথম তার গোয়েন্দাগিরিয়ে শীরাবাজি লখনৌতেই দেখিয়েছিল ফেলুন্দা।

‘সাধত আলির কথা জান তো?’

‘জানি।’

‘সেই সাধত আলি তখন লখনৌ-এর নবাব। দিলির পিদিয় তখন

মিশ্র-নিকৃষ্ট যত রোম্পনাই সব লখনৌ এ। সাদত ইয়াঁ বয়াসে কলকাতায় ছিল, সাহেবদের সঙ্গে রিশে ইংরিজি ভাষাটা একটু ভাসাভাসা খুঁখচিল, আর শিখেছিল ঘোলো আমা সাহেবিয়ান। আনাম-ডে-দৌল্যা আরা যাবার পর ওঁজীর আলি হল নবাব। সাদত আপি তখন কাশীতে। মন করাপ, কারণ আপি ছিল আসাফের পর সেই পর্যন্তে বসবে। এদিকে ওঁজীর ছিল অকর্মাজ টেকি। বিচ্ছিন্ন তাকে বয়াসন্ত করতে পারলে না; তার হাসে তার নবাবি দিলে বরবাদ করে। মনে রেখো। অযোধ্যায় তখন কোম্পানির প্রতিপক্ষি খুব; নবাবরা কোম্পানির কর্তব্য গুঠে বলে। ওঁজীরকে হাতিয়ে শুরা সাদতকে সিংহাসনে বসাল। সাদত খুশি হয়ে বিচিকিৎক অযোধ্যা দিয়ে দিলো।

‘সে সময়ে লখনৌ-এর অলিঙ্গে-পলিঙ্গে সাহেব। নবাবের বৌজে সাহেব অফিসার, সাহেব গোলন্দাজ; তা ছাড়া সাহেব বায়সায়ী, সাহেব ডাক্তার, সাহেব পেন্টার, সাহেব নাপিত, সাহেব ইন্সুল মাস্টার; আবার কেউ কেউ আছে যারা এসেছে শুধু টাকার লোকে; নবাবের নেক নজরে পড়ে দু পঞ্চাশ যদি কামাতে পারে। এই শেষ মলের মধ্যে পড়ে ট্যাম্ব গড়উইন। ইন্সেন্টের ছোকরা— সামেজ না সাফেক না সারি কোথার তার বাড়ি ঠিক মনে নেই—সে দেশে বসে নবাবির গুরু করে এসে হাজির হল লখনৌতে। সুপুর্ণব চেহারা, কণ্ঠার্তা ভাল, রেসিডেন্ট চেরি সাহেবের মন ভিজিয়ে তার কমছ থেকে সুপারিশপত্র নিয়ে শিয়ে হাজির হল নবাবের দরবারে। সাদত জিগোস করলে, তোমার গুণগনা কী। ট্যাম্ব ক্ষমতে নবাব বিলিতি খানা পছন্দ করে— রাজাৰ হাত ভাল ছিল ছোকরার—কললে আপি ভাল শেষ, তোমাকে বৈধে খাওয়াতে চাই। নবাব বশলে খাওয়াও। বাস—গড়উইন এমন রাজা রাঁধলে যে সাদত উকুনি তাকে বায়ুচিক্ষায় বাহাল করে নিলো। তারপর থেকে নবাব যেখানে যাই দেখানেই মুসলমান বায়ুচির পাশে পাশে বাই ট্যাম্ব গড়উইন। জাটসাহেব শহরে এসে সাদত তাকে বেকভাস্ট ভাকে— সাহেব খুশি হলে সাদতের মঙ্গল—তরসা ট্যাম্ব গড়উইন। আবা নকুন কেন্দ্র ডিশ পছন্দ হণ্ডেই আসে বকশিশ। নবাবি বকশিশ ভাজো তোঁ দু-দশ টাকা কি দু-চারটে মেজের পেঁজে দেওয়া

তো নায়—লখনী-এর নবাব। হাত খাড়লেই পর্বত। বুঝে দেখো, গড়উইনের পকেট কাঁড়াবে ফুলে-ফুলে উঠল। আব তাই ধনি না হাবে তো সে বাবুটি খানায় পড়ে থাকবে কেন? সে রকম লোকই সে নয়।

‘বেঁরিয়ে এল নবাবের আওতা থেকে। চলে এল আমাদের এই কলকাতায়। এসেই বিষে করলে জেন ম্যাডক বলে এক মেসাহেবকে—কোম্পানির খৌজের এক ব্যাপ্টিনের ঘোয়ে। তার তিন মাসের ইয়ে এক মোস্টোরান্ট শুল্লে থাস টোরঙ্গীতে। তারপর যা হয় আর কী। সুদিন তো আর কারুর চিরটাকাল থাকে না। গড়উইনের ছিল ফুরোর নেশ্বা। লখনী থাকতে মুরগীর জড়াই আর তিতিকের লড়াইয়ে বাজি ফেলে ফেমন কাহিনেছে তেমনি খুইয়েছে। কলকাতায় এসে সে রোগ আবার ধাঢ়া চাঢ়া দিয়ে উঠল।... এর বেশি আর তার মেরে কিছু লেখেনি। বদ্যূ খনে হয়, টমাস গড়উইন মারা বাবার কয়েক মাস পরেই এ-জেখাটা হেরোয়। সেক্ষেত্রে তার নিজের মেরের পকে তার বাপের ঘন্দ দিবাটা কি আর খুব বলাও করে লেখা চলে? অন্ত সে ফুলে বেত না নিশ্চরই। বাই হোক, এশিয়াটিক সোসাইটিতে শিয়ে তৃতী সেখাটি পড়ে দেখতে পারো। আমি যা খললাম তার চেয়ে ন্যাচারেলি আরও বেশি ডিটেল পাবো।’

আমার অবিশ্য মনে হল, সিধু জ্যোতি পুরো জেখাটাই বাংলা করে বলে ফেলেছেন।

কেবলুন্দা আর আমি দু জনেই টমাস গড়উইনের এই আশ্চর্য কাহিনী শুনে পেল কিপুর্কশ চুপ করে থাইসাম। আমাদের আগে সিধু জ্যোতি আবার মুখ বুললেন।

‘কিছু টমাস গড়উইনের বিষয় হঠাৎ জিজেস করছ কেন? কী ব্যাপার?’

কেবলুন্দা বলল, ‘সেটা বলছি। তার আগে অহর একটা জিজিস, জানার আছে। নরেন্দ্র বিদ্যাস থালে কারুর নাম শুনেছেন—যিনি পুরনো বস্তুকাতা নিয়ে প্রবন্ধ-টুবন্ধ সেখনে?’

‘যিসে সেখেন?’

‘তা জানি না।’

‘কেমন অব্যাক্ত কাগজে লিখলে সে লেখা আমার কোথে পড়বে

না। অজ্ঞান আৰু ধৰাবীধা বাস্তুজ্ঞের বাইরে অৱৰে কিছু পতি না। কিন্তু এ প্ৰয়োগ কৈ কৈন্তে ?

মেলুদা সংজ্ঞেপে কালকেৰ ঘটনাটা বলে বলে, 'গাছ পড়ে যদি একটা সোক ভৰ্বৰ হয়ে অজ্ঞান হয়, তাহপে তাৰ মানিব্যাপটা দশ হাত দূৰে ছিটকে পড়বে কেল, এইখালৈই ঘটিকা।'

'হ্যাঁ...'

সিধু জ্যাঠা একটু গান্ধীৰ খেকে বললোগ, 'কাল বড়েৰ গতিবেগ ছিল হটার নকুল মহিল। যদি দেৰোৰ যে ভৱলোকেৰ মানিবাখা তাৰ শার্ট বা পাঞ্জাবিৰ বুকপকেটে ছিল, তাহলৈ দৌড়ে পালাবে গিবে পকেট থেকে সে বাগ ছিটকে পড়া কিছুই আশ্চৰ্য নহ। আৱ দৌড়ামোৰ অবস্থাতেই তাৰ মাথায় গাছ পড়ে ধাকতে পাৱে। তা হলৈ আৱ রহস্য কোথায় ?'

'ভৱলোক পড়েছিলেন গড়ভাইলেৰ সমাধিৰ পাশে।'

'তাতে কী এসে গৈল ?'

'সেই সমাধিৰ পাশে আলেৰ মতো গৰ্ত। মনে হয় কেউ খৈড়াৰ কাজ শুন কৰেছিল।'

সিধু জ্যাঠাৰ চোখ ছানাখড়া।

'বল কী ছে। যেত ভিগি ! এ তো ভাৱী শ্ৰেণি সংবাদ দিলে ছে তুমি। এ তো অবিবাস্য। টাটকা লাখ হলৈ শুড়ে থার কৱে শৰ ব্যবছেদেৰ জন্য বিক্রি কোৱে পয়সা আসে জানি। কিন্তু দুশো বছৰেৰ পুৱনো লাশেৰ কয়েকটা হাড়লোড় ছাড়া আৱ কী পাওয়া যাবে বলো। তাৰ না আছে প্ৰত্যুত্তাৰিক ভ্যালু, না আছে বিসেল ভ্যালু। শুড়েছে সে ব্যাপারে তুমি শিওৱ ?'

'পুৱাপুৱি নহ—কাৱণ বৃষ্টিৰ জনা কোনোলৈৰ কেপেৰ চিহ্ন মুছে গৈছে—বিস্তু তবু...'

সিধু জ্যাঠা আৰো একটু ভোবে আৰো নেড়ে কললোগ, 'না দে কেলু, আমাৰ মনে হচ্ছে তুমি বুনো হাসেৰ পেছনে ধাওয়া কৰছ। হাতে কোনও কেস-টেস নেই বুনি ? তাই কলমাস্য একটা রহস্য আঢ়া কৰছ— অৱো ?'

মেলুদা তাৰ একপেশে হাসিটা হেসে চূপ কৱে বলিল। সিধু জ্যাঠা

বলসেন, 'গড়উইনের বৎশের কেউ যদি এখানে থাকত তা হলে না হয় তাদের জিগোস করে কিন্তু জানা যেত। কিন্তু সেও তো বোধহয় নেই। সব সবহেব পরিবারই তো আর বারওয়েল বা টাইটলার পরিবার নয়— যাদের কেউ না কেউ সেই ক্লাইভের আমল থেকে এই সেমিন অবধি ইতিয়াতে কাটিব্রে গেছে।'

এইবার ফেলুদা তার এতক্ষণের চাপা খবরটা দিয়ে দিল।

'ট্যাম্প গড়উইনের তিন পুরুষ পর অবধি তাদের কেউ না কেউ এ- দেশেই আরো গেছে সে খবর অমি জানি।'

'সে কী?' সিধু জাঁচা অবাক। আসলে আজই সকালে এখানে আসার আগে আমরা লোয়ার সার্কুলার রোডের গোরাচলটা দেত ঘটা থরে দেখে এসেছি। এটা পার্ক প্রিট গোরাচানের পরে তৈরি আর এখনও ব্যবহার হয়।

'শার্লট গড়উইনের সমাধি দেখেছি', বলল ফেলুদা। '১৮৮৬ সালে সাতবাহ্নি বছর বয়সে মরা যান।'

'গড়উইন পদবি দেখলে? তার মানে বিবাহ করেলামি। আহা, বড় সুলেবিকা ছিলেন।'

'শার্লটের পাশে তার বড় ভাই ডেভিডের সমাধি। মৃত্যু ১৮৭৪'— ফেলুদা পকেট থেকে তার খাণ্ডটা ধারে নোট দেখে দেখে বলে চলেছে— ইনি বিসিরপুরের কিড কোম্পানির হেড অ্যাসিস্টেন্ট ছিলেন। ডেভিডের পাশে তার হলে সেকেন্টেন্ট কর্নেল আজু গড়উইন ও তার স্ত্রী এমা গড়উইন। আজু মারা যান ১৮৮২-তে। আজু-এমার পাশে তাদের ছেলে চার্লস। ইনি ভাঙ্গার ছিলেন, মৃত্যু ১৯২০।'

'সাবাস! তোমার অনুসর্কিংসা আর অধিবসার।' সিধু জাঁচা সত্তিই খুশি হয়েছেন। 'এখন তোমার জন্মতে হবে বর্তমানে এন্দের কেউ জীবিত কিমা এবং কলকাতায় আছেন কিমা। টেলিফোন ডিয়েষ্ট্রিক্টে গড়উইন নাম পেলে?'

'মাঝ একটা কেন করেছিলাম। এই পরিবারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।'

'দেখো খৌজ করে। হয়তো থাকতে পারে। অবিশি তার হলিস কী

করে পাবে তা জানি না। পেলে, আর কিছু না হোক—গ্রেত ভিসিং-এর ব্যাপারটা আমার কাছে ভুয়ো বলেই মনে হয়—অন্তর্ভুক্ত চমৎস গুড়উইনের মতো একটা কালারফুল চরিত্র সম্ভবে হ্যাতো আরও কিছু তথ্য জোগাড় করতে পারো। শুভ লাভক।’

॥ ৪ ॥

বাড়ি এসে দুপুর পর্যন্ত বৈরে তারপর ফেলুদাকে আর না জিগ্যেস করে পারলাম না।—

‘কাল যে নরেন বিশ্বাসের ঘ্যাস হেকে একটা সাদা কাগজ বেরোল, তাতে কী লেখা ছিল ?’

নরেন বিশ্বাসের খাতটা ফেলুদা বিকেলে কেন্দ্রত দিতে যাবে। সে অধর নিয়ে জেনেহে যে, ভদ্রলোক পার্ক হস্পিটালে আছেন।

ফেলুদা তার খাতটা খুলে আমার দিকে এন্দিয়ে দিল।

‘যদি এর মানে বার করতে পারিস তা হলে বুঝব মোবেল প্রাইভেট তোর হাতের মুঠাপ্পি।’

খাতার কুল টানা পাতায় লেখা অয়েছে—

B/S 141 SNB for WO Victoria & P.C. (44?)

Re Victoria's letters try MN, OU, GAA, SJ, WN

আছি মনে মনে বললাম, মোবেল প্রাইভেট ফসকে গেল। তাও যুশে বললাম, ‘ভদ্রলোক ফুল্লি ভিট্টোরিয়া সম্ভকে ইন্টারেস্টেড বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ভিট্টোরিয়া আজও পি সি টা কী ঠিক কূঠাতে পারছি না।’

‘পি সি বেব হয় প্রিস কমসট; তার মানে ভিট্টোরিয়ার স্বামী প্রিস অ্যালবার্ট।’

‘আর বিছুই বুবাতে পারছি না।’

‘কেন, কর মানে জন্ম আম টাই মানে কেষ্টা বুর্মাল না ?’

ফেলুদার মেজাজ দেখে বুঝলাম সেও বিশেষ কিছু বোঝেনি। সিদ্ধ জ্যাতীয় কথটা যে আমারও মনে ধরেনি তা নয়। ফেলুদা সত্তাই হয়তো যেখনেন খাস নেই সেখানে জোর করে রহস্য তোতাছে। কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে যাকে কালকের সেই ক্লিন সিগারেটো, আরে

সঙ্গে সঙ্গে পেটের ডিডরটা কেমন হল খালি হয়ে যাচ্ছে। আমরা আহি জেনে কে পালাল পোরছান ঘোকে ? আর বাস্পা দিবে সঙ্গে করে সে সেখানে গিয়েছিলই বা কেন ?

আগে ঘেকেই টিক হিপ মে চারটের সঁয় আমরা নরেন বিখাসের বাগ ফেরত দিতে দাব, আর লালমোহনবাবুই আমাদের এসে নিয়ে আকেন। তাইমাফিক বাড়ির সামনে গাড়ি ধারের শব্দ পেলাম। তত্ত্বালোক ঘরে চুক্তিলেন হাতে একটা পত্রিকা লিয়ে। ‘ক’ বলেছিলুম মশাই ! এই দেশুন বিচিত্রপূর্ব, আর এই দেশুন নরেন বিখাসের লেখা। সঙ্গে একটা হবিও আছে ফনুমেন্টের, যদিও ছাপেনি ভাল।’

‘কিন্তু এও তো সেখাই নরেন্দ্রনাথ বলছে; নরেন্দ্রমোহন তো নয়। তা হলে কি অন্য সোক নাকি ?’

‘আমার মনে হয় ভিজিটিং কার্ডেই গঙ্গোলা। বাস্তু থেসে ছাপানো। আর তত্ত্বালোক হয়তো প্রফুল্ল দেখেননি। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে ওই কাটিৎ আর ভারপুর এই লেখা—ব্যাপারটা হেফ ব্যক্তালীয় বলে উভিয়ে দেওয়া বাবু কি ?’

বেলুন সেখাটার চোখ বুলিয়ে পত্রিকাটা পাশের টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বলল, ‘ভাবা মশ না, তবে নতুন বিশ্ব নেই। এখন জ্ঞান দয়কার এই সোকই গাছ পঢ়ে জন্ম হওয়া নরেন বিখাস কি না।’

পার্ক ইস্পিটালের ডা. শিকদারকে বাবা বেশ ভাল করে চেনেন। আমাদের বাড়িতেও এসেছেন দু-একবার, তাই যেন্দুর সঙ্গেও আসাপ। ফেলুন্ধা কার্ড পাঠানোর মিনিট পাঁচকের মধ্যে আমাদের ডাক পড়ল।

‘কী ব্যাপার ? কোনও নতুন কেস-টেস নাকি ?’

ফেলুন্ধা ঘেঁথানেই যে-কারণেই যাক না কেল, জ্ঞা লোক থাকলে তাকে এ প্রশ্নটা শুনতেই হব।

ও হেসে বলল, ‘আমি এসেছি এখানের এক পেশেন্টকে একটা ডিলিস ফেরত দিতে।’

‘কেন পেশেন্ট ?’

‘ফিল্টার বিখাস। নরেন বিখাস। প্রক্রি— ?’

‘সে তো চলে গেছে ! এই ঘন্টা দু-একে আগে। তার তাই এসেছিল

গাড়ি নিয়ে, নিয়ে গেছে।'

'কিন্তু কাগজে যে লিখল—'

'কী লিখেছে? সিরিয়াস বলে লিখেছে তো? কাগজে ও রকম কনেক লেখে। আস্ত একটা গাছ মাথার পড়লে কি আর সে সেৱক বাঁচে? একটা ছেঁট ডাল, যাকে বলে প্রশ়াখা, তাই পড়েছে। জখমের ক্ষেত্রে শক্টাই বেশি। তান ক্রবিটায় ঢেটি পেয়েছে, মাথায় কটা স্টিচ—ব্যাস এই তো।'

'আপনি কি বলতে পারেন ইনিই পূরনো কলকাতা নিয়ে—'

'ইয়েস। ইনিই। একটা লোক সম্মুখে দোরস্থুনে দেরাদুনি করছে, ন্যাচারেলি কৌতুহল হয়। তিনিইস করতে কলকাতা পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করছেন। তা আমি কলকাতা ডাল সাইন বেহেহেল; নতুন কলকাতাকে বড়টা দূরে সরিয়ে রাখা যায় ততই ভাল।'

'জখমটা স্বাভাবিক ননেই মনে হল?'

'অ্যাছি... পরে আসুন বাবা। একজনে একটা মেয়েন্দা মার্কা পাই হবেছে!'

ফেলুদা: অপ্রস্তুত ভাবটা চাপতে পারল না।

'মানে, উনি নিজেই বললেন যে গাছ পড়ে...?'

'আরে অশাই, গাছটা বে পড়েছে তাতে তো আর ভুল নেই? অম উমি সেখানেই ছিলেন। সম্মেহ করার কোনও ক্ষমতা আছে কি?'

'উনি নিজে অস্বাভাবিক বা সম্মেহজনক কিন্তু বলেননি তো?'

'মোটেই না। বললেন, তোখের সামনে দেখলাম গাছটা ভাঙল— তার ডালপালা মে কলখানি ছড়িয়ে আছে সেটা তো আর অঁচ করা সম্ভব হবলি। তবে হাঁ—ইয়েস—জোন হ্বাব পরে 'উইল' কথাটা দু-তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন। এতে যদি কোনও রহস্য হকে তে জানি না। মনে তো হয় না, কানে উইলের উচ্চে ওই একবারই আম করেননি।'

'তুম্বোকের পুরো নামটা আপনার জানা আছে?'

'কেন, কাগজেই তো বেরিবেছিল। নয়েন্দুনাথ বিশাস।'

'আন্দোলন প্রশ়া—বিজ্ঞ করাই, কিন্তু মনে করবেন না—ওনার পোশাকটা মনে আছে?'

হিলুন্স। শার্ট আৰ প্যান্ট। রংও মনে আছে—সাদু শার্ট আৰ
বিস্তীৰে বাজেৰ প্যান্ট। ম্যান্টে: না, ক্ৰিম ক্ষেকাজ—হোঁ হোঁ?

ফেনুনা ড. শিকদাৰেৰ কথৈ গৱেন বিশ্বাসেৰ ঠিকালা নিষে
নিষেছিল। আমুৱা নাৰ্সিংহোম থেকে সটান চলে গেপাই নিউ
অলিপুৰে। ভৱী আমেলা নিউ অলিপুৰে ঠিকালা খুজে বাব কৰা,
কিন্তু কটায়ুৰ ভৱিভাৱ মশাইটি দেখলাগ কলকাতাৰ রাস্তাঘাট ভাজই
চেনন। বাড়ি বাব কৰতে তিন মিনিটেৰ বেশি ধূৰতে হয়নি।

দেৱলা বাড়ি, দেখে মনে হয় পল্লেৱ থেকে কিম বছৰেৰ মহে
বয়স। গেটেৰ সামনে বাস্তৱ উপৱ একটা কালো অ্যামবাসাইডৰ
দাঁড়িয়ে আছে, আৰ গেটেৰ গাযে দুটো নাম—এন বিশ্বাস ও জি
বিশ্বাস। বেল টিপতে একজন চাকুৰ এসে দৰজা শুলে দিল।

‘নৱেনবাবু আছেন কি?’ ফেনুনা প্ৰশ্ন বাবল।

‘তাৰ তো অসুখ।’

‘দেখা কৰতে পাৰবেন না? একটু দৱকৰ ছিল।’

‘কাকে চাই?’

প্ৰশ্নটা এল চাকুৰেৰ পিছন দিক দিয়ে। এথেজন চঞ্চিল-পঁয়তালিশ
বছৰেৰ ভৰলোক এগিয়ে এসেছেন। ফৱনা রং, চোখ সামান্য কঢ়া,
দাঢ়ি-গৌৰু কামালো। পাজামাৰ উপৱ বুশ শার্ট, তাৰ উপৱ একটা
মাস্কৰ চাদৰ জড়ানো। ফেনুনা বলল, ‘নৱেন বিশ্বাস ইশাই—এৱ একটা
জিনিস তৈকে কেন্দ্ৰ দিতে চাই। ওৱ মানিব্যাগ, পকেট থেকে পড়ে
গেলো পাৰ্ক স্টিট গোৱহানো।’

‘তাই বুঝি? আৰি ওৱ তাই। আপনারা ভিতৰে আসুন। দাদা
বিজ্ঞানী। এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা। কথা বলছেন, তবে এ ব্ৰহ্ম
আঞ্জিলিন্ট...একটা বড় বৰ্কয হৈব তো।...’

দেৱলায় ঘাবৰে মিডিৰ পিছন দিকে একটা বেজুক, ভাতেই
নৱেনবাবু কৰতে আছেন। ভাই-এৱ চেয়ে রং আঁচ দু-পোচ কালো,
ঠোটেৰ উপৱ কেৱ একটা পুৰু গৌৰু, আৰ মাথাৰ ব্যান্ডেজটোৱ নীচে
যে টাক আছে সেটা বলে পিতে হয় লা।

বাঁ হাতে ধৰা স্টেটসম্যান কাগজটা নামিয়ে ভৱলোক ষড় হৈত
কৰে আমদেৱ নমস্কাৱ জামালেন। ভান কৰজিতে ব্যান্ডেজ, ভাই হাত

জোড় করে মঞ্চারে অসুবিধা আছে। ভাইটি আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বেঁটিকে গেলেন। শুল্কার চাকরকে হাঁক দিয়ে আরও দুটো চোরের কথা কলে দিলেন। এ ঘরে রয়েছে একটিমাত্র চেয়ার, খাটের পাশে তেক্কের সরিনে।

ফেনুদা মানিয়াগটা থারে করে এগিয়ে সিঙ্গ।

‘ও হো হো—অনেক ইন্দ্রিয়। আপনি আধাৰ কষ্ট করো...’

‘কষ্ট আৰে কী’—ফেনুদা কিয়ুভূষণ—‘বট্টাচক্রে খোলে শিয়ে প্ৰেক্ষিপাই, আমাৰ এই বজুটি কুড়িয়ে পেলেন, তাই...’

নৱেন্দ্রাব এক হাতেই মানিয়াগেৰ বাপগুলো ঝাঁক কৰে তাৰ ভিতৰে একবার চোখ বুলিয়ে ফেনুদাৰ দিকে ভিঞ্চাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। ‘গোৱহানে...?’

‘আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্ৰশ্নই কৰতে যাইলাম,’ ফেনুদা হেসে বলল, ‘আপনি বোধ হয় প্ৰাচীন কলকাতাৰ ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা কৰছেন?’

ভদ্ৰলোক দীর্ঘস্থাস ফেললেন।

‘কৰছিলাম তো বটেই—কিন্তু যা বা খেলাম। মনে হয় পৰমদেৱ চাইছেন না আমি এ নিয়ে কেশি ঘাঁটাঘাঁটি কৰি।’

‘বিচ্ছিপ্ত কাগজে যে লেখাটা—’

‘ওটা আমাৰই। মনুমেন্ট তো? আমাৰই। আৱও সিখেছি মু-একটা শ্ৰেণী সেৰামে। চাকৰি কৰতাম, গতি বছৰ রিটায়াৰ কৰেছি। কিন্তু তো একটা কৰতে ছৰে। হাত্তি ছিলাম ইতিহাসেৱ। ছেলেবেলা যেকৈই দেদিকটাৰ মৌঁক। কসেজে থাকতে বাগবাজাৰ থেকে হৈটে সমস্য ঘাই কুইভ সাহেবেৰ বাড়ি মেখতে। দেখেছেন? এই সেনিল অবধি ছিল— একজন্যা বাঁজো তাইসেৱ বাড়ি, সামনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিৰ কোট-অফ-অর্মস।’

‘আপনি প্ৰেসিডেন্সিতে পড়েছেন?’

খাটেৰ ভাল পশেই ট্ৰিল, আৱ তাৰ মু হাত উপৱেই দেখালে একটা বাঁধানো ঝুপ জৰিতে শৈথি—

‘Presidency College Alumni Association 1953.’

‘শুধু আমি কেন,’ কলকাতাৰ নৱেন্দ্র বিষ্ণুস, ‘আমাৰ ছেলে, ভাই, বাপ,

ঠাকুরী সবাই প্রেসিডেন্সির ছাত্র। শুটা কেটা ফালিলি ট্রাভিশন। এখন
বলতে লজ্জা করে—আমরা মোনার মেডেল পাওয়া হ্যাত—গিরিন,
অ্যামি, দু জনেই।

‘কেন, লজ্জা কেন?’

কী আর করলুম বলুন জীবনে? আমি গোম চাকরিতে, গিরিন
গেল বাবসায়। কে আর চিনল আমাদের বলুন?’

ফেলুন। এগিয়ে গিয়েছিল ছবিটা দেখতে। এবার তার দৃষ্টি নামল
নীচের সিকে। টেবিলের উপর একটা নীল খাতা। সেটার প্রথম পাতাটা
খোলা রয়েছে, দেখে বোৰা যান্তে একটা লেখা শুক্র হয়ে আট-দশ
শাইনের খেলি এস্যোগনি।

‘আপনার নাম কি নরেন্দ্রনাথ না নরেন্জেমোহন?’

‘আজো?’

ভগ্নপোক বোধহৃত একটু অবাঞ্ছন্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফেলুন
আবার প্রস্তুতি করল। খন্দাক একটু হেসে একটু ফেল অবাক হয়ে
বললেন, ‘নরেন্দ্রনাথ বলেই তো জানি। কেন, আপনার কি সন্দেহ
হচ্ছে?’

‘আপনার ডিজিটিং কার্ডে দেখলাম এন এম পিসাস রয়েছে।’

‘ও হো। ওটা তো ছাপার ভুল। কাউকে কার্ড দেবার আগে শুটা
কলম দিয়ে শুধৰে দিই। অবশ্য নতুন কার্ড ছাপিয়ে নেওয়া উচিত ছিল,
কিন্তু গাফিলতি করে আর করিনি। আর সত্যি বলতে কী, আমাদের
আর ডিজিটিং কার্ডের কী অজোজন বলুন। ইন্সীং বিউজিয়ু-
টিউজিয়মের কর্তা-খাতিসের সঙ্গে একটু দেখা-চেখা করতে হচ্ছিল
তাই কাগে কয়েকটা ভরে নিয়েছিলাম। ভাল কথা—আপনিও কি ওই
গোরঙ্গন নিয়ে লিখকেন-টিখকেন নাকি? অশী করি না। আপনার মতো
ইংং গ্রাইভ্যাপের সঙ্গে কিন্তু পেরে উঠব না।’

ফেলুন যাবার জন্য উঠে পড়ে বলল, ‘আমি লিখি-টিখি না—তবু
জেনেই আমন্ত্রণ। ভাল কথা—একটা অনুরোধ আছে। পুরনো কপাকাতা
নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে যদি গভ-উইন পরিবারের কেন্দ্র উচ্চাখ
পান তা হলে অনুহৃত করে জানানে উপকার হবে।’

‘গভ-উইন পরিবার?’

‘চীমাস পড়তেইনের সমাধি পার্ক প্রিট গোরস্থানে রাখেছে। ইন ফ্লাট, একই গাছ একসঙ্গে আপনাকে এবং পড়তেইনের সমাধিকে ঝুঁত করেছে।’

‘তাই গুণি?’

‘আর সার্কুলার রোড গোরস্থানে পড়তেইন পরিবারের আরও পঁচিটা সমাধি রয়েছে।’

‘অবিশ্বিত জানাব। কিন্তু কেথার জানাব? আপনার টিকামাটি?’

ফেলুন্দা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন সেখা কাউটা নরেনবাবুর হাতে ঢুলে দিল।

‘এই আপনার পেশা নাকি? গোয়েন্দাগিরি?’ ভদ্রলোক বেশ একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘কস্কান্তায় আইভেট ডিটেকটিভ আছে বলে শনেছি, কিন্তু তোরে দেখলাম এই প্রথম।’

॥ ৫ ॥

‘তুমি ডিস্ট্রোগিয়ার কথাটা জিজেস কল্পলে না কেন?’ আমি ফেলুন্দাকে জিজেস করলাম গাড়িতে চৌরঙ্গীর দিকে যেতে বেতে। আজ লালমোহনবাবু ধরেছেন ঝুঁকড়ে শিয়েই চা-স্যান্ডউচ খাওয়াবেন। কে জানত যে এই ঝুঁকড়ে শিয়েই উচ্চার মোড় শুরু যাবে।

ফেলুন্দা বলল, ‘তার ব্যাপের কাগজপত্র আমি ঘীটাঘীটি করেছি সেটা জানলে কি ভদ্রলোক খুব খুশি হতেন? আর লেখাটা সাংকেতিক ন হোক, সংক্ষিপ্ত ভাবায় তে বটেই। যদি কোনও গোপনীয় ব্যাপার হয়ে থাকে?’

‘তা বটে।’

লালমোহনবাবুর একটু ভাবুক থাপে ধরে হচ্ছিল। ফেলুন্দাও সেটা লক্ষ করেছে। বলল, ‘আপনার চোখে উদাস দৃষ্টি কেন?’

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘস্থাস কেনে বললেন, ‘পুলক হেকরার জন্য

একটা ভাল প্রটি কৌদেহিলুব। নির্বাচ আবার ছিট হও—তা সে আজ
লিখেছে হিনি হবিতে নাকি প্রিল আর ফাইটিং-এর বাজারে মন্দ।
সবাই নাকি ভঙ্গিমূলক ছবি চায়। জয় সভেবী মা সুপারহিট হবার
ফলে নাকি এই হাল। খেবে দেখুন।'

'তা আপনার মুশকিলটা কোথায়। ভঙ্গিভাব জাপছে না মনে?'

লালমোহনবাবু কথাটার উপর দেবারও প্রয়োগেন বোধ করলেন না।
কেবল ভীষণ একটা অভিভিত ভাব করে দুবার 'হেল' 'হেল' বলে চুপ
করে গোলেন। হেল বলার কারণ অবিশ্বাস পুরুক ঘোষালের চিঠি ময়।
অমরা বিড়লা প্লানেটেরিয়াম ছাড়িয়ে টেরনীতে পড়েছি; বাঁয়ো মাটির
পাহাড় ময়দানটাকে আড়াল করে দিয়েছে। লালমোহনবাবু কিছুদিন
থেকে পাতাল রেল না বলে হেল রেল বলছেন।

গাড়ি ক্রমাগত গাড়ভায় পড়ছে আর লালমোহনবাবু শিউরে শিউরে
উঠছেন। বললেন, 'ত্রিং যতটা খায়াপ ভাবছেন ততটা নয়। চলুন রেড
রোড দিয়ে, দেখবেন গাড়ির কেনও দোব নেই।'

'তাও তো এখন আস্তা পাবশ,' বলল মেলুনা, 'দুশ্মা বছর আগে এ
রাজা হিল গেয়ো কাঁস। কাঁসা করে দেখুন।'

'তখন তো আর আস্বাসাগুর চলত না। আর এত তিফও হিল না।'

'তিফ হিল, তবে সে মানুষের নয়, হাড়গিলের।'

'হাড়গিলে?'

'সাড়ে চার খুট লজ্জা পাবি। রাজায় ময়লা খুঁটে খুঁটে খেত। এখন
যেমন দেবছেন কাক চতুর, তখন হিল হাড়গিলে। গঙ্গার জলে মড়া
ভেসে যেত, তার উপর চেপে দিয়ি মোসকুর করত।'

'জঁসী জায়সা হিল বলুন। যীভৎস। ভয়াবহ।'

'তারই মধ্যে হিল জাতের বাড়ি, সেন্ট জনস চার্চ, পার্ক স্ট্রিটের
গোরহান, পিটেটার রোডের হিয়েটার, আর আবও কত সাহেব-
সুবোদের বাড়ি। এ অঞ্চলটাকে বলত হোয়াইট টাউন—এলিকে
নেটিউনের নো-পার্সা, আর উপর কলকাতা হিল ব্র্যাফ টাউন।'

'গায়ের রক্ত পরৱ হয়ে বাছে ঘলাই।'

পার্ক স্ট্রিটে এসে মোড় শুরু হু-ফঙ্গের অপেই ফেলুনা গাড়ি খামাতে
কলাম।—'একবার বইয়ের দেৰানে ইঁ মারতে ইবে।'

ওক্সফোর্ড বুক কোম্পানি সম্পর্কে লালমোহনবাবুর বেনাং উৎসাহ রয়েছে, কামন এখানে রহস্য নোমান সিরিজের বই বিক্রি হয় না। এলকেন, 'আমাদের কলেজ স্ট্রিট আর শাসিগঞ্জের ক্লাবসুকশন হৈচে গাকুক।'

ফেলুদা দোকানে চুকে এদিক ঘুরে একটা কাউন্টারের সামনে পিয়ে দাঁকাল। সামনে থেরে থেরে সাজানো রয়েছে মীল আর লাল খাতা, ফাইল, ডাইরি, এনজেজমেন্ট প্যাড। একটা লীল খাতা হাতে দুলে দাগচা দেখে নিল। বারো-পঞ্চাশ। ঠিক এন্টকম খাতা হিস লরেন বিশ্বাসের টেবিলে।

ইয়েস ?

দোকানের একজন সোক এগিয়ে এসেছে ফেলুদার দিকে।

‘কুইল ডিস্ট্রিবিউটর কোম্পানি চিত্রি কাপেকশন আছে আপনাদের এখানে ?’

‘কুইল ডিস্ট্রিবিউট ? নো সাবু। তবে আপনি প্রকাশকের নাম বলতে পারলে আমরা অনিয়ে দিতে পারি। বলি ম্যাকগিল বা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হয় তা হলে এসের কলকাতার আপিসে খোঁজ করে দেখতে পারি।’

ফেলুদা কই হেন ভাবল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে। আবি খোঁজ করে আপনাদের জানাব।’

আমরা পার্ক স্ট্রিটে বেরিয়ে এলাম। গাড়িটা এগিয়ে ঝু-ফুরের সামনে পিয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা হেটে এসেতে লাগলাম।

‘একটু দাঁড়া !’—ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করেছে—‘ভিড়ের মধ্যে হাঁটিতে হাঁটিতে পড়া যায় না।’

কয়েক মেকেন্ট খাতায় চোখ বুলিয়েই ফেলুদা আবার হাঁটিতে শুরু করল। ‘কিন্তু পেঙ্গে ?’ আমি জিদ্দেস্ব করলাম। জবর এল: ‘আসে ঝু-ফুরে পিয়ে বসি।’

প্রেস্টারাষ্টে বসে তানা গেল ঝু-ফুর নামটা ভাল লাগে বলেই শালমোহনবাবু আমাদের এখানে এনেছেন। নিজে এব আগে কখনও আসেননি। এমনকী পার্ক স্ট্রিটের কেন্দ্র প্রেস্টারাষ্টেই আসেননি।—‘আবি সেই গড়পারো। পার্সিশার কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়, এ ভোটে

খেতে আসার মন্তব্য বা কোথার আর দরবারাই বা কী ?'

চা আর স্যান্ডউইচ অর্ডার দেবার পর ফেলুন পাতাটা অবার ধার করে টেবিলের উপর রাখল। তারপর সেই পাতাটা থেকে বলল, 'প্রথম অঙ্গুলিটা এখনও রহস্যাবৃত। বিত্তীটা করছা করে ফেলেছি। এগুলো সব লিমেনি প্রক্রিয়াকরণ নাম।'

'কোন গুলো ?' জিগোস করলাম আরি।

'MM, OU, GAA, SJ আর WN হল ইঞ্জিনের মাক্রিলন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অর্ড আলেন আর্যান্ড আনডউইন, সিঙ্গার অ্যান্ড জ্যাকসন, ওয়াইডেনফেল্ড অ্যান্ড নিকলসন।'

'আপনের বাপ', বললেন জটায়ু, 'আপনার জিহ্বার অয় হোক। এতগুলো ইংরিজি নাম হেঁচে না দেয়ে একপ্রারম্ভে আউডে গেলেন কী করে যশাই ?'

'গোবাই থাক্কে তত্ত্বাবক এইসব প্রকল্পারদের চিঠি লিখতেন বা লিখছেন, ভিট্টোরিয়ার চিঠির সংকলন সম্বন্ধে খেঁজে করে। অথচ মজা এই যে, এত না করে প্রিচিন কাউন্সিল বা ন্যাশনাল সাইবেরিয়েটে গিয়ে ভিট্টোরিয়ার চিঠি পড়ে আসা তের সহজ ছিস।'

'এ যেন মাথার পিছন দিয়ে হাত ধুরিয়ে নাক দেখানো', মজবু করলেন জটায়ু।

ফেলুন পাতাটা পুরে স্যান্ডউইচের জায়গা করে দিয়ে একটা চাবলিনাৰ ধৰাল। লালমোহনবাবু টেবিলের উপর তাল টুকে একটা বিলিতি ধৰ্চের সুরেৱ এক লাইন শুন করে বললেন, 'চলুন কোথাও বেরিয়ে পড়ি শহৰের বাইরে। বাইরে গেলেই দেখিচি আপনার কেসও জ্ঞোটে, আমার গরও জ্ঞোটে। কোথার যাওয়া যায় বলুন তো ! বেশ কুকু জায়গা হওয়া চাই। সমতল শস্যশামল আয়োশি তেক্তে মিহিনে পরিবেশ হলে চলবে না। বেশ একটা—'

স্যান্ডউইচের জ্ঞে এসে পড়ার আৰ কথা এগোল না। আমাদেৱ তিনজনেই খিদে পেয়েছিল বেশ জয়ৱ। একসঙ্গে দু জোড়া স্যান্ডউইচে একটা বিশাল কামড় দিয়ে তিনবাৰ চোয়াল খেলিয়েই লালমোহনবাবু কেন জানি ধৰকে গেলেন। তারপৰ গেল গোল চোখ করে দু বার পৰ পৰ 'ইখৰেৱ কথ...ইখৰেৱ কথ' বললেন, যাব ফলে

মুগ থেকে কয়েকটি ফটিখ টুকরো ছিটকে বেরিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল।

কল্পারটা হল এই অমি আর ফেলুদা রাজাৰ দিকে মুখ করে বসেছিলাব। আৱ লালমোহনবাবুৰ মুখ ছিল রেস্টোৱান্টেৰ পিছন দিকটাখ। ঘৰেৱ শেষ মাথায় একটা লিচু প্ল্যাটফর্ম, দেখেই বোৱা ধাখ সেখনেৱ রাতে বাজনা বাজে। সেখানে একটা সাইনবোর্ড দেখেই জটায়ুৰ এই স্মৃতি। তাতে রায়েছে এই বাজনাৰ দলেৱ নাম, আৱ নমেৱ ঠিক কল্পায় সেখা—‘সিটার—কিস গডউইন।’

ফেলুদা হাত থেকে স্যান্ডউইচ নাচিয়ে একটা বেমারাকে তুঢ়ি দিবে কাছে ভাকল।

‘ওখানে ভিনারেৱ সময় বাজনা বাজে?’

‘হ’ বাবু, বাজনা হাব।’

‘তোমাদেৱ ম্যানেজাৰেৱ সঙ্গে একটু কথা বলতে পাৰি?’

কিস গডউইনেৰ ঠিকানা কোগাড় কৰাই ফেলুদাৰ উদ্দেশ্য। আৱ তাৰ কল্প একটা জুতসই অজুহাতও ৱেডি করে দোখেছিল। ম্যানেজাৰ আসতে কলল, ‘বালিগঞ্জ পাৰ্কেৰ মিস্টাৱ মানসুখানিয় বাড়িতে বিয়েৰ ঘণ্য একটা ভাল বাজিয়ে গ্ৰহ চাই। আপনাদেৱ এখানেৱ দলটাৰ মুখ নাম কৰেছি—তাৱা কি বিয়েতে ভাঙ্গ খাটবে?’

‘হোয়াই নট? এটাই তো তাদেৱ পেশা।’

‘ওই বে গডউইন লাগটা দেৰছি, কুই বোধ হয় লিভাৰ? ওৱ ঠিকনাটা বলি...’

ম্যানেজাৰ একটা স্লিপে ঠিকনাটা লিখে ফেলুদাকে এনে দিলেন। দেখলাম লেখা আছে—১৪/১ রিপন সেল।

অন্য স্লিপ হলো গঞ্জ-টল করে চা-স্যান্ডউইচ খেতে যাবটা সময় লগত, আজ অবিশ্বিত তাৱ কেৱে অনেক কম আগল। ফেলুদাৰ খিদে মিটে গোছে দে একটাৰ বেশি বেল না। লালমোহনবাবু অসংৰ পিছড়ে আৱ এমাৰ্কিৰ সঙ্গে ফেলুদাৰ দুটো আৱ নিজেৰ তিনটে খেয়ে ফেলে বললেন, ‘পায়সা যখন পুৱো দেৱ তখন আবাৰ ফেলা যাব কেন মশাই?’

ফোটিন বাই ওয়ান রিপন লেনেৱ বহিৱেটা দেখে মনটা দয়ে থাওয়া

বাভুবিক— কারণ সান্দত অলিল নবাবির কথা এখনও ঝুলতে পারিনি। কিন্তু ফেলুদা বলল, এতে আশ্চর্ষ হনার কিছু নেই। চায়-পাঁচ পুরুষের বাবধানে একটা পরিধান যে কোথা থেকে কেখায় নাহতে পারে তার কেন্দ্র সিমিট নেই। অবিশ্বিত বড়িজলো যে কুব ছেট তা নয়, সবই তিনজলা চারজলা, কিন্তু কেনপটারই বাইরেও দেশে ভিতরে চুকতে ইস্তে করে না। লালমোহনবাবু বললেন যে, বোঝাই যাচ্ছে এর অতোকটাই হানাবাড়ি। যাই হোক, তোমার আগে পাশেই একটা পান-বিক্রিগোলাকে ফেলুদা জিজ্ঞেস করে নিল।

‘ইরে কোঠিমে পড়উইন সাহাব বেলকে কোই রহতা হ্যাব?’

‘ওডিন সাহাব? জো বাজা বাজাতা হ্যায়?’

‘সে ছাড়া আরও আছে নাকি?’

‘শুচজা সাহাব তি হ্যায়। মার্কিস সাহাব। মার্কিস ওডিন।’

‘কোন কলায় থাকেন সাহেব?’

‘দো তল্লা। তিন তলায়ে আর্কিস সাহাব।’

‘আর্কিস-মার্কিস দুই ভাই নাকি বাবা?’ প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

‘নেহি বাবু। আর্কিস সাহাব আর্কিস সাহাব, মার্কিস সাহাব ওডিন সাহাব—দো তলায়ে মার্কিস সাহাব, তিন তলায়ে...’

ফেলুদা আর্কিস-মার্কিসের বামেলা ছেড়ে ইতিমধ্যে চোদ বই একে চুকে পড়েছে। আপরাও দুয়ো বলে তার পিছন পিছন চুকলায়।

যা ভেবেছিলাম তাই। ভিতরে বাইরে কেন্দ্র তফাত নেই। অন্ম মাসের দিন বড় বলে এই সাড়ে ছাঁটার সময়ও বাইরে আলো রয়েছে, কিন্তু ভিতরে পিড়ির কাছটায় একেবারে হিশমিলে অঙ্ককার। ফেলুদার একটা অঙ্কুত ক্ষমতা আছে—হয়তো ওর চোখটাই ওইভাবে তৈরি—অঙ্ককারে সাধারণ লোকের চেয়ে ও অনেক বেশি দেখতে পায়। ওর তরঙ্গিনীয়ে সিডি ওঠা নেশে লালমোহনবাবু রেলিংটাকে খাম্চ ধরে কোনওরকমে উঠতে উঠতে বললেন, ‘ক্যাট-বাগলার ইয়ে জানতুম মশাই, ক্যাট-গোয়েলা এই প্রথম দেবলুম।’

দোতলা থামথমে। একটা স্বীণ দাঙ্গনার শব্দ শোনা যাচ্ছে, বোধহয় কেন্দ্র বেডিং থেকে আসছে। সিডির মুখে একটা দরজা, তার পিছনে

গীরান্দা, তাতে আপো না জলসেও বাইরেটা খেলা বলে খানিকটা বিশেষ খেলো এসে পড়ে বারান্দার ভাঙ্গা-কাটের টুকরো বসানো যেখেন্টাকে বুবিয়ে দিছে: আমাদের বাইরের দরজা দিয়ে যে ঘরটা দেখ যাচ্ছে তাতে কেউ নেই, কারণ বাতি ব্লাঙ্গে না। ভিতরে বারান্দার বা দিকে একটা ঘর আছে বুবাতে পারছি, কারণ সেই ঘর খেকেই কে চিপতে আসো এসে বারান্দার একটা কোণে পড়েছে। একটা বালো কেড়ে সেই কালোর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে অবস্থাটে আমাদের দেখছে। তিনজনা বেকে পুরুষের গলার শব্দ পাই মাঝে আবে। একবার যেন একটা ঘংঘং কাশির শব্দও পেলাম।

‘বাড়ি চলুন’, বললেন জটারু। ‘এ হল রিপন লেনের গোরস্তান।’

হেঁসুদণ বারান্দার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

‘কোই হ্যাঁ?’

কয়েক সেকেন্ড কেনার শব্দ দেই, তামপর উত্তর এল——‘বৈন হাঁ হাঁ?’

হেলুদা ইচ্ছিত করছে, এমন সময় আবার কথা এল, এবার বেশ বড় অবৃ।

‘অলুর আইডে!—আই কাটি কাষ আস্টি।’

‘ভেতরে যাবেন, না বাড়ি যাবেন।’

হেলুদা জালমোহনদাবুর প্রান্ত অবাহ্য বদলে ঢোকাত পেরিয়ে এসিয়ে পেল। ও দুড়ি, আশরা স্যাজ, একেবৈকে এগোলাম দু জনে পিছল পিছন।

‘কাম ইন,’ হকুম এলো বায়ে ঘরের ভিতর থেকে।

॥ ৬ ॥

তিনজনে দৃঢ়লাই ভিতরে। একটা ঘায়ারি সাইজের বৈঠকখানা। দরজার উলটো দিকে একটা সোফ, তার কাপড়ের ঢাকনির তিন জাফগায় ফুটো দিয়ে নারকেলের ছেবড়া বেরিয়ে আছে। সোফের সামন একটা হেডপাথরের টেবিল,—এখন ষেত বলজে কুল হবে, কিন্তু এককালে তাই ছিল। বায়ে একটা কালো প্রফীল বুক কেস, তাতে



গোটা পনেরো প্রাচীন বই। বুক কোসের মাঝার একটা পিলের প্লেসান্টিকে ধূমো জমা প্লাস্টিকের ফুল, সে ধূমের রং বোবে কির পাধি। দেয়ালে একটা বাঁধানো ছবি, সেটা ধোঢ়াও হতে পারে, রেলগাড়িও হতে পারে, এত ধূমো জমেছে তার কাছে। যে ক্লিপস রেডিওটা সোফার পাশের টেবিলের উপর রাখা রয়েছে, সেটার খড়ে নিষাঙ ফেলুদার জন্মেরও আগের। অস্তর্ব এই যে সেটা এখনও চলে, কারণ সেটা থেকেই গানের শব্দ আসছিল। এখন একটা শিরা-বার-করা কাকাসে হাত নব ধূরিয়ে পালটা বক্ষ করে দিল। ধার হাত, তিনি সোফার এক কোণে একটা তুশন কোনো নিয়ে বাঁ পা-টা একটা মোড়ার উপর কুল দিয়ে বসে ঘিটঘিট করে আমাদের দিকে চাইছেন। এর শরীরে যে সাহেবের রক্ত আছে সেটা চামড়ার রং থেকে বোকা যাব, আর চুলের ঘেটুকু পাকা নব তার রং কটা। চোখটা যে বীরকুম সেটা বুঝতে পারছি না, কারণ হাত থেকে ঘোলামো যে বাতিটা কুলহে সেটার প্যান্ডার পঁচিশের বেশি নয়।

‘আমি গাড়িটো ভুগছি, তাই চলাকেরা করতে পারি না’, ইংরিজিতে বললেন সাহেব। ‘আই হ্যাভ টু চেক দ্য হেল্প অফ মাই সাইভেন্ট। সে শয়োরটা আবার ফাঁস পেলেই স্টকায়।’

ফেলুদা এবার পরিচয়ের ব্যাপারটা সেবে মিল। ভদ্রলোক আমরা আসাতে থিবাত হলেও সেটা এখনও প্রকাশ করেননি। ফেলুদা কাজের কথায় চলে গেল।

‘আমি শুধু একটা যবর জনতে এসেছি। আপনি কি টমাস গডউইনের বংশধর—যিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন?’

সাহেব মাথাটি আর একটু কুলালেন। এবারে কুকুলায় তার চেখের রং ঘোলাটে নীপ। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, ‘নাউ হ্যাও দ্য হেল্প ডিপ্ট ইন্ড সো আবাস্তি মাই হেট গ্রাউকামার?’

‘তাহলে আমার অনুমান ঠিক?’

‘শুধু তাই নয়; আমার কাছে যমন একটা জিনিস আছে যেটা ঘোল টমাস গডউইনের সম্পত্তি। অস্তত আমার ঠাকুরা তাই বলতেন।

দেখপো বছরের—ও হেল !

‘কী হেল ?’

‘দ্যাট স্টেডিয়ুন আরক্সি—টক, জোকার : কালই রাত্রে ওটা
চেহে লিয়ে গোছে। বলেছে আজ ফেরত দেবো। আজই ওদের মিটিং
বসবে। আজ বিশুদ্ধবার গো ? একটু পরেই ক্ষমতে পাবে মাথার উপরে
সব উন্নতি আওয়াজ।’

মাথাটা শুলিয়ে বাছে বলেই বোধহীন দুটা আরও অন্ধকার
লাগছে। কিংবা হংসতে সত্তি করেই রাত হয়ে আসছে। না, মেঘ
ডাকল। আকাশে মেঘ করেছে, তাই অন্ধকার।

ফেলুন্দা মি. গডফোর্ডের সামনে একটা হাতলভাঙা চেষ্টারে বসেছে।
তার ডান পাশে আরো কেদারায় জটাই। আরাম খুব হচ্ছে না, কারণ
উশপূর্বে তাব দেখে মনে হয় হারপোকার কামড় খাচ্ছে। আমি
বসেছি বাঁরে একটা চেষ্টারে। ফেলুন্দা চেয়ে আছে একদৃষ্টি সাহেবের
পিকে, ভাবটা—তুমি যা কলতে চাও বলো, আমি কলতে এসেছি।

‘ইটিস আম অইভরি কাসকেট,’ বললেন মি. গডফোর্ড। ‘ভেতরেও
জিনিস আছে। দুটো পুরনো পাইপ, একটা রুপোর নিয়ির কৌটো,
একটা চশমা, আর সিকে মোড়া একটা প্যাকেট। ভেতরে বহুতই আছে
বলে মনে হয়; কেমনগুলি খুলিনি। আরও সব হিল বাক্সিতে পুরনো
জিনিস; আমর বাউল্যে ছেলেটা সব বেচে দিয়েছে। পড়াশুনোয়
জলাখলি দিয়ে গাঁজা ধরল, আর তারপরেই ঘর থেকে এটা ওটা
সরিয়ে বেলতে শুরু করল। বাইরটা যে কেন সেয়েনি জানি না। হয়তো
বিত; ক্ষপাল কিরে গেল তাই মেবার দরকার হয়নি। বাজলার দল
করেছে একটা। তার বোকগারেই চলছে একন—যদি চলা বলো
ঝটাকে। ছেলেকে আর দোষ দিই কী করে ? আমারই কি কম দোষ ?
শুনেছি উম গডফোর্ড জুয়ো খেলে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন। আমারও
তাই।...’

ক্ষমতাক একটু থামসেন। হাঁপাচ্ছেন। বোধহীন একটামা এত কথা
বলে। বাজের ঘন্টাতেই বোধ হয় একবার মুখটা বেঁকে গেল। তারপর
আবার কথা।

‘একবার বিলোভ গিয়েছিলাম ইয়ঁ বয়লে। হেট কাক্ষ ছিল মাঝলে,

মিডলাংশ ব্যাটে কাশিয়ারি করত। তিনি মাসের বেশি থাকতে পারিনি। শীত সহ্য হয়নি। খনা সহ্য হয়নি। ভাল-ভাবের অভ্যেস। কিন্তু ক্লোচ ফ্যানকাটি। বিয়ে করলাগ। এটি অরেক্ষে দশ বছর আগে। এখন আছে কিন্টোফর। মুর দেখি সিলে একটিবার হয়তো; কী তাও না। পাশের ধরে বসে পিটারে টাঁ ট্যাঁ করে। হাত ভাল।

মাথার উপরে পঞ্জিই একটা অস্তুত আওয়াজ শুন গয়োছ। খটি খটি—খটি খটি। হচ্ছে আবার প্রমত্তে, ঘরের ছায়াগুলো দুলতে আবগ খটি খটির সাথে সিলিং-এর বাতিটা দুলতে আরম্ভ করোছে। এখন আর শব্দ লালমোহনবাবু না; আমারই ভয় করছে। এ রকম ঝাঁঁকিতে, এ রকম ঘরে কখনও আসিনি, এরকম মনুষের মুখে এ রকম কথা কখনও শনিনি। কী ব্যাপার হচ্ছে ওপরের ঘরে?

গড়উইন সাহেব ওপরে না তাকিয়োই বললেন, 'টেবিলটা লাফাছে। চার ব্যাটা ভও টেবিলটাকে ঘিরে বসেছে। বলে মরা শোকের আশ্চর্য ওয়া, আর যেই সে আশ্চর্য আসে অমনি টেবিলটা ছটফট করতে শুরু করে।'

'ওয়া কাহা?' ফেলুন প্রশ্ন করল।

'অ্যারাকিসের দল। প্রেতচর্চা সমিতি। পুটো ইহসি, একটা পার্শ, আর অ্যারাকিস। আমকে দলে টানতে চেয়েছিল, আরি বাইনি। একদিন অ্যারাকিসের কাছে ট্রাম গড়উইনের কথা বক্সেছিলাম। বললে, তোমকে তার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব। আরি কলসাম—নো, সার্টেন্সি নট। আঝ বাসে কাল এফনিতেই তার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর বয়লে এসে বললে—'

ভ্রুলোক থামলেন। খটি খটি খটি। আবার টেবিল লাফাছে।

'কিন্তু বাক্টা কেন নিল আপনার কাছ থেকে?' এর করলী যেখুন। 'সেটাই তো বলছি। বললে, আমরা তোমকে ছাড়াই গড়উইনের আশ্চর্য নামাব। তার নিখের জিনিস কিন্তু ধোকালে দাও, সেটা টেবিলের শুরুর রাখলে আক্ষা সহজে নামবে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে তিনি মেঘেছেন।'

খটি খটি খটি...আবার টেবিল লাফাল।

'ব্যাপারটা কি অস্তুতারে হয়?' ফেলুন জিজেস করল।

‘সব বৃক্ষকিংবা তো অঙ্কারে হব।’—গড়উইনের গলার হৰে
বিহুপ।

‘একবার উপরে যাওয়া যায়?’

লালমোহনবাবু প্রথমটা শুনেই চোরের হাতল খামকে তৌর আপন্তি
জানিয়ে দিয়েছিলেন। গড়উইন সাহেবের উভয়ে তিনি অনেকটা
আৰম্ভ হলেন।

‘ও হৰে তোমার চুক্তে দেখে না।’ বলসেন মি. গড়উইন। কৰ
মেৰবারাম শুনলি। ওৱা চুক্তিৰ পাহারা দেও। তলে কেউ যদি কাকুৰ
আঘাত নামাতে চায় ওদেৱ সাহায্যে, তো সে আলাদা কথা। আগাম বিশ
টাকা, আঘাত নামলে আৱণ একশো।’

‘আই সি...’

ফেলুদা উঠে পড়ল। ‘আচ্ছা, স্টোর গড়উইন। অনেক ধনবাদ।
আপনাকে বিৰস্ত কৰে দেলাম, কিন্তু মনে কৰবেন না।’

‘শুভ মাহিটা।’

গড়উইন সাহেবের শীৰ্ণ হাত আবার রেজিপ্রে দিকে চলে গোল।

ল্যাভিং-এ এসে ফেলুদা যেটা কুল সেটা আমাকে হৃষকিকে দিল,
লালমোহনবাবুৰ যে কী দশা হল সেটা অঙ্কারে বুৰাতে পারলাম না।
ফেলুদা নীচে না শিরে সটোন তিনতলাৰ উভয়ে দিল।

‘আপ-ডাউন শুলিয়ে কেলাশেন নাকি?’ বাস্তুভাবে প্রশ্ন কৰাকে
জটায়। উভয়ে এল, ‘চলে আসুন, দ্বাৰকালৈন না।’

উপরে উঠেই সামনে শুঙ্গি পৱা দারোয়ান।

‘আপ কিসকো মাংতে হ্যায়?’

‘আমি শুধু তোমার প্ৰয়োজন মেটাতে এসেছি ভাই।’

ফেলুদা আৱাকিস সাহেবের দারোয়ানেৰ দিকে একটা পাঁচ টাকার
নোট এগিয়ে দিয়েছে। সোকটা খতমত। ফেলুদা তার কানেৰ কাছে
মুখ নিয়ে কুল, ‘তোমার মনিব যে ঘৰে বসেছেৰ সেটা এখন চারদিক
থেকে বন্ধ বিলা সেটা আসে বলো।’

ওবুধ ধৰেছে কোধুৰ। চাকুৰ বলল বাদ্যলায় দিক থেকে বন্ধ, কিন্তু
শোবাৰ ঘৰ দিয়ে দৱজা আছে দেকাৰ; সেটা খোল।

‘তোমার কোনো চিজা নেই—কিন্তু কৱাতে হবে না—শুধু

একসরাতে শোবার ধর্টা দেবিতে দাও। নইলে লিপ্ত হবে। আমরা পুলিশের সোক: ইনি দারোগা।'

লালমোহনবাবু পায়ের পুড়ো আঙুলে দাঢ়িয়ে হাতটা রেট করে দু ইঁরি পাড়িয়ে নিলেন। এ জান্সিং-এ বাতি আছে। ফেলুমা সোক্স আর একটু এগিয়ে একেবারে দারোগানোর হাতের তেলগোড়ে টেকিয়ে দিল। তেলেটী আপনি থেকেই নেটের উপর মুঠো হয়ে গেল।

‘আইয়ে— সেকিন...’

‘নেকিন-টেকিন ছাড়ো ভাই! তোমর মনিবের বকুনের একজনের উপর পুলিশের সন্দেহ ভাই যাত্যা দরকার। তেমার সাহেবের বা তেমার কিছু হবে না।’

‘জাইয়ে।’

শোবার ঘর অঞ্চলের আর তার একটা খোলা পরাজান ওদিলে যে ঘর, সেও অস্তকার। আমরা তিনজনে সেই দরজাটির দিকে এগিয়ে গেলাম।

প্যানচেটের বর থেকে এখন কেবলও শব্দ নেই। তবে একটু আগে পর পর তিনবার টেবিলের পায়ের শব্দ পেয়েছি। বুকাত পারছি ভৃত নামনের ক্লাবের সদস্যরা সব দম বজ করে টমাস গড়ড়ইনের আস্থার জন্য অপেক্ষা করারেম। লালমোহনবাবু এত জোরে আর এত ছক্ত নিখনস ফেলছেন যে তাই ইছে তাতেই পাশের ঘরের সবাই আমদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। ফেলুমা ইতিমধ্যে বেষ্টহয় দরজার আরও কাছে এগিয়ে গেছে। কোথেকে যেন কেরোসিন তেজের গুরু আসছে। একবার খুলাব একটা বেজান মাও করল। বোধহয় পোতলার সেই কাশো হলোটী।

ট—মাস গড়ড়ইন। ট—মাস গড়ড়ইন।’

গোঙ্গনির মতো খয়ে নামটা দু বার উচ্ছারিত হল। বুখসাম এইভাবেই এরা আস্থাকে ডাকে।

‘আর ইউ উইথ আস? আর ইউ উইথ আস?’

কোনও সংজ্ঞা নেই, কেনও শব্দ নেই। আর আধ মিনিট হয়ে গেল। তারপর আবার সেই কাতর প্রশ্ন—

‘টোম গড়ড়ইন...আর ইউ উইথ আস?’



ইয়ে—স। ইয়ে—স।

আবার স্তন পাশেও পারা টক টক করে কাঁপছে। ফৈরিলের নতুন মানুষের। লালমোহনবাবুর হাত।

‘ইয়েস। আই হাত করে আই অ্যাম হিয়ার।’

‘হিয়ার’ বলতেও মনে হয় বহু দূর থেকে আসছে গলার শব্দ।

গ্লানচেটের দল আবার প্রশ্ন করল।

‘তুমি কি সুখে আছ? শান্তিতে আছ?’

উত্তর এস্লো—‘নো—ও।’

‘কী দুঃখ তোমার?’

‘আই...আই...আই...ওয়েট মাই...আই ওয়েন্ট মাই...কাসকেট।’

এর পরেই একসঙ্গে কতকগুলো অঙ্গুত ব্যাপার। পাশের ঘর থেকে এক ডরাবহ চিংকার, আতঙ্কের শ্বে অবস্থায় যেটা হয়—আর পর মুক্তেই আমার হাতে একটা হাঁচকা টান আর কানের কাছে কিসিফিস—‘চলে আয়, তোপসে।’

আয়ারাকিসের চাকর আমাদের তিনজনকে ছুটে বেরোতে দেখে দেন আরও হতভুব হয়ে কিছুই করল না। এক মিনিটের মধ্যে তিনজনে বিপন্ন লেন পেরিয়ে রয়েড ক্রিটে রাখা আমাদের গাড়িটার দিকে এগোতে লাগলাম। ‘এ এক খেল দেখালেন মশাই,’ বললেন লালমোহনবাবু। ‘এ কিমিস কিম্বে দেখালে সুশায়াছিট।’

লালমোহনবাবুর ভালিফের কারণ আর কিছুই না; ফেলুদার হাতে এসে গেছে সাল্ট আসিয়া দেওয়া টেবিল গভড়ইসের আইভরি কাসকেট।

॥ ৭ ॥

পরবর্তী সকাল। ফেলুদা নিজেই আমাকে তার ঘরে ভেকে পাঠিয়েছে। কাল রাত্রে লালমোহনবাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে হাবার

পৰি আধ হল্টীৰ মধ্যে আল-বাওয়া সেৱে ফেলুন্দা তাৰ ধৰে ঢুকে দৰজা
বন্ধ কৰে দিয়েছিল। সত্যি বসতে কী, রান্না আমাৰ ভাল কৰে খুমই
হৈলি। বেশ বুবতে পাৰছি যে আমৰা একটা অশুর বুকু পাঁচালো
ৱহন্তের জানে ভাঙিয়ে পড়েছি। এ গোলকধীৰার কথে পথনৌ-এৱ
ভুলভুলাইয়া হাত মেলি যায়। কেন দিকে কেন রাত্তায় যেতে হবে
জানি না, সব ভৱণা ফেলুন্দার উপর। অশু ফেলুন্দা নিজেই কি
ভুলভুলাইয়া খেতে বেৱানোৰ পথ জানে?

ফেলুন্দা তাৰ ধৰে বাটীৰ উপৰ বসে, তাৰ সামনে টুমাস গডউইনেৰ
বাকু, তাৰ ভিতৱ্যেৰ জিনিস খাটোৰ উপৰ হঠানো। দুটো তামাক
খাবাৰ সাদা পাইপ—শেঁফন পাইপ আমি কুঠলও চায়েই দেখিনি;
একটা ঝঁপ্সার নস্তিৰ কৌটো; একটা সোনাৰ চশমা, আৱ চৱত্তে লাল
চামড়াৰ বাঁধানো বাতা—তাৰ অন্ত্যেকটীৰ মলাটে সোনাৰ ফল দিয়ে
সেখা 'ভায়ারি'। পাতটা যে সিক্কেৰ কাপড়ে বাঁধা ছিল সেটা বিছনাৰ
উপৰেই পড়ে আছে, আৱ তাৰ পাল্লে পড়ে আছে মীল ফিতেটা।
ফেলুন্দা একটা বাতা আমাৰ দিকে এমিয়ে দিয়ে বলল, 'খুব সাবধানে
পথম পাতটা উল্টে দ্যাখ।'

'এ কী! এ যে শালট গডউইনেৰ বাতা।'

'১৮৫৮ থেকে ৬২ পৰ্যন্ত। যেৱল সুজোৱ মতো হাতেৰ লেখা,
ফেৰলি বৰ্ছন্দ ভাৰা। কাল সাগী বাত ধৰে পড়ে শ্ৰে কৰেছি। কী
অমূলা জিনিস যে বিপন লেনেৰ অৰুকুপ্সেৰ মধ্যে এতকাল পড়েছিল,
তা ভাৰা যায় না।'

আমি অবাক হয়ে প্ৰথম পাতাটাৰ দিকে তেৱে অছি। আৱ
উলটোতে সাহস পাছি না, কাগল বুবতে পাৱছি পাতাগুলো ঝুবুৰে
হৰে আছে। ফেলুন্দা বলল, 'আৱকিস এ বাতা খুলেছিল।'

'কী কৰে জনলে?'

'খাতাৰ পাতা অসাধানে উলটোলেই পাতাৰ উপৰেৰ ভান দিকেৰ
কোণ আকুপ্সেৰ চাপে ভেঙ্গে যায়। এই দ্যাখ—'

ফেলুন্দা একটা পাতা অসাধানে উলটো দেখিয়ে দিল।

'কৱ শুধু তাই না,' বলে চলল ফেলুন্দা, 'এই ফিতেটা দ্যাখ। কয়েক
জাহাগীয় ক্ষয়ে গোৱে—কেশো বছৰেৰ উপৰ গেৱোৰ্ধা অবস্থায়

পাকার কল্য। কিন্তু ওই করে যাওয়া জায়গা অভাব স্থায় এই দুটো জায়গায় যিতে কেমন পাকিয়ে গেছে। এটা হচ্ছে টিকা মনুন গেরের দেশ। সে বুলেছে সে তত হিসেব করে ঠিক একই জায়গায় গেরে নাখেনি; সেটা কবলে ধরা মুশকিল হত।

‘তোমার আশুলে কালো দাগ কেন?’—এটা আমি যখনে চুকেই লক্ষ করেছি।

‘এটা আরেকটা ঝুঁ।’ বলাক ফেলুন। ‘এটা বোঝানোর সময় পরে আসবে। দাগটা সেগোছে ওই নস্তির কৌটোটা থেকে।’

‘কী জানলে ওই ডায়ারি পড়ে?’ আঝে আমার প্রায় দুই বছ হাবে আসছিল।

‘তুম গড়উইনের শেষ বয়সের কথা,’ বলল ফেলুন। ‘একটা প্রসা হাতে নেই, যিটিতে মেজাজ। এক ছেলে ঘরে গেছে, অন্য ছেলে ডেভিডের উপর কোমও বিশ্বাস নেই, কোমও টান নেই। কাউকে ট্রাস্ট করে না, এমনকী নিজের মেঝে শাল্টিকেও না। কিন্তু শার্পিট তবু তার পরিচর্যা করে, তাকে আপ দিয়ে ভাস্তবাসে, ভগবানের কাছে তার মঙ্গল প্রার্থনা করে। কুমার সর্বস্ব গেছে টিমাস গড়উইনের; শাল্ট নিজে সেপাই-এর কাজ করে আর ক্যাপ্টে বুনে কলকাতার মেহসাহেবদের কাছে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। গড়উইন লখনৌ-এর নবাবের কাছে দামি ভিনিস যা পেয়েছিল সব বিক্রি করে দিয়েছে, কেবল তিনটি জিনিস ছাড়া। এই কাসেক্ট, এই মস্তির কৌটো—যেটা সে আগেই শাল্টিকে দিয়েছিল—আবু তৃতীয় হল সাদতের কাছে পাওয়া তার প্রথম বৰ্ষণ।’

‘সেটা ও শাল্টিকে দিয়ে গেছিস?’

‘না। সেটা সে কাউকে দেবলি। মারা যাবার আসে সে ঘেরেকে বলে শিয়েছিল, সেটা যেন তার খাফিনের মধ্যে পুরে তার মৃত্যুদেহের সঙ্গে কবর দেওয়ে হয়। শাল্ট তার বাপের ইচ্ছা পূরণ করে মনে শান্তি পেয়েছিল।’

‘সেটা কী জিনিস?’

শার্জটের ভাষায়—“ফাদারস প্রেশাস পেরিগ্যাল রিপিটার”।

‘সেটা আবার কী?’

‘এখানে ফেলু মিডিবঙ্গ ফেল মেরে গোছ রে তোপ্সে। ডিকশনারিতে বলছে রিপিটার বন্দুক বা পিস্তল হতে পাইল, আবার হাঁটও হতে পাইল। পেরিগ্যাল হয়তো কেম্পানির নাম। সিঁ জাঁও শিওর নন। তুই খ্য থেকে শঠার আগে ওর বাড়িতে টু মেরে এসেছি। দেখি, বিকাশবু যদি আলেকপাত করতে পারেন।’

প্রার্থ ট্রিটে একটা নিষ্পত্তির স্থেকলন আছে; নাম পার্থ অকশন হাউস। সেখনে বিকাশ চতুর্বৰ্তী বলে এক ভদ্রলোক কঁধে বাজেন হাঁর সঙ্গে ফেলুদাৰ বুৰ আলাপ। একটা কেনেৰ ব্যাপারে ফেলুদাকে ওখানে বেতে হয়েছিল বাব কয়েক, শখনই চেনা হয়।

‘এই সেন্টিনেল দোকানটার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেছি অনেক পুরনো হড়ি সাজানো রয়েছে। আমার মন বলছে এটা বন্দুক-চন্দুক নয়, হড়ি।’

লালমোহনবাবু আগে অবধি ফেলুদা শার্ট গড়উইনের জন্মৰি থেকে অনেক ছটনা বজল। শার্টের এক ভাইঁখি বা বোনবিৰিৰ কথ্য নাকি আছে ভাগ্যলিতে। শার্ট তাকে উঁঠেখ করেছে ‘মাই ডিয়াৰ ক্লেভাৰ মীস’ বলে। সে নাকি কোনও কাৰণে তাৰ ঠাকুৰদাদাকে অসন্তুষ্ট কৰেছিল, কিন্তু যারা যাবার আগে ট্য গড়উইন তাকে ক্ষমা কৰে তীৰ আৰ্দ্ধবাদ দিয়ে যান। শার্টের দুই ভাই ডেভিড আৰ জানেৰ কথাও ডায়িলিতে আছে। ডেভিডেৰ সমাধি আমৱা সাকুলৰ রোডেৰ গোৱাহানে দেখেছি। কৰ বিলেতে মিয়ে আৰহত্তা কৰেন; কেন সেটা শার্ট জনতে পারেননি।

লালমোহনবাবু এসে বললেন, ‘কাল সকাল অবধি দোটানাৰ মধ্যে ছিনুম,—পুলকেৰ জন্ম ভক্তিমূলক গঁথ লিখি, না আপনাৰ সঙ্গে ভিড়ে পৰ্বি। কালকেৰ কাণকাৰখনাৰ পৰি আৱ বিধা নৈই। খিল ইত্ত বেটাৰ দ্বান ডকি। সেই বাজে কিছু শেঙেন?’

‘একটা সোজালো বছৱেৰ পুৱনো ডাবৰি থেকে জানপাম যে, টমাস গড়উইনেৰ ক্ষমাৰ সুকলে হয়তো একটা পেরিগ্যাল রিপিটার পাওয়া বেতে পাৰে।’

‘কী পিটার?’

‘চলুন, দেয়িয়ে পড়া যাব। পেট্রেজ কত আছে?’

‘বেশ লিটুর ভৱনুম তো আজি সবালেই।’

‘ওখা ধোরাধুরি অছে।’

পার্ক অবশ্য হাউসে ঢুকেই ফেল্যুদার ভুরুত্তি কুঁচকে গেল।

অসম, ‘মিস্টার বিস্টিয়ার। কী সৌভাগ্য আমার। কেনও নতুন কেন-
তেস নাকি?’

বিকাশবাবু এগিয়া এসেছেন। বেশ চকচকে নাদুসন্দুম চেহারা, গাল
ভর্তি পান। কেন তানি সেখালেই খনে হত সর্ব কালকাতির লোক।

‘আপনার বে সৌভাগ্য সে তো দেখতেই পাও।’ বলল ফেল্যুদা।
‘এই সেমিন দেখলাম গেতী আস্ট্রেক ছেড়ে বড় ঘড়ি সজানো রয়েছে;
এর মধ্যেই সব বিক্রি হচ্ছে গেল?’

‘কেন? কী ঘড়ি চাই আপনার? ওহাল কুক? অ্যালার্ম ফ্লক?’

ফেল্যুদা তখনও এধিক খুটিক দেখছে। বিকাশবাবুকে দেখে কেন
জানি মনে হচ্ছিল যে কুনি ওই খটকট নামওয়ালা ঘড়ির বিষয় বিস্তু
জানাবেন না। ফেল্যুদার প্রশ্ন শুনে বললেন, ‘বিপিটার খোখহয় এক
রকমের অ্যালার্ম ঘড়ি। তবে পেরিগাল ঠিক বুঝলাম না। তা ঘড়ির
বিষয়ে জানাব তো খুব ভাল লোক রয়েছে। তার বাড়িতে শুনেছি
আড়াইশো রকম ঘড়ি আছে। ঘড়ি-পাগলা লোক আর কী।’

‘কার কথা বলছেন?’

‘মিস্টার চৌধুরী। মহাদেব চৌধুরী।’

‘বাস্তালি?’

‘বাস্তালি হলো মনে হয় পশ্চিম-টপ্টিমে মানুষ। ভাঙা-ভাঙা বলেন
বাজো। বেশির ভাগ ইঞ্জিনিই বলেন। এলেমদার লোক। অগে বাবে
ছিপেন, এখন কলকাতায় এয়েছেন। আর এসেই যা পাচেন—একটু
ভাল হচ্ছে—কিনে নিচ্ছেন। অবিশ্য পুরুষো হওয়া চাই। আপনি বে
বলচেন এখানে ঘড়ি দেখচেন না, তার বেশির ভাগই আপনি দেখতে
পাবেন ওর বাড়িতে গেমে। আর লোকটা জানেও। আপনি একবারটি
সিয়ে কথা বলে দেখুন না। কান্দজি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—দেখেননি?’

‘কী বিজ্ঞাপন?’

‘তার কাছে কেনও পুরুষো ঘড়ি বিক্রি থাকলে ওর সঙ্গে
যোগাযোগ করতে।’

‘সোফটিকে একটি প্রযোগস্থর কলকৃতার বলে মনে হচ্ছে?’

‘বাবু—শ্রী মিল, সিমেয়া হাউস, চ. জুট, রোডের ঘোড়া, ইল্পেট-এল্পেট কী চাই আপনার?’

‘ঠিকনা জানুন?’

‘আনি বইকী। কলকাতায় আলিপুর পার্ক, আর তা ছাড়া প্রেমেটিভে গঙ্গার ধরে একটা বাড়ি কিনেছে। ওখানেই কাহকাহির মধ্যে কাপড়ের ছিল। এখন বোধমানি বলকাতায় আছে, তবে আপনারা সকালে খাগিজে বিকলে যাবেন; এখন অপ্পিসে থাকবেন।...দৌড়ান, টিকানাটা লিখে দিবি।’

মহাদেব টৌগুরীর টিকনা নিয়ে আমরা পার্ক অক্ষেন হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ‘আপনারা এক কাজ করুন,’ ফেলুদা গাড়িতে উঠে বলল, ‘আমাকে ন্যাশনাল সাইন্সের এসপ্লানেডে রিডিং করে নামিয়ে দিবে একবারও পার্ক স্টিট গোরস্থানে পিয়ে দেবে আসুন তো রিপোর্ট বরাবর মতো কিছু আছে কিনা।’

‘মিহিপোর্ট?’—লালমোহনবাবুর গলা আর টেডি নেই।

‘হ্যা, রিপোর্ট। আর কিছু দেখবার দরকার নেই, শুধু গড়ত্তহনের সমাধিটা একবার দেবে আসবেন। এ দু দিন জল হইলি, জাধগাটা কুকলোই পাকেন। ওখানে কাজ সেৱে চলে আসবেন আমার কাছে, তারপর বাহিরে কোথাও খেয়ে নেওয়া যাবে। এখন আর বাড়ি কেবার কোনও মানে হয় না। অনেক কাজ; একবার রিপুন লেনেও বেতে হবে।’

ফেলুদা গড়ত্তহন সাহেবের বাস্টা ভল করে ভাউন কাগজে প্যাক করে সঙ্গেই এলেছে, আর সব সব বগলদাবা করে রেখেছে।

‘অবিশ্বিত দিনের বেলা আর তামের কী আছে বলুন,’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘সঙ্গের দিকটাতেই একটু ইয়ে-ইয়ে লাগে।’

‘মন বদি কুসংস্কারের ডিপো না হত তা হলে ভূতের ভুর কোনও সময়ই নেই।’

এসপ্লানেডের পথে একটা ট্যাফিক অ্যামে পড়ে অপেক্ষা করার ফাঁকে লালমোহনবাবু বললেন, ‘আপনি যে ঘড়ির খোজ করছেন, সে কি ট্যাক-ঘড়ি?’

‘সে তো জনি না এখনও।’

‘স্টাক-ড্রি যদি হয় তো আমার কাছে একটা আছে।’

‘কির থড়ি?’

যারা ঘড়ি তার তিনটে ছিলিল রয়েছে আমার কাছে—ঘড়ি, ছড়ি আর পার্গড়ি। প্রস্তুতভাবের ভিনিস। সেটি পার্সীচরণ পঙ্কজাখ্যায়। আছা, পার্সী নামটা কোথেকে এল মশাই?’

‘এখনেই ছিল,’ বলল ফেলুদা। ‘আপনি বাংলা রাইটার হয়ে পারী মান জানেন না ই প্যারী ছিল রাধার আর এক নাম। যেমন রাধিকাচরণ, তেমনি প্যারীচরণ।’

‘কান্ত ইউ সার। যা হোক, যা বলছিলাম—ঘড়িটা ভাবছি আপনাকে দিয়ে দেব।’

ফেলুদা বেশ অবাক।

‘হঠাত?’

‘একটা কিছু দেব দেব করছিলাম ক-দিন থেকে; আমার হিন্দি ছবির সফল্যার পিছনে তো আপনার অবদান কর নয়।—আর তার মানে এই গাড়িটা হওয়ার পিছনেও। হয়তো মেখবেন এ ঘড়িও সেই পেরিপিটার না কী বলছিলেন, সে ভিনিস।’

‘সেটার চাল কর। তবে আপনি যে ভিনিসটা অবশ্য করলেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার কাছে খুব বড়ে খাকবে এটা কথা দিতে পারি। উনবিংশ শতাব্দীর ভিনিস তো আর ব্যবহার করা খায় না—তবে দয় দেব রোজ। ঘড়িটা চলে?’

‘মিথ্যা।’

ফেলুদাকে নামিরে দিয়ে যখন আমরা গোরঙানে পৌছলাম তখন প্রার বাজোটা বাজে। এখানে কাজ সেরে ফেলুদাকে তুলে নিরে আমরা বাব নিজামে ঘাসি রোল খেতে। এটা ফেলুদারই প্ল্যান, ওই বাওহাবো। অবিশ্বি তার আগে বাওহা হয়ে রিপস লেনে বাজে ফেরত দিতে।

পার্ক ট্রিটে এ সময়টা ঔয়াফিক কর, শুই দুপুর হওয়া সঙ্গেও গোরঙানের পরিবেশটা সেল নিরিয়িশি। গেট মিয়ে তুকে দু একবার ডাকতাকি করেও বরমদেও দারোয়ানের দেখা পেলাম না। সে আবার



ইন্দুরের সৎকর্ম করতে কেমনও বোপের পিছনে গেছে কিনা কে জানে।

আমরা মানবানন্দের পথটা দিয়ে এইভাবে গেলাম। লালমোহনবাবুকে ঘতই টাট্টা করি না বেল, আর যেসব কুসংস্কারের কথা যাই বলুক না কেন, এই গোপন্তার ভিতরে চুক্তি সহসের খনিকটা কর পড়ে যায় টিকই। শুধু সমাধিগুলো থাকলেও না হয় ইত; তার উপরে এতে পাছপালা, এতে বোপজ্ঞান আগামা কচুবনে হেঁয়ে আছে ক্যাগটা যে, তাতে হস্তমে ভাবটা আরও বেড়ে যায়। অবিশ্বাস লালমোহনবাবু ধন্তী বাড়াবাড়ি করছেন, ততটা করায় মতো তরের কানিগ শিলের বেলা কী ধূকতে পারে জানি না। অহলোক এসেতে এসেতে আড়াচাঁথে ফলকগুলোর দিকে দেখছেন আর সমানে ঘন্টা আওড়নোর মতো করে বিড়বিড় করছেন। কী যে বলছেন সেটা কল পেতে তনে তবে বুকতে পারলাম। সেটা শোনার মতোই বটে।

‘দোহাই পাহার সাহেব, দোহাই হ্যামিলন সাহেব, দোহাই শিখ হেমসাহেব—ঘাড়টি মটকিও না বাবা, কাজে ব্যাগড়া দিয়ো না। তোমরা অনেক সিঁড়েচ, অনেক নিঁড়েচ, অনেক শিঁবিয়েচ, অনেক টেঁচিয়েচ...ক্যাসেল সাহেব, আর—হঁ হঁ—তোমার নামের তো বাবা উচ্চারণ জানি না।—দোহাই বাবা, তোমরা ধূলো, ধূলো হয়েই থাকে বাবা, ধূলো...ধূলো...’

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, ‘কী ধূলো-ধূলো করছেন?’

‘ছেলেবেলায় পড়িচি যে বাবা তশেশ—জাট দাউ আর্ট, টু ভাস্ট রিজার্নেন্ট। এ সবই তো ধূলো।’

‘তাহলে আর ভব কীসের?’

‘কবিরা বা লেখে সব কি আর সত্তি?’

আমরা বাঁয়ের মোড় দ্যুরেছি। গাছ এখনও পড়ে আছে। মাটি শুকনো। অনেক মাটি। টমাস গডউইনের সমাধি ধিরে মাটির তিবি।

‘ধূলো...ধূলো...ধূলো...’

লালমোহনবাবু কেন মনে সাহস আসার কল্পনা যান্তিক মানুষের শুভে কথাটা বলতে বলতে গডউইনের সমাধির দিকে এগিয়ে

গেলেন। তারপর তাকে তিনবার 'ক' আর দু বার 'কঁ' কথাটা বলতে শুনলাম, আর তাঁসবাই তিনি দাঁত কপাটি লেজে কাটা পাছের মতো সচল পড়ে গেলেন মাটির চিবির ওপর।

আর পা দেখালে পড়েছে তার পর থেকেই কুর হয়েছে একটা গর্ত, সেটা প্রায় এক-মিনিয়ু গভীর, আর সেই গর্তের মাটির তিওর থেকে উকি মারছে একটা মড়ার খুপি।

॥ ৮ ॥

আর দশেক বাঁকুনিটে লালমোহনবাবুর জ্ঞান কিনে না এমে সত্ত্বিই শৃশ্কিল হত। কারণ এরকম অবস্থায় এর আগে অমি কখনও পড়িনি। ভদ্রলোক গাঁথের খুলোমাটি ঝোড়ে বললেন সাহিত্যিকদের নাকি সহজে অজ্ঞান হ্যার একটা চেনাডেনসি আছে, বিশেষত ভয় পেলে, কারণ তাদের কর্মনাশক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ধারালো। 'তোমার দামা যে কুসংস্কারের কথাটা বললেন সেটা একদম বাজে। আমার মধ্যে তেব্য ইয়ে একদম নেই।'

আমরা অবিশ্বি আর এক মিনিটও স্মরণ নষ্ট না করে সোজা চলে শিয়েছিলাম ক্ষেত্রুলার কাছে। ওর কাজও শেষ হচ্ছে গিয়েছিল; না হলেও ও যে এমন খবর শনে সব কাজ ফেলে গোরস্থানে চলে আসবে সেটা জ্ঞানতাম। গড়উইনের সমাধি দেখে, মাটির ভিতর থেকে উকি মারা আয় দেড়শো বছরের পুরনো মড়ুর খুলি দেখে আর চারিসিকটা ভাল করে সার্ট করে সমাধি থেকে হাত দশেক দূরে পড়ে থাকা একটা কেদাল ঝাড়া আর কিছু পেজ না ফেলুস্য।

এবারে অবিশ্বি দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হল। সে বগল তার ভাতিজার পানের দোকান আছে কাছেই লোয়ারে সার্কুলার রোডের মোড়ে, সেখানে একটা ভজনি কথা বলতে গিয়েছিল। সে কবর খৌড়ার ঘটনা বিস্তুই জানে না। তার বিশ্বাস হটেলটা আগের রাত্রে ঘটেছে, আর যারা করেছে তারা পাঁচিল টপকে এসেছে। ফেলুদা দারোয়ানের সাহায্যে মিনিট পানেরোৱ মধ্যে খাটি আর গাছের পাতা দিয়ে গুড়টা খেজিয়ে দিল। যাবার সময় দারোয়ানকে বলে



গেজ পাঁচটা সে খেন কাটিকে না দলে।

গোরস্থন থেকে আমরা সোজা চলে সেলাম রিপন লেনে।

চোক বাই একের সিডি দিয়ে উঠতে আমাদের একটু বাধা পড়ল। একজন নামছেন সিডি দিয়ে, তার হাতে একটু চৰা ১১৫ড়ার কেস। গিউচের কেস। বছর পঁচিশেক বয়সের একজন যুবক। এ ধরনের চেহুরা যে কেলও সহয়, বিশেষ করে সকের দিকে, পার্ক স্ট্রিটে পেলেই দেখা বাব, কমেট কুন্না দেবার দরবার নেই। কিম গড়উইন এই যে বেলে, কিমবে বোকহত সেই রাতে, ঝু-ফেঁজের ধার্জনা দেয়ে।

দেওলা আজ আর কাজকের মতে; নিজের নয়; বৈঠকখনার গলাবাজি চলেছে। একটা গলা; অমাদের চেনা; অন্যটা মনে হয় তিন তলার সাহেবের। অথবা গলা বিশ্বী ভাষায় ধরকাছে, আর দ্বিতীয় গলা ইনিয়ে-বিনিয়ে দোষ অঙ্গীকার করছে। 'কাসকেট' কথাটা বাব বাব ব্যবহার করছেন দু জনেই।

কেলুদা বারান্দায় গিয়ে বৈঠকখনার দরজায় ঢোকা মারল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেসনপের মতো শোনা গেল 'কৌন হ্যাঁ'। আমরা তিনজনেই ঢোকাঠ পেরোলাম। অনেক ভদ্রলোকটির গায়ের রং হলদে, সর্বাঙ্গে মেচেতা, মাথায় টাক, দুটো ফাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, বয়স ষাট-পঁচাষটি। ভদ্রলোক আমাদের দিকে পিছন হিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কেলুদা তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে হাতের বাঁজটা ঘোড়ক খুলে সোফায় বসা ছি। গড়উইনের দিকে এগিয়ে দিল।

'এটা কাল নিয়ে কাবার লোভ সাহসাতে পারিনি। অমোর মিসার্চ অচুর সাহায্য করবে।'

গড়উইন বাঁজটা পেয়ে এক যুক্ত হতত্ত্ব থেকে তারপর অটুহাসিতে ফেটে পড়ল।

'সো ইউ ফুলড দেম, ইউ ফুলড দেম! দোজ ফুলস!—ধূর্ত, ঠগ, জোকেয়ার।'—এবাব কথু রাগ আর বিজ্ঞপ, আর তার সবটা গিয়ে পড়েছে অন্য ভদ্রলোকটির উপর।—'ইই গড়উইনের প্রেতাখ্যা নিয়ে গোছ তার বাজ? ইনি কি টম গড়উইনের প্রেতাখ্যা?—দিস কেনটেলম্যান? কী হনে হয় তোমার?—এই যে, ইনিই হচ্ছেন মিস্টার অ্যারাকিম, আমার তিনতলার অতিবেশী, যার টেবিলের ছটফটানি

আমার প্রাতঃক বিশ্বাদবাবের সঙ্গেজনাকে মাটি করে দেব।'

মিস্টার আরাকিস বোকার মতো বাস্তার দিকে ঢেয়ে ছিলেন; এখানে তাঁর দৃষ্টি গোল ফেলুন্দার দিকে। তারপর আবার বোকার মতো দৃষ্টি ঘূরিয়ে দরজার দিকে এগোতে গিয়েই তাঁকে ধেয়ে যেতে হল। ফেলুন্দা তার নাম ধরে ডেকেছে।

'মিস্টার আরাকিস!'

ভদ্রলোক ফেলুন্দার দিকে চাইলেন। ফেলুন্দা ধীরকচ্ছে বলল, 'এই বাস্তার একটা জিনিস বোধহয় আপনার কাছে গোরে গোছে।'

'সার্টেনজি নট।' আরাকিস গর্জিয়ে উঠলেন। 'আর সেটা আপনিই বা দুবছেন কী করে? মার্কাস, তুমি বাস্ত বুলে ধোঁকে নাও তো কেলাঙ জিনিস কম পড়ছে বিদ্যা।'

একঙ্কপে জনসাম মি. গডউইনের অথম নাম, আর সেই সঙ্গে আরাকিস-মার্কিস রাহস্যের সমাধান হলো।

মার্কাস গডউইন বাস্ত খুলে তার ভিতর হাতড়ে ধোঁকে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন, 'কই মি. মিটার, এতে তো সব জিনিসই আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'ওই নসির কৌটেটি একবার বাব করবেন কি? --- যেটা বর্ণনা শালিট গডউইন তার ভায়গিঁতে দিয়েছেন এবং বলেছেন ওর গায়ে পায়া চুনি এবং নীজে বসানো ছিল?'

মি. গডউইন কৌটো বাব করে ঘূরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন।

ফেলুন্দা বলল, 'বুঝতে পারছেন কি যে, শুটা একটা শস্তা নতুন কৌটো, যাতে কালো রং মাঝিয়ে পুরনো করার চেষ্টা করেছিলেন মি. আরাকিস?'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওপর থেকে আসল নসির কৌটো এমে দিলেন মিস্টার আরাকিস, আর মি. গডউইন তাকে দিয়ে উঠবের দোহাই দিয়ে বলিয়ে নিলেন যে, সামনের বিশ্বাদবাব যদি অবার খটখটানি শোনেন তা হলেই পুলিশে থবর দেবেন। কালো সুখ করে চের আরাকিস চোরের মতো হর থেকে বেরিয়ে গোল।

'থাক ইউ, মিস্টার মিটার,' হাঁপ ছেতে বললেন মার্কাস গডউইন।

শাখট গডউইনের ভায়রি যে কত মূল্যবান জিনিস সেটা আপনি

জানো? প্রথম ফেলুদার।

‘না। শান্তি গড়টাইনের আমারি ওই দাঙ্গে রয়েছে তা অমি জানতাম না।’ প্রচলেন মার্কিন গড়টাইন। ‘তবে একটা কথা অমি আপনাকে বলতি ছি, মিটোর—আমার পূর্বপুরুহদের মিয়ে আমার মিন্দুমাই কৌতুহল নেই। সত্ত্ব এলতে কী আমার ক্ষেনও বিষয়েই ক্ষেনও কৌতুহল নেই। এখন শুধু ধরার দিনটির ফল আপন্ত। ওই বেড়াল ছাড়া আর আমার আপন বলতে কেউ নেই। সকেবেলা একজনের বাক্তিতে শিয়ে পোকার ফেলতাম, এখন গাড়িটির জন্য তাও পারি না।’

‘তাহলে প্রশ্নগুলো করে বোধহয় সাত নেই।’

‘কী প্রশ্ন?’

‘আপনার ঠাকুরদাদার খাদার নাম ছিল ডেভিড, যার সমাবি রয়েছে সার্কুলার রেড গোরস্কানে।’

‘ইয়েস।’

‘ডেভিডের আর ক্ষেনও ভাই বা বেন ছিল বি?’

‘মনে নেই। আমার এক পূর্বপুরুষ আবাহতা করেছিলেন। সে বিনা অনে নেই।’

‘ডেভিডের ছেলে, অর্থাৎ আপনার ঠাকুরদাদার নাম ছিল অ্যাঞ্জু?’

‘ইয়েস। হি শয়াজ ইন বি আর্মি।’

‘শান্তি গড়টাইন তার এক ভাইবি বা বেনবির কথা লিখেছেন। হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, তিনি আপনার ঠাকুরদার আপন বেন কিংবা—?’

‘আমার ঠাকুরদাদার ক্ষেনও ভাই-বেন ছিল না।’

‘তাহলে কাজিনা।’

‘তাসের সহজে আমি বিষু বলতে পারব না, মি. মিটোর। আমার অ্যারণপ্রক্রি অনেকদিন ধেকেই কৈগ হয়ে আসেছে। তা ছাড়া আমাদের পরিবার তোমাদের খণ্ডে কাছাকাছি ধেকে না। তারা সব ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে। এ তো আর তোমাদের বাঙালিদের একাত্মবক্তী পরিষ্কার নয়।’

* * *

সেসাইটি সিনেমার সামনে নিজামেতে বসে মাটিল রোল খেতে

থেতে ফেলুন। লালমোহনবাবুকে একটা প্রশ্ন করল।

‘নতুন বিশ্বাস সোকটিকে আপনার কেন্দ্র মনে রাখ?’

লালমোহনবাবু চিরনো শেষ করে তোক শিলে বললেন, ‘ভাসই
তো। চোখের মধ্যে কেল একটা ইঝে ভাব আছে।’

‘আমারও তাই মনে হয়েছিল।’

‘এখন আর হচ্ছে না?’

অবিশ্য একটা দেহস্থৈ একটা মানুষের গোটা চরিত্র নষ্ট করে দেয়
না। কিন্তু এটা বলতেই হয় যে, কম্বলোক একটা মানুষক অন্যাণ করে
ফেলেছেন।’

আমরা দু জনেই খাওয়া ধারালাম।

আজ প্রমাণ পেলাম যে, ওর মানিয়াগোর কাটিং স্টোর ন্যাশনাল
আইন্ডেরিয় শীড়ি ক্লবে সবস্বে রাখিত দেড়শো মুশো বছরের পুরানো
ব্যক্তির কাগজ থেকে ত্রেত নিয়ে কেটে নেওয়া। আমার মতে, এ
অপরাধের জন্ম মানুষের জেল হওয়া উচিত।’

আমি কঞ্জনা বরতে চেষ্টা করলাম নজেনবাবু রিডিং করে বসে দম
বজ্জ করে সোপনে কর্মচারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই দুর্কর্মটি করলেন, কিন্তু
পারলাম না। সঙ্গি, মানুষকে দেখে তেলায় উপর লেই।

‘এটা একটা ঝোগ বলতে পারেন,’ ফেলুন। বলে চলল, ‘আর এ
ব্যক্তির অন্যাণ কচ ধরা না, পড়ে সাজেসফুলি করতে পারলে মানুষ
একটা উৎকৃষ্ট আনন্দও পায়, নিজেকে আর পাঁচজনের চেয়ে বেশি
চুরু মনে করে একটা আস্তৃষ্টি অনুভব করে। ভেরি স্যাড।’

মাটিন গোলের পর লসিয়ার অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুন বিলটি ও
আনতে বলে দিল। ঘড়িতে বলছে আড়াইটা। আবারও তিনি ঘণ্টা সময়
কাটিয়ে তারপর ঘোড়ে ছুরি ঘড়ি-পাগল মিস্টার টোমুরীর ঘাড়িতে।
আমি জানি পেরিগ্যাল মিস্টারের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত
ফেলুনরে সোয়াস্তি লেই।

‘আচ্ছা রশাই, হাত্তগিলেও কি এইভাবে খাবারের প্রভাশোর
জ্বালালাভ উপর বসে হাঁক পাড়ত মাটি?’

আঝগুপের পাশেই রেস্টোর দিকে একটা জানালা, তার উপর একটা
কাক বসে বেশ কিছুক্ষণ থেকে কাকা করছে। সেইটোর দিকে

তাকিয়েই লিপিমোহনবাবু প্রস্তা করেছেন।

‘সম্ভবত না’, বলল ফেলুদা, ‘তবে বাড়ির আপসে বা ছাতের পাঁচিলো যে বস্তু তার অনেক প্রশান্ত পুরানো ছবিও আছে।’

‘আশ্চর্য, পাখিটির চেহারা যে কীরকম তাই জানি না।’

‘জানুর একটা উপায় হচ্ছে চিড়িয়াখানার রাওয়া। আর না হয় চলুন কর্পোরেশন স্ট্রিট দিয়ে বেরোব। মিউনিসিপ্যাল বিস্টিং-এর সামনেই কর্পোরেশনের সিলেনে হাঙ্গামিলের চেহারা দেখিয়ে দেব।’

‘আপনি এখনও কর্পোরেশন স্ট্রিট বলছেন?’ হেসে বললেন কুকটা।

‘থুড়ি, সুরেন ব্যানার্জি—’

ফেলুদা খেমে গেল। কোথের চাহনি চেঞ্চ। পকেট থেকে খাতা বার করে কী জানি দেখল। তারপরেই ছটফটে ভাব, কারণ বিল দিতে দেরি করছে। ফেলুদা বেয়ারা বলে হাঁক দিল—যোটা সচরাচর করে না। বিল দিয়ে গাড়িতে উঠে আইভার হারিপথকে নির্দেশ দিয়ে দিল। গাড়ি সুরেন ব্যানার্জি রোডে গিয়ে পড়ল। ফেলুদা বাড়ির নম্বর দেখছে, যদিও সব বাড়িতে নম্বর নেই—কলকাতার এই আরেকটা কেলেক্ষারি। ‘আরেকটা এগিয়ে ঘবে ভাই।...তোপ্সে, ১৪১ মেথসেই বলবি।’

মনে পড়ে গেল—১৪১ SNB। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। কুকটা টিপ্প টিপ্প করছে।

‘তই যে একশো একশতলিশ।’

গাড়ি থামল। বাড়ির গাঁও দেখা Boume & Shepherd-BS। পাওয়া গেছে। মিল গেছে।

ফেলুদার মনে আমরা দু জনও ভিতরে চুকলায়। লিফ্ট দিয়ে উঠতে হবে।

দোতলায় লিফ্ট থেকে বেরিয়েই একটা সোকা-বেঞ্জি পাতা ঘর। একজন কর্মচারী আমদের দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদার ইতস্তত ভাব, কারণ যে প্রস্তা করতে হল সেটাই একটা বেকুবি গুরু থাকতে বাধ্য।

‘ইয়ে—ভিট্টোরিয়ার কেনও হবি আছে আপনাদের এখানে?’

‘ভিট্টোরিয়া মেমোরিয়াল।’

‘না। কুইন ভিট্টোরিয়া।’

‘আজে না। আমদের এখানে ক্ষু করা ভাবত্বাবে এসেছেন আমদের ছবি প্রয়োগ। এতগুরুত্ব দ্য সেভেন্থ পারেন—হঢ়ন প্রিস অফ ওয়েল্স হিলেন—কুর্জ ন্য ফিল্ম, দিস্ট্রিবিউবার...’

‘তা সব ক্ষয়ক্ষতি প্রয়োগ যাব?’

‘প্রিপট তৈরি থাকে না। নেচেটিভ আছে; অর্ডার দিলে করে দিই। ১৯৫৪ থেকে সব নেচেটিভ রাখা আছে।’

‘বলেন কী! আঠারোশো চুয়াত?’

‘লের্ন অ্যান্ড শেপার্ট হল প্রিবেইট বিতীব আচিনত্ব ফোটোর সোকাল।’

‘তার মানে তো হাঙায় হাঙাল নেচেটিভ থাকবে আপনাদের এখানে।’

‘আসুন মা, দেখিয়ে দিছি। ওই যে মেরুদণ্ড মেঝালে যুলাই— ১৮৮০-তে মুম্বাইতের উপর থেকে তোলা হবি।’

এক্সপ্রেস দেখিনি, এবার বসতে চোখ গেল। এক হাত থাই পাঁচ হাত সাইজের ছবি। মুম্বাইতের উপর থেকে প্রায় একশো বছর আগের কল্কাতা শহর। ডলহোসি-এসলামন্ড থেকে শুরু করে উত্তরে যতদূর দেখা যায়। গির্জাগুলির মাথা অন্য সব বাড়িকে ছাপিয়ে উঠেছে। হিন্দীমানার একটা শহীদের মেই। দেখলেই বোধ যায় শাক্ত শহর।

নেচেটিভের ঘর দেখে চোখ টেরিয়ে দেশ। ঘরের চার দেয়ালের মেঝে থেকে সিলিং অবধি শেলফ উঠে গেছে, আর অন্যেকটি শেলফ বাড়ি উচ্চে চ্যাপটা চ্যাপটা বালো ঠাস। প্রায়ক বালোর গায়ে লেখা রয়েছে তাতে কোন সালের কী ফরমের ছবি রয়েছে।

কেবুল শেলফগুলোর সামনে ঘুঁয়ে ঘুঁয়ে সেখানগুলোর দিকে বিচুক্ষণ ঘূর মন দিয়ে দেখে হাতের রিস্টওয়ার্চটার দিকে একবার চেয়ে আমদের দিকে ফিরে বলল, ‘তোমা অস্টা বানেক ঘুঁয়ে আয়; আমার একটু কাজ আছে এখনো।’

লিফ্টে উঠে লালমুহুরবাবু বললেন, ‘তোমার দাদাৰ হকুম শিল্পাধাৰ। ওই একটা সোবাকে ভা বলা যাব না। কী পার্সেনালিটি; চলো একটিবাবে ফ্রাঙ্ক রস্ক-আ।’

গাড়িট সুরেন ব্যানার্জি গোড়েই খেবে অমরা টেরফি দিয়ে গ্রান্ট হোটেলের দিকে হাতিতে লাগলাম। লালমোহনবাবু কো ওযুধ কিনবেন জানি না; আমার দরকারও নেই। উদ্দেশ্য কেবল সবস কঢ়ান।

তিতের মধ্যে ক্ষিণ বাচিয়ে কিছুদূর এগোলোৎ পর তাঁলোক বলাবল, 'কিছু বুঝতে পারিব তাই তশেশ—তোমার দাদার মাতিগাতি?'

বলতে বাধ্য হলাম যে কিছুই বুঝছি না, তবে এটুকু আস্তাজ করতে পারছি যে, কেলুনা ছাড়াও আবেকজন কেউ শার্ট গড়তেইনের ভাষায় পড়েছে, আর সেই পক্ষের সঙ্গে টামাস গড়তেইনের কবর খোঢ়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে।

'দুশো বছর মাটির নীচে থাকার পরও যে সেই বহুল অবস্থায় থাকে সেটা তুমি জানতে?' জটায় জিজেস করলেন।

এ বাপারে জোব চার্নবেন হৃতদেহ নিয়ে একটা ঘটনা হেলুন আমাকে বলেছিল; সেটা লালমোহনবাবুকে ফললাম। চার্নক মারা যাবার দুশো বছর পরে সেন্ট জন্স গির্জার একজন পাহির ঘনে হঠাৎ সন্দেহ ঢাকে চার্নকের সমাধিটা সত্যিই সমাধি তো, নাকি এমনিই একটা স্তুতি খাড়া করা হয়েছে। সন্দেহটা এমনিই পেয়ে বসে হে, পাহি শেষে লোক দিয়ে শাটি খোঢ়ালেন। চার ফুট নীচে পর্যন্ত কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু আর দু ফুট বুঁড়তেই একটা কক্ষালের হাত বেরিয়ে পড়ল। পাহি মানে মানে গর্ত দুজিছে দিলেন।

ঝাঁক রস-এ নিয়ে লালমোহনবাবু যখন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন 'ওয়াল ফরহানস ফর দি গারস ফ্যায়লি সাইজ', তিক তখনই লক্ষ করলাম দোকানে একজন কেলা লোক চুক্তি হেন। তিনি অবিশ্ব আমাদের দেখামাত্ত দেনেননি; বায় দু-তিন আমাদের দিকে তাকিয়ে তারপর মুখে হাসিটা এল। নরেনবাবুর তাই পিতৃীনবাবু। হাতে একটা বড় বাক্স, তাতে লোৰা হকেং জাই কিনারস। বললেন, 'দাদার জন্ম ওযুধ নিতে এসেছি।'

'কেমন আছেন নরেনবাবু?' জিজেস করলেন জটায়।

'দাদা বেটার। ভাল কথা—আপনাদের সঙ্গে সেমিন যিনি ছিলেন তিনিই মাকি গোয়েন্দা প্রদেশে মিশ্রিয়? দাদা সিলেন খবরটা ভুঁলেকের নামে শুনেছি আগে। ভাবছিলাম—'

গীয়ীনবাবু ভুক গুঁচকে একটু যেন অন্যমনক হচ্ছেন। শারপর ন্যালেন, 'ওকে বাড়িতে পাওয়া যাব কথন ?'

'সেট টিক বলা মুশ্কিল,' আমি বলিবাব, 'তবে ডিনেটারিতে নবর পাবেন। আপনি আসতে চাইলে আশে ফেল করে নিতে পারেন।'

'হঁ...ওর সঙ্গে একটু...টিক আছে, আমি টেলিফোন করে দেব। কলকেন প্রদোষবাবুকে, সরকার পড়লে যাব—হচ্ছে...'

আমরাও হৈ হৈ করতে করতে ভুলাকের কাছে বিলাব নিয়ে বেরিবে এলাম।

নিউ মর্কেটে একটা চকর যেরে অতিশীল স্ট্রিট নিয়ে সুরেন বানার্জিতে পড়াম। বোর্ন আন্ড শেপার্টের সমনে এসে দেখি ফেলুদা বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কমজু নাকি যা আন্দজ করা গীয়েছিল তার একটু আগেই শেষ হয়ে গেছে। গীয়ীনবাবুর সঙ্গে দেখা হবার হবরটা ফেলুদাকে দিলাম। 'বাটো ?' বলল ফেলুদা, 'কী বললেন ভদ্রলোক ?' আমি জানি ফেলুদাকে ভাসাভাসাভাবে কিন্তু বললে চলবে না, তাই যা কথা হল সব ডিটেলে বললাম। এমনকী ভদ্রলোকের হাতে পড়ির বাছটার কথাও বললাম। ফেলুদা চুপ করে শুনে দেল। 'কাজ কেমন হল ?' লালমোহনবাবু কিন্তেস করলেন।

'কাস্ট ক্লাস,' বলল ফেলুদা, 'একেবারে রফুগনি। আর ওখান থেকে হেম করে জেনে নিয়েছি মি. চৌধুরী বাড়ি ফিরেছেন। পাকা অ্যাপেন্টমেন্ট হয়ে গেছে। মৰমলের মতো মোলায়েম গলায় কথা বলেন ভদ্রলোক।'

॥ ৯ ॥

বাজা-ঘড়ি বা চাইমি ক্লক অনেক শুনেছি, কিন্তু মহাদেব চৌধুরীর বাড়িতে চুক্তে না-চুক্তে ইটা বাজাব যে সব অসুস্থ শব্দ একটোর পর একটা ঘড়ি থেকে আমদের কানে আসতে শোগল, সে বকম হড়ির বাজনা আমি কেনও দিন শুনিনি। লালমোহনবাবু বললেন, 'এ যেন খর্মধার দিয়ে চুক্তি মশাই। মাজলিক বাজছে। এ মিসেশ্পেল ভাবা যায় না।'

চুক্তিই যে ভদ্রলোকের পক্ষে দেখ ইস কা নয়। একজন কর্মচারী গোছের লোক একে বলল, মি. চৌধুরী ব্যস্ত আছেন, মহাদের একটু অসেকা করতে হবে। আমরা একটা আপিস রয়ে গিয়ে বসলাম। এই হেটি ঘরেও দুটো বাহারের ঘড়ি—একটা দেছালে, একটা বুকশ্লিফের ওপর।

বড়ির সব ঘটতে এখন বাড়িটা থমথমে হনে হচ্ছে। পেঁচায় হল ব্যাশনের বাড়ি, পারের নীচে খেতপাথরের মেঝেতে মুগ দেখা যায়।

একটা দলার সব বাড়ির ভিতর থেকে মাঝে মাঝে কুকুরে পার্শ্বে বেলুদা বলল সেটাই নাকি মহাদেব চৌধুরীর গলা। মৰমল কি না সেটা এখান থেকে বোধা মুশকিল, তবে এই গলাটাই যে হঠাৎ সঙ্গে চড়ে আর মখমল রাইল না সেটা বেশ বুঝতে পারলাম।

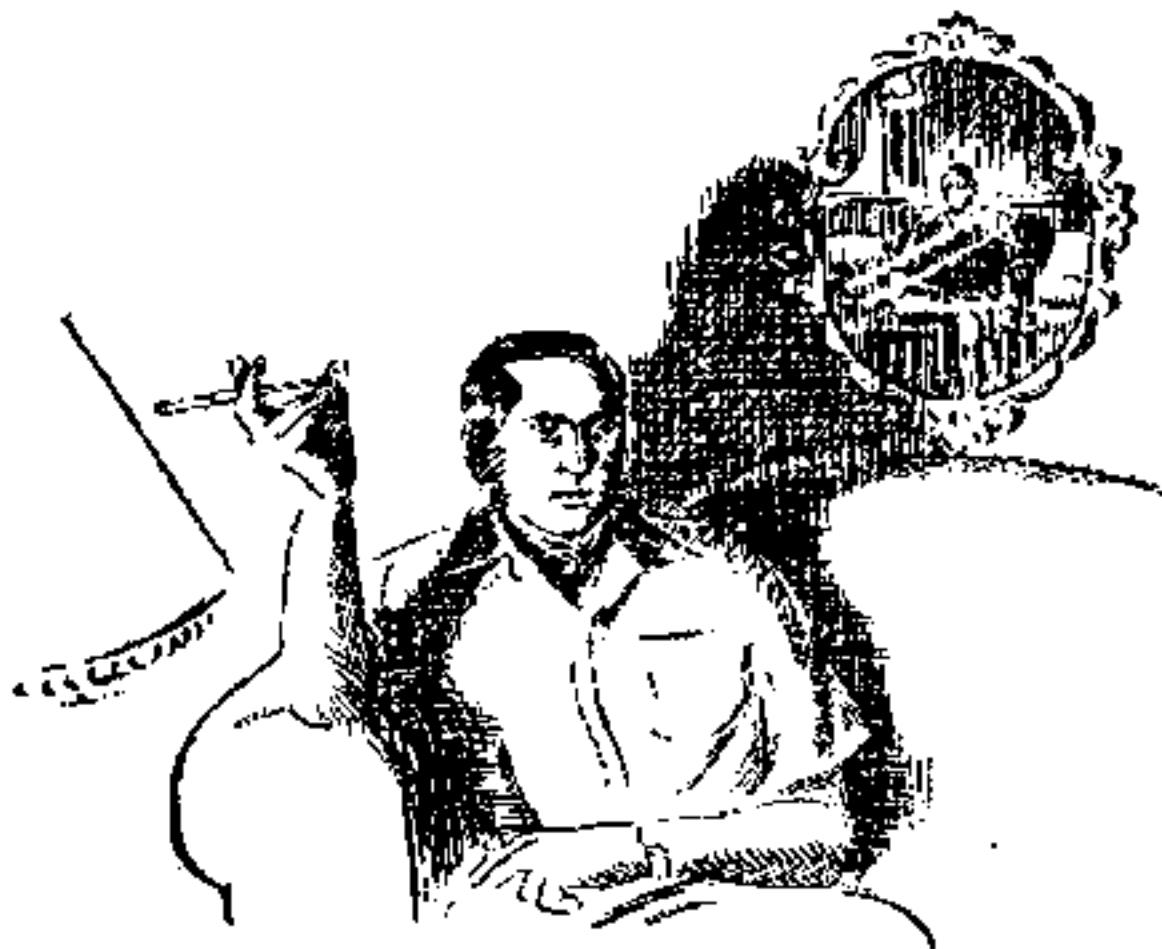
মহাদেব চৌধুরী কাকে ফেন কেমন ধন্দক দিয়েছেন। আমরা তিনজনে আব্য দমকক করে অনিষ্টাসক্ষেত্রে আড়ি পাঞ্চছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি গলা জুলাই না, তাই তার কথা বুঝছি না। কথা হচ্ছে ইঁরিজিতে। চৌধুরীর প্রসাধ হমকানি শোনা গেল—

‘এ সব ব্যাপারে আমি অ্যাডভাস মিই না—আপনি অত করে কলপেন বলে দিলাম—আর এখন বলছেন, সেটাকা বৰচ হয়ে গোছে? আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আর এই সামান্য কাজটা করতে এত টাকা কেন সাগর্যে সেটাও আমি বুঝছি না। যাই হোক, আমি সিচ্ছি টাকা, কিন্তু দু দিনের মধ্যে আমি আস চাই। আমি কোনও অসুবিধার কথা কুন্তে চাই না, বুঝেছেন?’

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ, তারপর একটা জুতোর শব্দ পেঁচায় মনে হল সেটা সবর দরজার দিকে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই কর্মচারীটি অব্যাক এল।—

‘আপনোগ আইরো।’

মি. চৌধুরীর মাথার চুল থেকে জুতোর ডগা পর্যন্ত সত্তিই মখমলের মতো। ভদ্রলোক দিনে দু বার মাড়ি কামান লিখিছে, মাহলে সক্ষা ছটায় পুরুষ মানুষের গাল এত হস্ত হচ্ছে না। (পরে লাখযোহনবাবু বলেছিলেন, মনে হচ্ছিল গালে যাই কম্বলে পিছনে যাবে)। যে বিশাল তৈরিকৰণ ঘটাতে আমরা এসেছি সেটাও মি.



চৌধুরীর মন্তব্য পালিশ করা। আনাড়ে-কানাড়ে কোথাও এক কপা
ধূলো বা একটাও পিপড়ে বা আরশোলা থাকতে পারে বলে ঘনে হচ্ছে।

সেনার হোস্তারে ধরা সিগারেটে একটা টান দিবে যেমো হেঢ়ে
ফেলুন্দার লিকে চেয়ে অশ্র করলেন মি. চৌধুরী—

‘ওয়েল—ঘড়িটা এসেছেন সঙ্গে?’

অমের সকলেই অন্ধক: ফেলুনা তো বাটেই।

‘ঘড়ি? কী ঘড়ি বলুন তো?’ অশ্র করল ফেলুনা।

‘আপনি যে বললেন একটা ঘড়ির ব্যাপরে দেখা করতে আসছেন?
আমি তো ভাবলাম আমার বিজ্ঞাপন পড়ে ফেল করছেন আমাকে।’

‘আপ করবেন মিস্টার চৌধুরী—আমি আপনার বিজ্ঞাপন পড়িনি।
আমার একটা ব্যাপার একটু জলার দূরব্যাস হয়ে পড়েছে, সেটা সম্ভবত

গতি সংক্ষেপ। শুল্কাম আপনি ঘড়ির বিষয় অনেক কিন্তু জানেন, তাই—'

মুখ্যমন্ত্রী ভাই পড়েছে। ভদ্রলোক একটু ফেন বিরতির সঙ্গেই নড়েচাপড়ে এসে গল্পনে—

‘আমার সময় বেশি সেই মি. পিটার। একটু পরেই কলকাতার বাইরে জলে যাব। আপনার কী জানার আছে সংক্ষেপে বলুন।’

‘পেরিগ্যাল রিপিটার জিনিসটা কী সেটা জনতে চাইছিলাম।’

মুখ্যমন্ত্রী হঠাতে পাথর হয়ে গেল: সিগারেট হোল্ডার পাঁটের বাইরে এসে দেখে গেছে। তারের মণি পাথর, সৃষ্টি ফেনুদার দিকে, নিষ্পত্তি।

‘আপনি কেমনায় পেলেন নাখটা?’

‘জনবিশ্ব শতাব্দীর একটা ইঁরেক্টি উপন্যাসে।’

তার কাজের দুবিতের জন্য যে ফেনুদা অস্থানবদলে যিখ্যে কথা বলতে পারে সেটা আগেও দেখেছি।—‘রিপিটার যে ঘড়িও হতে পারে ব্যক্তিগত হতে পারে সেটা অভিধানে দেখেছি, কিন্তু পেরিগ্যাল সবজে কেউ কিন্তু বলতে পারল না।’

মহাদেব টেইলুরী এখনও সেইভাবেই চেবে আছেন ফেনুদার দিকে। এর পাশের থ্রেটাকে মুখরলেন সঙ্গে মেশানো একটা ধারালো তাব দেখা দিল।

‘আপনি কি সব সময়ই কথার মানে জানতে অচেনা লোকের বাক্তি ধাওয়া করেন?’

‘বিশেষ প্রয়োজন হলে করি বইকী।’

আমি ভেবেছিলাম ভদ্রলোক তিনজন বসবেন বিশেষ প্রয়োজনটা কী; কিন্তু তা না করে সেই একইভাবে ফেনুদার দিকে তাকিয়ে থেকে যে কথাটা বললেন, তাতে আমার জান পাশের টেবিলের উপরে ঘড়িটা ফেনুদের টিক্টিক্ক করছে, আমার হংপিণ্টাও টিক সেইভাবেই টিক্টিক্ক করতে আরম্ভ করে নিল।

‘আপনি তো গোরেপা, তাই না?’

ফেনুদার নার্টের বলিহারি। জবাবটা দিতে বোধ হয় পাঁচ সেকেন্ড দেরি হয়েছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এল তারপর গম্ভীর মুখ্যমন্ত্রী।

‘আপনি খবর রাখেন দেখছি।’

‘যাখতেই হয় হিস্টার মিটার। খবর সংগ্রহের জন্য লোক থাকে।’

‘আমার প্রশ্নটা কেব হয় ভুলে গেছে। হয়তো উত্তরটা আপনার
গান নেই। আর যদি কেবেও জবাব না দিতে চান তা হলে আমি ডটি।
বৃথা আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না।’

‘সেই তাউন, মিস্ট্রি মিটার’

ফেনুদা উত্তে পড়েছিল, তাই এই জবাব: লালমোহনবাবুকে দেখে
মন হচ্ছে তাঁর নিজের থেকে গোপ্য অসম্ভা নেই, ধরে উঠিয়ে দিতে হবে।

‘সেই গাউন, মিজ।’

ফেনুদা বসল।

‘রিপিটার হলে বন্দুকও হব’, বলাপেন মহাদেব টোধুরী, ‘তবে তাঁর
মধ্যে পেরিগ্যাল বোম দিলে সেটা হয় ঘড়ি। পকেট ওষাঢ়া ফাঁসিস
পেরিগ্যাল। ইংলিশম্যান। অঞ্চলশ শতাব্দীর শেষভাগে পেরিগ্যালের
মতো ঘড়ির কারিগর পৃথিবীতে করই ছিল। দুশো বছন আগে
ইংল্যান্ডেই সবচেয়ে ভাল ঘড়ি তৈরি হত, সুইটজারল্যান্ডে নহ।’

‘আজকের দিনে একটা পেরিগ্যাল রিপিটারের দাম কত হতে পারে?’

‘সে ঘড়ি কেবার সামর্থ্য তো আপনার নেই মি. মিটার।’

‘তা জানি।’

‘আমরে আছে।’

‘তাও আলি।’

‘তাহলে দাম জেনে কী হবে?’

‘কোতুহল।’

‘ব্যর্থ কোতুহল।’

মি. টোধুরী সিগারেটে শেষ টীক দিয়ে হোস্তার থেকে সেটা খুলে
গালে কাঁচের আশ-ট্রিটে ফেলে দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

‘আপনি যা জানতে চেয়েছিলেন সেটা আপনার জন্ম হয়ে গোছে’,
লক্ষ্মন মি. টোধুরী। ‘এগার আপনি আসুন। পেরিগ্যালে রিপিটার
জন্মভাব থেটা আছে সেটা আমিই পাব, আপনি পাবেন না।—
পঞ্চারেলাল।’

একজন কর্মচারী এসে দাঁড়াল। সেই একই লোক—যিনি আমাদের
ফাঁপিস ধরে বসিবেছিলেন। আমরা উঠে পড়লাম। যখন ঘর থেকে
বেরোল্লি, তখন অধমালের মতো গলাটা আরেকবার শোনা গেল।

‘আমার কাছে অন্যরকম রিপিটারও আছে মি. মিটার; তবে তার আওয়াজ হড়ির মতো সুরেণ্ড নয়।’

‘আপনার বর্তমান কাহিনীর নথিক তো ইনিই বলে মনে হচ্ছে, এলজেন ঝটিল।

আচরা অঙ্গিপুর পার্ক থেকে ফিরছি। গাড়ির কাঁচ আবার তুলে দিতে হয়েছে, করিশ বৃষ্টি। জানেস কোর্ট রোডে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টিটি দেখেছে।

ফেলুদা লালমোহনবাবুর কথার কোনও জবাব না দিয়ে জানলোর বাইরে দৃশ্য দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু একটোলা বেশিক্ষণ কথা না বলে একতে পারেন না। বললেন, ‘জানি নায়ক না বলে ভিলেন বলা উচিত, কিন্তু আপনি যে এলজেন জাইমের ব্যাপারে সকলকেই সন্দেহ করা উচিত—যে কেউ ভিলেন হতে পারে— তাই আর বললুম না। অবিশ্বিত সন্দেহটাও যে টিক কী কারণে করা উচিত, সেটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। কবর খোঁড়াটি কি জাইমের মধ্যে পড়ে?’

ফেলুদা কোনও কথারই জবাব দিয়ে না দেখে লালমোহনবাবু এবার অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—‘ও মশাই, আপনি যে দয়ে গোলেন বলে মনে হচ্ছে: তাহলে আমাদের কী দশা হবে ভেলে দেখুন! একে তো ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে হাড়গোড় নড়বড়ে হয়ে ঘাবার অবস্থা। তারপরে ওই অতঙ্গলা হড়ির চং চং, আর তার উপরে আবার আপনি ওয়, বাইরে বৃষ্টি, রাঙ্গায় গাঞ্জি...’

এতক্ষণে ফেলুদা মুখ শুল্প।

‘আপনার অনুমান ভুল, মি. গাঞ্জী। আমি দমিনি হোটেই। জটিল গোলকধীর মধ্যে পথ পেয়ে গোলে কি লেকে দয়ে? বরং উলটো।’

‘পথ পেয়ে গোহেন?’

‘পেরেছি, তবে পথের শেষে কী আছে তা এখনও জানি না। পথ অভ্যন্ত যোরালো। আরও কেশ কিছুটা গুড়ালে পরে শেষ দেখা যাবে।’

আমরা ধাক্কি ফেরার পরও টিপ্প টিপ্প করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। লালমোহনবাবু বলে গোলেন কাল সকাল সকাল আসবেন।—‘এ ক্ষেত্রায় আমি ধুঁড়া আপনার গতি নেই, ফেলুবাবু। বাস-ট্রামে

ফোরাম্সি করতে পেলে আপনার কল সময় সাগর ভাবন দিকি ?

আজ দুপুর লিঙ্গামে বসে থাকতেই লক্ষ করেছিলাম, ফেলুন তার বাতায় কী যেন ছিজিবিজি কাটছে; খাবার পর ওর ঘরে এসে জনতে পরিলাম সেটা কী। ও যে আমাকে জেকে পাঠিয়েছিল তা নয়; এমনিতেই আমার ওর জন্য ভাবন হচ্ছিল; মহাদেব ঢোবুরীকে দেখে আর তার কথা শুনে অবধি মুশ্টিখা হচ্ছিল; উদ্দলোকের মুখটা মনে করলেই কেমন জানি দুর্বল কেপে উঠছিল। লাগমেহলবাবু হিন্দো ভিলেন বা ইছে তাই বলুন না কেন, আমার কাছে উমি একটি ভয়াবহ চরিত্র। বাইরেটা মরমল হলে কী হবে, তিতুয়া থে মকড়ুমির খাটি-বোপের জঙ্গি।

অবিশ্বি ফেলুনাকে দেখে মনেই হল না যে তার কেনও দুষ্টিখা হচ্ছে। সে এখন সাধনে পাতা খুলে বসে একমনে একটা নকশার দিকে দেখছে। আমি চুকাতে ‘এই স্যার শাখাঅশাখা’ বলে খাতাটা আমার দিকে এগিকে দিল। তাতে যে জিনিসটা আঁকা রয়েছে সেটা আমি খুলে দিছি—

টাইম গড়টাইন
[১৯৮৮-১৯৯৮]

জাতিক গড়টাইন [১৯৯৩-১৯৯৮]	জাতি গড়টাইন [১৯৯৮-১৯৯৯]	শাখাগড়টাইন(বিষ বয়স্মি) [১৯৯৯-১৯৮৯]
আন্ত, গড়টাইন [১৯৯৭-১৯৯২]	?	?
চলবস্তি গড়টাইন [১৯৯০-১৯৯১]		
মার্কিন গড়টাইন [১৯৯৪- ৩]		
কিস্টোশালু গড়টাইন [৩ - ৩]		

‘তাম মিকটা কী রকম আলি-আলি সাগছে না?’ বলল ফেলুন।

আমি বললাম, ‘তা তো লাগবেই। শার্ট তো বিয়েই করেনি।’

‘শার্টকে নিয়ে সমস্যা নয়। সমস্যা ওই জন বাতিটিকে নিয়ে। ওই একটি শব্দের বাকি অশ্টা সুবিধার আছে। অবিশ্বাস্য একটা পিনিস উলটো অবস্থার দেখেছি; সেটা সোজা দেখলে পরে কিছুটা আলোকপাত হতে পারবে। অর্থাৎ কখন সকাশে।’

এটা ফেলুনার একটা অর্কমারা হৈয়ালি; আর যখন হৈয়ালি করে বসছে, তখন হৈয়ালি করবার অন্তর্ভুক্ত বশেছে।

আমাদের কথার ফাঁকেই বৃষ্টিটা যেমে গিয়েছিল। ফেলুনাকে হঠাৎ ব্যাক্তভাবে বিহুনা থেকে উঠতে দেখে অবাক জাগল।

বললাম, ‘বেরোবে নাকি?’

‘হৈয়েস স্যার।’

‘সে কী? কোথায়?’

‘ডিউটি আছে।’

‘কীসের ডিউটি?’

‘পাহারা।’

তার হাতিঁ বুট-জোড়া বার করে রেখেছে ফেলুনা সেটা এন্টক্ষণ দেখিলি। ওটা দেখালেই আমার গায়ে কাঁচা দেয়, কারণ ফেলুনার প্রত্যেকটা বিশ্বাত তদন্তের সঙ্গে ওটা জড়িয়ে আছে। যাবাবাড়িরে সৌরহানে চলতে হলে ওটা ছাড়া গতি নেই।

‘গোবরহানে?’ ধূম গূলায় ডিজেস করসাম আমি।

‘আর কোথায় বস?’

‘একা বাবে?’

‘চিঙ্গা নেই। সঙ্গী আছে। নিপিটির।’

ফেলুনা আলমারি থেকে তার ৩২ কোষ্টো বার করে পকেটে পুরান। আমার তাজ সাগছে না ব্যাপারটা যোটেই। বললাম, ‘কিন্তু ওখানে কী ঘটলা ঘটবে বলে আশা করছ? ব্যবহ তো বৌড়া হয়ে গেছে। ঘড়ি বলি পেছে থাকে সে তো নিয়ে গেছে।’

‘নেয়নি। যে বা ধারা ঝুঁড়ছিল তারা মড়ার খুলি দেখেই ভরে

পালিয়েছে। নইলে ওভাবে কেবল ফেলে দিয়ে যায় না। হয় নিয়ে
যাবে, না হয় লুকিয়ে রাখবে।'

এ জিনিসটা আমার এবেবাবেই খেয়াল হয়নি।

॥ ১০ ॥

কেলুদা ফিরেছে কখন জানি না। আমি যখন উঠে নীচে নেমেছি,
ওখন পুর ঘরের দরজা বন্ধ; তখন বেজেছে সোয়া সাতটা। বুরুলাম দু
রাত না ধুমিয়ে সকালে একটু ধুমিয়ে নিলে।

ন-টার সময় ও দরজা খুলল। ফিটফট দাঢ়ি কামানো চেহারা,
তাঁখে-মুখে কোনও ঝাঞ্জির ছাপ নেই। বুড়ো আঙুল নেড়ে ধুকিয়ে লিল
রাত্রে কিছু হটেনি।

সাড়ে ন-টার জটায়ু এলেন।

‘দেখুন তো কীরকম জিনিস।’

জটায়ু তাঁর কথামতো তাঁর ঠাকুরদামার ঘড়িটা নিয়ে এসেছেন।
কুপোর ট্যাক্সি, তাঁর সঙে বুলছে কুপোর চেন।

‘বাঃ, দিয়ি জিনিস,’ ঘড়িটা হাতে নিয়ে বলল কেলুদা।
‘কুকুরেজতির বেশ নাম ছিল এককালে।’

‘কিন্তু সে জিনিস তো হল না’—আক্ষেপের সূরে কল্পনা
লালমোহনবাবু। ‘এ তো কলকাতার তৈরি ঘড়ি।’

‘কিন্তু আপনি সত্যিই এটা আমাকে দিছেন?’

‘উইথ মাই রেসিস অ্যান্ড বেস্ট কম্প্রিমেন্টস। আপনারে চেরে
সাড়ে তিনি বছরের বড় আমি, সুতরাং আমার কাছ থেকে আশীর্বাদ
নিতে আপনার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই।’

কেলুদা ঘড়িটাকে কমালে মুড়ে পকেটে রেখে টেলিফোনের দিকে
এগোল। কিন্তু ডায়াল করার আগেই মাত্রার দিকের দরজার কড়টায়
নাড়া পড়ল।

খুলে দেখি শিরীনবাবু। ইয়ি কাল হিচ দিলেও, সত্তি করে যে
আসবেন, আর এত তাড়াতাড়ি আসবেন, সেটা জানিনি। কাজে
বেরিয়েছেন সেটা বোধ যাচ্ছে পোশাক দেখে—কেট প্যাট, হাতে

একটা ঝিলুক্স।

‘টেলিফোনে দশ মিনিট ডায়াল করেও লাইন প্লেম না। কিছু মনে করবেন না।’ উত্তোলকের হাতচাব চোখেন, নার্তস।

‘মনে করবার কিছু লেই। টেলিফোন তো না ধাকারই সামিল। কী বাপার কলুন।’

উত্তোক সোফায় না বসে একটা কেজারে বসপেন। আমি অরু ভট্টাচু উত্তোলে, ফেলুদা সোফাত।

‘কার কাছে যাওয়া উচিত ঠিক বুঝতে পারছিলাম না’, কল্পাল দিয়ে বক্ষালের যাম মুছে বললেন পিরীন বিশাস, ‘পুলিশের ওপর পুর ভৱন নেই, ফ্লাষলি কলছি। ঘটনাচক্রে আপনি ঘর্খন এসেই পড়লেন...’

‘সহসাটা কী?’

পিরীনবাবু গলা থাক্রে নিলেন। তারপর বললেন, ‘দাদার মাথায় গাছ পড়েনি।’

আমরা তিনভাবেই চুপ, উত্তোকও কথাটা বলে চুপ।

‘তাহলে?’ প্রশ্ন করল ফেলুদা।

‘মাথার বাড়ি মেরে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল আকে।’

ফেলুদা শাজসামুহে চারছিলায়ের প্রাক্কেটো উত্তোলকের সিকে এগিয়ে দিলে তিনি প্রজ্ঞাধ্যান করাতে সে নিজের জন্য একটা বার করে বলল, ‘কিন্তু আপনার দাদা নিজে যে কলসেন গাছ পড়েছিল।’

‘তার কারণ দাদা মরে গেলেও তার নিজের ছেলের নাম প্রকাশ করবে না।’

‘নিজের ছেলে?’

‘প্রশান্ত। বড় হলে। ছেটাটি বিলেতে।’

‘কী করে প্রশান্ত?’

‘কী না-করে সেইটে ঠিক্কেস করুন। যত রুকম গর্হিত কাজ হজে পারে। গত তিস-চার বছরে এই পরিষর্তন। দাদা দুই ভাইকে সমান ভাগ দিয়ে উইল করেছিল। বউদি মারা গেলে সেভেনটিতে। মাসবাবেক আসে দাদা প্রশান্ত-র ব্যবহারে বিস্তু হয়ে তাকে শাসার; বলে তাকে উইলচৃত করবে, সব টাকা সুশাস্তকে দিয়ে দেবে।’

‘প্রশান্ত আপনাদের বাড়িতেই আকে তো?’

‘আকার অধিকার আছে, তার জন্ম ঘর আছে আলাদা, তবে থাকে না: কেখায় থাকে বলা শুরু। তার দল আছে। উখন তাইসের ওপা সব। আর বিশাস সেনিন ও খুন্দ করে ফেলত, যদি না সাংগতিক লাভটা এসে পড়ত।’

‘আপনার দাদা এ বিষয় কী বলেন?’

‘দাদা বলছে, সত্ত্বেই গাহ পড়েছিল। সে জেনে-শনেও বিশাস করতে চাইছে না যে তার ছেলে তার মাদার জন্মের জন্য দায়ী। কিন্তু দাদা বাই বলুক না কেন—অমার নিজের তাইসে হলোও কলছি—আপনি একটা কিছু বিহিত না করলে সে আকার খুন্দের চেষ্টা দেখবো।’

‘মরেনবাবু, যদি নতুন উইল করেন তাহলে তো আর তার ছেলের তাকে খুন করে কেনও অধিক খুব ইবে না।’

‘অধিক লাভটাই কি বড় কথা মিস্টার মিস্টির? সে তো খেপে পিটেও খুন করতে পারে। অতিশেষের জন্য কি যদুব খুন করে না?—আর দাদা উইল চোলা করবে না। তার মাপার ঠিক নেই। অপর্যন্তে যে কন্দূর ষেতে পারে তা আপনি জানেন না, মিস্টার মিস্টির। এ ক-দিন আমি বাড়িতেই ছিলাম, কিন্তু আজ আমাকে একটু বলকাতার বাইরে যেতে হলো দু-তিন দিনের জন্য, ব্যবসার কাজে। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি যদি ব্যাপারটা...’

‘মিস্টার বিশাস,’ ফেলুদা পায় এক ইঞ্চি জমা ছাইটা অ্যাপ-টেলে কেলে দিয়ে বলল, ‘আমি অসম্ভ দুঃখের সঙ্গে জানছি আমি আরেকটা তদন্তে অভিযোগ পড়েছি। আপনার দাদার প্রোটেকশনের একটা ব্যবস্থা করা উচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি নিজেই যদি জোর গলাক বলেন যে তাঁর মাথায় গাছ পড়েছিল, তাঁকে কেউ হত্তা করার চেষ্টা করেনি—তাহলে পুলিশের বাবাও কিছু করতে পারবে না।’

শিরীনবন্দু অনেকদিন-পরে-রোদ-গঠা সকালের মেজাজটা বিগড় দিয়ে বিদায় নিলেন।

‘বিচির ব্যাপার’, বাসে ফেলুদা সোকা ছেড়ে উঠে পিয়ে টেলিফোনে নম্বর ডাকাল বাবল!

‘হ্যালো, সুহুদ? আমি ফেলু কলছি আ...’

সুন্দর সেনগুপ্ত ফেলুদার সঙ্গে কলেজে পড়ত এটা আরি জানি।

‘শোম—তোর বাড়িতে একটা প্রেসিডেন্সি অসলজ ম্যাগজিনের শতবর্ষিকী সংখ্যা দেখছিলাম—তোর দাদুর ক’র্প—যদুর মনে হয় পৰিশৰতে বেরিয়েছিল—সেটা আছে এখনও?...বেশ, ওটা তুই বেরেবের সময় তোর চাকরে হাঁড়ে রেবে থাস, আমি দশটা-সাতকে দশটা নাগাত শিয়ে নিয়ে আসব...’

অমরা তা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তিনি জ্যোগার যাবত আছে ফেলুদার—নরেনবাবু, বোর্ন অ্যান্ড প্রেপার্ড আৰ পৰ্ক ট্ৰিট গোৱাল। নরেনবাবু শুনে একটু অবাক হলাম। ফেলুদাকে বলতে বলল, ‘পিটীনবাবুকে মুখে যাই বলি না বেস, খুঁর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। কমজোহ একবার খাওয়া দৰকার। তৃতীয় আয়গাটায় তোদের না গেলেও চলবে, তবে বাথের পাহারাটায় আজ ভাবছি তোদের নিয়ে থাব। সোনালীনে মাঝারাতিনের আটিমোসফিরারটা অনুভূত না কৰা যাবে একটা অসমান্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।’

‘জহু মা সজোষী,’ বললেন লালমোহনবাবু। তারপৰ মাঝপথে একবার বললেন, ‘মশাই, সন্ম অক টারজানুর মতো সান অফ সজোষী কৰা যায় না?’—বুবজাম পুলক ঘোষালের অফারটা নিয়ে ভদ্রলোক একমাত্র ভাবা শেখ কৰেননি।

নরেনবাবু যদিও শৰীরের সিক দিয়ে অনেকটা সুস্থ—বললেন ব্যাধি-ট্যুন্ডা প্রার সেৱে গেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাডেজ চুলবেন—তবু খুঁর চাহলিটা ভাল লাগল না। কেমন যেন তকনো বিষণ্ণ ভাব।

‘আপনাকে শুশু মু-একটা প্ৰৱ কৰার আছে,’ বলল ফেলুদা, ‘বেশি সহয় নেব না।’

ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ‘কিছু অনে কৰকেন না—আপনি কি কোনও উন্নত চালাক্ষেত্ৰ অপনি গোহেন্দা জেনেই এ প্ৰস্তাৱ কৰছি।’

‘আপনি টিকই আসাজ কৰৱেনন,’ বলল ফেলুদা। ‘মে ব্যাপারে প্ৰচুৰ সাহায্য হবে যদি আপনি সত্য গোপন না কৰেন।’

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ কৰলেন। আনন্দ সৰূপ যন্ত্ৰণাবোধ কৰলে পেটাকে সহ্য কৰার চেষ্টাৰ শনুবৰে হেভাবে চোখ বন্ধ কৰে এও সেই

রুক্ষ। মনে হল তিনি আনন্দাত্ম কারেছেন যে ফেনুদার জেরাটি ওঁর পক্ষে কষ্টকর হবে। ফেনুদা বলল, 'আপনি হাসপাতালে জন হবার পরমুচ্চর্তে উইল সম্পর্কে কিন্তু বলতে চাইছিলেন।'

নরেন্দ্রবাবু সেইভাবেই চোখ বল করে রইলেন।

'উইলের উল্লেখ বেল সে স্বাক্ষর কর্তৃ আলেকপাও করবেন কি ?'

এবাব নরেন্দ্র বিখ্যাস চোখ খুললেন। তার ঠিক নড়ল, কাঁপল, তারপর কথা বেরল।

'আমি আপনার কথার জবাব নিতে বাধ্য নই মিশচ্ছই ?'

'মিশচ্ছই না।'

'তাহলে দেব না।'

ফেনুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ। আরো সবাই চুপ। নরেন্দ্রবাবু দ্রষ্টি ধূরিয়ে নিরেছেন।

'বেশ আমি অন্য প্রশ্ন করছি' বলল ফেনুদা।

'জবাব দেওয়া না-দেওয়ার অধিকার কিন্তু আমার।'

'একশোবার।'

'বলুন।'

'ভিট্টেমিয়া কে ?'

'ভিক-টোরিয়া... ?'

'এখানে বলে রাখি আমি একটা অন্যায় করে করে ফেলেছি। আপনার বাগের ভিতরের কাগজপত্র আমি দেখেছি। তাতে একটি লিপ-এ—'

'ও হো হো।'—ভদ্রলোক আমাদের বেশ চমকে দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন।—'ও তো মাকাতার আমলের বাপার ! আমি ও প্রায় ছুলেই শিয়েছিলাম। আমি তখনও চাকরিতে। এক আংশে ইঞ্জিনিয়ান কাজ করত আমাদের আপিসে—নর্টন— জিমি নর্টন। বললে তার ঠাকুরার দেখা গুচ্ছের ঠিক রয়েছে অদের বাড়িতে। সে ঠিক আমি চোখেই দেখিনি। এই ঠাকুরা নাকি মিউনিসিপাল সংস্থার বহুমন্দিরে ছিলেন তখন পাঁচ সাত বছর বয়স। ঠিকভো পরে লেখা, কিন্তু তাতে তার ছেলেবেলার অভিজ্ঞতার কথা আছে। আজকাল তো এ সব নিয়ে বই-টই খুব বেরোচ্ছে, তাই নর্টনকে বলেছিলাম কিন্তু বিসিতি

পাবলিশারের নাম দিয়ে দেব। সে নিজে এ সব ব্যাপারে একেবারে আনন্দি। সৌভাগ্য—কাগজটা বার করি।’

নরেনবাবু বাঁ হ্যাত বাতিলের টেবিলের উপরের দেরাজটা খুলে খাগ থেকে ভার টিপ্পটা বার বনাসেন।

‘এই বে—বোর্ন অ্যান্ড স্পেশার্ড। ওকে দেখতে চেয়েছিলুম খোজ করে দেখতে পারে, ওখানে শুর ঠাকুরমার কেনও ছবি পাওয়া যাব কি না। আর এই বে সব পাবলিশারের নামের অস্তুক্ষণ। এ কাগজ আর তাকে সেওয়া হয়নি, বাবুল বাট্টনের জন্মিস হয়। দেড়মাস ট্রিটমেন্টে ছিল, তাহলে চাকরি ছেড়ে দেয়।’

ফেলুদা উঠে পড়ে। ‘ঠিক আছে, পিটার বিখাস—তবু একটা ব্যাপারে আকেপ প্রকাশ না করে পরাছি না।’

‘কী ব্যাপার?’

‘আপলি ভবিষ্যতে কেনও লাইনের কোনও বই বা পরিকা থেকে কিন্তু ছিঁড়ে বা কেটে নেবেন না। এটা আমার অনুরোধ। আসি।’

ঘর থেকে বেরোবার সময় ভদ্রলোক আর আমাদের মুখের দিকে চাইতে পারসেন না।

বেঙ্গলিন্দু স্ট্রিটের সুস্বদ সেনগুপ্তের চাকর একটা ডাউস বই এনে ফেলুদাকে দিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাঞ্চিমেন্স প্রতিবার্ষিকী সংখ্যা। সেটা ফেলুদা সারা রাস্তা কেন বে এত মন দিয়ে দেখল, আর দেখতে দেখতে বেজ বে বার তিনেক ‘বোর্ন ব্যাপারবানা’ বলপ সেটা বুবাতে পারলাম না।

বোর্ন অ্যান্ড স্পেশার্ড ঢুকে ফেলুদা দশ মিনিটের মধ্যে একটা শত লাল খাম নিয়ে বেরিয়ে এল। সেখেই বোকা যায় তার মধ্যে বড় সাইজের ফোটো রয়েছে।

‘কীসের ছবি আনলেন হশাই?’ তিন্দোস করাসেন সালমোহনবাবু।

‘পিউটনি,’ বলল ফেলুদা। আমি আর লসলমোহনবাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ফেলুদার কহার মানে ছবিগুলো নট ফর দ্য পাবলিক।

‘গোরস্থানে আর আপনাদের ভেতরে টানব না; আমি তবু দেখে আসি সব ঠিক আছে কি না।’

আমরা মাড়িটা ঘুরিয়ে পোরস্থানের ঠিক সামনেই পার্ক করলাম।

ফেলুদা হখন গেটি দিয়ে চুকল, তখন দেখলাম নারোয়ান বরখদেও
বেশ একটি বড় রকমের সেপাথ টুকল।

দল মিনিটের মধ্যে ফেলুদা ফিরে এসে 'ওকে' বলে গাড়িতে উঠল।
তিক হস রাঙ শাড়ে দশটার আমরা আবার এখানে ফিরে আসছি।

আমার মন বলছে আমরা নাটকের শেষ অঙ্কের সিকে এসিয়ে
চলেছি।

॥ ১১ ॥

ফেলুদার সঙ্গে এতবার এত জায়গায় ধূঁধেছি বহসের পিছনে
পিছনে—সিকিম, লাবনী, রাজস্থান, সিংহলা, কেন্দ্রস্থানেই
অ্যাডডেকারে কমতি পড়েনি; কিন্তু এই কলকাতাতে বসেই এমন
একটা রঙ-হিঁ-করা বহসের জালে জড়িয়ে পড়তে হবে এটা
কেন্দ্রস্থিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিশেষ করে আজকের দিনটা, লালমোহনবাবু যেটার নাম
মিহেছিলেন ঝ্যাক-সেটার ডে—হাঁড়িও সেটাকে আবার পৰে বদলিয়ে
করলেন ঝ্যাক-লেটার নাইট। আর পার্ক স্ট্রিট সেমেট্রি সবাজে
বসেছিলেন, 'ফেলেবেলার মেজো জ্যাঠা দুঃখিয়েছিলেন ওটাকে বলে
গোরহান, কানুন ওখানে গোরাদের সমাধি আছে। এখন মনে হচ্ছে
নামটা হওয়া উচিত গেরোহান। এখন গেরোয় এর আগে পর্ফিচি
কল্পনা উপেশ? তোমার মনে পড়তে?

সত্ত্ব বলতে কী, অনেক ভেবেও মনে করতে পারিনি।

লালমোহনবাবু এমনিতেই পঁঠুয়াল; গাড়ি হবার পর মেজাজটা
আরও চিঙিটারি হয়ে গোছে। আসে কড়া নাড়তেন, অজ্ঞ সেখি নক
করনেন। আমরা দু জনেই খেয়েদেহে তৈরি হয়ে বসেছিলাম। আজ
ফেলুদার সঙ্গে আমাকেও হাটিং বুট পরতে হয়েছে। আমারটা
প্রত বছর বেলা, ওয়টা এপ্রারো বছরের পুরালা। বোধহয় অবহৃতি ধূ
ভাস নষ্ট বলে বিকেলে দেখেছিলাম ও নিজেই সুকলদায় কী সব
হেরাঘড়ের কাজ করছে। এখন একটু বেঁড়াছে দেখে মনে হল শুভি
ভাকিয়ে কাঞ্চটা করালেই ভাল হত। এই বিপদের বাবে খৌজালে

চলবে বেন?

দাঙুর টোকা পড়তেই আমরা উঠ পড়লাম। ফেলুদার কাঁধে
ঘয়েরি রঙের শাস্তিনিয়কতাসি বোলা, তার ভিতর থেকে সাক থামের
বানিকটা বাইরে বেঁচিয়ে রয়েছে। এখানে বলে বাঁধি, বেই
কুমুদমাণিক আঙ আমরা সকলে গত রঙের পোশাক পরেছি।
লালামহেনবাবু পরেছেন একটা কালো টেরিতাটের সুট।

ভদ্রলোক ঘরে চুক্তেই বললেন, ‘ফর্জার্ন মেডিসিন কেখের পৌছে
গেল মশাই!—একটা মডুল মার্ট-পিল বেরিয়েছে—নামটায় আবার
দুটো ‘এক্স’—ভকে ডাঙুরের সাঙ্কেশনে তিনারের পরে একটা খেয়ে
নিশ্চুধ—এরই মধ্যে সমস্ত শরীরে বেশ একটা কলপ-দেওয়া কিলিং
হচ্ছে। তঙ্গেশ ভাই, যা থাকে কপালে—লড়ে যাব, কি খেলোঁ’ কীদের
সঙ্গে লড়বেন সেটা অবিশ্যি উনিও জানেন না, আমিও জানি না।

ফেলুদা আগেই ঠিক কয়েছিল গাড়িটা গোরহানের সেট থেকে বেশ
কিছুটা দূরে রাখবে—‘গাড়ির রঁটা আপনার আঙকের পোশাকের
সঙ্গে ম্যাচ বস্তু অঙ্গটা চিপ্তা করতাম না।’ সেট জেভিয়াস ছাড়িয়ে
রাঙ্গন ট্রিটের মোড়ের একটু আগেই ও গাড়িটা থার্মতে বলল। ‘তোরা
এগিয়ে যা’ গাড়ি থেকে নেমে বলল ফেলুদা, ‘তামি হারিপদবাবুকে
ক্ষয়কর্তা ইন্ট্রাক্ষন দিয়ে আসছি।’

আমরা এগিয়ে গেলাম। ফেলুদা কি ইন্ট্রাক্ষন দিল জানি না, কিন্তু
এটা জানি যে হারিপদবাবু এ ক-দিন আমাদের বাণিকারখানা দেখে
আর কথাকৰ্তা শুনে রীতিমত উৎসাহ পেয়ে গেছেন। এটা ঠুঠ
হাবেভাবে বেশ বোৰা যায়।

মিলিট ডিনিকের মধ্যেই ফেলুদা ফিরে এল। বলল, ‘আপনার জাক
ভাল মি. গান্ধুলী যে আপনি এমন একটি ভাইজার পেয়েছেন।
ভদ্রলোককে কাজের দায়িত্ব দিয়ে বেশ নিশ্চিত হওয়া যাব।’

‘কী দায়িত্ব দিলেন মশাই?’

‘এদিকে গন্ধোস না হলে কেনও দায়িত্ব নেই, আর হলে ঠুঠ
উপর বেশ খানিকটা ভয়সা রাখতে হবে।’

এব বেশি আর ফেলুদা বিছু বলল না।

লোহার ফটকের সামনে পৌছে দেবি সেটা ঘোলা। ফেলুদাকে



ফিসফিস বরে জিজেস করাতে ও ফিসফিস করে উভর দিল যে
এমনিতে এ সময় খোলা থাকে না। কিন্তু আজ স্টোর ব্যবস্থা করা
হয়েছে। 'পাঁচলের উপর কাঁচ বসানা, টপকানা রিপকি, তাই এই
ব্যবস্থা। কিন্তু ব্রহ্মদেও আছেন কি?'

দারেয়ানের ঘরে টিমটিন করে বাতি ব্রহ্মে, খিঁড় সেখানে কেউ
আছে বলে মনে হল না। আরো ঘরের আশপাশটি ঘুরে দেখান্ত
কেউ নেই। পার্ক টিটি থেকে আসা কিন্তে আসোতে দেখতে পান্তি
যেগুলোর জন্ম। বুকলাম দারেয়ানের সঙ্গে যা ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে
ওর থাকবার কথা।

আমরা এগিয়ে গেলাম। আজ আর মাধ্যাদের সেই পেটা দিবে নহ। সেটা দিয়ে করেক পা গিয়েই ফেলুন বায়ে চুল। আমরা সমাধির ভিত্তির মধ্যে দিয়ে অসোজে জাগলাম। বাতাস বইছে কেশ জোরে। আবাশে ফালি ফালি মেঘের দ্রোত। তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে বিকে আধা-চৌটা উকি মেরেই আবার দুরিতে পড়ছে। সেই ধৰ্মের আলোজে ফলকের নামওসো এই আছে এই নেই। এই আলোজেই বৃক্ষলাভ আমরা স্যামুয়েল কাখবৰ ধর্মহিপের সমাধিজ্ঞে আশ্রয় নিলাম। এটা সরু হয়ে উঠে বাওয়া ওবেগিঙ্গ নহ। এর নীচে বেদি, বেদির উপর চারিদিকে বিরে থাম আর মাথায় পন্দুজ। ডিনজন লোকে দিয়ি আপটি মেরে থাকতে পারে। এখনে আলো পৌছোয় না, তবে সুবিধে এই যে ডান দিকে চাইলে অন্য সমাধির ফাঁক বিয়ে শোহুর ফটকের একটা অংশ দেখা যাব।

এ গোরস্তানে এখন আমরা ছাড়া কেউ থাকতে পারে না ভেবেই ফেলুন মুখ পুলুল; তবে মনা তুলল না।

‘এটা ছড়িয়ে নিন তো একটু আশেপাশে।’

ফেলুন খোলা খেকে একটা ছিপি-আঁটা খোকে বার করে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

‘জ্ঞান—ছড়িয়ে ন’

‘কার্বলিক আসিঙ্গ। সাপ আসবে না। চারদিকে হাত চারেক দূর অবধি ছিটে দিলেই হবে।’

লালমোহনবাবু আজ্ঞা পালন করে এক মিনিটের মধ্যেই কিনে এসে কলেন, ‘যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গোল। সাপের গুরটা মশাই নার্ভ-পিসেও যায় না।’

‘ভুতের তর গেছে?’

‘টেটালি।’

যাঁও ডাকছে। বিয়ি ডাকছে। একটা দিকি বোধহয় আমাদের প্রাশোর ক্ষেত্রেই আতমা গেড়েছে। চলত মেঘের এক-একটা খণ্ড বোধহয় একটু বেশি হন বলেই অঙ্ককারটা হঠাৎ-হঠাৎ গাঢ় হয়ে উঠছে। তার কলে সমাধিগুলো তালগোল পাবিত্রে চোখের সামনে একটা জমাট বাঁধা অঙ্ককার ছাড়া আর কিন্তুই দেখা যাচ্ছে না। আবার

মেঝে চাঁদ মেরে ক্ষে অমনি সমাপিঙ্গলোর এক পাশে আসো পড়ে
ফেরলো পরম্পর থেকে ঝুল্জা হয়ে যাচ্ছে।

ফেরলুদা পকেট থেকে চিকিৎসা বার করে আমাদের সিয়ে জিজে
ন্দে মুখে পুরুল।

গাড়ির শব্দ ক্রমেই কম্বু আসছে। এক দূই ডিন করে সেকেন্ড শুনে
তিমার করে বেখলাম একটানা প্রায় আধ মিনিট ধরে ব্যাং বিকি আর
দমক। হাওয়ার পাতার সরসর জড় আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

‘মিডনাইট’, চাপা হয়ে লালমোহনবু বললেম।

মিডনাইট কেন বললেন? আমি দু মিনিট আগে হাত বাড়িরে আমার
পিস্টোয়াক চাঁদের আসো কেলিয়ে দেখেছি বেজেজে এগারোটা
পরিশ। জিজেস করাতে বললেন, ‘না, এমনি বলছি। মিডনাইটের
একটা বিশেষ ইয়ে আছে জ্ঞে।’

‘কী ইয়ে?’

‘গেরস্থানে মিডনাইট তো—তার একটা বিশেষ ইয়ে আছে।
কোথায় বেন পড়িচি।’

‘তখনই ভুত হেরোয়?’

গালমোহনবাবু কফেকবার ‘ঝঝ’ ‘ঝঝ’ বলে শেষের বার এক-এক
‘ঝ’কে সাপের মতো কিন্তু কিন্তু টেনে রেখে চুপ হেয়ে গেলেন। আমার
পাশে একটা প্রায়-শোনা-যায়-না খচ শব্দ থেকে বুরলাম ফেরলুদা
হাতের আড়ালে দেশলাহি জালাল। তারপর হাতের আড়ালেই একটো
পাপমিলার ধরিয়ে হাতের আড়ালেই টান দিয়ে ধোঁয়া হাড়ল।

আকাশে হেয় বাড়ছে। গাড়ির আওয়াজ হাওয়া। হাওয়ার আওয়াজ
হাওয়া। সব সাড়া, সব শব্দ শেষ। কাছের বিকি ঠাতা। আমার শরীর
ঘাণা, গলা শুকনো। টেট চেটে টেটি ভিজল না।

টা-এর পরে একগাদা ঝ-ফলা দিয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। এক
মলে দুটো থাইকের আওয়াজে বুরলাম লালমোহনবাবু হাত দিয়ে
হাইস্পেডে কান ঢাকলেন। ফেরলুদা বীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

একটা গাড়ি থেমেছে। কতদুরে, সেটা এত রাত্রি বেবো যাবে না।
দরজায় বস্তুর শব্দ। মন বস্তুর শব্দটা উন্তরে পার্ক স্টিট থেকে নয়,
পশ্চিমের রাজ্ব স্টিট থেকে। ওদিকে গেট নেই, পাঁচিল আছে;

পাঁচিলের উপর কাঁচ ইঞ্জিনো।

আমাদের চোখ তবু তোহার পেটের নিকে। সালমোইনবাবু হঁহ খুলতে বাহিলেন, ফেলুন আমার কাঁচের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে উর কাঁচে চাপ দিয়ে ধামিয়ে দিল।

কিন্তু কেউ তো আসছে না গেটের নিকে।

হয়তো গাড়ি কন্ত কোথাও অন্য বাসরে থেমেছে। কন্ত বাড়ি তো রয়েছে চারপাশে। হয়তো কেউ নাইট-শো দেখে ফিরল। আশা করি তাই; তাহলে আর এ গাড়িটা মিয়ে ভাববার কিন্তু থাকে না।

ফেলুন কিন্তু স্টাইল দাঁড়িয়ে আছে, পিছনের দেয়ালের সঙ্গে সৈথিয়ে। তার সামনেই একটা থাম। চারিদিকে বাদুড়ে অক্কার। কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।

কিন্তু আমরা তাসের দেৰব কী করে? যদি তারা এসে থাকে?

দেৰবার দৰকার নেই। একটু পৰেই সেটা বুরতে পাৱলৈ। চোখের দৰকার নেই। কাজ কৰবে বান।

বুপ...বুপ...বুপ...বুপ...

হাটি শৌকার শব্দ। বিকুঁফল চলল শব্দ। আমরা নকারাসে শুনতি।

বুপ...বুপ...

শব্দ থেমে গেল।

একটা আলো। দুরে দুটো ওবেলিক্সের কঁক দিয়ে বাসের উপর কীণ আলো। প্রতিক্রিয়াত আলো।

আলোটা ক্ষির নত—সূলছে, নড়ছে, খেলছে। উচ্চের আলো।

এবার নিম্নে গেল।

‘পাঁচিল টপকে এসেছে’ দৌড় চিপ্পে মন্তব্য কৰল ফেলুন। তারপর বলল, ‘ফলো কৰব?’ বুকাম আবৰ গাড়ির আওয়াজের অপেক্ষা কমছে ফেলুন।

এক মিনিট।

দু মিনিট, তিন মিনিট, চার মিনিট।

‘ক্রেঙ? বলল ফেলুন।

কোনও শব্দ আসছে না আৰ পাৰ্ক ছিট থেকে। রাতেন ছিট থোকেও না। যে গাড়িটা এসেছিল সেটা থেমেই আছে। তাহলে?

আবারও দু রিন্টি গেল। আবার মেঘে ফাটল। চাঁদ বেয়েল। কেউ হোপাও আই।

‘পুর এটা—’

ফেলুন্দা তার ঝোলটা আমহে দিয়ে সাসে নামল। যেদিকে আপোটা দুখেভিশাখ সেজিকে এগিয়ে দেল। ক্ষয় নেই—ওর পকেটে কেন্ট ৩২। ১০৪ এপ্রিল শিগগিরাই তার গর্জন এই সোনাহাজের ক্ষতি নিষ্কৃতা যাবা-খান হতে চলেছে। কিন্তু পা বে খৈড়া ওর। সামাজি হলেও খৈড়া। কেন বে সর্দিরি করে নিজে জুতে সামাজি গেল জানি না।

কিএ কই? কোল্টের গর্জন?

‘ভুল করলেন,’ খুঁতড়ে গল্যায় বলাকেন জটিয়। ‘তেমার দাদা ভুল করলেন।’

আব যেন কষা না বলেন তাই আমি জিভ দিয়ে সাপের শব্দ করে শুনে থামিয়ে দিলাম। ফেলুন্দা কয়েক পা ধাপিয়ে গিয়েই অন্ধকারে পিলিয়ে গেছে। কী ঘটছে এই সহাধিক্ষেত্রের মধ্যে কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা শব্দ পাওয়া গেল কি? কানের ভুল নিষ্কৃত।

মিলাইতে? এটা কোন ঘড়ি? সেন্ট পলস? হাওয়া শব্দিক থেকেই। পশ্চিম হাওয়া হলে মাঝিরে আলিপুরের চিকিৎসাবাজার সিংহের গর্জন শেখে যায় আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে।

ওই যে গাড়ির শব্দ!

দরজা বুক হল। স্টার্ট নিল। তারপর হস।

আব বসে থাকা যাবে না। তব করছে না; শুধু ভাবনা।

উচ্চে পড়লাম দু অনেই। শালমোহনবাবুর বিড়বিড়ানিকে কান দেব না; সহজ দেই।

এগিয়ে সোনাম দ্রুত পায়ে। যেরি এগিসের কবর। কবরের দেয়ালে হাত দিয়ে যেযে এগোচ্ছি। জটায় আমার শার্ট খাবতে আহেন পিছন থেকে। পায়ের তসায় ধাস একলও ভিজে, একলও ঠাণ্ডা।

জন মার্টিনের কবর। সিনথিয়া কেলেট। ক্যাশেল এভানস। এবার একটা ওয়েলিংস্ট। কালো ফসকের উপরে—

৪৬—

পায়ের ডলার কী জানি পড়ল। মুদু শব্দ করে চেপটে গোল। পা

শরিয়ে নীচের দিকে চাইলাম। চাঁদের আশে রয়েছে। হাতে ঝুলে
নিলাম জিনিসটা।

চার্মিনায়ের প্যাবেট।

বাঁচি না। অনেক সিগারেট রয়েছে ভিতরে। সব চ্যাপটা,
ফেপুদা—

আর কিছু মনে নেই—কেবল মুখের উপর একটা চাপ, আর
লালমোহনবাবুর এক ছিলতে আর্তনাদ।

॥ ১২ ॥

আম হোৱে প্রথমেই মনে হল পুরীর সমুদ্রের ধারে রয়েছি। এত
হাওয়া সমুদ্রের ধারেই হয়। কান ঠাণ্ডা, নাক ঠাণ্ডা, চুল উড়ছে।

কিন্তু কীল কোথায়? বালি? টেউ কোথায়? এ পর্জন তো টেউয়ের
পর্জন নয়; এ তো চলাচল গাড়ির শব্দ। অক্ষকারের মধ্যে খেলা রাজা
দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। গাড়ির পিছনে বসে আছি আমি। আমি
মাঝখানে, ডান পাশে লালমোহনবাবু, বাঁয়ে যে লোক তাকে চিনি না,
দেখিনি কখনও। সামনে ড্রাইভারের মাথায় পাগড়ি, আর পাশে
আরেকটা লোক। কেউ কথা বলছে না।

একটু মাথা তুলতেই পাশের লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে দেবল। আধা-
শতা টাইপের চেহারা। কেনেও ধৰক দিল না। কেল দেবে? আমাদের
ভৱ করার তো কেনও কারণ নেই। আমাদের কাছে কেনও হাতিয়ার
নেই। হাতিয়ার ফেনুমার কাছে। সে এ গাড়িতে নেই। সে কোথায়
জানি না।

কিন্তু ফেপুদার সেই বোলটা?

আমার মাথার পিছনে, কাঁচের সামনের তাকটায়। খোলার ছ্যাপটা
আমার গালের পাশ অবধি ঝুলে আছে।

‘মিডলাইট’, পাশ থেকে বলে উঠেলেন জটায়। আমি আড়চোখে
দেখলাম ওঁর চোখ এখনও বোজা।

‘মিডলাইট, মা।—জয় মা, মা সন্তোষী!... মিডলাইট...’

‘বকে যব! পাশের লোক শাসাগ।

আবার বিহুনি। অবার অক্ষকার। পাড়ির শব্দ মিলিয়ে এল...

এর পর আবার যখন চোখ শুগল তখন মন বলছে দেখব কেনও মনিরের ভিতর বসে আছি। না, মনির ন—গির্জা। এ তো পিতলের দিশি ঘটা নয়। এ সুর বিলিতি।

কিন্তু দেখলাম এটা মনির নয়। এটা টেক্টকখন। মাথার উপর কাঢ় দাঁধ, তবে সেটা জ্বলছে না। যবে কালো বেশি নেই—কেবল একটা লাঙ্গ। সেটা একটা মখমলে ঘোড়া সোফার পাশে একটা টেবিলের উপর রাখা। আবিষ্ট বসে আছি মখমলের সোফায়। বসে না; আধ-শোয়া। আমার পাশেই জালমোহনবাবু। তাঁর চোখ বন্ধ। আমার ডান দিকে পরের সোফাটায় বসে আছে ফেলুদা। তাঁর মুখ গঁজার। তাঁর কপালের ডান দিকে একটা অংশ কালো হয়ে ফুলে আছে। বাঁয়ে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একটা শোক, যাকে আমরা পেয়ারেলাল বলে চিনি। তাঁর হাতে গিঞ্জপ্রভার। কোল্ট .৩২। নির্ণয় ফেলুদারটা।

আবও তিনজন শোক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে মুখ করে। কেউ কেনও কথা কলছে না। কথা বলার শোক বোধহীন এখনও আসেনি। আমাদের সামনে সবচেয়ে যে বড় সোফা, যার মখমলের রং কালো, সেটা একমও খালি। মনে হয় সেটা কালুর অস্পৰ্শ্য বরেছে। বোধহীন হিস্টার চৌধুরী। কিন্তু এটা অলিপুরের কোনও হালের বাড়ি নয়। এ বাড়ি আমিকাপের। এর সিলিং বিশ হাত উঁচু। সোহার কড়িবরগ্য। এর দরজা দিয়ে ঘোড়া চুকে যায়।

আবও আছে। বড়ি। ঝুলনো আর দাঁড়ানো ঘড়ি। তাঁর মধ্যে একটা প্রায় দেড় মানুষ উঁচু, আমার ডান দিকে। এই শতিশুলেই বাজছিল একটু আগে। এখনও মাঝে মাঝে বেজে উঠছে। রাত দুটো।

ফেলুদার সঙ্গে একবারই চোখাচোখি হয়েছে। ওর চোখের ভাষাটা আমি জানি কুন্তই ভরসা পেয়েছি। ওর চোখ কলছে ঘাবড়াসনি, আমি আছি।

“গুড় মর্নিং, হিস্টার মিটার?”

বিলিতি নিয়মে রাত বারোটায় পরেই মর্নিং।

ভদ্রলোকের দেখতে পাইনি, কারণ স্যাম্পের ঠিক পিছন দিকের দরজা দিয়ে চুক্তিহুন এবনও মুখ্য। আগের বার মা দেখেছিলাম তার চেয়ার বেশ। না হ্যায় কোনও কার্য নেই। এখন তুনি আপ, ফেলুন ভড়ুন।

‘ওতে কী আছে পেয়ারেলাল? ওটা সার্ট করা হয়েছে ভাল করে?’

ভদ্রলোকের চোখ গোছে ফেলুনুর বেগোর দিকে। ওটা যে কর্মে ফেলুনুর কাছে চলে গেছে জানিনা।

পেয়ারেলাল জানাল যে ওতে বই খাতা আর ছবি জাতা আর কিছু নেই। একটা বোতল ছিল, সরিয়ে রাখা হয়েছে।

‘কিছু মনে করবেন না এইভাবে ধরে আনার জন্য’—গলায় একটু বেশি পাত্রিশ দিয়ে ফেলুনুর ভুক্তিশ করে কথাটা বলপেন মি. চৌধুরী। ‘ভাবলাই পেরিপ্যাল রিপিটার সম্পর্কে যখন আপনার জেন্সেল কৌতুহল, তখন জিনিসটা আমির হাতে এসে পড়ার মুহূর্তে আপনি থাকলে হয়তো খুশিই হবেন।—কেমা বলওয়াত্ত, সাফা হয়া ধড়ি?’

একজন ভৃত্য মাথা নেড়ে বলল, ধড়ি সাফা হবো এল, এক্ষুনি আসবো।

‘ঊ হাঙ্গেড ইয়ারস থেকের মধ্যে পড়েছিল,’ বলপেন মি. চৌধুরী। ডিলিয়ার এ কথাটা আসে আমাকে বলেনি। বলেছে তার কাছে পেরিপ্যাল ধড়ি আছে। অথচ আনব-আনব করে দেরি করছে। তারপর চাপ দিতে বলল ধড়ি আছে মাসির নীচে তাই দেরি হচ্ছে। ডেডবডিইর পাশে পড়েছিল তাই বললাম কুরুশ দিয়ে বাড়ন দিয়ে সাফা না করে আমির কাছে আনবে না। ডেটসের শৈছ দিয়ে দেবার কথও বলেছি।’

ফেলুন স্টান চেরে আছে মি. চৌধুরীর দিকে। মুখ দেখে তার অনেয় ভাব বোঝার উপায় নেই। আমাদের ক্লোরোফর্ম দিয়ে জানে করেছিল; তবে মাথায় বাড়ি মেরে।

‘আপনি গোবেকে জানলেন এ ধড়ির কথা মি. মিটার?’ প্রশ্ন করলেন মহামেষ চৌধুরী।

‘উনবিংশ শতাব্দীর একটা ভাস্তি থেকে। যার ধড়ি তার মেরের ভায়রি।’

‘ভায়রি? চিঠি না?’

‘না, খাইবি।’

মি. চৌধুরী তার বিলিটি সিগারেটের পাকেটটি বাঁচ করেছেন পরে থেকে, আর সেইসঙ্গে সোনার লাইটার আর সেবর হোল্ডার।

‘আপনার সঙ্গে উইপিয়ারের পরিচয় মেই?’ ছেলের সিগারেট ঘোষণের মি. চৌধুরী:

‘উইপিয়ার নামে আমি কাউকে চিনি না।’

বসু করে মি. চৌধুরীর ডানহিপ পাইচার কুলে উঠল।

‘তাহলে ওই ডায়রি পড়েই আপনার ঘড়িটার উপর সোভ হয়েছিল?’

‘সোভ জিনিসটা তো আপনার একটেটিবা, মি. চৌধুরী।’

মখমলের উপর মেঘের ছয়া। দুই অঙ্গুলে দুরা হেঞ্জারটা উৎৎ কাপছে।

‘আপনি মুখ সামলে কথা কলবেন, মি. মিজের।’

‘সত্যি কথা বলতে আমি মুখ সামলাই না, মি. চৌধুরী। আমর ভদ্রেশ্য দিল ঘড়ি যাতে গড়উইনের ক্ষয়ারেই থাকব; অপেনার মতো লোকের হাতে—’

ফেলুদার কথা শেব হস্ত না। একজন লোক হাতে একটি সিল্কের ক্ষমালের উপর একটা জিনিস এনে মি. চৌধুরীকে দিল। চৌধুরী জিনিসটা হাতে কুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশ থেকে একটা গোঁজামির শব্দ উঠল—

‘আৰ...আৰ...আৰ...আৰ...’

কালমোহনবাবুর জ্ঞান হয়েছে, আর হয়েই মি. চৌধুরীর হাতের জিনিসটা দেখেছেন। জিনিসটা তিনি বুব ভাল করেই চেনেন।

মি. চৌধুরীর অবস্থা যে কী হল সেটা আমার পক্ষে সিল্পে বেরামে খুব মুশকিল। ফেলুদাকেই বলতে শুনেছি যে গানের সাত সুর আর রামধনুর সাত রঙের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু একটা মানুষের গলায় আর মুখে এত কম সময়ে এত রকম সুর আর এত রকম রং খেলতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। গাল্পাগালে যা বেরল মানুষটার মুখ দিয়ে সেটা শোনা যায় না, বলা যায় না, লেখা যায় না। ফেলুদা অবিশ্বিত মিথিকার। আমি বুঝতে পারছি এটা কোনী কীভিত্তি, কাল যখন

দুপুরে দশ মিনিটের ডনা সে পেরহানে চুকেছিল তখনই সে এ কাণ্ঠটা
করে এসেছে। কিন্তু আসল ঘটি কি তাহপে নেই?

কুককেলভির রাস্তারে মি. চৌধুরী উশামনের মতো ঝুঁড়ে যেলে
দিগেন তার ডন পাশে থালি সোকাটায় দিকে। আর তার পরেই তিনি
হস্কার দিয়ে উঠলেন—

‘উইলিয়াম সাহারকো বোলও!—আর উঠো রিভলভার দেও
হামকে?’

পেয়ারেলাঙ্গ রিভলভারটা মি. চৌধুরীর হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল
বর যেকে। মি. চৌধুরী দু-একবার ‘কাউকেল’ ‘সুইলসার’ ইত্যাদি বলে
সোকা ছেড়ে উঠে অন্তর্ভুক্ত অসহিতু ভাবে পারচারি শুরু করলেন।

এবার পেয়ারেলাঙ্গ সেই পিছনের দরজাটা দিয়ে আরেকটা সোককে
সাজে নিয়ে চুকল। আবছা অঙ্ককারে দেখপাই কাথ অবধি পথ্য মাথার
চুল আর চৌকের দু পাশে বুলে থাকা গোক। পরলে প্যান্ট, সার্ট আর
সুতির কেটি।

‘কী ঘড়ি নিয়ে এসেছ তুমি কবর খুঁড়ে?’ বজ্রগাঁথীর গলায় প্রশ্ন
করলেন মি. চৌধুরী। তিনি অবার সোকার নিয়ে বসেছেন, তার হাতে
একলও রিভলভার, দৃষ্টি এখনও ফেলুন্নার দিকে।

‘যা শেয়েছি তাই এনেছি, মি. চৌধুরী!—আগম্বক কাতর করে
জবাব দিল। ‘আপনাকে ঠকিয়ে কি আমি পায় পাব? আপনি এত বড়
এঙ্গপাটি।’

‘তাহলে সে চিঠির কথা কি ঘিখো?’ বর কাঁপিয়ে প্রশ্ন করলেন
মহাদেব চৌধুরী।

‘তা কী করে জানব মি. চৌধুরী! ওটার উপর ভয়সা করেই তো সব
কিছু এই তো সেই চিঠি—দেখুন না।’

আগম্বক একটা পুরানো চিঠি বার করে মি. চৌধুরীর হাতে দিল।
চৌধুরী সেটায় চোখ বুলিয়ে বিরক্তভাবে সেটাকেও ঝুঁড়ে ফেলে দিল
পাশের সোকার উপর, আর চিক সেই সময় হেসে উঠল ফেলুন।
আগাখেলা হ্যাসি। এখন হাসি খেকে অনেকদিন হসেতে দেখিনি।

‘হাসির কী শেজেন আপনি মি. মিটার?’ গর্জন করে উঠলেন মহাদেব
চৌধুরী। কেনওমতে হাসিটাকে একটু চেপে ফেলুণ উভয় দিল—

‘আপনার এক নাটকীর আবোজন সব ভেতে গেল দেখে হাসি
পেল, মি. চৌধুরী।’

চৌধুরী রিভিউর হাতে আধাৎ সেবণ ছেড়ে উঠে পুরু কার্পেটের
উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এগিয়ে একল ফেজুম্বার দিকে।

অভিনব নাটক কি দেখ হয়ে গেছে ভাবছেন, মি. মিটার? আপন
বাস্তু যে আপনার কাছে নেই তার কী বিশ্বাস? আপনি তো গোবহনে
অনেকবার গেছেন। আজও তো উইলিয়ামের আগে আপনি
পৌছেছেন। আপনার গাছে ঘড়ি খালসে সে ঘড়ি হাত না করে কি
অধি হচ্ছে? আপনি বেখানে সেটা লুকিয়ে এসেছেন সেখান থেকে
আপনাকেই সেটা কার করে দিতে হবে মি. মিটার। অর ঘড়ি বলিও
নাও থেকে থাকে—এই চিঠি যদি যিথে হয়ে থাকে—তাহলেও যে
আমি আপনাকে ছেড়ে দেব এটা কী করে ভাবছেন? আপনার সব
ব্যাপারে নাক গলানোর অঙ্গামটা যে আমার পক্ষে বড়
অসুবিধাজনক, মি. মিটার। কাজেই, নাটক ফুরিয়েছে কী বলছেন?
নাটক তো সবে শুরু?’

ফেজুম্বার গলার এদার আমার একটা খুব চেম্ব সুর দেখা দিল। এটা
ও নাটকের চরম মুহূর্তে ব্যবহার করে। লালমোহনবাবু বললেন, এ
সূরটা নাকি ত্বঁকে ত্বিখণ্ডি শিষ্টাচ কখা মনে করিয়ে দেয়।

আপনি কুল করছেন, মি. চৌধুরী। নাটক এখন আমার হাতে
আপনার হাতে নহ। এই মুহূর্ত থেকে আমি নাটকটা চালাব। আমি ই
যিচার করব আপনাদের দু জনের মধ্যে কার অপরাধ বেশি—আপনার,
না যিনি উইলিয়াম বলে—’

ঘরে তোলপাড় ব্যাপার। উইলিয়াম একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে তার
সামনে দাঁড়ান পেঁয়ারেপালকে এক ঘূর্খিতে ধরাশায়ী করে বাইরের
মরজার দিকে ধাওয়া করেছে। চৌধুরীর রিভিউরের শুলি তাকে হাত
দু-একের জন্য মিস করে দরজার বাঁ দিকের একটা দাঁড়ানো ঘড়ির
কাঁচের ভায়াল বানাবান করে দিল; আর সবাইকে অবাক করে সেই
সঙ্গে শুরু হয়ে গেল সেই জখম ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি।

মিস্টার উইলিয়ামকে ধরতে অরও দু জন সোক ছুটিয়ে, বিস্তু তারা
বেশি দূর যেতে পারল না। তাদের পথ আটকেছে কয়েকজন সশস্ত্র



লোক। তারা এখাম উইলিয়াম সমেত সকলকে নিয়ে বৈকথনিক এসে চুক্ল। সামনের ভবনেরকে দেখে বলে দিতে হয় না ইনি একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর। সঙে আরও পাঁচজন পুলিশ কমিস্টেবল ইত্যাদি, অরূপ সবার পিছন দিয়ে সাঁওহে উঁকি দিচ্ছেন লালমোহনবাবুর জাহিদার ছরিপদ দণ্ড।

‘সাধাস, হরিপুরবাবু,’ বলল ফেলুন।

‘আপনিই তো যেনু মিহির?’ ঠিক শোকের পিকে চেয়েই প্রশ্ন।



কর্মসূল ইন্সেক্টের প্রশ্নাই। 'কী ব্যাপার বলুন তো ? মি. টোধুরীকে জ্ঞান চিনি-- কিন্তু ইনি কে, যিনি পালাচ্ছিলেন ?'

ফেলুদা এর উত্তর দেবার আগে ইত্তেব মহাদেব টোধুরীর দাত থেকে কিভের বিভিন্নভাবাতি অনায়াসে বার করে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ইউ, মি. টোধুরী—বোর আপনি কাইভলি আপনার নিজের ভাবগামী গিয়ে বলুন তো। নাটকের বাকি অংশটা সেপার সুবিধে হবে। আর তা হাড়া আপনাকে কালো মুখলে মানচ বজ্জ ভাল। আর মিস্টার উইলিয়াম তো'—ফেলুদাৰ দৃষ্টি চুরে পেছে—'আপনার চূপ আৱ গোৰাটাতে কিন্তু আপনাকে হবত আপনার প্রপিতামহের মতো দেখাচ্ছে। ও মুটো শুল্কেন কী দয়া করে ?'

পুলিশ টান দিতেই উইলিয়ামের গৌৰু আৰু পৰচুলা বুলে এল, আৱ অবাক হয়ে দেখলাম উইলিয়ামের ভাবগাম সাঁড়িয়ে আছেন নৈলেন বিশ্বাসের ভাই গিরীন বিশ্বাস :

'এবাব বলুন তো মি. বিশ্বাস,' বলল ফেলুদা, 'আপনার পুৱো নামটা কী ?'

'বেজ, আবুৱ নাম আপনি জানেন না ?'

'আপনার এখন মুটো নাম জানা যাচ্ছে। এই মুটো ভুড়েই বোধহীন আপনারে অসুল নাব, তাই না ? উইলিয়াম গিরীনবনাথ বিশ্বাস—তাই না ? অন্তত প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাঞ্চিস সোস্ক মেডিলিস্টদের ভালিকায় তো তাই বলছে। আৱ আপনার ভাইহের নাম বলছে মাইকেল, তাই না ? আপনাবো হাঁলা নামটা বাবহার কৰাতেন এসেই বোধহীন নৈলেনবাবু ভিজিটিং কাৰ্ডে "এম. এন" না ছেপে "এল. এম" - ছেপেছিলেন—তাই না ?'

গিরীনবাবু চূপ। বোঝাই যাছে ফেলুদা ঠিকই বলেছে।

'আপনার দাদা আপনাকে কী বলে ভাবেন, মি. বিশ্বাস ?'

'তাতে আপনার কী প্রয়োজন ?'

'আপনি যখন বলবেন না, তখন আমিই বলছি। উইল। উইল বলে ভাবেন আপনার দাদা। হাসপাতালে আম ছবাৰ পৰি তিনি আপনায়ই নাম উচ্চারণ কৰেছিলেন দু বার—তাই না ?'

এখনে ফেনুদা লাল হামতা থেকে একটা বড় ছবি টেনে বার করল। 'দেখুন তো শিরীনবাবু এইদের চেনেন কিনা। এ ইবি হয়তো আপনাদের বাড়িতেও নেই। কিন্তু বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে ছিল।'

হাঁমা-জীর ছবি। যাকে বলে গুড়েড়িং শুপ। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে শিরীনবাবুর চেহারার আল্পর্থ ছিল। আর শুভমহিলা মেমসাহেব।

বেনুলা বলল, 'চিনতে পারছেন এইদের ? ইনি হচ্ছেন পার্বতীচরণ— অর্থাৎ কি সি বিক্সাস, আপনার প্রপিতামহ। ইনি যে ক্লিচান হয়েছিলেন সেটা তো এই পেশাক দেবেই বোঝা যাচ্ছে। আর এই মহিলাটি হচ্ছেন টমাস গড়উইনের নান্দনি—ওই চিঠিটা বিনি সিখেছেন তিনি— ভিট্টোরিয়া গড়উইন। এর দুহারী অবস্থার ছবিও বোর্ন অ্যান্ড শেপার্ডে রয়েছে। এই ভিট্টোরিয়া আপনার প্রপিতামহের মতো এবদজন নেটিভ ক্লিচানকে ভালবেসে তার ঠাকুরদাদার বিহাগভাজন হয়েছিলেন! কিন্তু মৃত্যুশয্যায় টুক গড়উইন ভিট্টোরিয়াকে কর্ম করে ফেল। তার এক বছর পরেই পার্বতীচরণ ভিট্টোরিয়াকে বিবে করেন। তার মানে হচ্ছে এই যে, বলকানায় একটি ময়, মুটি পরিবারের সঙ্গে টম গড়উইনের নাম জড়িত রয়েছে—একটি রিপন লেনে, আরেকটি নিউ আলিপুরে। আর অল্পর্থ এই যে, দু জনের কাছেই এমন দলিল রয়েছে যাতে টমাসের ঘড়ির উঁচোর রয়েছে। এক হল ভিট্টোরিয়ার এই চিঠি, আর আরেক হল টমাসের মেষের শার্ট গড়উইনের ডারবি।'

আল্পর্থ হট্টা! গলকে হাব মানায়। ভিট্টোরিয়ার লেখা চিঠির একটা তাঢ়া বছকাল ফেরেকেই নাকি নক্রেনবাবুদের বাড়িতে বরেছে পুরনো ট্রাফের মত্তে, কিন্তু কেউ পরভ করে পাড়েনি। পুরনো কলকাতা নিয়ে শিশুদে ক্ষণ ক্ষণ পঞ্চ নক্রেনবাবু চিঠিগুলো পড়েন। তখনই টমাস গড়উইনের ঘড়ির ঘটেনাটা জানতে পারেন, আর ঘাঁইকে সে সবক্ষে গলেন।

শিরীনবাবু ফেনুদার জেরারে টেলায় কাহিল, কিন্তু এখনও তাকে জেহাই দেবার সময় আসেনি। ফেনুদা ইঠাং প্রস্ত করস—

'আপনার কি রেসের যাত্তি যাবার অভ্যাস আছে, মি. বিক্সাস ?'

ভদ্রলোক কিছু বলার আগে মি. চৌধুরী খেকিয়ে উঠলেন।

'আমার কাছ থেকে টাকা আসার লিঙ্গে সব গোড়ার পিছনে খুইমেছে,

আর এখন কবর শুভে কৃতকেশভির ধর্তি মেনে হাজির করেছে—
অকর্ম কোথাকার !

ফেলুদা টেবুরীর কথাত্ত কান না দিয়ে গিরীনবাবুকেই উদ্দেশ্য করে
বলে চলে, 'তার মানে তম গভড়ইনের একটি গুণ আপনি পেয়েছেন !
আর সেই কারণেই বোধহৱ এত বড় একটা শুকি নিয়েছিলেন !'

উভয়টি এক মেশ ঘাঁজের সঙ্গে ।

'মি. মিত্র, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, একশো বছর পেরিয়ে গেলে
কবরের ভিতরের কোনও জিনিসের উপর কোনও ঘৃত্যিষ্ঠাবের
আর কোনও অধিকার থাকে না। ওই ঘড়িটা এখন আর তম গভড়ইনের
সম্পত্তি নয়।'

'সেটা জানি মি. বিশ্বাস। ও ঘড়ি সরকারের সম্পত্তি, আপনারও
ময়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, আপনার অপরাধ তো শুধু ঘড়ি ছুরির চেষ্টা
ময়, অন্য অপরাধও বে আছে।'

'কী অপরাধ ?' গিরীন বিশ্বাস একবার একাঞ্চলে ভাব করে দেয়ে
যাচ্ছেন ফেলুদার দিকে।

এবার ফেলুদা তার পকেট থেকে ছোট একটা জিনিস নার করল।

'সেবি তো, এই বোজাছটা আপনার ওই কোটটা থেকেই পাঢ়েছে
কিনা—যে কোটটা আপনি এই দু দিন আগে হংকং লাভি থেকে নিয়ে
গেলেন।'

ফেলুদা কোজাম নিরে এগিয়ে গোল।

'এই দেশুম, মিগে বাছে।'

'তাতে কী প্রয়োগ হল ?' প্রশ্ন করলেন গিরীনবাবু। 'এটা শুল্ক পড়ে
বার গোরস্থানে। আমি তো অর্থীকার করছি না যে সেখানে
নিয়েছিলাম।'

'আমি যদি বলি এটা আপনার কোট নয়, আপনার দাদার কেটি, তা
হলে দীকার করবেন কি ?'

'কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি ?'

'আবোল-তাবোল আমি বকছি না, মি. বিশ্বাস, আপনি বকছেন।
কাল আমার বাড়িতে এসে বকছেন, আবার এখানে বকছেন। এ কেটি
আপনার দাদার। এটা পরে তিনি গোরস্থানে নিয়েছিলেন সেই বড়ের

দেন। গিয়ে দেশেন গড়ত্তেইনের কবর খোঁজা হচ্ছে, আপনি রয়েছেন। তিনি আপনাকে দেখা নিয়ে আন। আপনি তার মাথার বাড়ি আয়েন— আগুন বা খুব জাঁটাই কিছু দিয়ে। মরেনবাবু অঙ্গুল হয়ে পড়েন। আপনি দাতো তাকে মেরেই ফেলতেন, কিন্তু সেই সময় ঘৃঢ়া আসে। আপনি পাশাতে দান। গাছ পড়ে—'

‘ধৰীনবাবু আবার কথা দিলেন।

‘আমার দাদাকে আপনি মিথোবাদী বানাতে চান? তিনি বলেছেন তাঁর মাথার পাহের ডাল—’

কিন্তু ফেনুসুর কথা আটকানো এখন সহজ নয়। সে বলেই চলল—

‘গাছের ডাল তেওঁ পড়ে আপনার পিটে। আপনার গায়ে কোট ছিল না। পিটের জন্য ঢাকবার জন্য আপনি দাদার কেট খুলে নিজে পড়েন। কোটের বোতাম ছিড়ে যায়, পকেট থেকে মানিব্যাপ পড়ে যায়। আপনার নিজের পকেট থেকে রেসের বই—’

ধৰীনবাবু আবার পাশাতে ঢেঁটা করলেন, কিন্তু পারলেন না। এবার ফেনুসুর তাকে ধরে তাঁর কেটটা খুলে দিয়ে দেখিয়ে দিল তাঁর চেরিলিনের সার্টের নীচে ব্যাঙ্গেজটা।

‘আপনার দাদা আপনাকে বাঁচাবার জন্য অনেক মিথ্যে বলেছেন ধৰীনবাবু, কারণ তিনি আপনাকে অভাব বেশিরকম সেহ করতেন।’

ফেনুসু এবার তার বোলাটাই কুকুকেলভির ঘড়িটা আর ডিষ্টেনিয়ার চিঠিটা ভরে দিয়ে, সেটা কাঁধে নিয়ে হতভুর হি. টোকুরীর দিকে ফিরে বলল, ‘আপনার সব ঘড়িতে এক সঙ্গে বারোটা বাজলে কেমন শোনাব, সেটা শেষের আর সুযোগ হল না। হবে হয়তো একদিন।’

তিনিবার ডাকার পর ঢাক্কায় উঠলেন। তিনি যে এর ফাঁকে আবার ছুঁস হারিয়ে নাটকের আসল দৃশ্যটাই মিস করে গেছেন সেটা একক্ষণ বুঝতে পারিনি।

* * *

‘এ সব গোককে দাবিয়ে রাখা যায় না যো। পুলিশও কিছু করতে

পারে না। মহাদেব চৌধুরীর মতো লোকগুলো হল এক-একটা হিটলার। কাঁও তুছিয়ে নিতে এর কল পোবকে যে তাকার জোরে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে তার ঠিক নেই।'

আমরা তিনজনে পেনেটির পসার ঘাটে এসে এসেছি। চৌধুরীর বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচকের পৰ্য এই হাট। পুর আকাশের রঁই মেঝে মনে হচ্ছে সূর্য এই উঠল বলে। হরিপদবাবু অক্ষরে অক্ষরে ফেলুদার সিরেশ প্রস্তুত না করলে আজ আমাদের কী মশা হও গেমি না। (শাশমোহনবাবু বললেন গঢ়াপ্রাণি)। একজন লোকের কথখালি দাবিকৃত্বান্বিত করে আমাদের গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে এসে সটান গিয়ে থালায় ব্যবহু দেয়, সেটা ভাবতে অথাক লাগছে। লালমোহনবাবু হরিপদবাবুরই এনে দেওয়া ভাঁড়ের চারে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'গাড়ি কেনার ফলটা আশা করি টের পেয়েন।'

‘মোক্ষমত্তাবে’, বলল ফেলুদা। 'আপনার গাড়ির উপর অনেক অভ্যাচার হয়েছে এই তিনি দিনে। আজ শহরে কিনে দুটো জারগায় যাবার পর আর বেশ কিছুদিন ও গাড়ির উপর জুলুম করব না।'

‘দুটো জারগা মানে?’

‘এক হল নরেনবাবুর বাড়ি। তাকে ব্যবরটা আয় সেই সঙ্গে এই চিঠিটা ফেরত দেওয়া দয়কার।’

‘আর দ্বিতীয়?’

‘সাউধ পার্ক স্ট্রিট গোরস্তন।’

‘আ-হ্যাঁ-র।’

‘কী সাথখালে পা ফেলতে হয়েছে জিনিস তোপ্সে? এর জন্মে জুত করে লড়কে পারবাবু না লোকগুলোর সঙ্গে?’

ফেলুদা তার বাঁ পায়ের হাটিং বুটাটা খুলে তার ডিতর হাত দুকিয়ে অথবে বাঁর করল তার তৈরি ফলস সুকলজা, যার তলায় পোপ, যার মধ্যে তুলোর মোড়কে ধূঁফিয়ে আছে একটি আশ্চর্য জিনিস, এত হলসুল কাঁওয়ের মধ্যেও যার শুধু কাঁচটি স্বত্ত্বা আর সবই অক্ষত, অচুট রয়েছে।

‘এটা ধরাস্তানে ফেরত দিতে হবে না?’

মেল্পুদার হাতে বুলছে টগস গডউইনের তার রাজার জন্মে দেয়ো
গুরুনা-এর মধ্যে সামু আলির প্রথম বকশিশ—ইংল্যান্ডের অন্তর্গত
ক্ষেত্র কার্ডিফের ক্রানসিস পেরিগ্যানের তৈরি রিপিটার পকেট ঘড়ি—
দুশ্মা বছরে তার মালিবের কক্ষালের পাশে ভূগর্ভে থেকেও যার
জোনুস সূর্যের অধিম আলোতে এখনও আমাদের কোথ ধাঁধিয়ে নিষেছে।

চিমুস্তার অভিশাপ

Pradosh C. Mitter
Private Investigator



ছিমিন্তার অভিশাপ

ৰ

1

ৰহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওঁরকে জটায় সেখের সামনে থেকে বইটা সরিয়ে ফেলুন্দার দিকে ফিরে বসলেন, 'রামমোহন রাজের নাতির সার্কাস ছিল সেটা জানতেন ?'

ফেলুন্দার মুখের উপর কম্বাল চাপা, তাই সে শুধু মাথা নাড়িতে না আনিয়ে দিল ।

প্রায় দশ মিনিট ধরে একটা পর্বতপ্রশাশ খড়বোৰাই সৱি আমাদের যে শুধু পাশ দিচ্ছে না তা নয়, সমানে পিছন থেকে রেলগাড়ির মতো কালো মৌয়া ছেড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে । লালমোহনবাবুর গাড়ির ড্রাইভার হরিপদবাবু বার বার হ্রস্ব লিয়েও কোনো ফল হয়নি । সরির পিছনের ফুলের নকশা, নদীতে সূর্য অন্ত যাওয়ার দৃশ্য, ইন্দ্ৰীজ, টা-টা গুড়বাই, থ্যাক ইউ সব মুখৰ হৰে পেছে । লালমোহনবাবু সার্কাস সম্বন্ধে বইটা কিছুদিন হল জোগাড় কৰেছেন ; অনেক দিন আগেও লেখা বই, নাম 'বাঙালীৰ সার্কাস' । বইটা ঠৰ খোলাৰ মধ্যে ছিল, সরিৰ জ্বালায় সামনে কিছু দেখবাৰ জো নেই, বলে সেটা বার কৰে পড়তে পড় কৰেছেন । ইজু আজে সার্কাস নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস লেখাৰ, তাই ফেলুন্দার পৰামৰ্শ অনুযায়ী বিবয়টা নিয়ে একটু পড়াতনা কৰে আসছেন । সার্কাসেৰ কথা অবিশ্বা এমনিতেই হচ্ছিল, কাৰণ আজ সকালেই ঝাঁচি শহৰে দা প্রেট মাজেস্টিক সার্কাসেৰ বিঞ্চাপন দেখেছি । হজারিবাগে এসেছে সার্কাস, আৱ আমৰা বালিতে হজারিবাগেই । ওখনে সজোৱেলা আৱ কিছু কৰাৰ না আৰুলো একদিন নিয়ে সার্কাস দেখে আসব সেটাৰ ভিজনে আন কৰে আৰেছি ।

শীতেৰ মুখটাতে কেৰাও একটা যাৰাৰ ইজু ছিল ; লালমোহনবাবুৰ নতুন বই পুঁজোয় বেবিয়েছে, তিন সঞ্চাহে দু হজাৰ বিকি, তত্ত্বালকেৰ মেজাজ বুল, তত

খালি । নতুন বইতের নাম 'ভ্যানকুভারের ভ্যাম্পায়ার' এ ফেলুদার আপত্তি ছিল ; এ বলেছিল ভ্যানকুভার একটা পোশায় আধুনিক শহর, ওখানে ভ্যাম্পায়ার থাকতেই পারে না ; তাতে লালচেহনবাবু বললেন ইরিমানের জিওগ্রাফিক বই তরঙ্গত করে টেক্টে খৈর মনে হয়েছে ওটাই বেস্ট নাম । ফেলুদা কোভার্ম্যান একটা তদন্ত করে এসেছে গত সেপ্টেম্বরে, মক্কেল সর্বেশ্বর সহায়ের একটা বাড়ি আছে হাজারিবাগে, সেটা প্রায়ই খালি পড়ে থাকে, তাই ফেলুদার কাজে খুশি হয়ে ভদ্রলোকে তাঁর বাড়িটা অমার করেছেন দিন দশকের জন্মা । তৌকিদার আছে, সে-ই দেবানন্দ করে, আর তার বৌ রাজা করে । যাওয়ার খরচ ছাড়া আর কোনো খরচ লাগবে না আমাদের ।

লালচেহনবাবুর নতুন আহসানভবেই যাওয়া ঠিক হল ; বসলেন, 'লঙ্ঘ রানে গাড়িটা কীরকম সার্টিফ দেয় সেটা দেখা দরকার ।' হ্যাঙ্গ টাঙ্ক বোত দিয়ে আসানসোল-ধানবাদ হয়ে আসা যেত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খড়গপুর-বাঁচি হয়ে আসাই ঠিক হল । খড়গপুর পর্যন্ত ফেলুদা চালিয়েছে, তারপর থেকে ড্রাইভারই চালায়েছে । গতকাল সকাল আটটায় বওনা হয়ে খড়গপুরে লাল সেবে সকারায় বাঁচি পৌছেই । সেখানে আস্তার হোটেলে থেকে আজ সকাল নটায় হাজারিবাগ বওনা দিই । পঞ্জশ মাইল দূরতা, খালি পেলে সোয়া ঘৰ্তায় পৌছে যাওয়া যাবে, কিন্তু এই লরির কালায় সেটা নিষ্পত্তি কেড়ে পিয়ে দাঢ়াবে ।

আরো মিনিট পাঁচেক ইর্ণ দেবার পর লরিটা পাল দিল, আর আহসান সামনে খোলা পেয়ে হাঁপ ছাড়লাম । দু'পাশে বাবলা গাছের সারি, তাঁর অনেকগুলো তেই বাবুইয়ের বাসা, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে । যাবে যাবে পথের ধারেও টিপ্প পড়ছে । লালচেহনবাবু বই বন্ধ করে দৃশ্য দেখে আহা-আহা করাচ্ছন আর যাবে যাকে বেমানান বৰীকু-সঙ্গীত গুনগুম করচেন, যেমন অগ্নান মাসে ফান্ডুলেন নলীন আনন্দে । খুব চেহারায় গান মানায় না, গলার কথা হেতেই দিলাই । মৃশকিল হচ্ছে, উনি বলেন কলকাতার ডামাডোল থেকে বেরিয়ে নেচারের কনটাক্টে এলেই নাকি খুর গান আসে, যদিও স্টক কম বলে সব সময়ে অ্যাপ্রোপ্রয়েট গান মনে আসে না ।

তবে এটা বলতেই হবে যে খৈর মৌলতে এই চিলিপি ঘণ্টার মধ্যে সার্কস সময়কে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছি । কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালীর সার্কস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল ? সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল প্রোফেসর বোসের ফ্রেট বেস্ট সার্কস । এই সার্কাসে নাকি বাঙালী মেয়েদাও খেলা দেখাত, এমনকি বায়ের খেলাও । আর সেই সঙ্গে বাশিয়ান, আমেরিকান, জার্মান আর ফরাসী খেলোয়াড়ও ছিল । গাস ধার্নস বলে একজন আধুনিকানকে রেখেছিলেন প্রোফেসর প্রিয়নাথ বোস বাট-সিংহ ট্রেন করার জন্মা । ১৯২০-এ

প্রিয়নাথ বোস ঘাঁরা যান। আর তার পর থেকেই বাঙালী সার্কিসের দিন ফুরিয়ে আসে।

‘এই গ্রেট ম্যাজেস্টিক কোন দেশী সার্কিস মশাই?’ জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

‘দক্ষিণ ভারতীয়ই হবে’, বলল ফেলুদা, ‘সার্কিসটা আজকল ওদের একচেটে হয়ে গেছে।’

‘ভালো ট্র্যাপীজ আছে কিমা সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। হেলেবেলায় হার্মস্টোন আর কালেক্টার সার্কিসে যা ট্র্যাপীজ দেখিচি তা তোলবার নয়।’

লালমোহনবাবুর গালে নাকি ট্র্যাপীজের একটা বড় ভূমিকা থাকবে। শুন্যে সব লোমহর্ষক খেলার মাঝখানে একজন ট্র্যাপীজের খেলোয়াড় ঝুলত্ত অবস্থায় আরেকজনকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে খুন করবে। রহস্যের সমাধান করতে হিঁড়ো প্রথর কন্দকে নাকি ট্র্যাপীজের খেলা শিখতে হবে। ফেলুদা শুনে বলল, ‘ঘাক, একটা জিনিস তাহলে আপনার হিঁড়োর এবনো শিখতে বাকি।’

৭২ কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছুদুর গিয়েই আরেকটা আশাসাজের দেখা গেল। সেটা বাস্তার এক ধারে বনেট খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক হাত তুলে যে ভঙ্গিটা করছেন সেটা রেলের স্টেশনে খুব দেখা যায়। সেখানে সেটা গড়-বাই, আর এখানে হয়ে গেছে থামতে বলার সংকেত। হরিপুরবাবু ব্রেক করলেন।

‘ইয়ে, আপনারা হাজারিবাগ যাচ্ছেন কি?’

ভদ্রলোকের বয়স চারিশের কাছাকাছি। গায়ের রং ফরসা, কোথে চশমা, পরনে খয়েরি প্যাটের উপর সাদা খাট আর সবুজ হাত-কাটা পুলোভার। সঙ্গে ড্রাইভার আছে, যার শরীরের উপরের অর্ধেকটা এখন বনেটের নিচে।

প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা ‘আজ্ঞে হ্যাঁ’ বলায় ভদ্রলোক বললেন, ‘আমার গাড়ীটা গুণ্ডোল করছে, বুকেছেন। বোধহয় সিরিয়াস। তাই ভাবছিলাম....’

‘আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে চাইলে আসতে পারেন।’

‘সো কাইতু অফ ইউ।’—ভদ্রলোক বোধহয় ভাবতে পারেননি যে না চাইতেই ফেলুদা অফারটা করবে।—‘আমি ওখান থেকে একটা মেকানিক নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে আসব। তাছাড়াতো আর কোনো ইয়ে দেখছি না।’

‘আপনার সঙ্গে লাগেজ কী?’

‘একটা সুটকেস, তবে সেটা অবিশ্ব পরে নিয়ে যেতে পারি। এখান থেকে যেতে আসতে তিন কোর্টারের বেশি লাগবে না।’

‘চলে আসুন।’

ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠে আরো

দু'বার বললেন সো কাইড অফ ইউ। তারপর বাকি পঁচটা আমরা কিন্তু যা জিগ্যেস করতেই নিজের বিষয়ে একগাদা বলে গেছেন। টেব নাম প্রীতীন্দ
টেবুরী। কাপ বছর দশেক হল বিটায়ার করে হাজাবিদাপে বাড়ি করে আছেন.
আগে বাঁচিতে আডতোকেট ছিলেন, নাম মহেশ টেবুরী। এ অঞ্চলের নামকরা
সোক।

‘আপনি কলকাতাতেই থাকেন?’ জিগ্যেস করল ফেলুদা।

‘হ্যাঁ। আমি আছি ইলেক্ট্রনিকসে। ইভেনিউমের নাম ওনেছেন?’

ইভেনিউম নামে একটা সহুন টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন কিমুদিন থেকে কাগজে
দেখছি, সেটা নাকি এমেরই তৈরি।

‘আমার বাবার সত্তর পূর্ণ হয়ে কাল’, বললেন ভদ্রলোক, ‘বড়দা আমার শী
আর থেয়েকে নিয়ে দিন তিনেক হল পৌছে গেছেন। আমার আবার দিনগতে
একটা কাজ পড়ে গেছে, আসা মুশকিস হচ্ছিল, কিন্তু বাবা টেলিফ্রাম করলেন
মাস্ট কাম বলে।—একটু ধামাবেন গাড়িটা কাইভলি?’

গাড়ি ধামল; কেন তা বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোক তাঁর হাতের বাগটা
থেকে একটা ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার বার করে গাড়ি থেকে নেমে বাঞ্ছাব পাশেই
একটা শালবনে ঢুকে মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, ‘একটা
ফ্লাইক্যাচার ডাকছিল; সার্কিল পেয়ে গেলাম। পাখির ডাক রেকর্ড করাটা
আমার একটা নেপ। সো কাইড অফ ইউ।’

ধন্যবাদটা অবিশ্বিত তাঁর অনুরোধে গাড়ি ধামানোর জন্য।

আশ্চর্য, ভদ্রলোক নিজের সমস্কে এত বলে গেছেও, আমাদের কোনো পরিচয়
জানতে চাইলেন না। ফেলুদা অবিশ্বিত বলে যে একেকজন সোক থাকে যাৰা
অন্যের পরিচয় নেওয়াৰ চেয়ে নিজেৰ পরিচয় দিতে অনেক বেশি বাধা

হৃজারিবাগ টাউনে পৌছে ইউরেকা অটোমোবিলস-এ প্রীতীন্দবাবুকে নামিয়ে
দেৱাৰ পৰি আৱেকবাৰ সো কাইড অফ ইউ বলে ভদ্রলোক হঠাৎ জিগ্যেস
কৰলেন, ‘ভালো কথা, আপনারা উঠেছেন কোথায়?’

জবাবটা দিতে ফেলুদাৰ গলা তুলতে হল, কাৰণ গাড়িৰ কচেই কেন জানি
লোকেৰ তিড় জমেছে, আৱ সবাই বেশ উৎসুকিতভাৱে কথা বলতে। কী নিষয়ে
কথা হচ্ছে সেটা অবিশ্বিত পৱে জেনেছিলাম।

ফেলুদা বলল, ‘সঠিক নির্দেশ দিতে পাৰব না, কাৰণ আমরা এই প্ৰথম আসছি
এখানে। এটা বলতে পাৰি যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউস আৱ কৰ্নেল মোহন্তিৰ
বাড়িৰ খুব কাছে।’

‘ও, তাৰ মানে আমাদেৰ বাড়ি থেকে মিনিট সাতকেৰ হটা
পথ।—টেলিফোন আছে?’

‘সেতেন কোর টু ।’

‘বেশ, বেশ ।’

‘আর আমার নাম মিত্র । পি সি মিত্র ।’

‘সেখেছেন, নামটাই জানা হয়নি ।’

তপ্রস্তোককে ছেড়ে দিয়ে ইওন হ্বার পর ফেলুন বলল, ‘নতুন মাল বাজারে
ছাড়ছে বলে বোধহয় টেন্স হয়ে আছে ।’

‘বাটিকগ্রন্ত,’ বললেন লালমোহনবাবু ।

ডিট্রিক্ট বোর্ড রেস্ট হাউসের কথা জিগ্যেস করে আমাদের বাড়ির রাস্তা খুঁজে
বার ক্রবণে কোনো অসুবিধা হল না । কর্নেল জি সি মোহাম্মদ নাম দেখা মার্বেল
ফ্লক ওয়ালা গেট ছাড়িয়ে তিনটে বাড়ি পরেই এস সহায় দেখা বুগেনভিলিয়াম
ঢাকা গেটের বাইরে এসে হর্ন দিতেই একজন বেটে মাঝবয়সী লোক এসে গেটটা
খুলে দিয়ে সেলাম টুকুল । মোরাম ঢাকা পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একতলা
বাংলো টাইপের বাড়ির সামনে আমাদের গাড়ি থামল । মাঝবয়সী লোকটাও
দোড়ে এসেছে পিছন পিছন, জিগ্যেস করে জানলাম সে-ই টোকিসার, নাম
বুলাকিপ্রসাদ ।

গাড়ি থেকে নেমে বুরুলাম জায়গাটা কী নির্জন । বাংলোটা বিরে বেশ বড়
কম্পাউণ্ড (লালমোহনবাবু বললেন আট সীস্ট তিন বিষে), একদিকে বাগানে
তিন চার রকম ফুল ফুটে আছে, অন্য দিকে অনেকগুলো বড় বড় গাছ, তার মধ্যে
তেকুল, আম আর অর্জুন চিনতে পারলাম । কম্পাউণ্ডের পাঁচিলের উপর দিয়ে
উন্নর দিকে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, সেটাই নাকি কানারি হিল, এখান থেকে
মাটিপ দৃশ্যক ।

বাড়িটা তিনজনের পক্ষে একেবারে ফরমাশ দিয়ে তৈরি । সামনে তিনি ধাপ
সিডি উঠে চওড়া বারান্দার পর পাশাপাশি তিনটে ঘর । মাঝেরটা বৈঠকখানা,
আর দু’দিকে দুটো শোবার ঘর । পিছন দিকে আছে খাবার ঘর, বাজারের ইত্যাদি ।
সামনের দেখা যাবে বলে লালমোহনবাবু পশ্চিমের বেজরমটা নিলেন ।

সুটকেস থেকে জিনিস বার করে বাইরে বাখছি, এমন সময় বুলাকিপ্রসাদ
আমার ঘরে চা নিয়ে এসে ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে যে কথাটা বলল, তাতে
আমাদের দু’জনেরই কাজ বন্ধ করে ওর দিকে চাইতে হল । লালমোহনবাবু সবে
ঘরে ঢুকেছেন, তিনিও দরজার মুখটাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন ।

‘আপলোগ যব বাহার যায়ে,’ বলল বুলাকিপ্রসাদ ‘পদমল যানেসে যাবা
সমহালকে যানা ।’

‘চোব ডাকাতের কথা বলছে নাকি মশাই ?’ বললেন লালমোহনবাবু ।

‘নেই, যাবু : বাঘ ভাগ গিয়া মজিস্ট্রি সর্কস সে ।’

সর্বনাশ ! লোকটা বলে কী !

জিগ্যেস করতে জানা গেল কাজেই সকানে নাকি একটা তাগড়াই বায় সার্কাসের থাচা থেকে পালিয়েছে। কী করে পালিয়েছে সেটা বুলাকিপ্রসাদ জানে না, কিন্তু সেই বাষের ডয়ে সারা হাজারিবাগ শহর শুটখু। বাষের খেলাই নাকি না, কিন্তু সেই বাষের ডয়ে সারা হাজারিবাগ শহর শুটখু। বাষের খেলাই নাকি না, এই সার্কাসের যাকে বলে স্টার অ্যাট্র্যাকশন। সার্কাসের বিজ্ঞাপনও যা দেখেছি, এই সার্কাসের যাকে বলে স্টার অ্যাট্র্যাকশন। সার্কাসের বিজ্ঞাপনও যা দেখেছি, তাতে বাষের ছবিটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। ফেলুদাৰ অবিশ্ব চোখই তাতে বাষের ছবিটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। বলল, বাষের খেলা ধিনি আলাদা, তাই সে আমাদের জেয়ে বেশি দেখেছে। বলল, বাষের খেলা ধিনি আলাদা নাকি মারাঠী, নায় কারাভিকার, আৱ নামটা নাকি বিজ্ঞাপনে দেওয়া দেখান তিনি নাকি মারাঠী, নায় কারাভিকার, আৱ নামটা নাকি বিজ্ঞাপনে দেওয়া দেখান তিনি।

লালমোহনবাবু খবরটা শনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন তাঁর গৱেষণালোৱা ঘটনা একটা বাষা যায় কিনা সেটা তিনি ভাবছিলেন, কাজেই এটাকে টেলিপ্যাথি ছাড়া আৱ কিছুই বলা যায় না।—‘তবে আপনি যশাই একেবাবে ইন্ক্রিপ্টো হয়ে থাকুন, গোয়েন্দা জানলে আপনাকে নিষ্পত্তি ওই বায় সকানের কাজে লাগিয়ে দেবে।’

ইন্ক্রিপ্টো অবিশ্ব ইনকগনিটোৰ জটায়ু সংস্করণ। লালমোহনবাবু মাঝে মাঝে ইংরিজি কথায় এৱকম ওলট পাল্পট করে ফেলেন। খবরটা শনে এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে তাঁকে আৱ শুধৰে দেওয়া হস্ত না। ফেলুদা অবিশ্ব অকারণে কৰনই ওৱ পেশাটা প্রকাশ করে না। আৱ গোয়েন্দা বলেই যে ওকে যে কেউ যে কোনো তসকে ফাঁসিয়ে দেবে সেটারও কোনো সংজ্ঞাবনা নেই।

বুলাকিপ্রসাদ আৱও বলল যে সার্কাসটা নাকি আগে শহৱেৰ মাঝখানে কাৰ্জন মাঠে বসত, এইবাবেই নাকি প্রথম সেটা শহৱেৰ এক ধাৰে একটা নতুন জায়গায় বসেছে। এই মাঠটার উভৱে নাকি বিশেষ বসতি নেই। বায় যদি সেদিক দিয়ে বেঞ্চোয় তাহলে রাতা পেরিয়ে কিছুদূৰ গিয়েই জঙ্গল পাবে। কাছাকাছি আদিবাসীদেৱ গ্রাম আছে, যিসে পেলে সেখান থেকে গুৰু বাহুৰ টেলে নিয়ে যাওয়া কিছুই আশ্চৰ্য নয়।

মেটিকখা, ঘটনাটা চাকচাকৰ। আপসোস এই যে হাজারিবাগেৱ মতো জায়গায় এসে বাষের ভয়ে স্বচ্ছন্দে হেঠে বেড়ানো যাবে না।

চা খাওয়াৰ পৱ লালমোহনবাবু প্ৰস্তাৱ কৰলেন যে দুপুৰে একবাৱ গ্ৰেটি ম্যাজেস্টিকে টু মাৰা হৈক। ঘটনাটা ঠিক কীভাৱে ঘটেছে সেটা জানতে পাৰলে নাকি ওৱ বুব কাজে দেবে, ‘টু মাৰা মানে কি টিকিট কেটে সার্কাস দেখাৰ কথা ভাবছেন ?’ ফেলুদা জিগ্যেস কৰল।

‘ঠিক তা নয়,’ বললেন সালমেহনদাৰ, ‘আমি ভাৰছিলাম যদি খোদ মালিকেৰ
সঙ্গে দেখা কৰা যায়। অনেক ডিটেলস জানা যেত তাৰে কাছে।’
‘সেটা ফেলু মিডিয়ের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নহু।’

॥ ২ ॥

দুপুরে বুলাকিপ্রসাদেৰ বৈঠকৰ বাজা ‘মুখগী’ৰ কাবি আৰ অড়ন্ডেৰ ডাল খেন্দঃ
গাড়িতে কৰেই বেৰিয়ে পড়লাম আমৰা। বুৰতে পাৱলাম ফেলুদাৰও যথেষ্ট
কোড়ইল আছে এই বাধ পালানোৰ ব্যাপারে। বেৰোবাৰ আগে দ্বান্যায় একটা
ফেন কৰল। কোড়াধীয় ওকে বিহুৰ পুলিশেৰ সঙ্গে কাঞ কৰতে হয়েছিল,
সহৃদ্দেৰ সহায়কেও এখানে সবাই চেনে, তাই নাম কৰতেই ইনক্ষপকৰণ কাউতো
ফেলুদাকে চিনে ফেললেন। আসলে পুলিশেৰ সাহায্য ছাড়া হয়ত এই জুকৰী
অবস্থায় সাক’সেৰ মালিকেৰ সঙ্গে দেখা কৰা মুশকিল হত। রাউত বলালেন,
সাক’সেৰ সামনে পুলিশেৰ স্নোক থাকবে, ফেলুদাৰ কোনো অসুবিধা হবে না।
ফেলুদা এটাও বলে দিল যে সে কোনোৱকম অসম্ভু কৰতে যাবে না, কেবল
কোড়ইল মেটায়ত যাবে।

সময় শুভৰে যে সাড়া পড়ে গেছে সেটা গাড়িতে যেতে বেশ বুৰতে
পাৱছিলাম। শুধু যে গান্ধাৰ মেডে জটিল তা নহু, একটা চোমাখায় দেখলোম
জাড়া পিটিয়ে লোকদেৰ সাৰধান কৰে দেওয়া হচ্ছে। ফেলুদা একটা পানেৰ
দোকানে চারখিলাৰ কিনতে মেমেছিল, দেখানে দোকানদাৰ বলল যে বাধটাকে
নাকি উপৰে ডান্ডিৰ বলে একটা আদিবাসী গায়েৰ কাছাকাছি দেখা গেছে, ওবে
কোনো উৎপাদেৰ কথা এখনো শোনা যায়নি।

সাক’সেৰ তীব্র দেখলেই দুকেৰ ভিতৰটা কেমন জানি কৰে ওঠে, দেখলেৰেলা
ফেলুদাৰ সঙ্গেই কল সাক’স দেখেছি সে কথা মনে পড়ে যায়। যেটো
ম্যাজেন্টিকেৰ সাদা আৰ নীল ডেমাকটা ছিয়দান তীবৃটা দেখলেই বোৰা যায়
এটা ভাল সাক’স। তীব্র চুড়োয় ফৰফৰ কৰে ইলদে ফ্রাগ ডিভচে, চুড়ো থেকে
বেঙ্গা অৰ্দ্ধ টেনে আনা দড়িতে আৱো অভিষ বৰ্জিন ফ্রাগ। তীব্র গেটেৰ বাইবে
কমপংক্ষ হাজাৰ লোক, তাৰা অনেকেই টিৰ্কিট কিনতে এসেছে। বাধ পালানোৰ
সাক’স এক হয়নি, শুধু আপাতত বাধেৰ খেলাটাই খুবিগত। আৱো কৰতৰকম খেল
যে সে সাক’সে দেখানো হয় সেটা হাতে আৰু প্ৰকাণ বড় বড় বিজ্ঞাপনে
বোৰাবো হয়েছে। শিল্পী খুব পাকা নন, তবে লোকেৰ মনে চলমনে ভাৰ অন্তৰে
এই থাধেষ্ট।

পুলিশেৰ লোক গেটেৰ বাইবেই ছিল। ফেলুদা জাড়া দিতেই খুব খাতিৰ কৰে

ভিউরে তৃকিয়ে দিন : বলল, পালিক মি: কুটিকেও বলা আছে, তিনি তাঁর ঘরে
আপন্ত্র করবেন।

ফেনুল প্রত্যন্তই বলে নিল যে ও পুলিশের পোক নয়, সার্কস ও দুব প্রিমিস জিমিস, একটা মার্জিনিটাকের খাতিপ কথা ও জানে, ইজারিকোগে এসে সার্কস দেখার ইচ্ছে ছিল, আপনাস এই যে একটা দুর্ঘটনার জন্ম আসল থেলাতাই দেখা হবে না । সেই সঙ্গে জাগরুকনবাদুরও পরিচয় করিয়ে নিল এক জন বিশিষ্ট লেখক বলে । —‘সার্কস নিয়ে একটা গুরু সেখাব কথা তা বছেন বিঃ গান্ধুলী ।’

মিঃ কৃতি বজলেন, সার্কাসে আসার আগে ছবিচ্ছবি উনি কলকাতায় একটা জাহাজ কোম্পানিতে ছিলেন, বাণিজ্যিক ভাবে বাণিজ্য, কাবণ বাণিজ্য রাই নাম্বিক সার্কাসের সভিকাব করে করে। আমরা সার্কাস দেখায় নিজেসাহ গোপ করছি জেনে বগলেন যে বাস্তুর খেলা ছাড়াও অনেক কিছু দেখাব আছে প্রেত ম্যাজিস্ট্রিক। — 'কাল আগামীর প্রেশাল শো ছিল, শাখাবিবাদের অনেক নামকরা সোককে আমরা ইনভাইট করেছিলাম আপনাদেরও ইনভাইট করছি।'

‘বাপুরটা হল কীভাবে?’ লালমোহনবাবু হিন্দি আব ইংরিজি মিশিয়ে ভিগোস করলেন। (আসলে ভিগোস করেছিলেন—‘শেব তো ভাগা, এটি হাউ?’)

‘ভেরি আনন্দরচন্তে, মিঃ গ্যাংকলী; বলপেন মিঃ কৃষ্ণ। শাখের শীঁচাৰ
দৰজাটা ঠিকভাবে বক কৰা হয়নি। বাঘ নিজেই সেটাকে মাথা দিয়ে ঢালে ঢুলে
পালিয়েছে। তাৰ উপৰ আৱেকটা গলতি হয়েছে এই যে টিনেৰ বেড়াৰ একটা
অংশ কে জানি ফাঁক কৰে বাইৰে ঘাৰে বলে শটকাট কৰেছিল তাৰপৰ আৱ এক
কৰেনি। কে দোষী সেটা আৰম্ভা দাব কৰেছি, আৱ তাৰ ভনা প্ৰপাৰ স্টেপস
মিছি।’

ଫେଲା ବଲା, 'ବସେତେ ଏକଥାର ଠିକ ଏହିଭାବେ ବାଘ ପାଲିଯେଛିଲ ନା ?'

‘হী, নাশনাল সার্কাস ! শহরের কান্তর বেরিয়ে গিয়েছিল বাধ ! কিন্তু বেশি দুর যাবার আগেই রিং-মাস্টার তাকে ধরে নিয়েছিল ।’

এখনকাব বাহ পালানোর ব্যাপারে আরো ব্যবর জানলাম কৃষ্ণের কাছে। কম করে জন পক্ষাশেক লোক নাকি বাষটাকে তীব্র বাইরে দেখেছে। এক পেট্রোল স্টেশনের মালিকের বাড়ির উঠোনে নাকি বাষটা ঢুকেছিল। তপ্তসোকের ক্রী সেটাকে দেখতে পেয়ে ডিয়নি যান। এক মেপালী-জুন্ডেক স্কুটারে পাঞ্জলেন, তিনি বাষটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে সোজা লাম্পপোস্টে ধাক্কা মেঘে পীজরার তিনয়ট হাত্ত ভেড়ে এখন হাসপাতালে আছেন।

‘আজ্ঞা, আপনাদের তো বিং-মাস্টার আছে নিশ্চয়ই?’

বিং-মাস্টার কথাটা নতুন শিখে সেটা বাবহার করার সোজ সামলাতে পারলেন না জটায়।

‘কে কারাণিকাব? তার শরীর কিছুদিন থেকে এমনিত্বেই খারাপ যাচ্ছে। বয়স হয়েছে নিয়ারলি ফাঁটি। ঘাড়ে একটা বাধা হয় মাঝে মাঝে, তাই নিয়েই খেলা দেখায়। আমার কথা শুনবে না, ভাস্তুরও দেখাবে না। মাস খালেক হল তাই আমি আরেকজন লোক রেখেছি। নাম চন্দন। কেবলের লোক। তেরি গুড়। সেও বাষ ট্রেন করে, কারাণিকাব অসুস্থ হলে সে-ই খেলা দেখায়।’

‘কাল স্পেশ্যাল শো-ডে কে দেখিয়েছিল? ফেলুন্দা জিয়েস করল।

‘কাল কারাণিকাবই দেখিয়েছিল। একটা খেলা ও হাত্ত আব কেউ দেখাতে পারে না। খেলার ফুইয়াজে দু'হাতে বাষের মুখ ফাঁক করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেয়। দুঃখের বিষয়, কাল একটা বিত্তী গুঁগোল হয়ে যায়। দু'বার চেষ্টা করেও গখন বাষ মুখ খুলল না, তখন কারাণিকাব হঠাতে চেষ্টা থামিয়ে দিয়ে খেলা শেষ করে দেয়। ফলে হাতডালির সঙ্গে তাকে কিছু টিকিবিও শুনতে হয়েছিল।’

‘আপনি তাতে কেনো স্টেপ নেননি?’

‘নিরেছি বৈকি। পুরনো লোক, কিন্তু তাও কথা শোনাতে হল। ও সতেরো বছর কাজ করছে সাক্ষিস। প্রথম তিন বছর গোশেনে ছিল, বাকি সময়টা এখানে। ওর যা নাম তা আমার সাক্ষিসে খেলা দেখিয়েই। এখন বলছে কাজ ছেড়ে দেবে। খুবই দুঃখের কথা, কাবণ অসুস্থ আরো বছর তিনেক ও কাজ করতে পারত এলে আমার বিশ্বাস।’

‘বাষ খুঁজতে সাক্ষিসের লোক যায়নি?’

‘কারাণিকাবেরই যাবার কথা ছিল, কিন্তু ও বাজি হয়নি। তাই চন্দনকে যেতে হয়েছে ফ্রেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকের সঙ্গে।’

লালমোহনবাবুর সাহস বেড়ে গেছে। বললেন, ‘কারাণিকাবের সঙ্গে দেখা করা যায়?’

‘কোনো গ্যারান্টি দিতে পারি না,’ বললেন মিঃ কৃষ্ণ, ‘কুব মুড়ি লোক। মুরগেশের সঙ্গে যান আপনারা, গিয়ে দেখুন সে দেখা করে কিনা।’

মুকুগোশ হল মিঃ কৃষ্ণের পাসেন্ডিল বেয়ারা। সে বাইরেই দাঙ্ডিয়ে ছিল। মনিবের দ্বার্তায়ে আমাদের ডিনডনকে নিয়ে গেল রিঃ-ফাস্টারের তাবুতে।

তাবুর ভিতরে দুটো ডাগ ; একটা বসার জাহাগা, আরেকটা শোবাব। আশ্চর্য এই যে বৰুৱা দিতেই বেজুক থেকে বেগিয়ে এলেন রিঃ-ফাস্টার। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বলে দিতে হয় না যে উনি একজন অত্যন্ত শান্তিশালী পুরুষ, বায়বের খেলা দেখানোর পক্ষে এর চেতে উপযুক্ত চেহারা আৰ হয় না। সন্ধায় ফেপুদার সমান, চওড়ায় ওৱ দেড়। ফৰ্সা বাতে কুচকুচে কালো চাড়া-সেওয়া পোফটা আশ্চর্য খুলেছে, চোখের সৃষ্টি এখন উদাস হলেও হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা বলত্ব জলে পাঠে। ভদ্রলোক জানিয়ে দিলেন যে তিনি মারাঠী মালয়ালম ভাষিল আৰ ভাঙা ভাঙা ইংরিজি আৰ হিন্দি জানেন। শোকের দুটো ভাখাতেই কথা হল।

কাৰাগুিকাৰ প্ৰথমেই জানতে চাইলেন আমৰা কোনো ধৰণৰ কাগজ থেকে আসছি কিনা। বুৰুলাম ভদ্রলোক লালমোহনবুৰ হাতে থাঠা পেনসিল দেখেই প্ৰশ্নটা কৰেছেন। ফেলুদা প্ৰথমে জবাবটা যেন বেশ হিসেব কৰে দিল।

‘যদি তাই হয়, তাহলে আপনাৰ কোনো আপত্তি আছে?’

‘আপত্তিতে নেইই, বৰং সেটা হলে খুশিই হব। এটা পাৰলিকেন জানা দৱাৰা যে বাধ পালানোৰ জন্য ট্ৰেনাৰ কাৰাগুিকাৰ দায়ী নয়, দায়ী সাক্ষীসেৱ মালিক। বাধ দুঃজন ট্ৰেনাৰকে মানে না, একজনকেই মানে। অনা ট্ৰেনাৰ আসাৰ পৰি থেকেই সুলতানেৰ মেজাজ ধাৰাপ হতে শুৰু কৰেছিল। আমি সেটা মিঃ কৃষ্ণকে বলেছিলাম, উনি গা কৰেননি ; এখন তাৰ ফল ভোগ কৰছেন।’

‘আপনি বাধটাকে খুজতে গেলেন ন যে?’ ফেলুদা জিগ্যেস কৰল।

‘ওৱাই খুজুক না,’ গভীৰ অভিমানেৰ সঙ্গে বললেন কাৰাগুিকাৰ।

লালমোহনবুৰ বিড়বিড় কৰে ফেলুদাকে বাঁলায় বললেন, ‘একটা জিগ্যেস কৰুন তোতেমন তেমন দৱাৰাৰ পড়লে উনি যাবেন কিনা। অবৰটা পেলে বাধ ধৰা দেৰা যেত। অবিশ্ব একা নয়, ইন ইওৱ কম্প্যানি। খুব প্ৰিলিং ব্যাপাৰ হবে নিশ্চয়ই।’

ফেলুদা জিগ্যেস কৰাতে কাৰাগুিকাৰ বললেন যে বাধকে গুলি কৰে মানাৰ প্ৰত্যাৰ উঠলে তাকে যেতেই হবে বাধা দিতে, কাৰণ সুলতান ওৱ আৰুয়েৰ বাড়া।

আমিও একটা জিনিস জিগ্যেস কৰাত কথা ভাৰছিলাম, শেষ পৰ্যন্ত ফেপুদাই কৰল।

‘আপনাৰ মুখে কি বাধ কোনোদিন আঁচড় ঘৰেছিল?’

‘নট সুলতান,’ বললেন কাৰাগুিকাৰ। ‘গোল্ডেন সাক্ষীসেৱ বাধ। গাল আৱ নাকেৰ থানিকটা মাস তুলে নিয়েছিল।’

কথাটা বলে কারণিকার তীর সার্ট বুলে বেপালেন। সেখলাম বুকে পিটে কাঁধে কত যে আচড়ের দাগ রয়েছে তার হিসেব নেই।

আমরা ভুবনেক অনেক ধনাদান দিয়ে উঠে পড়লাম। তবু থেকে বেরোনার সময় ফেলুন বলল, 'আপনি এখন এখানেই থাকবেন ?'

কারণিকার পঞ্জীর হয়ে বললেন, 'আজ সতেরো বছর আমি সার্কাসের ভাবুকেই ঘর বলে জেনেছি। এখার বোধহ্য নতুন জেনা সেখতে হবে।'

লালমোহনবাবু মি: কুটিকে বলে রেখেছিলেন যে তিনি ম্যাজেন্টিকের পক্ষশালোটা একবার দেখতে চান। মুকগেশের সঙ্গে গিয়ে আমরা সার্কাসের অবশিষ্ট দৃষ্টি বাধ, একটা দেশ বড় ভালুক, একটা জলহস্তী, তিনটে হাতী, গোটা ছয়েক ঘোড়া আর পুলানারের গা ইমছম করা খালি বাঁচাটা দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল পাঁচটা। বুলাকি প্রসাদকে চা দেবার জন্য ভেকে পাঁয়াতে সে বলল, চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে একজন বাবু এসেছিলেন, বলে গেছেন আবার আসবেন।

সাড়ে ছটায় এলেন প্রীতীন্দ চৌধুরী। ইতিমধ্যে সূর্য জোবার সঙ্গে সঙ্গে ওপ করে ঠাণ্ডা পড়েছে, আমরা সবাই কোট পুলোভার চাপিয়ে নিয়েছি, লালমোহনবাবুর প্রাণিকাপটা পুরার মতো ঠাণ্ডা এখনো পড়েনি, কিন্তু উর টাক বলে উনি রিষ্প না নিয়ে এর মধ্যেই টো চাপিয়ে বসে আছেন।

'আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো বলেননি।' আমাদের তিনজনকেই অনাক করে দিয়ে বললেন প্রীতীন্দ চৌধুরী।—'বাবা তো আপনার মকেল মি: সহায়কে খুব ঢালে করে চেনেন। সহায় ওকে ভালিয়েছেন যে আপনারা এখানে আসছেন। বাবা বিশেব করে বলে দিয়েছেন আপনারা তিনজনেই যেন কাল আমাদের সঙ্গে পিকনিকে আসেন।'

'পিকনিক ?' লালমোহনবাবু ভুক্ত কপালে ভুলে প্রর করলেন।

'বলেছিলাম না—কাল বাবার জন্মদিন। আমরা সবাই যাইছি রাজবাড়ী পিকনিক করতে। দুপুরে খেনেই যাওয়া। আপনাদের তো গাড়ি রয়েছে, নটা নাগাদ আমাদের ওখানে চলে আসুন। বাড়ির নাম কৈলাস। আপনাদের ডিবেকশন দিয়ে দিচ্ছি, খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।'

রাজবাড়ী হাজারিবাগ থেকে মাইল পক্ষাশেক দূর, জলপ্রপাত আছে, চমৎকার দৃশ্য, আর একটা পুরানো কালীমন্দির আছে—নাম ছিমুক্ষুর মন্দির। এসব আমরা আসবার আগেই জেনে এসেছি, আর পিকনিকের নেমছুঁয় না হলে নিজেরাই যেতাম।

প্রীতীনবাবু আরো বললেন যে আমরা যদি একটু আগে আগে যাই, তাহলে মহেশবাবুর প্রজাপতি আর পাথরের কালেকশনটা দেখা হয়ে যেতে পারে।



‘কিন্তু পিকনিকে যে যাচ্ছেন আপনারা, বাধ পালানোর ক্ষবরটা জানেন কি ? এরা গলায় প্রশ্ন করলেন ছটায় ।

‘জানি বৈকি !’ হেসে বললেন শ্রীতীনবাবু, ‘কিন্তু তাৰ জন্য ভয় কী ? সঙ্গে বন্দুক থাকবে ? আমাৰ বড়ৰা ক্যাক শট ! তাৰাজা বাবতো শুনেছি উত্তৰে হ্যান দিছে, রাঙৰাজা তো দক্ষিণে, বাহগড়েৰ দিকে । কোনো ভয় নেই ।’

ঠিক ইল আমাৰ সাড়ে আটটা নাগদ মহেশ চৌধুৰীৰ বাড়িতে পৌছে যাব । পালমুহূৰ্তবাবু ‘কৈলাস নাম দিল কেন, মলাই’-এৰ উত্তৰে ফেলুন্দা বলল, শিবেৰ বাসস্থান কৈলাস, আৰ মহেশ শিবেৰ নাম, তাই কৈলাস ।

শ্রীতীনবাবু চলে যাবাৰ কিছুক্ষণেৰ মধ্যেই দুৰ্ঘৃতি অস্ফক্ষাৰ হয়ে এস । আমাৰ বাবান্দুয় বেতোৱে চেয়াৰে এসে বাতটা ক্ষাললাভ না, যাতে চাঁদেৰ আলো উপভোগ কৰা যায় । ছিমুমস্তুৰ মন্দিৱেৰ কথাটা লালমুহূৰ্তবাবু জানতেন না, তাই বোধহয় থাকে মাঝে নামটা বিড়বিড় কৰছিলেন । সাতবাবেৰ বাব হিন্দু বলেই থেমে যেতে পার, কাবণ ফেলুন্দা হাত দুলেছে ।

আগতা তিনিটোই চুপ, মিথি পোকাৰ ডাক ছাড়া আৰ কোনো শব্দ নেই, এমন সময় শোনা গেল—বেশ দূৰ থেকে, আও গায়েৰ বক্স জল কৰা—বাহেৰ গৰ্জন । একবাৰ, দুবাৰ, তিনিটো ।

সুলভান থাকছে ।

কোন্দিক থেকে, কতদুৰ থেকে, সেটা বুঝতে হলে শিকারীৰ কান চাই ।

॥ ৩ ॥

আমি ভেবেছিলাম যে সাকাসেৰ ধৰ পালমুহূৰ্তবাবু দুঃখি হাজারিবাগেৰ আসল ঘটনা হবে ; কিন্তু তা ছাড়াও যে আৱো কিছু ঘটবে, আৰ ফেলুন্দা যে সেই ঘটনাৰ জালে ঢাঁড়িয়ে পড়বে, সেটা কে জানত ? ২৩শে নভেম্বৰ মহেশ চৌধুৰীৰ বার্ষিকে পিকনিকেৰ কথাটা আনেকদিন মনে থাকবে, আৰ সেই সঙ্গে মনে থাকবে বাজৰাজ্ঞাৰ আশ্চৰ্য সুন্দৰ কৃষ্ণ পৰিবেশে ছিমুমস্তুৰ মন্দিৱ ।

কাল বাত্রে বাধেৰ ডাক শোনাৰ পৰ ধেকেই পালমুহূৰ্তবাবুৰ মুখটা জলি বেমন হয়ে শিয়েছিল, ভাবহিলাম বলি উনি আমাদেৱ ধৰে আমাৰ সঙ্গে শোন, আৰ ফেলুন্দা পশ্চিমেৰ ঘৰটা নিক, কিন্তু সেদিকে আমাৰ ভদ্রলোকেৰ গো আছে । চৌকিলাৰেৰ কাছে টাপি আছে জেলে, আৰ লোকটা বেতে হলেও সাহসী ভেনে ভদ্রলোক থানিকটা আহ্বান পেয়ে নিজেৰ তিন সেলোৰ টুচ্ছেৰ বাহে আমাদেৱ পীচ সেলটা নিয়ে দশটা নাগদ নিজেৰ ঘৰে চলে গেলেন ; বড় টুচ্ছ মেওয়াৰ কাৰণ এই যে, ফেলুন্দা বলেছে শীত্র আলো জোখে কেললে বাধ নাকি অনেক সময় আপনা

থেকেই সরে পড়ে।—‘অবিশ্বি ঝানালার বাইরে যদি গর্জন শোনেন, তখন টর্চ ঝালানোর কথা, আর সেই টর্চ ঝানালার বাইরে বায়ের তাঁবে ফেলার কথা, মনে থাকবে কিনা সেটা জানি না।’

যাই হোক, রাতের বায় এসে থাকলেও সে গর্জন করেনি, তাই টর্চ ফেলারও কোনো দরকার হয়নি।

আমরা প্রীতীনবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক সাড়ে আটটার সময় কৈলাসের সামনে ফটকের সামনে গিয়ে হাতির হলাম। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে লালমোহনবাবু যত্নে করলেন যে বোঝাই যাচ্ছে এ শিব হল সাহেব শিব। সত্যই, বছৰ দশেক আগে তৈরি হলেও বাড়ির চেহারাটা সেই পঞ্চাশ বছৰ আগের ত্রিতীয় আমলের বাড়ির মতো।

দারোয়ান গেট খুলে দিতে আমরা গাড়িটা বাইরে রেখে কৌকুল বিছানো রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আরো তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণাট্টের এক পাশে; একটা কালকের দেখা প্রীতীনবাবুর কাগো আয়াসাজ্জর, একটা সাদা ক্ষিয়াট, আর একটা পুরাদো হলদে পনচিয়াক।

‘একটা কু পাওয়া গেছে মশাই।’

লালমোহনবাবু বাগান আর রাস্তার মাঝখনে সাদা রং করা ইটের বেড়ার পাশ থেকে একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা বলল, ‘আপনি রহস্যের অর্হতামেই কুয়ের সংকান পাচ্ছেন?’

‘জিনিসটা কীরকম মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে না?’

একটা কৃষ্ণটানা পাতা, তাতে সবুজ কালিতে গোটা গোটা অংশের লেখা কিছু অর্থহীন ইংরিজি কথা। মিস্টিরি কিছুই নেই, বোঝাই যাচ্ছে সেটা একচার হাতের লেখা, আর সেই কারণেই কথাগুলোর কোনো মানে নেই।

যেমন—OKAHA, RKAHA, LOKC।

‘ওকাহা যে জাপানী নাম সেতো বোঝাই যাচ্ছে’ বললেন লালমোহনবাবু।

‘বাত্তলা নামটা না চিনে আগেই জাপানী নামটা চিনে ফেললেন?’—বলে ফেলুদা কাগজটা পকেটে পুরে নিল।

একজন লীলপ বুড়ো মুসলিম বেয়াবা দাঁড়িয়েছিল গাড়িবারাদ্বাৰ নিচে, সে আমাদের সেলাহ করে ‘আইয়ে’ বলে ভিতরে নিয়ে গেল। একটা চেনা গপা আগে থেকেই পাঞ্জিলাম, বৈঠকখানার চৌকাঠ পেরোতেই প্রীতীনবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

‘আসুন, আসুন—সো কাইড অফ ইউ টু কাম।’

বরে চুকে প্রথমেই তাঁবে যায় দেশালের দিকে। তিনি দেশাল জুড়ে ছবির

বদলে টাঙানো ব্যয়ে যেখে বীধানো মহেশ চৌধুরীর সংগ্রহ করা পিনে আটা সার সার ডানা মেলা প্রজ্ঞাপতি। প্রতি দেশে আটটা, সব মিলিয়ে চৌধুরী, আর তাদের বক্তব্যের বাহারে পুরো ঘরটা যেন হাসছে।

যাঁর সংগ্রহ, তিনি সোফায় বসে ছিলেন, আমাদের দেরে হাসিমুরে উঠে দাঁড়ালেন। বুঝলাম এককালে ভদ্রলোক বেশ শক্ত সুস্কুর ছিলেন। টকটকে রঞ্জ, দাঙিগোক পরিষ্কার করে কামানো, জোখে রিমলেস চশমা, পরনে ফিনফিনে ধূতি, গুরদের পাখাবি আর ঘন কাজ করা কাশ্মীরী শাল। বুঝলাম এটা মহেশ চৌধুরীর সম্মত বছরের জন্মদিন উপজাঙ্কে স্পেশাল পোশাক।

প্রীতীনবাবু শুধু ফেলুদার নামটাই জানেন, শাই বাকি দুজনের পরিচয় ফেলুদাকেই দিতে হল। ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই সালিমোহনবাবু আমাদের অন্তর করে দিয়ে বললেন, ‘হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, স্যার।’

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠলেন।—‘থ্যাক ইউ, থ্যাক ইউ।’ বুজোমানুরের আবার জন্মদিন। এসব আমার বৌদ্ধার কাও।—যাক আপনারা এসে গিয়ে শুব ভালোই হল। হোয়ার ইজ দা ডেড বড়ি খুজে বার করতে অসুবিধা হয়নি তো।’

প্রশঠা শুনে আমার আর লালিমোহনবাবুর মুখ একসঙ্গে হাঁ হয়ে গেছে। ফেলুদা কিঞ্চ ভুক্ত একটু ভুলেই মাথিয়ে নিল। ‘আজ্জে না, অসুবিধা হয়নি।’

‘তেরি শুভ। আমি বুঝেছিলাম আপনি যখন গোয়েন্দা তখন হ্যাত আমার সাংকেতিক ভাষা বুঝতে পারবেন। তবে আপনার দুই এক মনে হচ্ছে বোধনেননি।’

ফেলুদা বুঝিয়ে দিল। ‘বৈলাস হচ্ছে “কই লাশ” ?’

বোরে পক্ষ করলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চিতাবাঘের ছালের উপর বসে একটি বছর পীচেনের মেয়ে ডান হাতে একটা চিমটোর মতো জিনিস নিয়ে বী হাতে ধরা একটি বিলিতি ভলের ভুক্ত জায়গায় এক ধনে চিমটি কাটছে। বোধহয় পুতুলের ভুক্ত প্লাক করা হচ্ছে। আমি ওর দিকে চেয়ে আছি বলেই বোধহয় মহেশবাবু বললেন, ‘ওটি আমার নাতনী ; ওর নাম জোড়া মৌমাছি।’

‘আর ভুমি জোড়া কাটারি’, বলল মেঘেটি।

‘বুক্সেনতো রিঃ মিতির ?’

ফেলুদা বলল, ‘বুঝলাম, আপনার নাতনী হলেন বিবি, আর আপনি ওর দাদু।’

লালিমোহনবাবু আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন দেখে বুঝিয়ে দিলাম বিবি হচ্ছে Bee-Bee, আর দাদুর ‘দা’ হল কাটারি আর ‘দু’ হল দুই। ফেলুদা আর আমি অনেক সময়ই বাড়িতে বসে কথার খেলা তৈরি করে খেলি,



তাই এগুলো বুঝতে অসুবিধা হল না ।

‘শ্রীতীনবাবু ‘দানাকে ডাকি’ বলে ধর থেকে বেরিয়ে গেলেন ; আমরা তিনজনে সোজায় বসলাই । যেহেশবাবুর ঠোটের কোথে হাসি, তিনি একদৃষ্টি চেয়ে রয়েছেন ফেলুদার দিকে । ফেলুদার তাতে কোনো উস্কুসে ভাব নেই, সেও দিকি উল্ট চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে ।

‘ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল’, অবশ্যে বললেন যেহেশ কৌশ্লী, ‘সহজ আপনার খুব সুখ্যাতি করছিল, তাই আপনি এসেছেন তবে তিনিরকে বলগুম, ভদ্রলোককে ডাক, তাক একবাবি দেবি—আমার জীবনেও তো অনেক রহস্য, দেখুন মদি তার দু একটা সম্পর্ক করে দিতে পারেন ।’

‘তিনি মানে আপনার তৃতীয় পুত্র কি ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল ।

‘বট্টট এগুলো, বললেন ভদ্রলোক । ‘আমি যে কথা নিয়ে খেলতে ভালোবাসি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ।’

‘ও বাতিকটা আমারও আছে ।’

‘সে তো খুব ভালো করা । আমার নিজের ছেলেদের মধ্যে টেকা তবু একটু আপটু বেরো, তিনির মাথা এদিকে একেবারেই খেলে না । তা যাক গে—আপনি গোয়েন্দাগিরি করছেন কিনিন ?’

‘বছর আটকে ।’

‘আর তিনি কী করেন ? মিঃ গাস্টুলী ?’

‘উনি লেগেন । রহস্য উপনাস । ভট্টায় ছফ্ফনামে ।’

‘বাঃ ! আপনাদের কষিমেশনটি বেশ ভালো । একজন রহস্য-প্রট পাকান, আরেকজন রহস্যের জট ছাড়ান । ভেরি গুড় ।’

ফেলুদা বলল, ‘আপনার প্রজাপতি আর পাথরের সংগ্রহ তো দেখতেই পাইছি ; এ ছাড়া আরো কিছু জমিয়েছেন কি কোনোদিন ?’

পাথরগুলো রাখা ছিল ধরের একপাশে একটা বড় কাঁচের আলঘারির তিতির । এত বুকম রাখের পাথর যে হয় তা আমার ধারণাই ছিল না । কিন্তু ফেলুদা হঠাৎ এ পুরু করল কেন ? ভদ্রলোকও বেশ অবাক হয়ে বললেন, ‘তুম সংগ্রহের কথা হঠাৎ জিগ্যেস করলেন কেন ?’

‘আপনার নাতনীর হাতের চিমটেটাকে পুরান্য টুইজারস বলে মনে হচ্ছে তাই—’

‘ব্রিলিয়ান্ট ! ব্রিলিয়ান্ট !’—ভদ্রলোক ফেলুদার কথার উপর তারিফ চাপিয়ে দিলেন ।—‘আপনার অস্তুত চোখ । আপনি ঠিক ধরেছেন, ওটা স্টার্স্প কালেকটরের চিমটেই বটে । ডাকতিকিউ এককালে জমিয়েছি বইকি, আর বেশ যত্ন নিয়ে সিরিয়াসলি জমিয়েছি । এখনও মাঝে মাঝে গিবন্সের কাটিলগের

পাতা উলটোই। ওটাই আমার প্রথম হবি। যখন শুকালতি করি তখন আমার পাতা উলটোই। ওটাই আমার প্রথম হবি। যখন শুকালতি করি তখন আমার এক অক্ষে, নাম সোকারজী, আমার উপর কৃতজ্ঞতাবশে তার একটি আন্ত শুরানো, অ্যালবাম আমাকে দিয়ে দেয়। তার নিজের অবিশ্বিত শব্দ মিটে গিয়েছিল, কিন্তু এ জিনিস সহজে কেউ দেয় না। বেশ কিছু দুর্দাপ্ত টিকিট ছিল সেই অ্যালবামে। জিনিস সহজে কেউ দেয় না।

‘आमि निजे स्ट्रीम्प छाउं, आर फ्लूट्यार्ट एक समय ताफ्टाकृत्या देखा
शुद्धीकृत । उ बल्ल, ‘मे आशंकाम देखा थाए ।’

‘আজে ?’—ভদ্রলোক যেন একটু অন্যবন্ধন হয়ে পড়েছিলেন—‘আলবান ?
আলবান তো নেই ভাই ! সেটা খোয়া গেছে !’

‘ବୋଯା ଗାଇଁ ?’

‘বলছি না—আমার জীবনে অনেক বহস। বহসও বলতে পারেন, প্রাজিডিও বলতে পারেন। তবে আজকের দিনটায় সেসব আলোচনা থাক।—এখো টেক। কোমর সাক্ষ আলাপ করিয়ে নিই।’

‘তিনিকে মাইক স্মথেজে জিগেস করলে আপনি ভালো জবাব পাবেন’, বলেনেন
মহেশ চৌধুরী, ‘আব ইনি মাইকার কারবারি ! অক্ষগেৰু ! কলকাতায় অফিস,
গুজুরিয়াগ মাতৃস্থান আছে কৰ্মসূচে !’

‘আৱ দুৰি বুঝি উনি?’ ফেলুনা কুপোৱ কেম্বে বীণানো একটা ছবিৰ দিবে
দেখালু। ক্যামিল শুপ। মাহেশবাবু, তাৰ গীৱি, আৱ তিন ছেলে। অন্তৰে বছৰ
পিচিল আগে তোসা, কাৰণ বাপেৰ দু'পাশে দীড়ানো দু'জন ছেলেই হাঁৎ পাট
পৰা, আৱ তৃতীয়টি মায়েৰ কোসে। দীড়ানো ছেসে দুটিৰ মধ্যে যে ছেটি সেই
নিকট মহেশবাবুৰ হিতীয় ছেলে।

‘ଠିକଇ ବଲେଛେନ ଆପଣି’ ବଲେନେମ ମହେଶ୍ବାବୁ, ‘ତାରେ ଦୂରିର ସଙ୍ଗେ ଆଲାପେନ ପୌଜାଗୀ ଆପନାର ହୁଏ କିମ୍ବା ଜାନି ନା, କାରଣ ମେ ଭାଗମୁୟା ।’

অক্ষয়বাবু ক্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। 'বৌরেন বিশেষ চলে যায় উনিশ বছর
বয়সে; তারপর আর ফেরেনি।'

‘କେବେଳି କି ?’—ଅକ୍ଷେତ୍ରବାଦର ପ୍ରରେ କୋଥାଯ ଯେନ ଏକଟା ଖଟକାର ମୂର ।

‘ଫିରିଲେ କି ଆମ ତୁମି ଜାନନ୍ତେ ନା, ବାବା ?’

‘কী জনি !’—সেই একই সূরে বললেন মহেশ চৌধুরী। ‘গত দশ বছর তোমে আবাকে চিঠি লেখেনি !’

যাবে কেবল একটা ধৰ্মধর্মে ভাব এসে গেছিল বলেই যোধহয় সেটা দূর করাব

জনা মহেশবাবু হঠাৎ চাটা হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন।—‘চলুন, আপনাদের আমার বাড়িটা একটু ঘূরিয়ে দেখাই। অবিল আর ইয়ে যখন এখনো এল না, তখন হাতে কিছুটা সময় আছে।’

‘তুমি উঠছ কেন বাবা’, বললেন অরুণবাবু, ‘আমিই দেখিয়ে আনছি।’

‘নো সার, আমার আল করা আমার বাড়ি, আমিই দেখাব। আসুন, মিঃ মিস্টির।’

দোতলায় উত্তরে রাঙ্গাট দিকে একটা চমৎকার চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে কানারি হিল দেখা যায়। বেডরুম তিনটে, তিনটেতেই এখন লোক রয়েছে। মাঝেরটায় খাকেন মহেশবাবু নিজে, এক পাশে বড় হেলে, অন্য পাশে শ্রী আর মেয়েকে নিয়ে প্রীতিনবাবু। নিচে একটা গেস্টকক্ষ আছে, তাতে এখন রয়েছেন মহেশবাবুর বড় অবিল চক্রবর্তী। অরুণবাবুর দুই সন্তানের মধ্যে পড়টি হেলে, সে এখন বিলেতে, আর খেয়েটির সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা বলে সে মাঝের সঙ্গে কল্পকান্তায় রায়ে গেছে।

মহেশবাবুর বেডরুমে দৈর্ঘ্যমাত্রে কিন্তু পাপর আর প্রজ্ঞাপত্তি রায়েছে। একটা বৃক্ষশেষে পাশপাশি রাখা অনেকজনের একবক্র দেখতে বইয়ের দিকে ফেলুন্দার দৃষ্টি ধিয়েছিল, ভদ্রলোক বললেন, ওগুলো তুর ভাতুরি। চারিশ বছর একটোনা হুগুমি পিখেছেন উনি। খাটের পাশে টেবিলে একটা ছোটু বাধানো ছবি দেখে লালমোহনবাবু বলে উঠলেন, ‘আরে, এ যে দেখছি মুকুন্দেব ছবি।’

মহেশবাবু হেসে বললেন, ‘আমার বক্স অবিল দিয়েছে ওটা।’ তারপর ফেলুন্দির দিকে ফিরে বললেন, ‘তিনটে মহানেশের শক্তি এর পিছান।’

‘কাকেটি।’ বলাজেন লালমোহনবাবু, ‘বিরাট তাত্ত্বিক সাধু। ইতিয়া, ইউরোপ, আর্মেনিকা—সর্বত্র ত্রুটি শিখ।’

‘আপনি তো আমাক খবর বাবেন দেবৰ্জি,’ বললেন মহেশ চৌধুরী, ‘আপনিও ত্রুটি শিখ নাবি।’

‘আরে না, তবে আমার পাড়ায় আছেন একজন।’

দোতলায় থাকতেই একটা গাড়ির শব্দ পেয়েছিলাম, নিচে এসে লেখি, যে-দুজনের কথা মহেশবাবু বলছিলেন, তৌরা এসে গেছেন। একজন মহেশবাবুরই বয়সী, সাধারণ শুভি পাঞ্জাবি আর গাঢ় বয়েরি রঙের আলোয়ান গায়ে। ইনি যে উকিল-চুকিল ছিলেন না কোনোদিন সেটা বলে দিতে হয় না, আর সাহেবীরও কোনো গন্ধ নেই এর মধ্যে। অন্য ভদ্রলোককে অনে হল চামিশের নিচে বয়স, বেশ হাসিখুশি সপ্রতিত ভাব, মহেশবাবু আসতেই তাঁকে চিপ করে প্রণাম করলেন। বৃক্ষ ভদ্রলোকটির হাতে মিস্টির হাঁড়ি ছিল, সেটা তিনি প্রীতিনবাবুর হাতে চালান দিয়ে মহেশবাবুর দিকে ফিরে বললেন, ‘আমার কথা যদি শোনতো

পিকনিকের পরিকল্পনাটি বাস সাও। একে যাত্রা অন্তর্ভুক্ত, তার উপর বায় পালিয়েছে। শার্পুলবাবাঙ্গী যদি সুজ্ঞানক্ষেত্রে শিখতিথ্য হল তাহলে একবার কিম্বত্ত্ব শাক্তির দেওয়াটা কিছুই আশ্র্য নয়।

সবাই যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে দেশে অবিলম্বে আরেকবার বললেন, 'তাইলে আমার নিষ্পত্তি কেউ মানছে না ?'

‘না ভাই’, বললেন মহেশ চৌধুরী, ‘আমি থবর পেয়েছি বাবুর নাম সুলতান, কাজেই সে মুসলমান, তাস্তিক নয়।—ভালো কথা, মিঃ মিস্টির ধরি সময় পানতো আবার কোথায় যাবেন না। আবার ইনভাইট করেছিল পরশু। বৌমা সার্কাসটা একবার সেখে দেবেন। আবাদের ইনভাইট করেছিল পরশু। বৌমা আবার বিবিসিদিমগিকে নিয়ে আমি দেখে এসেছি। দিশী সার্কাস যে এত ডায়াটি কারুছে জানতাম না। আবার বাবুর খেলার তো তুলনাই নেই।’

‘କିନ୍ତୁ ପରଶ ନାକି ବାହେର ଖେଳାଯ ଗୋଲମାଲ ହେବିଲ ?’ ଅପା କବଳେନ ଲାଲମୋହନବାସୁ ।

‘সেটা খেলোয়াড়ের কোনো গুণগোলে নয়। আনোয়ারেরও তো মুড় থালে
একটা জিনিস আছে। মে-তো আর কলের পুতুল না যে তাবি টিপলেই লাঘুবিম্প
করবে।’

‘କିନ୍ତୁ ମେହି ମୁଢର ଠେଳାତେ ଏଥିଲା ସାମଲାନୋ ଦାୟ,’ ବଲାଲେନ ଅକପନାବୁ । ‘ଶହରେ ତୋ ପ୍ରୟାନ୍ତିକ । ଓଡ଼ାକେ ଏକ୍କୁନି ମେରେ କେଳା ଉଚିତ । ବିଲାତି ସାର୍କାରୀ ହଲେ ଏ କିନିମ୍ବ କହନୋ ହତ ନା ।’

মহেশবাবু একটা শুভনো হসি হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ—ভুঁয়ি তো আবাব
বনাপত্র-সংহার সমিতির সভাপতি কিনা, তোমার হাততো নিশপিশ করবেই।’

ରାଜରାଜ୍ଞୀ ରତ୍ନା ହବାର ଆଗେ ଆବେକଜ୍ଞନେର ମଧ୍ୟେ ଆଲାପ ହୁଲ । ଉନି ହଲେନ ଶ୍ରୀତୀନବାବୁର ଶ୍ରୀ ମିଲିମା ଦେବୀ । ଏକେ ଦେଖେ ବୁଝଲାମ ଯେ ଟୋଧୁରୀ ପରିବାରେର ମନ୍ଦିରରେ ବେଶ ଭାଲୋ ଦେଖିତେ ।

তেড়া নদী পর্যন্ত গাড়ি যায়। নদী হেঁটে পেরিয়ে খানিকদূর গিয়েই রাজস্বারা।

শক্রলাল মিশ্রের গাড়ি সেই। তিনি আবাদের গাড়িতেই এসেন। দুর্জন বেয়াবাকেও নেওয়া হয়েছে পিকনিকের পথে, তাদের একজন ইন বুড়ো নৃত্য মহসুদ, যে মহেশবাবুর কোলতির জীবনের শুরু থেকে আছে। অন্য জন ইন বিশ্বা মার্কো জগৎ সিং, যার জিন্দাবাদ রায়েছে অঙ্গুলবাবুর বন্দুক আর টোটার বাজ।

মিঃ মিশ্রকে দেখেই বেশ ভালো লেগেছিল, তার সঙ্গে কথা বলে আরো ভালো লাগল। ভদ্রলোকের জীবনের ঘটনাও শোনবার মতো। শক্রলালের বাবা দীনদয়াল মিশ্র ছিলেন মহেশবাবুর দাবোয়ান। আজ থেকে প্রয়ত্নিশ বছর আগে, যখন শক্রলালের বয়স চার—দীনদয়াল নাকি একদিন হঠাতে নিবোজ হয়ে যায়। দু'দিন পরে এক কাঠুরে তার মৃত্যুদেহ দেখতে পায় মহেশবাবুর বাড়ি থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে একটা জঙ্গলের ঘৰে। কোনো ভালোমারের হাতে তার মৃত্য হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দীনদয়াল ওই জঙ্গলে কেন গিয়েছিল সেটা জানা যায়নি। একটা পুরানো শিবমন্দির আছে সেখানে, কিন্তু দীনদয়াল কোনোদিন সেখানে যেত না।

এই ঘটনার পর প্রেকে নাকি মহেশবাবুর ভীষণ মায়া পড়ে যায় বাপহারা চার বছরের শিশু শক্রলালকে উপর। তিনি শক্রলালকে মানুষ করার ভাব নেন। শক্রলালও শুন বুদ্ধিমান ছেলে ছিল : পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, বি এ পাশ করে রীচিতে শক্র বুক স্টোর্স নামে একটা বইয়ের দেকান খেলে। হ্যাজারিবাগে ত্রাস্ত আছে, দু জাহাগাতেই যাতায়াত আছে ভদ্রলোকের।

এই ঘবরটা শুনে অবিশ্বাস লালমোহনবাবু জিগোস করার লোভ সামলাতে পারলেন না। এই বইয়ের দেকানে বাঙ্গলা বইও পাওয়া যায় কিনা। 'নিষ্ঠয়ই', বললেন শক্রলাল, 'আপনার বইও বিক্রী করেছি আমরা।'

ফেনুদা সব শুনে বলল, 'মহেশবাবুর ছিটীয় ছেলে তাহলে আপনারই বয়সী ছিলেন তা ?'

'বীরেন্দ্র ছিল আমার চোয়েক মাসের ছেট', বললো শক্রলাল। 'আমরা দুজন ইঙ্গলে এক ক্লাসেই পড়েছি, যদিও কলেজের পড়াটা ওরা তিন তাইই করেছে কলকাতায় ওদের এক ব্যাটামশাইয়ের বাড়িতে থেকে। বীরেন্দ্রের পড়াশুনায় মন ছিল না। সে ছিল বেপরোয়া, রোমাণ্টিক প্রকৃতির ছেলে। উনিশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।'

ফেনুদা বলল, 'মহেশবাবু কি সাধুসংসর্গ-ট্র্যান্স করেন নাকি ?'

'আগে করতেন না মোটেই, তবে তাঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি যদিও দেখিনি, তবে শুনেছি এককালে মিলিটারি মেজোজ ছিল, প্রচুর মদপান করতেন। সব ছেড়ে দিয়েছেন।। সাধুসংসর্গ না করলেও, আমার বিশ্বাস আজ

রাজরাজায় পিকনিকের কারণ ছিমন্তার ছিদ্র।

‘এটা কেন বলছে ?’

‘তুনি বাহিরে বিশেষ প্রকাশ করেন না, কিন্তু আমি এর আগেও কয়েকবার রাজরাজা গিয়েছি ওর সঙ্গে। ছিদ্রের সামনে এসে ওর মুখের ভাব খদলে যায় এটা লক্ষ করেছি।’

‘অঙ্গীতে কি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যার ফলে এটা ইত্যাকৃত হবে ?’

‘সেটা আমি বলতে পারব না। তুলে যাবেন না, আমি ছিলাম ওর দারোয়ানের হেসে।’

সাড়ে দশটা নামাদ পরপর তিসবানা গাড়ি এসে খামল ভেড়া নদীর ধারে। আমাদের গাড়িটা ছিল সবচেয়ে পিছনে; আমাদের সামনে প্রীতীনবাবুর গাড়ি। আমাদের গাড়িটা ছিল সবচেয়ে পিছনে; আমাদের সামনে প্রীতীনবাবুর গাড়ি। তিনিই প্রথমে নামলেন গাড়ি থেকে, হাতে টেপ রেকর্ডার আর দেখেই ৮শে গোলেন বায়ে জঙ্গলের দিকে। আমরা সবাই নামলাম। যেহেনবাবু ছিলেন প্রথম গেলেন বায়ে জঙ্গলের দিকে। আমরা সবাই নামলাম। যেহেনবাবু ছিলেন প্রথম গেলেন বায়ে জঙ্গলের দিকে। তাড়া নেই, নদী পেরিয়েই গাড়িতে, তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘তাড়া নেই, নদী পেরিয়েই রাজরাজা, সঙ্গে ফ্রাঙ্কে কফি আছে, একটু রিলায় করে তবে ওপারে যাবা।’

আমরা সবাই নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড়ে নদী, যাকে বলে খৰঙ্গোতা। বৰ্ষাৰ ঠিক পৰে এ নদী পেরোনো নাকি মৃশকিল, কারণ তখন জল থাকে হাঁটু অবধি। ছোট বড় মেজ সেজো নানান সাইজের সাদা কালো খায়াল পার্টিকলে ছিটার সব পাথৰ ভিত্তিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগ যুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম কৰে, পালিশ কৰে বাস্তবাগীশ ভেড়া নদী তড়িঘড়ি ছুটে চলছে দামোদরে ঝীপিয়ে পড়বে বলে। এই ঝীপের জয়গাই হল রাজরাজা।

মালিমা দেবী কফি ঢেলে দিলেন কাগজের কাপে, আমরা সবাই একে একে গিয়ে নিয়ে নিলাম। প্রীতীনবাবুকে বোধহয় নদীর শব্দ বাঁচিয়ে পাখির ডাক বেকড় করতে হবে বলে বনের একটু ভিতর দিকে যেতে হয়েছে। পাখি যে ডাকতে নানারকম সেটা ঠিকই।

এখনে এসে নতুন যাদের সঙ্গে আলাপ হল, ফেলুদার কায়দায় তাদের একটু স্টাডি কৰার চেষ্টা কৰলাম।

বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, সে তার ডলটাকে একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিয়ে বলল, ‘চুপটি করে বসে থাক। দুষ্টুমি কৰলেই ভেড়া নদীতে ফেলে দেব, তখন দেখবে মজা।’

অকৃণবাবু হ্যাত থেকে কাগজের কাপ ফেলে দিয়ে একটু দূরে একটা খোপের পিছনে অদৃশ্য হলেন, আর তার পৰেই খোপের মাথার উপর ধৌঁয়া দেবে বৃঝলাম এই বয়সেও ভদ্রলোক খাপের সামনে সিগারেট খান না।

মহেশ টোকুরী হাত দুটো পিছনে জড়ে করে নদীর কাছেই দাঁড়িয়ে একসুষ্টি জলের দিকে চেয়ে আছেন।

ফেনুদা দুটো পাথর ঠোকাঠুকি করে সেগুলো চকমকি কিনা পরীক্ষা করছিল, অবিলম্বে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনার মালিটা কি জানা আজে ?' ফেনুদা বলল, 'কৃত্তি। সেটা গোয়েন্দার পাশে ভালো না আরাপ ?'

মালিমা দেবী যাটি থেকে একটা বুনো হলদে কুল কুলে সেটা খৌপাত্ত কুকুরের লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে কী একটা বলায় লালমোহনবাবু মালিটা পিছনে হেলিয়ে আউলি হাসতে গিয়ে এক লাঙে দৌয়ে সরে গেলেন, আর মালিমা দেবী খোলা হাসি হেসে বললেন, 'সে কী, আপনি গিরগিটি সেসে ভয় পাচ্ছন ?'

শুষ্করুলালকে খুঁজতে গিয়ে দেখি উনি ইতিমধ্যে কখন ভাবি নদী পেরিয়ে গিয়ে উপারে একজন গেম্বোধারী ডুর্লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। একটা বাসে কিছু যাত্রা এসেছিল, তারা একটুক্ষণ আগেই নদী পেরিয়েছে সেটা দেখেছিলাম।

কফি আওয়া শোব, প্রীতিনিধিবুও এসে গেছেন, তাই আমরা উপারে যাবার জন্য তৈরি হনাম। ধূতি, শাড়ি, প্যান্ট সবই একটু উপরদিকে উঠে গেল, বিষি চড়ে বসল গুড়ে, নূর মহম্মদের পিটে, লালমোহনবাবু জলে নামদার আগে ঘনে হল চোখ বুজে কী জানি বিড়বিড় করে নিলেন, পেত্রোবাব সময় বাব তিনেক বেসামাল হতে হতে সাবলে নিলেন, আর উপারে পৌছিয়েই বঙ্গলেন ব্যাপারটা যে এত সহজ সেটা উনি ভাবতেই পাবেননি।

বাকি পথটার দু পাশে গাছপালা ছিল, যদিও সেটাকে জঙ্গল বলা চলে না। তাও লালমোহনবাবু সেদিকে বারবার আড়চোবে চাওয়াতে বুঝলাম উনি বাবের কথা ভোলেননি।

একটা ঘোড় ঘুরতেই ধিয়েটারের পর্ম সরে যাওয়ার মতো কোথের সামনে কাজৰাঘা বেরিয়ে পড়তে লালমোহনবাবু এত জোরে বাঃ বললেন যে পাশের গাছ থেকে একসঙ্গে দুটো ঘূরু উড়ে পালাল।

অবিশ্য বাঃ বলার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে দুটো নদীই দেখা যাচ্ছে। বী দিকে উত্তরে ভেড়া, আর তাইনে নিচে দামোদর জলপ্রপাতের জায়গটা দেখতে হলে আরো এগিয়ে বীয়ে যেতে হবে, যদিও শব্দটা এখান থেকেই পাচ্ছি। সামনে আর নদীর উপারে বিশাল কচ্ছপের পিটের মতো পাথর, দূরে বন, আর আরো দূরে আবর্ণ পাহাড়ের পাইন।

মন্দির আমদারের বীয়ে বিশ হাতের মধ্যে। বোঝাই যায় অনেকবিনের পুরানো, কিন্তু সেটাকে আবার নতুন করে সাজগোজ পরানো হয়েছে। এই কদিন অগেই কালীপুঞ্জোতে এখানে ঘোষ বলি হয়েছে বলে শুনলাম। লালমোহনবাবু বললেন এককালে নির্ঘাতি নববপি হত। অবিশ্য সেটা যে খুব কুস বলেছেন তা হত্তি না।

বাসে যেসব যাত্রী এসেছে তাদের দৃশ্য দেখার উৎসাহ নেই, তারা সবাই মন্দিরের সামনে জড়ো হয়েছে। শক্রলাল ঠিকই বলেছিলেন। মহেশ চৌধুরী আব্য মিনিট থানেক ধরে মন্দিরের দরজার দিকে চেয়ে বইলেন, যদিও অঙ্ককারে বিগ্রহটা দেখাই যায় না। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেলেন অন্যরা যেদিকে চোছে সেইদিকে। আমরা তিনজনও সেইসিকেই এগায়ে গেলাম।

খানিকটা যেতেই ফলস্তো দেখতে পেলাম। যেখানে বালির উপর শতনাম পাতা হচ্ছে সেখন থেকে ওটা দেখা যাবে। জানমোহনবাবু এলেন, 'এটা কিন্তু ফাউ হয়ে গেল মশাই। হাজারিবাগ এসে সেকেড় দিনেই একজন রিটায়ার্ড আডভোকেটের কন্যাদিনে পিকনিকে ইনভাইটেড হবেন, এটা কি তাবতে পেরেছিলেন ?'

'এ তো সবে শুন', বলল ফেলুন।

'বলছেন ?'

'দাবা খেলেছেন কখনো ?'

'বক্সে কখন মশাই !'

'তাহলে ব্যাপারটা দৃঢ়াতেন। দাবার শেষ দিকে যখন দু'পক্ষের পাঁচটি কি সাতটি টুটি বোর্ডের এবানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন অবৰ্দ্ধ অবস্থাতেই তাদের প্রস্তরের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলতে থাকে। যাবা বেলহে তারা তাদের প্রত্যেকটি স্বায় দিয়ে ব্যাপারটা অনুভব করে। এই চৌধুরী পরিবাবটিকে দেখে আমরা দাবার ঘুটির কথা মনে হচ্ছে, যদিও কে সাদা কে কালো, কে বাজা কে গুরী, তা এখনো বুঝিনি।'

আমরা মন্দির আব পিকনিকের জায়গার মাঝামাঝি একটা জয়গায় একটা অশুধগাছের তলায় পাথরের উপর বসলাম। এগারোটাও বাঁকেনি এখনো, বাবার তাড়া নেই, সবাইয়ের মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত জিলেচালা ভাব। অখিলবাবু বালিতে উন্মু হয়ে বসে বিবিকে হাত নেড়ে কী যেন বোঝেছেন; নীলিমা দেবী শওর্নিতে বাসে তাঁর বাগের ভিতর থেকে একটা ইংরিজি পেপারব্যাক বার করলেন, সেটা নিষ্পত্তি ডিটেকটিভ বই; প্রোতীনবাবু একটা ডিবির উপর বসে তাঁর টেপ রেকর্ডারে একটা নতুন কাস্টে ভরলেন; অক্ষণবাবু জগৎ সিংহের কাছ থেকে তাঁর বন্দুকটা নিলেন, মহেশবাবু মাটি থেকে একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সেটা নেড়ে ছেড়ে দেবে আবার ফেলে দিলেন; 'শক্রলালকে দেখছি না', বললেন জানমোহনবাবু।

'আছেন, তবে দূরে', বলল ফেলুন।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম মন্দির ছাড়িয়ে আরো বেশ কিছুটা দক্ষিণে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শক্রলাল কিছুক্ষণ আগে সেখা সেই গেরয়াধীনীটির

সঙ্গে কথা বলছেন। 'একটু যেন সাস্পিশাস বলে মনে হচ্ছে', মন্তব্য করলেন লালমোহনবাবু।

ফেনুদারও সাস্পিশাস মনে হচ্ছে কিনা সেটা জানবাব আগেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন অরূপবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। 'ওটা দিয়ে কি বাধ মারা যায় ?' জিগোস করল ফেনুদা।

'সাকসের বাধ এন্দুর আসবে না', হেসে বললেন অরূপবাবু। 'সাবাব যেরেছি এটা নিয়ে, তবে সাধারণত পাখিটাখিই থারি। এটা ট্যারেটি-টু।'

'তাই তো দেখছি।'

'আপনি শিকার করেন ?'

'শুধু খানুম।'

'আপনার কি কোনো এজেন্সি আছে নাকি ? না প্রাইভেট ?'

ফেনুদা তার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর সেখা একটা কার্ড অরূপবাবুকে দিয়ে দিল। ভদ্রলোক বললেন, 'ধ্যাসস। কখন কাজে লেগে যাব বলা তোথায় না।'

ভদ্রলোক যেনিক দিয়ে এসেছিলেন সেইদিকেই চপে গেলেন। ফেনুদা এই কাঁকে কখন যে সেই সকালের কাগজটা পকেট থেকে বের করেছে সেটা দেখতেই পাইনি। লালমোহনবাবু কাগজটার দিকে ঝুকে পড়ে বললেন, 'বাঙলা বামের কথা কী বলছিলেন মশাই ?'

'এই দেখুন।'

ফেনুদা পাশাপাশি সেখা চারটে ইংরিজি অক্ষরের দিকে দেখাল। লালমোহনবাবু তুক্ক দুচকে বললেন, 'ওটাতোমনে হচ্ছে লক্ষ শিথতে গিয়ে বানান তুল করে LOKC লিখেছে।'

'এলোকেশী !' আমি টেচিয়ে উঠলাম। এরকম ভাবে ইংরিজি অক্ষরে বাঙলা কথা অভিও লিখেছি ছেলেবেলায়।

'বাঃ', বললেন লালমোহনবাবু, 'সতিইতো। আব এই জাপানী নামটা ?'

'ওকাহা ? এটা একটা বাংলা সেন্টেস। OKAHA !'

'ও, কে, এ, এইচ, এ ? এটা একটা বাংলা সেন্টেস ? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি ?'

'ও, কে, এ, এইচ, এ—এটা তাড়াতাড়ি বলুনতো, না খেবে। মেনুনতো কী রুকম শোনায়।'

এবাব লালমোহনবাবুর মুখে একটা বিশ্বাস আব বুশি মেশানো ভাব দেখা দিল। 'ও কে এয়েচে ! ওয়ালাৰফুল—বাঃ, বাঃ, এইত, জলেৱ মতো সোজা—SO—এসো ; DO—দিও ; NADO—এনে দিও ; NHE—এমেচি।—ও বাবু ! এটা যে বিৰাট সেন্টেস ; এৱ তো শেষ নেই

মশাই !—AKLO ATBB BBSO ADK SO RO ADK SO AT KLO
PC LO ROT OT DD OK OJT RO OG এ আমার পাখি নেই ।

‘বৈরে নেই বলুন । তোপসে পড় । পাকুয়েট করে নিসে জলের মতোসোজা ।

‘কুব বেশি না ঠেকেই পড়ে গেলাম আমি ।—

‘এ কে এল ? এটি বিবি । বিবি এস । এদিকে এস । আরো এদিকে এস । এটি কে এল ? পিসি এল । আর ওটি ? ওটি দিনি । ও কে ? ও জেঠি । আর ও ? ও কি ?’

‘সেটা কোথায় পেলেন আপনারা ?’ মহেশবাবু হাসিয়ুন্থে আমাদের নিকে এগিয়ে এসেছেন ।

‘আপনার বাগানের ধারে পড়ে ছিল,’ বলল ফেলুনা ।

‘বিবিদিদিমপির সঙ্গে একটু কেলা করছিলাম আর কী ?’

‘সেটা আমাজ করেছি’, বলল ফেলুনা । আমরা তিনজনেই উঠতে যাচ্ছিলাম, ভুবলোক যাব্বা দিয়ে আমাদের পাশেই পাথরের উপর বসে পড়লেন ।

‘আরেকটি কাগজ দেখাব আপনাদের ।’

মহেশবাবুর দুখে আগ হাসি নেই । পকেট থেকে মানিবাগ বার করে তার ডিতর থেকে একটা পুরানো ভাঁজ করা পোস্টকার্ড বার করলেন ।—‘আমার ছিটীট পুরো শেষ পোস্টকার্ড ।’

ফেলুনা পোস্টকার্ডটা নিয়ে ভাঁজ কুলল । একদিকে রঙিন ছবি । সেক সমেত ভূরিখ শহরের দৃশ্য । উল্টোদিকে শুধুই নাম ঠিকানা দেখে আমরা সকলেই বেশ অবাক ।

মহেশবাবু বললেন, ‘শেষের দিকে ও তাই করত । শুধু জানান নিয়ে দিত কোথায় আছে । আগেও দু’এক সাইনের বেশি লেখেনি কখনো ।’

ভুবলোক ফেলুনার হাত থেকে পোস্টকার্ডটা নিয়ে আবার ভাঁজ করে বাগে রেখে দিলেন ।

ফেলুনা বলল, ‘বীরেনবাবু বিলেতে কী করতেন সেটা জানতে পেরোছিলেন ?’

মহেশবাবু হাত্তা নাড়লেন । মাঝুলি চাকরি করার ছেলে ছিল না বীরেন । সে ছিল যাকে বলে হেবেল । একটি অগ্নিকুলিন । গানুগতিকের একেবারে বাইরে । তার আবার একটি হিরো ছিল । বাঙালী হিরো । একশো বছর আগে তিনিই মার্কিন বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত যান । তারপর শেষ পর্যন্ত ব্রেজিল না মেরিকো কোথায় গিয়ে আর্থিতে চুক্তে কর্নেল হয়ে সেখানকার যুক্তে অসাধারণ হীরাট দেখান ।’

‘সুরেশ বিক্রাম কি ?’ ফেলুনা জিগ্যাস করল । লালমোহনবাবুরও চোখ চকচক করে উঠেছে । বললেন, ‘ইয়েস ইয়েস, সুরেশ বিক্রাম । ব্রেজিল ধ্যান যাব

ভদ্রলোক। কার্নেল সুরেশ বিশ্বাস।'

মহেশবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছেন। ওই নাম। কোথেকে তার একটা জীবনী জোগাড় করেছিল, আর সেটা পড়েই ওর অ্যাডভেক্টরের শুধু হয়। আমি বাধা দিইনি। জানতাম দিলে কোনো ফল হবে না। উধাও হয়ে গেল। তারপর মাস দুয়েক পরে এল ইউরোপ থেকে এক চিঠি। ইলায়, সুইডেন, কাম্পনি, অস্ট্রিয়া...কী করছে কিছু বলে না, কখনুমিয়ে দেয় সে আছে। চলে গেছে বলে যেমন দৃঃখ হত, তেমনি নিজের ঠটায় নিজের পায়ে পাড়িয়েছে বলে গবর্ণ হত। তারপর সিল্বাটি সেভলেনের পর আর চিঠি নেই।'

মহেশবাবু কিছুক্ষণ উদাস চোখে দূরের গাছপালার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'সে আর আমার কাছে আসবে না। এত সুখ আমার কপালে নেই। আমার উপরে যে অভিশাপ লেগেছে।'

'সে কি হে, তুমি আবার অভিশাপ-টিভিশাপে বিশ্বাস কর করে থেকে?—অখিলবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। মহেশবাবু দীর্ঘস্থাস ফেলে বললেন, 'তুমি আমার কোষ্টাই বিচার করেছ অখিল, মানুষটাকে বিচার করুনি।'

'ওইখানেই তো ভুল', বললেন অখিলবাবু, 'মানুষের কৃষ্টি, মানুষের গাণি শহু লশ—এ সবের থেকেও আলাদা নয় মানুষ। তোমায় বলছিলুম সেই ফটিটুতে, যে তোমার জীবনে একটা বড় চেষ্টা আসছে—মনে আছে তোমার।—শুনুন যশাই—' ফেল্দার দিকে ফিল্মেন অখিলবাবু—'এই যে দেখছেন আরেক, এখন দেখলে বুঝতে পারবেন কি যে ইনি এককালে রাচি টু নেতৃত্বহীন যাবার পথে এসে একটি পুরানো ফোর্ড গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় তার উপর বাধা করে সেটাকে পাহাড় থেকে হাজার ফুট নিচে ফেলে দিয়েছিলেন।'

মহেশবাবু উঠে পড়েছিলেন। বললেন, 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলায় সেটা বলে দিতে কি জোড়িষ্ঠীর দরকার হয়?'

কথাটা ব্যুল মহেশবাবু উন্নতিদিকে চলে গেলেন, বোধহয় পাথরের সম্ভানে। অখিলবাবু বসমন্তেন তাঁর জায়গায়। গাঁজ বলার মুড়ে ছিলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'আশ্চর্য লোক এই মহেশ। আমি তাঁর পড়শী ছিলাম। যদিও অন্য দিক দিয়ে বাবধান বিশ্বাস। আমি শিক্ষক, আরও উদ্দীয়মান আডভোকেট। ওর ছেলেদের টিউশনি করেছি কিছুদিন, সেই থেকে আপাপ। অ্যালোপাথিতে আস্তা ছিল না, তাই অসুখ-টমুখ করালে মাঝে মাঝে শিকড় বাকল চেয়ে নিত আমার কাছে। সামাজিক বাবধানটা কোনোদিন বুঝতে দিত না। আমার ছেলেকেও নিজের জেলের মতোই স্নেহ করত। কোনো স্বার্থ ছিল না।'

'আপনার ছেলে কী করে?'

'কে, অধীর? অধীর ইঞ্জিনিয়ার। বোকারোয় আছে। খড়গপুরে পাশ করে

ডুসেলডর্ফে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। বিনেশেই ছিল বছর পশ্চেক, ও রপর—'

একটা বিক্ষেপণের শব্দ অর্খিলবাবুর কথা ধারিয়ে দিল। 'বন্ধুক !'—ঠিক্যে
উঠল বিবি—'জেন্ট পারি মেরেছে ! আমরা রাত্তিরে তিতিরে মাসে থাব !'

'দেবি অহেল আবার কোথায় গেল ?' অর্খিলবাবু যেন কিছুটা চিন্তিত ভাবেই
উঠে পড়লেন। 'পাথর দুর্ভাগ্যে গিয়ে পা হড়কে পড়ে-উড়ে গেল জন্মদিনটাই ...'

'পিকনিক বলে মনেই হচ্ছে না !' প্রাণীনবাবুর গ্রীষ্ম হাতের বইটা নষ্ট করে
শতরঞ্জির উপর রেখে উঠে আশের দিকে এগিয়ে এলেন। 'সবাই এমন ছড়িয়ে
আছে কেন বলুন তো ?'

'বিদেশে পেলেই সৃজনসূজন করে এসে হাজির হবে,' বলল ফেলুন।

'কিছু খেললে হত না ?'

'তাস ?' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি কিন্তু ক্রু ছাড়া আর কিছু জানি না !'

'তাও আবার চিলে,' বলল ফেলুন।

'তাস তো আলিনি সঙ্গে,' বললেন নীলিমা দেবী। 'এমনি দুখে মুখে কিছু খেলা
যেতে পারে ?'

'জল-মাটি-আকাশ হলে লালমোহনবাবু যোগ দিতে পারেন,' বলল ফেলুন।

'সেটা আবার কী মশাই ?'

'শুর সহজ,' বললেন নীলিমা দেবী, 'ধরন, আপনার দিকে তাকিয়া আমি জল,
মাটি, আকাশ এই তিনটের যে কোনো একটা বলে দশ শুনতে শুর করব। তব
বললে জলের, মাটি বললে মাটির, আর আকাশ 'বললে আকাশের একটা প্রাপীর
নাম করতে হবে আপনাকে ওই দশ গোনার মধ্যে !'

'এটা খুব কঠিন খেলা দুরি !'

'খেলে দেখুন একবার। আমি আপনাকেই প্রশ্ন করছি !'

'কেল। রেডি !' লালমোহনবাবু দম নিয়ে সোজা হয়ে যোগাসনে বসলেন।
নীলিমা দেবী ভদ্রলোকের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাতে ঠিক্যে
উঠলেন—

'আকাশ ! এক দুই তিস চার পাঁচ—'

'ঁ-ঁ-ঁ—'

'ছয় সাত আট নয়—'

'বেঙ্গুর !'

ফেলুন অবিশ্বিত জানতে চাইল বেঙ্গুরটা কেন গ্রহের আকাশে চরে বেড়ায়।
তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে ব্যাখ, হাঙ্গর আর বেঙ্গুন—এই তিনটে তিনি
ভেবে রেখেছিলেন, বলাৰ সময় তাজগোল পাকিয়ে গেছে। তাতে ফেলুন বলল
যে বেঙ্গুনকে প্রাণী বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; কিন্তু লালমোহনবাবু



কথটা যানতে চাইলেন না। বললেন, 'বেলুনে অঞ্জিজেন লাগে, প্রাণীরও কথটা যানতে চাইলেন না। কেন মশাই?' ফেলুদা বলল যে অঞ্জিজেন ছাড় চলে না, মুকুরাং প্রাণী বলব না কেন মশাই?' এমনকি সে হাওয়া, ইইজ্জোজেন আর হিলিয়ামের বেলুনের কথা শনেছে, এমনকি কয়লার গ্যাসের বেলুনের কথাও শনেছে, কিন্তু অঞ্জিজেন বেলুনের কথা এই প্রথম শুনল ।

নীলিমা দেবী তর্ক ধারানোর জন্য হাত তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা হটল যে তর্ক আপনিই থেমে গেল ।

প্রীতীনবাবু ।

মানুষে একসঙ্গে দুইব আর আতঙ্ক অনুভব করলে তার কীরকম ভাবভঙ্গী হতে পারে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির করা তার একটা ড্রইং ফেলুদা একবার আগামকে দেখিয়েছিল । প্রীতীনবাবুর চেহারা অবিকল সেই ছবির মতো ।

ভদ্রলোক একটা খোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কাপড়ে কাপড়ে মাটিতে বসে পড়লেন ।

নীলিমা দেবী ছুটে গেলেন স্বামীর দিকে, যদিও ফেলুদা তার আগেই পৌছে গেছে । কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথা বেরোতে বেশ সময় লাগল

'বা....বা....বাবা !' বললেন প্রীতীনবাবু, আর সঙ্গে সঙ্গে তার ডান হাতটা পিছন দিকে নির্দেশ করল ।

১৫॥

মহেশবাবুকে যখন বাড়িতে আনা হয় তখন প্রায় আড়াইটা । তখনও জান হয়নি ভদ্রলোকের । শাথায় চেট সেগোছে, দীঢ়ানো অবস্থা থেকে সটান পড়েছিলেন মাটিতে । ডাকুর বলছেন হাঁট অ্যাটাক । ভদ্রলোকের হাঁট এমনিতেই দুর্বল ছিল, তার উপর এই বয়সে হঠাৎ কোনো কারণে শক্ষ পেলে এরকম ইওয়া অস্বাভাবিক নয় । মোট কথা, তাঁর অবস্থা ডালো নয়, সেরে ওঠার সভাবনা আছে কিনা সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না ।

বাড়োঢ়ায় আমরা কে বলে বসেছিলাম, তার উপরে বালিকটা দূরে একটা বেশ বড় পাথরের পিছনে একটা খোলা জায়গায় অহেশবাবুকে পাওয়া যায় । এটা কোনোদিন ভুলে না যে আমরা যখন সেখানে পৌছলাম তখন তাঁর কাছেই দুটো হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছিল । প্রীতীনবাবু পাহাড় নেয়ে উপর দিকের ক্ষমলে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে কিছুদূর নেয়ে এসে একটা খোপ পেরিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখেন মহেশবাবু পড়ে আছেন মাটিতে । তিনি ভেবেছিলেন ভদ্রলোক মারাই গোছেন, তাই ওরকম চেহারা করে এসেছিলেন খবর দিতে । ফেলুদা গিয়েই

মহেশবাবুর মাড়ী ধরে বলল তিনি বেঁচে আছেন। তাঁর মাথাটা পড়েছিল একটা খান ইটের সাইজের পাথরের উপর, তাঁর ফলে খনিকটা রক্ত পেরিয়ে পড়েছিল পাথর আর বালির উপর।

আমরা মহেশবাবুর কাছে পৌছানোর মিনিটখনেক পরে প্রথম এসেন অরুণবাবু, তাঁর হাতে বন্দুক। তাঁরপর এসেন অধিলবাবু। সব শেষে এসেন শঙ্করলাল মিশ্র। শেষের ভদ্রলোকটিকে যেরকম ভেঙে পড়তে দেখলাম, তাঁতে বুরুলাম মহেশবাবুর প্রতি তাঁর টান করে গতীর।

এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে মহেশবাবুকে তুলে তেড়া নদী পেরিয়ে হাজারিবাগ নিয়ে আসা অসম্ভব, তাই ভদ্রলোকের দুই ছেলে তৎক্ষণাতে চলে গেলেন শহরে : ডাক্তার আর আলুলাল নিয়ে আসতে লাগল প্রায় আড়তি টক্টা, কৈলাসে পৌছতে আরো এক ঘণ্টা। আমরা কিছুক্ষণ কৈলাসেই রয়ে গেলাম। পিকনিক আর হ্যানি, তাই কাকুর খাওয়া হয়নি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই প্রীতীনবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য পরোটা, আলুরস্থ, খাঁসের কাবাব ইত্যাদি এনে দিলেন। অশ্চর্য শক্ত বলতে হবে ভদ্রমহিলা। বিবি অবিশ্বি ব্যাপারটা বুঝতেই পারছে না, কলাহে দাদু মাথা চুরে পড়ে গেছে। আমরা বৈঠকখানাটেই বসেছিলাম, অরুণবাবু ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন বাপের ঘরে, প্রীতীনবাবু মাঝে মাঝে এসে ভদ্রতার খাতিরে আমাদের মাঝে দু একটা কথা বলে যাচ্ছিলেন। শঙ্করলাল নিরবি, এই বায়ুক ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবারও মুখ খোলেননি। অধিলবাবুর মুখে একটাই কথা—'ক্রত করে বললাম, তাও কথা শুনল না। আমি জানতাম আজ একটা কিছু অঘটন ঘটবে।'

চারটে নাগাদ আমরা উঠে পড়লাম। প্রীতীনবাবু ছিলেন, তাঁকে বললাম কাল এসে খবর নিয়ে যাব কেমন থাকেন মহেশবাবু।

বাঁড়ি ফিবে এসে হাত মুখ ধূয়ে বারান্দায় এসে বসেলাম তিনজন। একদিনে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটলে মাথাটা কেমন যেন ভৌ ভৌ করে, আমার মেই অবস্থা। ফেলুন্দা কথা বলছে না, তাঁর মানে তাঁর ভাবনা চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে ফেলছে। আমি জানি ও এখন বেশি কথা বলা পছন্দ করে না, তাও একটা জিনিস না বলে পারলাম না।

'আজ্ঞা ফেলুন্দা, ডাক্তার বলেছেন একটা শক্ত পেসে এরকম হতে পারে, কিন্তু বাজরাপাতে কী শক্ত পেতে পারেন মহেশবাবু ?'

'গুড কোয়েল্চেন,' বলল ফেলুন্দা, 'আজকের ঘটনার ওই একটা ব্যাপারই আমার কাছে অর্থপূর্ণ। অবিশ্বি শক্ত পেয়েছেন কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না এখনো।'

'সেটা ভদ্রলোক সুস্থ হয়ে উঠলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে,' বললেন

লালমোহনবাবু ।

‘উঠবেন কি সুহ হয়ে ?’

মহেশবাবু সবকে ফেলুন্দার মনে যে কৌতুহলের ভাব জেগে উঠেছে, সেটা আজ কৈলাসের বৈঠকখানার বসেই বুঝতে পারছিলাম। বেশির ভাগ সময়টাই ও হরের জিনিসপত্র, আলমারির বই, এই সব দেখে কাটিয়েছে। ভাবটা যে তদন্ত করছে তা নহ, বেশ চিলেচালা, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে এ সব কিছু মনে মনে নেটি করে নিজে। সেই ফ্যাফিলি শুপটা ও হাতে তুলে নিয়ে দেখল প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ।

আদিবাসী প্রতি ধোকে মাদলের শব্দ ভেসে আসছে। ইঠাঁৎ খেয়াল হল যে আজ ম্যাজেস্টিক সার্কাসের বাঘটার কোনো ধরণের পাওয়া যায়নি। অবিশ্য ধরা পড়লে নিশ্চয়ই জানা যেত। অন্তত বুলাকিপ্রসাদ নিশ্চয়ই জানাত।

ঠাণ্টাটা পড়েছে, লালমোহনবাবু তাই মার্কিক্যাপটা আরো টেনে নামিয়ে নিয়ে বললেন, ‘সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপর !’

ভপ্রশ়েক বোধহয় ভেবেছিলেন আমরা দুজনেই জিগোস করব বাপারটা কী : সেটা না করাতে শেষে নিজেই বললেন, ‘যে সময়টা ঘটনাটা ঘটল, তখন কিন্তু মিসেস প্রীতীন আর খুকী ছাড়া আর কে কী করছিল তা আমরা কেউই জানি না।’

‘কেন জানব না,’ বলল ফেলুন। ‘অঙ্গুষ্ঠাবু পাখি মারার চেষ্টা করছিলেন, প্রীতীনবাবু পাখির ডাক রেকর্ড করছিলেন, অধিলবাবু মহেশবাবুকে খুজছিলেন, শত্রুরলাল তীর সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন, আর বেয়ারা দুজন আমাদের বিশ হাত দূরে শিমুল গাছের তলায় বসে বিড়ি খাচ্ছিল।’

‘বেয়ারাদের তো আধিত দেখেছি মশাই, কিন্তু আর সবাই সত্ত্ব কথা বলছে কিম্বা সেটা জানচেন কী করে ?’

‘যাদের সঙ্গে মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপ তাদের আচরণ সবকে এত চট করে সন্দেহ প্রকাশ করতে আমি রাজি নই।’

‘তা বটে, তা বটে !’

তিনারের মাঝখানে লালমোহনবাবু ইঠাঁৎ একটা নতুন কথা ব্যবহার করলেন—‘সুপার-কেলেক্টরি’। এটাও বলা দরকার যে কথাটা বলার সময় তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রায় ছইঝিক সাফিয়ে উঠেছিলেন। ফেলুন্দা স্বত্ত্বাবতই জিগোস করল ব্যাপারটা কী।

‘আরে মশাই, একটা জনকী কথাই বলা হয়নি। সাংবাদিক ঝুঁ। যেখানে ডেডবেডি—পুড়ি, মহেশবাবু পড়েছিলেন, তার একপাশে পায়ে কী জানি টেকতে চেয়ে সেখি প্রীতীনবাবুর টেপ অকড়ারি।’

‘সেটা এনেছেন সঙ্গে ?’

‘ভাবলুম পরে তুলব, তুপে ভদ্রলোককে দেব, তা তখন যা অবস্থা... কেবার
সময় দেখি সেটা আর নেই।’

‘প্রীতীনবাবু তুলে নিয়েছিলেন বোধহয়।’

‘দুর মশাই, প্রীতীনবাবু ওই দিকটাতেই বেসেননি : তাহাজা জিনিসটা পড়েছিল
একটা বোপড়ার মধ্যে ; পায়ে না ঢেকলে ঢোবেই পড়ত না।’

ফেলুদা ব্যাপারটা নিয়ে কী যেন খন্দব্য করতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা
টেলিফোন এল।

অরুণবাবু।

ফেলুদা দু একটা কথা বলেই ফোনটা রেখে ধসল, ‘কৈলাস চল। মহেশবাবুর
আন হয়েছে। আমার নাম করছেন।’

গাড়িতে কৈলাস যেতে লাগল এক মিনিট।

মহেশবাবুর ঘরে সকলেই রয়েছেন, এক বিবি ছাড়া। ভদ্রলোকের মাধ্যম
বাস্তেজ, চোখ আধবোজা, হাত দুটো বুকের উপর জড়ো কৰা। ফেলুদাকে দেখে
মুখে যে হাসিটা দেখ নিল সেটা প্রায় চোখে ধরাই পড়ে না। তারপর তাঁর ডান
হাতটা উঠে তর্জনীটা সোজা হল।

‘কা কা...’

‘একটা কাজের কথা বলছেন কি?’ ফেলুদা ভিগ্যোস করল।

ভদ্রলোকের মাথাটি সামান্য নড়ে উঠল হাঁ-য়েব ভঙ্গিতে। তারপর তর্জনীর
পাশে মাথের আঙুলটাও উঠে দাঁড়াল। একের কায়গায় দুই।

‘উই... উই...’

এইটুকু বলে দুটো আঙুল আবার তাঁক হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় বুজো
আঙুলটা সোজা হয়ে উঠে এদিক ওদিক নড়ল।

তারপর ভদ্রলোক বেশ কষ্ট করে ঘাড়টা ডানলিকে ঘোরালেন। ওদিকে
বেডসাইড টেবিল। তার উপর মুকানদের ছবি।

ছবিটি দিকে হাতটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে অরুণবাবু ছবিটা বাপের দিকে এগিয়ে
দিলেন। মহেশবাবু সেটা নিজে না নিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি কেরালেন।
অরুণবাবু ছবিটা ফেলুদাকে দেবার পর মহেশবাবু আবার দু আঙুল দেখালেন। কী
যেন একটা বলতেও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

এর পরে আর কোনো কথা বলতে পারেননি মহেশ তৌরুরী।

তিনি মহাসেশের শক্তি ঘোর পিছনে, সেই মুকুন্দের ঘেঁষে বাঁধানো পাসপোর্ট সাইজের ছবি এখন আমাদের ঘরে। আমরা চলে আসার ঘণ্টা দুয়েকের অধোই অহেশবাবু মারা যান। যাবার আগে ফেলুদার উপর যে তিনি কী দায়িত্ব দিয়ে গেছেন সেটা ফেলুদা বুঝলেও, আমি বুঝিনি। আর লালমোহনবাবুও নিষ্ঠাই বোকেননি, কারণ উনি বললেন অহেশবাবু নাকি ফেলুদাকে মুকুন্দের শিখা হতে বলে গেছেন। ফেলুদা যখন ভিগ্যেস করল যে ছবিটা দেবার পরে দুটো আঙুল দেখানোর যান্মে কী, তখন লালমোহনবাবু বললেন মুকুন্দের শিখা হলে ফেলুদার শক্তি ডুবল হয়ে যাবে এটাই বেঁবাতে চেয়েছিলেন তত্ত্বজোক। 'অবিশ্বা কাঁচকলা দেখানেন কেন সেটা বোঝা গেল না।' শীকার করলেন লালমোহনবাবু।

প্রতিদিন সকালে অবিলবাবুর টেলিফোনে আমরা মৃত্যুসংবাদটা পেলাম।

এগারোটা নাগাদ শুশ্রান থেকে ফেরার পথে লালমোহনবাবু ভিগ্যেস করলেন, 'কৈলাসে যাবেন, না বাড়ি যাবেন?' ফেলুদা বলল, 'এবেলা ওদিকটা না মাড়ালোই তালো: অনেকে সঘবেদনা জানাতে আসবে, কাজ হয়ে না কিছুই।'

'কী কাজের কথা বলছেন ?'

'তথ্য সংগ্রহ।'

দুপুরে বাবার পর বারান্দায় বসে ফেলুদা শুর সবুজ খাতায় কিছু নোট লিখল। সেটা শেষ হলে পর এইরকম দাঁড়াল—

- ১। মহেশ চৌধুরী—জন্ম ২৩শে নভেম্বর ১৯০৭, মৃত্যু ২৪শে নভেম্বর ১৯৭৭
(স্বাভাবিক হাঁট আটাক ? শক ?)। হৈয়ালিপ্রিয়। ডাক্তান্তিকিট, প্রজ্ঞাপত্তি, পাত্র। দেৱাবজীর দেওয়া মূল্যবান স্ট্যাম্প আলবাম লোপাট (how ?) মেজো ছেলের প্রতি টান। অন্য দুটির প্রতি মনোভাব কেমন ? শক্ষণশালের প্রতি অপত্তি সেহে। স্ববাবি ছিল না। অঙ্গীতে মেজোজী, ফদাপ। শেষ বয়সে সাহিক, সদাশয়। অভিশাপ কেন ?
- ২। ঐ শ্রী—মৃত্যু ! কবে ?
- ৩। ঐ বড় ছেলে অকশেন্দ্র—জন্ম (আদ্বাজ) ১৯৩৬। অস বাবসায়ী। কলকাতা-হাঙ্গারিবাগ যাতায়াত। মৃগয়াপ্তিয়। দুর্ভাগ্যী।
- ৪। ঐ মেজো ছেলে বীরেন্দ্র—জন্ম (আদ্বাজ) ১৯৩৯। 'অগ্নিশুলিঙ্গ'। ১৯
বছর বয়সে মেশ-ছাড়া। কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ভক্ত। বাপকে বিদেশ থেকে চিঠি লিখত '৬৭ পর্যন্ত। জীবিত ? মৃত ? ধাপের ধারণা সে কিরে
এসেছে ?

- ৫। ছেট ছলে প্রীতীন্দা—অঙ্গের সঙ্গে বাণধান অন্তত ১-১০ বছর (তিনি ফার্মিল ফুপ)। অপর্যাপ্ত জন্ম (আন্দাজ) ১৯৪৫। ইলেক্ট্রনিকস। পাখির গান। মিশনকে নয়। কথা বললে বেশি বাসে, নিজের বিষয়। টেপ রেকর্ডিং মেশিন এসেছিল রাজেরামায়।
- ৬। প্রীতীনের প্রী নৌলিন্দা—বয়স ২৫/২৬। সহজ, সপ্রতিভ।
- ৭। অধিল চক্রবর্তী—বয়স আন্দাজ ৭০। এক্স-সুলমাস্টার। মহেশের বকু। ভাগ্য গণনা, আবুর্বেদ।
- ৮। শক্তরলাল হিন্দু—জন্ম (আন্দাজ) ১৯৩৯। ধীরেনের সম্বন্ধসী। মহেশের সার্বাধ্যান দীনদয়ালীর ছেলে দীনদয়ালের মৃত্যু ১৯৪৩। প্রথ—জন্মে গিয়েছিল কেন? শক্তরক্তে মানুষ করেন ধরেশ। বর্তমানে বইয়ের দেকানের মালিক। মহেশের মৃত্যুতে ভূঘনাম।
- ৯। নূর মহস্যদ—বয়স ৭০-৮০। চার্লিং বছরের উপর মহেশের মেয়ারো। ফেলুদা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। দুপুরে খাওয়ার পর কৈজাসে গিয়ে শুনলাম সকালে অনেকেই এসেছিলেন, কিন্তু একটা নাগাম সবাই চলে গেছেন। বৈষ্টকখানায় মহেশবাবুর দুই ছেলে আর অধিলবাবু ছিলেন, আমরা সেখানেই বসলাম। প্রীতীনবাবুর অস্ত্র ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেছে; একটা আলাদা সেফার এক কোণে বসে থালি ছাঁত কচলাচ্ছেন। অধিলবাবু ধাকে মাঝে দীর্ঘবাস ফেলছেন আর মাথা নাড়ছেন। অরূপবাবু যথারীতি গঁজীর ও শাস্ত। ফেলুদা তৌকেই প্রস্তা করল।

‘আপনারা কি কিছুকিন আছেন?’

‘কেন বলুন তো?’

‘আপনাদের একটু সাহায্যের দরকার। মহেশবাবু একটা কাজের তার দিয়ে গোছেন আমাকে, কী কাজ সেটা অবিশ্বিষ্য স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। আমি প্রথমে জানতে চাই—উনি কী বলতে চেয়েছিলেন সেটা আপনারা কেউ বুঝেছেন কিনা।’

অরূপবাবু একটু হেসে বললেন, ‘বাবাৰ সূত্র অবস্থাতেই তাঁৰ অনেক সংকেত আমাদের বুঝতে বেশ অসুবিধা হত। রাশতারী সোক হলেও খো একটা ছেনেমানুষী দিক ছিল সেটাৰ কিছুটা আভাস হ্যাত আপনিও পেয়েছেন। আমার মনে হয় বাবা শেষ অবস্থায় যে কথাগুলো বললেন সেটাৰ উপর বেশি তরঙ্গ না দেওয়াই ভালো।’

ফেলুদা বলল, ‘আমার কাছে নির্দেশগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অবস্থীন বলে হলে হ্যানি।’

‘তাই বুঝি?’

‘হাঁ। তবে সব সংকেত ক্ষরতে পেরেছি এটা বলতে পারব না। যেমন ধূম্বন্ধ, মুকুন্দনদের ছবি।’ ফেলুনা অখিলবাবুর দিকে ফিরল। ‘আপনি ওটা সহজে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারেন। ছবিটা তো বোধহয় আপনারই দেওয়া।’

অখিলবাবু বিষয়ে হাসি হেসে বললেন, ‘হাঁ, আমারই দেওয়া। মুকুন্দ রাঁচিতে এসেছিলেন একবার। আমার তো এসবের দিকে একটু বেশি আছেই চিরকাল। বেশ জেনুইন লোক বলে খণ্ডে হয়েছিল। আমি মহেশকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম—তুমি তো কোনোদিন সাধু-সম্মানীতে বিশ্বাস-তিখাস করলে না, শেষ বয়সে একটু এলিকে মন সাও না। তোমাকে একটা ছবি এনে দেব। ঘরে রেখে দিও। মুকুন্দনদের প্রভাব খারাপ হবে না। তিনটি মহাদেশে ত্রি প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, না হয় তোমার উপরেও একটু পড়ল।—তা সে ছবি যে সে 'তা'র খাটের পাশে রেখে দিয়েছে সেটা কালই প্রথম দেখলাম। অসুবের আগেতোওর শোনার ঘরে যাইনি কখনো।’

‘আপনি ওটা সহজে কানেন কিছু?’ ফেলুনা অরূপবাবুকে প্রশ্ন করল।

অরূপবাবু মাথা নাড়লেন। ‘ও জিনিসটা যে বাবার কাছে ছিল সেটাই জানতাম না। বাবার শেষবার ঘরে আমিও কামই প্রথম গেলাম।’

‘আমিও জানতাম না।’—প্রতীনিবাবুকে কিছু জিগ্যেস করার আগেই তিনি বলে উঠলেন।

ফেলুনা বলল, ‘মুটো জিনিস পেলে আমার কাজের একটু সুবিধা হতে পারে।’

‘কী জিনিস?’ অরূপবাবু জিগ্যেস করলেন।

‘প্রথমটা হল—মহেশবাবুকে সেখা তাঁর প্রতীয় পুত্রের চিঠি।’

‘বীরেনের চিঠি?’ অরূপবাবু অবাক। ‘বীরেনের চিঠি দিয়ে ‘কী হবে?’

‘আমার বিশ্বাস এই ছবিটা মহেশবাবু বীরেনকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন আমাকে।’

‘স্কাউট ট্রেঞ্জ! এ ধারণা কী করে হল আপনার?’

ফেলুনা বলল, ‘ছবিটা আমাকে দিয়ে মহেশবাবু দুটো আঙুল সেখিয়েছিলেন সেটা আপনারাও দেখেছিলেন; একটা সংজ্ঞাবনা আছে যে দুই আঙুল মানে দুরি। আমার চুল হতে পারে, কিন্তু আপাতত এই বিশ্বাসেই আমাকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।’

‘কিন্তু বীরেনকে আপনি পাছেন কোথায়?’

‘ধূম্বন্ধ মহেশবাবু যদি ঠিকই দেবে খাকেন; যদি সে এখানে এসে থাকে।’

অরূপবাবু তাঁর বাপের মৃত্যুর কথা ক্লে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

‘বাবা গত পাঁচ বছরে কল্পবার বীরেনকে দেখেছেন তা আপনি জানেন? বিশ বছর যে ছেলে বিদেশে, বাবা তাঁর দুর্বল দৃষ্টি দিয়ে তাকে এক ঝলক দেখেই চিনে

ফেলবেন এটা আপনি ভাবছেন কী করে ?

‘আপনি ভুল করছেন অঙ্গবাবু, আমি নিজে একবারও ভাবছি না যে বীরেনবাবু কিনে এসেছেন। কিন্তু তিনি যদি দেশের বাইরেও কোথাও থেকে পাকেন, তাহলেও আমার দায়িত্ব দায়িত্বই থেকে যায়। তিনি কোথায় আছেন জেনে তিনিসটা তাঁর হাতে পৌছানোর বাবস্থা করতে হবে আমাকে।’

অঙ্গবাবু একটু নরম হয়ে বললেন, ‘বেশ। আপনি দেখবেন বীরেনের চিঠি। নাবা সব চিঠি এক জায়গায় সাখতেন। বীরেনের চিঠিগুলো আলাদা করে দেছে রাখব।’

‘ধনাবাবু’, বলল ফেলুদা, ‘আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে—মহেশবাবুর ডায়রি। সন্তুষ্ট হলে সেগুলোও একবার দেখব।’

আমি ভেবেছিলাম অঙ্গবাবু এতে আপত্তি করবেন, কিন্তু করবেন না। বললেন, ‘দেখতে চান দেখতে পাবেন। বাবা তাঁর ডায়রিতে ব্যাপারে কোনো গোপনিতা অবলম্বন করতেন না। তবে আপনি হতাশ হবেন, মিঃ মিস্টার।’

‘কেন ?’

‘বাবার মতো বেকায় নীরস ডায়রি আর কেউ লিখেছে কিনা জানি না। অত্যন্ত মায়ুরি তথা ছাড়া আর কিছু নেই।’

‘হতাশ হবার কুকি নিতে আমার আপত্তি নেই।’

চিঠির বাপারে ঠিক হল অঙ্গবাবু আর প্রীতিনিবাবু ভাইয়ের গুলো বেছে আলাদা করে রাখতেন, সেগুলো কাল সকালে ফেলুদাকে দেওয়া হবে। ডায়রিগুলো আজই নিয়ে যাব আমরা, আর কালই ফেরত দিয়ে দেব। বুঝলাম ফেলুদাকে আজ রাত জাগতে হবে, কারণ ডায়রির সংখ্যা চারিশ।

তিনজনে ভাগাভাগি করে ব্যবরের কাগজে ঘোড়া মহেশ তৌঙুরীর ডায়রির সাতটা পাকেট নিয়ে কৈলাসের কৌকরবিহানো পথ দিয়ে যখন ফটকেন মিকে যাচ্ছি, তখন দেখলাম জোড়া-মৌমাছি তাঁর বিলিতি ভল হাতে নিয়ে বাগানে ঘোরাফেরা করছে। পায়ের শাখে সে হাঁটা পাখিয়ে আমাদের মিকে ঘুরে দেখল। তারপর বলল, ‘দাদু আমাকে বলেনি।’

হঠাতে এমন একটা কথায় আমরা তিনজনেই থেমে গেলাম।

‘কী বলেনি দাদু ?’ ফেলুদা জিগ্যেস করল।

‘কী খুঁজছিস বলেনি।’

‘কবে ?’

‘প্রশঙ্খ তরঙ্খ নরঙ্খ ?’

‘তিনিমি ?’

‘গ্রন্থিমি ।’

‘কী হয়েছিল বল তো ।’

বিবি দুরে পৌড়িয়েই টেচিয়ে কথা বললে, যদিও তার মন পৃতুলের দিকে। সে পৃতুলের মাথায় গৌজুর জন্ম বাগান থেকে ফুল নিতে এসেছে। ফেলুদার প্রজ্ঞের উত্তরে বলল, ‘দাদুর যে দুর আছে দোতলায়, যেকানে টেবিল আছে, বই আছে, আর সব জিনিস-টিনিস আছে, সেইখানে খুজছিল দাদু ।’

‘কী খুজছিলেন ?’

‘আমি তো জিগোস করলাম । দাদু বলল, কী পাস্তি না, কী খুজছি ।’

‘আবোজ তাবোজ বকচু, মশাই,’ চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু ।

‘আর কিছু বলেননি দাদু ?’ ফেলুদা জিগোস করল ।

‘দাদু বলল এটা হৈয়ালি, পারে মানে বলে দেব, এখন খুজতে দাও । তারপর আর বলল না দাদু । দাদু যখনে গেল ।’

ইতিমধ্যে ডলের মাথায় ফুল গৌজা হয়ে গেছে, বিবি বাড়ির দিকে চলে গেল, আর আমরাও হলাম বাড়িযুক্তে ।

॥ ৭ ॥

ফেলুদা এখন মহেশ চৌধুরীর ভাবার নিয়ে বসবে, একে ডিস্টার্ব না করাই ভালো, তাই আমরা দুজনে চারটে নাগাদ চা খেয়ে একটু ঘূরব বলে গাড়িতে কানে বেরিয়ে পড়লাম । লালমোহনবাবুর ধারণা শহরের দিকে গেলে হয়ত সুনতানের লেটেটে খবর পাওয়া যেতে পারে ।—‘মহেশ চৌধুরীর মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার দাদা যতই রহস্যের গত্ত পেয়ে থাকুন না কেন, আমার কাছে বায় পালানোর ঘটনাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর ।’

বায়ের ব্যবর পেতে বেশি দূর যেতে হল না । পেট্রোল নেবার দরকার ছিল, যেন গোড়ে বৃজভূষণ তেওয়ারীর পেট্রোল পাস্পের সামনে ভিড় দেখেই দুর্বলান্বিত আবের আবোচনা হচ্ছে, কারণ একজন ভদ্রলোক থাবা মারান ভঙ্গি করলেন কথা বলতে বলতে ।

পাপমোহনবাবু গাড়ি থেকে নেমে স্টোন এগিয়ে মেলেন জটলা’র দিকে ভদ্রলোক এককালে রাজস্থান সাবেন বলে বই পড়ে কিছুটা হিন্দী শিখেছিলেন, কিন্তু এখন স্টোন ফেলুদার ভাষ্যে আবার শ্রেয়ালের স্টোনার্ডে নেমে গেছে । তার মানে কেয়া হয়া-বেশি এগোনো মুশকিল হয় । তবু ভালো, ভিড়ের মধ্যে একজন বাড়লী বেরিয়ে গেল । তার কাছেই প্রানপ্রাপ্ত যে হাজারিবাগের পুরু বিস্তুগাড়ের

দিকে একটা বনের মধ্যে নাড়ি সুলতানকে পাওয়া গিয়েছিল। ট্রেনের চতুর্দশ সঙ্গে বনবিভাগের শিকারী নাকি বাষ্টার দিকে এগিয়ে যায়। একটা সময় মনে হয়েছিল যে বাষ্টা ধরা দেবে, কিন্তু শেষ যুক্তি সেটা চতুর্দশের একটা ধারা মেরে পালিয়ে যায়। গুলি চলেছিল, কিন্তু বাষ্টা অবস্থা হয়েছে কিনা জানা যায়নি। চতুর্দশ অবিশ্য জব্ব হয়েছে, তবে তেমন গুরুতরভাবে নয়। সে এখন হাসপাতালে।

লালমোহনবাবু বললেন, 'কারাগারিকারের কোনো খবর জানেন ?'

এটা শুধুমাত্রেই হল। বললাম, 'কারাগারিকার নয়, কারাগাতিকার—যিনি বাবের আসন ট্রেনের !'

ভূপ্লোক বললেন তার খবর জানেন না, তবে এটা জানেন যে বাবের অভাবে নাকি সার্কাসের বিক্রি কিছুটা কঠেছে।

বাবের দিকে গুলি চলেছে জেনে কারাগাতিকারের অনোভার কী হল সেটা জানার জন্য ভীষণ কৌতুহল হচ্ছিল আমাদের দুজনেরই, তাই পেট্রোল নিয়ে সোজা চলে গেলাম প্রেট ম্যাজেস্টিকে।

ফেলুন্দা সঙ্গে থাকলে দেখেছি লালমোহনবাবু নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে সাহস পান না ; আজ দেখলাম সোজা গেটে গিয়ে বললেন, 'পুট মি পুট মিস্টার কুটি প্রীজ !' গেটের সোকটা কী বুঝল জানি না। হ্যাত সুদিন আমাদের চিনে বেঁধেছিল, তাই আর কিছু জিগ্যেস না করে আমাদের চুক্তে দিস, আর আমরাও সোজা গিয়ে শাজির হলাম মিঃ কুটির ক্যারাভালে।

কুটির কাছে যে খবরটা পেলাম সেটাকেও একটা হেঁয়ালি বলা চলে।

কারাগাতিকার ন্যাকি কাল রাত থেকে হ্যাওয়া।

'দুদিন থেকেই পাবলিক আবার বাবের খেলা ডিমান্ড করতে শুরু করেছে,' বললেন মিঃ কুটি। 'আমি নিজে কারাগাতিকারের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছি। বলেছি সে ছাড়া আর কেউ বাষ ট্রেন করবে না। কিন্তু তাও সে না বলে চলে গেল। এর মধ্যেও দু-একদিন বেরিষ্যেছে, কিন্তু ঘন্টাবানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু আজ সে এখনও ফিরল না।'

খবরটা শুনে সার্কাসের ধাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'সুলতান-ক্যাপচারের দৃশ্য আবু দেখা হল না, তপেশ। এমন সুযোগ আর আসবে না।'

আমারও মনটা ধর্মাপ লাগছিল, তাই ঠিক করলাম গাড়িতে করে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসব। উন্নরে যাব না দক্ষিণে যাব—অর্থাৎ কানারি হিসের দিকে যাব না রামগড়ের দিকে যাব—সেটা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত টস্ করলাম। দক্ষিণ পড়ল। লালমোহনবাবু বললেন, 'ওদিকটাতেও একটা শাহুড়

আছে, সেদিন হাবাব পথে দেখেছি। খাসা সৃষ্টি।

‘দৃশ্য ভালো কিন্তু, কিন্তু এগাতো কিলোমিটারের পোস্টটা পেরিয়ে কিছু দূর পিয়েই একটা কালভাট্টের খারে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটাকে মোটেই ভালো বলা চলে না।

মাত্র ছ'বিস আগে কেনা লালমোহনবাবুর আমাদারের বার তিনেক হেচকি তুলে মিনিটখানেক গো ঝো করে অবশেষে বেমালুম ধর্মঘটের দিকে চলে গেল। ‘বোধহীন তেল টানতে না, বললেন হরিপদবাবু।

ঘড়িতে পাঁচটা কৃতি। সূর্য আকাশের নিচের দিকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, কারণ পশ্চিমে সূর্যে শালবনের মাঝের উপর মেঘ জমে আছে।

আমরা গাড়ি থেকে সেই কালভাট্টের উপর গিয়ে বসলাম, হরিপদবাবু গাড়ি নিয়ে পড়লেন। লালমোহনবাবুকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি ভাইভাবের উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ উনি গাড়ি সহকে কিছুই জানেন না। উনি বলেন, ‘আমার নিজের পায়ের ভেতর কটা হাড় আছে কটা মাসল আছে না কেনে যখন দিবি চলে ফিরে দেড়াঙ্গি, তখন গাড়ির ভেতর কী কলকতা আছে সেটা জানাব কী মেসেন্টি ভাই?’

যেখের গায়ে নিচের দিকে একটা বড়ঘড়ির মধ্যে দিয়ে একটিমার উকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আকাশের মতো ছুটি নিলেন, হরিপদবাবু সেই সময় জানালেন যে তিনি বেড়ি—‘চলে আসুন, স্যার।’

কালভাট্ট থেকে উঠে আরেকবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি পাঁচটা ত্রিশ। সময়টা অকুণ্ডী, কারণ ঠিক তখনই আমরা দেখলাম সূলতানকে।

স্বরং আরো অনেক নাটকীয়ভাবে সিংহে পারতার, কিন্তু ফেলুন বলে এটাই ঠিক।—‘গাদাগুচ্ছের অর্টে-কো বিশেষ আর উপাকথিত লোম-খাড়া-করা শব্দ ব্যবহার না করে তোকে যা দেখলি সেইটে ঠিক ঠিক সোজাসুজি বলে গেলে কাজ দেবে তোর বেশি।’ আমিও সেটাই করার চেষ্টা করছি।

খীচার বাইরে বাব এর আগেও একবার দেখেছি, যেটার কথা রয়েল বেঙ্গল রহস্যে আছে। কিন্তু সেখানে আমাদের সঙ্গে আরো অনেক লোক ছিল। শিকারী আর বন্দুক ভোছিলই, সবচেয়ে বড় কথা—ফেলুন ছিল। তার উপরে আমি আর লালমোহনবাবু ছিলাম গাছের উপর, যাহের নাগালের বাইরে। এখানে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছি খোলা রাঙ্গায়, যার মুদিকে বন, অন্দরে একটা পাহাড়, যাতে ভদ্রুক আছেই, আর সময়টা সঙ্গে। এই সময় এই অবস্থায় আমাদের পেকে হাত পঞ্চাশেক সূর্যে পশ্চিম দিকের বন থেকে বেরিয়ে বাঘটা রাঙ্গার উপর উঠল। আমরা তিনজনে ঠিক একসঙ্গে একই সময় বাঘটা দেখেছি, কারণ আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুজনও ঠিক সেইভাবেই কাঠ হয়ে গেল। হরিপদবাবুর এই হাতটা

গাড়ির দরজার দিকে দাঢ়িয়েছিলেন, সেই বাড়ানোই রয়ে গেল ; সালমোহনবাবু নাক কাড়বেন বলে ডান হাতের বুজো আঙুল আর তর্জনীটা নাকের দুপাশে ধরে শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুকিয়েছিলেন, তিনি সেই ভাবেই রয়ে গেলেন ; আর ধূলো কাড়বার জন্ম আবার ডান হাতটা আমার জীন্সের পিছন দিকে নিয়েছিলাম, তার ফলে শরীরটা একটু বেকে গিয়েছিল, বাষটা দেখার ফলে শরীরটা সেইরকম বেকেই রইল ।

বাস্তায় উঠে বাষটা ঠিক চার পা গিয়ে ধেমে গেল । তারপর মাথাটা ঘোরালো আমাদের দিকে ।

আমার পা কাপতে কঙ্ক করেছে, শুকের ডিতনে কে যেন হাতুড়ি পিটিছে । অথচ আমার চোখ কিছুতেই বাধের দিক থেকে সরছে না । সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছি যে আমার ডান পাশে আবজা কালো জিনিসটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর মাথা, আর সেটা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে । আবারে বুকচাম তাঁর পা অবশ হয়ে যাবার ফলে শরীরের ভাব আর বইতে পারছে না । এটাও বুঝতে পারছিলাম যে আমার দৃষ্টিতে কী জানি গওগোল হচ্ছে, কারণ বাঘের আউটলাইনটা বাব বাব আপসা হয়ে যাচ্ছে, আর গাবের কালো ডোরাক্তলো স্থির না থেকে ভাইত্রেট করছে ।

সুলতান যে কতক্ষণ দাঢ়িয়ে আমাদের দেখল সেটার আদ্দাজ দেওয়া মুশকিল । মনে হচ্ছিল সময়টা অফুরন্ট । লালমোহনবাবু পরে বললেন কম করে অট-চশ মিনিট ; আমার মতে অট-চশ থেকেভ, কিন্তু সেটাও যথেষ্ট বেশি ।

দেখা শেষ হলে পর মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে আঝো চার পা কেলে বাঘ বাস্তা পেরিয়ে গেল । সাহস একটু বাড়তে ধীরে ধীরে ডান দিকে হাথা ঘুরিয়ে দেখপান শাল সেগুন সরল শিশি শিমুল আর আঝো অনেক সব শুকনো গাছের জঙ্গলে সুলতান অদৃশ্য হয়ে গেল ।

অস্তর্থ এই যে, এর পরেও আমরা অস্তত মিনিটখানেক (লালমোহনবাবুর বর্ণনায় পনেরো মিনিট) প্রায় একই ভাবে দাঢ়িয়ে রইলাম । তারপর তিনজনে কেবল তিনটে কথা বলে গাড়িতে উঠলাম—হরিপদবাবু 'চলুন', আর 'আসুন' আর লালমোহনবাবু 'চল' । শুব বেশি ভয় নিয়ে কথা বলতে গেলে লালমোহনবাবুর একক্ষম হয় এটা আরি আগেই দেখেছি । ডুয়ার্সে ঘষ্টাতোহ সিংহরায়ের বাড়িতে আমরা তিনজন একঘণ্টা শয়েছিলাম । একদিন বাত্রে ঘরের বক্ষ দরজাটা হাওয়াতে খটু খটু করায় উনি 'কে' না বলে 'বে' বলেছিলেন ।

হরিপদবাবুর নার্ভটা দেখলাম মোটাঘুটি ভালো । ফেরার পথে স্টিয়ারিং হইলে হাতটাত কাপেনি । উনি নাকি এর আগেও বাস্তায় বাঘ দেখেছেন, আমসেদপুরে স্কাইভারি করার সময় ।



বাড়ি ফিরে দেখি ফেলুনা তখনো মহেশবাবুর ডায়ারিতে ভুকে আছে। আমার মনে হচ্ছিল সুলতানের খবরটা লালমোহনবাবু দিতে পারলে শুশি হবেন, তাই আমি আর কিছু বলশাম না। ভদ্রলোক সেখনে-টেবেন বলেই বোধহয় সরাসরি খবরটা না দিয়ে একটু পায়তারা কমে নিলেন। বার দু-তিন টাঙ্ক করে কী একটা গানের মূল ভেজে নিয়ে বললেন, 'আজ্ঞা, তপেশ, বায়ের পায়ের তলায় বোধহয় প্যাডিং থাকে, তাই না ?'

আমি মজা দেখছি; বললাম, 'তাই তো গুনেছি।'

'নিশ্চয়ই তাই; নইলে এত কাছ দিয়ে গেল আবকানো শব্দ হল না ?'

লালমোহনবাবুর পায়তারা কিন্তু মাঠে মারা গেল। ফেলুনা আমাদের দিকে চাইলও না, কেবল একটা দুয়ি সরিয়ে রেখে আবেকটা হাতে নিয়ে বলল, 'আপনারা যদি বায়টাকে দেখে থাকেন, তাহলে ক'টাৰ সময় কোনখানে দেখেছেন সেটা বন বিভাগে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া উচিত ইমিডিয়েটলি।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'টাইম পাইট ডেত্রিশ, পোকেশন রামগড়ের রাজ্য এগারো কিলোমিটারের পোষ্টের পরের কালভাটের কাছে।'

'বেশ তো পাশের ঘরে ডিবেকটির রয়েছে, আপিসে এখন কেউ নেই, আপনি একেবারে ডি-এফ-ওব বাড়িতে ফেল করে জানিয়ে দিন। ওদের উপকার হবে।'

'আজ্ঞা, টাঙ্কে... লালমোহনবাবু দেখলাম মাস্লগুলোকে টান করে নিচ্ছেন।—'কীভাবে পুট করা যায় বায়টাকে ? ইঁরিজিতেই বলব তো।'

'হিন্দি ইঁরিজি যেটায় বেশি দখল তাতেই বলাবেন।'

'দি টাইগার ছইচ এসকেপ্ড ফ্রম দি...এসকেপ্ডই বলব তো ?'

'সহজ করে নিয়ে রাজ্য আওয়ে বলতে পারেন।'

'এসকেপ্টা বোধহয় ম্যানেজ করতে পারব।'

'তাহলে তাই বলুন।'

নম্বর বাব করে দিলাম আমি। ফোনটাও বোধহয় আমি করলেই ভালো হত, কারণ লালমোহনবাবু 'দি সার্কাস ছইচ এসকেপ্ড ফ্রম দি প্রেটি মার্জিস্টিক টাইগার—শুভি', বলে ধেয়ে গেলেন। ভাগিস ভদ্রলোক কথাটা শুব চেচিয়ে বলেছিলেন। ফেলুনা পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে সৌভে এসে টেলিফোনটা ওর হাত ধেকে ছিনিয়ে খবরটা নিজেই দিয়ে দিল।

গিয়েছিল। ফেলুদা ধারণা করাতিকার ছাড়া এই বাহ জ্যাত ধরার সাধ্য কানক নেই।

লালমোহনবাবু গরম চায়ে একটা সশস্ত চুমুক দিয়ে বললেন, 'কিছু পেলেন ও ডায়রিতে ? নাকি অঙ্গুশবাবুর কথাই টিক ?'

'আপনিই বলুন না।'

ফেলুদা একটা ডায়ারি খুলে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

লালমোহনবাবু পড়লেন 'Self elected President of club—meeting on 8.4.46'—তারপর আরেকটা পাতা খুলে পড়লেন—Tea Party at Brig. Sudarshan's আর তার পরের পাতায়—'Trial for new suit at Shakur's—4 P.M....' এই মশাই, এসব খুব তৎপর্যপূর্ণ বুঝি ?'

'তোপসে, তোর কী ঘনে হয় ?'

আবি লালমোহনবাবুর পিছন দিয়ে খুকে পড়ে দেখছিলাম, এবার ডায়বিটা হাতে নিয়ে নিলাম। 'আলোর কাছে আন', বলল ফেলুদা।

টেবিল লাম্পের নিচে ডায়বিটা ধরে চোখটা কাছে নিতেই একটা শিহরন খেলে গেল আবার শিরদীড়ায়।

বেশ বড় সাইজের ডায়বি, তার পাতার মাঝখানে ফাউন্টেন পেনে ইংরিজিতে লেখা ছাড়াও অন্য লেখা রয়েছে যেটা আর চাবে দেখা যায় না। পাতার একেবারে উপর দিকে ছাপা তারিখেরও উপরে, খুব সক্র করে কাটা হার্ড পেনসিল দিয়ে বুন্দে বুন্দে অক্ষরে হালকা লেখা।

'কী দেখলি ?'

'বাংলা লেখা।'

'কী লেখা ?'

'এই পাতাটায় লেখা—“পাঁচের বশে বাহন খৎস”।'

'সর্বনাশ', বললেন লালমোহনবাবু, 'এ যে আবার হেয়ালি দেখছি মশাই।'

'তাতো বটেই', বলল ফেলুদা, 'এবার এটা দেখুন। এটা ১৯৩৮ অর্থাৎ প্রথম বছরের ডায়বি, আব এটাই পেনসিলে প্রথম সাংকেতিক লেখা।'

১৯৩৮-এর ডায়বির প্রথম পাতাতেই শিখেছেন ভদ্রলোক "শঙ্খ দুই-পাঁচের বশ।"

'শঙ্খটি কে ?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক নিতের বিষয় বলতে গেলে সব সময়ই শিখের কোনো না কোনো একটা নাম ব্যবহার করেছেন।'

'শিখের নাম তো ইল, কিন্তু দুই-পাঁচের বশ তো নোঝ গেল না।'

‘রিপু বোবেন ?’ জিপোস করল ফেলুদা।
 ‘মানে হৈভা কাপড় সেলাই-সেলাই করা বলছেন ?’
 ‘আপনি ফারসী-সংস্কৃত তিনিয়ে ফেলছেন, লালমোহনবাবু। আপনি যেটা
 বলছেন সেটা হল রিপু। আমি বলছি রিপু।’
 ‘ওথে—ধড়িরিপু ? মানে শত্ৰু ?’
 ‘শত্ৰু। এবাব মানুবের এই ছটি শত্ৰুৰ নাম কৰুন তো ?’
 ‘তেরি ইঞ্জি। কাম ক্ষোধ লোক মদ মোহ মানসৰ্ব।’
 ‘হল না। অর্ডারে ভুল। কাম ক্ষোধ লোক মোহ মদ মানসৰ্ব। অৰ্থাৎ দুই আৱ
 পীচ হল ক্ষোধ আৰ মদ।’
 ‘ওয়াকুৰফুল !’ বললেন লালমোহনবাবু, ‘এ তো মিলে যাচ্ছে মশাই।’
 ‘এবাব তাহালে প্ৰথমটা আৱেকণাৰ সেখুন, এটাও মিলে যাবে।’
 এবাবে আমাৰ কাছেও বাপাৰটা সহজ হয়ে গেছে। বললাগ, ‘বুকোছি, দুইয়েৰ
 বাশে বাহন ধৰস হচ্ছে, বাগেৰ মাথায় গাড়ি ভাঙা।’
 ‘তেরি গুড়, বলল ফেলুদা, ‘তবে দুই-পাঁচ নিয়ে একটা সংকেতেৰ এখনো
 সমাধান হয়নি।’
 যে ডায়বিগুলো দেখা হয়ে গেছে, সেগুলোৰ বিশেষ বিশেষ জায়গায় কাগজ
 গুঁজে রেখেছে ফেলুদা। তাৰই একটা জায়গা শুলে আমাদেৱ দেখালো। লেখাটা
 হচ্ছে—**২০৫-X**।
 লালমোহনবাবু বললেন, ‘এক্ক তো মশাই আমনোৰ কোয়ান্টিটি। ওটা বাদ
 দিন। আৱ, সব সংকেতেই যে একটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ধৰকৰে সেটাই বা ভাৰছেন
 কেন ?’
 ফেলুদা বলল, ‘যেখানে একটা লোক বছৱে ভিন্ন পৰিষ্কৃতি দিনে ভাৰ
 পনেৱো-বিল দিন সংকেতেৰ আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে কাৰণটা যে জৰুৰী ভাতো
 ৰোখাই যাচ্ছে। কাজেই **X**-এৰ গৎসা আমাকে উদ্ঘাটন কৰতেই হবে।’
 ‘ওই ভাৱিকেৰ কাছাকাছি কোনো লেখা থেকে কোনো হেল্প পাচ্ছেন না ?’
 ‘ওৱ দশ দিন পৰে আৱেকটা সংকেত আছে। সেখুন—’
 এটাও আমাৰ কাছে অসম্ভব কঠিন বলে মনে হল। লেখাটা
 হচ্ছে—‘অনগল— ঘৃতকুমারী’।
 ফেলুদা বলল, ‘লোকটা যে কথা নিয়ে কী না কৱেছে তাই ভাৰছি।’
 ‘আপনি ধৰে ফেলেছেন ?’
 ‘আপনিও পাৰবেন—একটু হেল্প কৰলে।’
 ‘ঘৃতকুমারীতো কবৰেজীৰ বাপাৰ মশাই।’ বললেন লালমোহনবাবু।
 ‘হ্যাঁ,’ বলল ফেলুদা, ‘ঘৃতকুমারীৰ তেল মাথায় মাথালৈ মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

জৰ্বি রাগ কহায় ।'

'কিন্তু তেল অনগলি মাথতে হয় এতো জানতুম না মশাই ।'
ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনি জ্যাশটা অগ্রহ করছেন কেন ? ওটারও একটা মানে আছে । আর অগলি মানে আনেন তো ?'

'কপাট । বিল ।'

'এবার ওই হিসীয় মানেটাৰ সঙ্গে একটা নেগেটিভ জুড়ে দিন ।'

'অধিল ।' আমি টেচিয়ে উঠলাম। 'তাৰ মানে অধিলবাবু ওকে ঘৃতকুমারী ব্যবহাৰ কৰতে বলেছিলেন ।'

'শাবাশ । এবার পৱেৱটা দ্যাখ ।'

তিনি পাতা পৱে পড়ে দেখলাম—'আজ থেকে পীচ বাস ।' তাৰ মানে মহেশবাবু যদি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাৰ এক মাস বাদেই মহেশবাবু লিখছেন—'জোলানাথ ভোসে না । আবার পীচ । পাচেই বিশ্বতি ।'

ফেলুদা বলল, 'কিছু একটা ভুলে থাকাৰ জন্য মহেশবাবু আবার মদেৰ আশ্রয় নিয়েছেন । প্ৰথম হচ্ছে—কী ভুলতে চাইছেন ?'

লালমোহনবাবু আৰ আমি মাথা চুলকোলাম। মহেশবাবু বলেছিলেন তাৰ জীবনে আনক বহস্য । এখন মনে হচ্ছে কথাটা টাপ্পি কৰে বলেননি ।

ফেলুদা আৱেকটা জায়গায় ডায়ারিটা খুলে বলল, 'এটা যুব মন দিয়ে পড়ে দেখুন । কঢ়া নিয়ে বেলার একটা আশ্চৰ্য উদাহৰণ । অনেক দুঃখ, অনেক জটিল মনেৰ ভাৰ এই কয়েকটি কথাৰ মধ্যে পুৰো দেওয়া হয়েছে ।'

আমৰা পড়লাম—'আমি আজ থেকে পালক । পালক - feather - হ্যালকা । পালক - পালনকৰ্তা । আজ থেকে শমিৰ ভাৱ আমাৰ । শমি আমাৰ মুক্তি ।'

শুনি যে শক্তুলাস মিশ্র সেটা আমি বুৰতে পাৱলাম। ফেলুদা বলল, 'শক্তুলাসকে মানুব কৰাৰ ভাৱ বহন কৰতে প্ৰেৰ মহেশবাবুৰ মন থেকে একটা ভাৱ নেমে গৈছে । এই ভাৱটা কিসেৰ ভাৱ সেইটো জানা দুৰকাৰ ।'

ফেলুদা বাটি থেকে উঠে কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাৱে পারচাৰি কৰল : অমি ডায়ারিতেলোৱ দিকে দেখছিলাম। কী অস্তুত সোক ছিলেন এই মহেশ চৌধুৱা । বৈঞ্চ থাকলে ফেলুদাৰ সঙ্গে নিষ্পত্যাই ভাৱ জন্মে যেত, কাৰণ ফেলুদাৰও হৈযাসিৰ দিকে ঝৌক আৰ হৈয়ালিৰ সমাধানও কৰতে পাৱে আশ্চৰ্য চটপট ।

লালমোহনবাবু খাটেৰ এক কোনায় ভুক কুঁচকে বসেছিলেন। বললেন, 'অধিলবাবু ভদ্রলোকেৰ এত বস্তু ছিলেন, ওকে কৰৰেঞ্জী পুষুধ দিয়েছেন, ওৱ কুষ্টী ধৈতেছেন, তাৰতো মহেশবাবুৰ নাড়ীনক্ষত্ৰ জানা উচিত । আপনি ডায়াৰি না ধৈতে তীকেই জেৱা কৰল না ।'

ফেলুদা পায়চারি ধারিয়ে একটা চারমিনার ধূরিয়ে বলল, 'এই ডায়রিশলোর মধ্যে দিয়ে আমি আসল মানুষটার সঙ্গে যোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। ওই পেনসিলের লেখাশলোতে আমার কাছে মহেশ টোকুরী এখনো বৈচে আছেন।'

'ওর ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু পেসেন না ডায়রিত্বে !'

'প্রথম পনেরো বছরে বিশেষ কিছু নেই, তবে পরে—'

একটা গাড়ি থামল আমাদের গেটের বাইরে। ফিল্যাটের হ্রন্ব। চেনা শব্দ।

আমরা তিনজনে বারান্দায় এসে দেখলাম অরুণবাবু হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন।

'মিঃ সিং-এর ওখানে যাচ্ছিলাম—এখানকার ফরেস্ট অফিসার,' বললেন অরুণবাবু, 'তাই ভাবলাম বীরেন্দ্র চিঠিশলো দিয়ে যাই। চিঠি অবিশ্বিত নামেই। তাও আপনি যখন চেয়েছেন…'

'আপনাকে এই অবস্থায় এভ বাসেলার মধ্যে ফেললাম বলে আমি অভ্যন্ত মজ্জিত !'

'দ্যাটেস্ অল রাইট,' বললেন অরুণবাবু 'বাবা যে কী বলতে চাইছিলেন সেটা আমার কাছে রহস্য। দেখুন যদি আপনি বুঝি খাটিয়ে কিছু বাব করতে পারেন। সত্যি বলতে কী, আমি বাবার সঙ্গ খুব বেশি পাইনি। হাজারিবাণে আসি মাঝে মাঝে আমার কাজের ব্যাপারে। এককালে প্রায়ই আসতাম শিকারের জন্য। তা, বড় শিকার তো এবা বজাই করে দিয়েছে। কাল একটা সুযোগ পাওয়া গেছে—দেখি !....'

'কী সুযোগ ?'

'যে কারণে সিং-এর কাছে যাচ্ছি। ক্ষবর এসেছে রামগড়ের বাস্তায় আজ বিকেলেই নাকি বাঘটা দেখা গেছে। এবিকে একটি ট্রেনের তো হ্যাসপাতালে, অন্যটি ভালিকের সঙ্গে ঝগড়টিগড়া করে নিখোঁজ। আমি সিংকে বলেছি যে বাঘটাকে যদি মারতেই হয়, তো আমাকে মারতে দাও। অলরেডিতো তার দিকে গুলি চলেছে; যদি জখ্ম হয়ে থাকে তাহলে তো হি ইঞ্জ এ ডেক্সারাস হীস্ট !'

আমার বলার ইচ্ছে ছিল বাঘটাকে দেখেতো জখ্ম বলে ঘনে হয়নি, কিন্তু ফেলুদার ইশারাতে সেটা আর বললাম না।

'আমি তো সঙ্গে খি ওয়ান ফাইভটা নিচ্ছি,' বললেন অরুণবাবু, 'কারণ এমনিক্তেই চারিদিকে প্যানিক। গুরু হাগলও গোছে এক-আধটা। সার্কাসের খীচাম বন্দী অবস্থায় বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে জঙ্গলে গুলি খেয়ে মরাটা খারাপ কিসে ?... যাই হোক, আপনার ইস্টারেস্ট থাকলে আপনিও আসতে পারেন। কাল সকালে বেরোব আমরা।'

'দেখি....' বললো ফেলুদা। 'আমর এই কাজটা কতদূর এগোয় তাৰ উপর

নির্ভর করছে। ভালো কথা—'

অক্ষণবাবু ঘাবার জন্ম পা বাড়িয়েছিলেন, ফেলুদাৰ কথায় থামলেন। ফেলুদা বলল, 'সেদিন পিকনিকে আপনিই তো বন্দুক ছুড়েছিলেন, তাই না ?'

ডন্ডলোক হেসে উঠলেন। 'আপনি বোধহয় ভাৰতীয়েন—বন্দুক চলল, অথচ শিকার নেই কেন ? গোয়েন্দাৰ মন তো ওয়েল, আই মিসড ইট। একটা বটেৰ। সেৱা শিকারীৰ মক্ষ কি সব সময় অৰ্থৰ্থ হয়, মিঃ মিত্রে ?'

॥ ৯ ॥

বিলেত থেকে লেখা অক্ষণবাবুৰ দ্বিতীয় ছেলেৰ চিঠিখলো থেকে সঁওয়েই বিশেষ কিছু জানা গেল না। চিঠি বলতে সবই পোষ্টকার্ড, তাৰ একদিকে ছবি, অন্যদিকে ঠিকানা। যেখানে ঠিকানা ছাড়াও কিছু লেখা আছে, সেখানে বীণেন তাৰ বাবাৰ দেওয়া নাম বাবহাব কৰোছে—সুনি !

ন'টায় বুলাকি প্রমান ভিনাৰ রেডি কৰে আমাদেৱ ডাক দিল। ফেলুদা ডায়াৰি আৱ খাতা নিয়ে থেকে বসল। যে-সকেতগুলো তৎক্ষণাৎ সমাধান হচ্ছে না, সেগুলো সে বিজেৰ খাতায় লিখে রাখছে। বী শুভে লিখছে, এবং দিবি লিখছে। লালমোহনবাবু একবাৰ বললেন, 'লেখা বক্ষ না কৰলে আজকেৰ ঘাসেৰ কাপিটাই ঠিক জাসচিস কৰতে পাৱকেন না। দুৰ্ধৰ্ষ হয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'বাদৰ সমস্যা নিয়ে পড়েছি, এখন মাস্স-টাইস বলে ভিসটাৰ কৰবেন না !'

আমি লক্ষ কৰছিলাম ফেলুদাৰ ডুকটা সাংঘাতিক কুচকে রয়েছে, যদি ও ঠোটেৰ কোণে একটা হাসিৰ আভাসও রয়েছে। ভিগোস কৰতেই ইল খাপাৰটা কী। ফেলুদা ডায়াৰি থেকে পড়ে শোনাল—'আগিৰ উপাসকেৰ অসীম বদানাতা। নবৰত্ন বীদৱেৰ হিসাবে দু হাজাৰ পা।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'ৰাচিতে পাগলাগারদ আছে বল এখনকাৰ বাসিন্দাবাবু নাকি একটু ইয়ে হয় বলে শুনিচি। সেটাও একটু মনে রাখবেন।'

ফেলুদা এ কথায় কোনো অন্তৰ্বা না কৰে বলল, 'আগিৰ উপাসক পাসীদেৱ বলে জানি, কিম্বা বাকিটা সম্পূৰ্ণ থোয়া।'

তাতে লালমোহনবাবু বললেন যে, প্রথমত নবৰত্ন বীদৱ বলে কোৰোৱক্ষ বীদৱ হয় কিনা সে বিধয়ে তাৰ সন্দেহ আছে; আৱ দ্বিতীয়ত, নটা বঞ্চেৰ কী কৰে দু হাজাৰ পা হয়, আৱ বীদৱ কী কৰে সে হিসেবটা কৰে সেটা কোনোমতেই বোধগম্য হচ্ছে না—'এইবাৰ আপনি খাতা বক্ষ কৰে একটু বিশ্রাম কৰুন।'

লালমোহনবাবু বলাৰ জন্ম নিশ্চয়ই নয়, হয়ত চোখ আৱ মাথাটাকে একটু

কেস্ট দেবার জন্য ফেলুন। আবার পরে হাততে বেরোল। অবিশ্বি একা নয়, আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে।

পূর্ণিমার ঢাঁধ এই কিন্তু ক্ষণ হল উঠেছে, তার গায়ের বৎ থেকে এখনো হজুদের ছোপটা যায়নি। আকাশে মেঘ ভরেছে, তাই দেখে জটায়ু বললেন, 'চন্দ্রালোক ক্ষণগ্রহণ বলে মনে হচ্ছে।' পঞ্চম দিক থেকে মাঝে আবে একটা দমকা বাতাস দিচ্ছে, আব তার সঙ্গে একটা শব্দ জেসে আসছে যেটা ভালো করে বললে বোকা যায় সার্কাসের ব্যাস্ত।

ডাইনে মোড় নিয়ে দুটো বাড়ি পরেই কৈলাস। এক সারি ইউক্যালিপটাসের ফৌক দিয়ে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। দোতলায় একটা ঘরের জানলা খোলা, ঘরে আলো ঝলচ্ছে। সেই আলোর সামনে দিয়ে কে যেন দৃত পাহচারি করছে। ফেলুন্দারও চোখ সেইদিকে। আবরা হাতা থামিয়েছিল। ওটা কার দ্বা? প্রীতীমন্দানুর! পায়চারি করছেন নীলিমা দেবী। একবার জানালায় এসে থামছেন, আবার সারে গিয়ে পায়চারি। অস্থির ভাব।

আবরা আবার চপ্পা শুক করলাম। জানালাটা কখনে পৃষ্ঠির আড়াস হয়ে গেল।

পরপর আরো বাড়ি। প্রতোক্তাতেই বেশ বড় কম্পাউন্ড। বেডিওলে দ্বর বলচ্ছে; কোন বাড়িতে চলাচ্ছ বেডিও জানি না। জালমোহনবাবু আরেকটা বেগানান বনীভূসন্নীত ধরতে যাচ্ছিসেন—গুনগুমানি শব্দে হল ধানের ক্ষেতে বৌদ্ধিচায়ায়—এমন সময় দেখলাম দূরে একজন সোক বাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদেরই দিকে। গায়ে নীল রঞ্জের পুনোভার।

আরেকটু কাছে এলেই চিনতে পারলাম।

'আপনাদের পথানেই যাচ্ছিলাম,' নমস্কার করে বললেন শক্রলাল মিশ। চেহারা দেখে মনে হল অনেকটা সামলে নিয়েছেন, যদিও সেই হাসিশূলি হেলেবানুষী ভাবটা এখনো ফিরে আসেনি।

'কী ব্যাপার?' বলল ফেলুন।

'আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ?'

'আপনি তদন্ত হেড়ে দিন।'

ইঠাঁৎ এমন একটা অনুরোধে নীতিমত হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফেলুন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, 'কেন বলুন তো?'

'এতে কারুর উপকার হবে না, মিঃ মিস্টির।'

ফেলুন একটুক্ষণ চুপ থেকে একটা হালকা হেসে বলল, 'যদি বলি আমার নিজের উপকার হবে? মনে খটকা থাকলে আমি বড় উৎসে বোঁধ করি মিঃ মিশ; সেটাকে দূর না করা অবধি শান্তি পাই না। তা হাড়া মৃত্যুশয়্যায় একজন

একটা কাজের ভার আধাদের দিয়ে গেছেন, পেটা না করেও আশণ শাখি নেই। এইসব কারণে আমাকে শুধু চালাতেই হবে। উপকার-অপকারের প্রয়োগ এখনে শুধু বড় নয়। তেবি সরি, আপনার অনুরোধ আমি বাধ্যতে প্রবর্লাম না। শুধু তাই সুব বড় নয়। তেবি সরি, আপনার অনুরোধ করব যে অমাকে একটু নর—এই শুধুতের ব্যাপারে আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে অমাকে একটু সাহায্য করব। ঘৃহেশবাবু সমস্কে আর কেউ কাই ভাবুন না কেন, আপনি ত'কে শুন্দা করতেন এটা তো ঠিক ?

‘নিশ্চয়ই ঠিক।’ ফেলুদার কথাটা মনে ধরতে কিছুটা সময় নিল বালেই বোধহীন
ক্ষয়বাতী এল একটু পরে। কিন্তু যখন এজ উন্ন বেশ জ্বালেন সঙ্গেই এল।
‘নিশ্চয়ই ঠিক’, আবার বলাস্বল শক্তরূপ। তারপর তার গলার সুরটা কেবল যেন
বললেন গেল। বললেন, ‘যে অস্তাটি বহুদিন ধূর ক্রমে ক্রমে পড়ে ৩৫, সেটাকে
কি এক ধাক্কায় ভাঙতে দেওয়া উচিত?’

‘आपनि कि लेटिए करहिलेन ?’

‘হাঁ, সেটাই করছিমাম। কিন্তু সেটা ভুল। এখন বুঁকেছি সেটা মন্ত ভুল, আমা
বুঁকতে পেরে ঘনে শান্তি পাইছি।’

‘তাহলু আপনার কাছে সাহায্য আশা করতে পারি?’

‘কী সাহায্য চাইছেন বলুন?’ ফেনুদার দিকে সোজাসুজি চেয়ে দেশ সহ উভার
কথাটি বললেন শফুরগান

‘তাঁর দুই ছেলের প্রতি অচেশবাদুর মনোভাব কেবল ছিল পেটা কোনও চাহি ! কৌশলী পরিবার সম্বন্ধে আপনি যতটা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারবেন, তেখন আনন্দের পার্যবেশন দা ।’

শতরূপ বললেন, 'আমি যেটুকু বুঝেছি তা বলছি। আমার বিশ্বাস ক'য় বয়সে বীরেন ছাড়া আর কারুর উপর টান ছিল না যদেশ্বাবুর। অকণা আর প্রিণীন দুজনেই তাকে হতাশ করেছিল।'

‘সেটাৰ কানুপ বলতে পাৰুন ?’

‘সেটা পারব না, আমেন, কারণ, ওই দু ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিশ্বাস যোগাযোগ ছিল না অনেকবিন থেকেই। তবে অরুণদাকে যে ভূম্যাদ নেশায় পেয়েছে সে কথা আমাকে একদিন মহেশ্বারু বলেছিলেন। সোজা করে বলেননি, ওর নিজস্ব ভাষার বলেছিলেন। আমি বুঝতে পারিনি; শেষে ওকেই মুক্তি দিতে হল। বললে, “অরুণ গুড হলে আমি শুশি হত্ত্ব, বেটার হয়েই আধাম চিন্তায ঘেসেছে। শুনছি নাকি আজকাল মহাজাতি যবদানে যাতায়াত করছে নিয়মিত।”—বেটার তো বুঝতেই পারছেন, আর জাতি হল রেস; মহাজাতি যবদান হল মহেশ্বারুর ভাষায ঘেসের মাট।’

ଫେଲ୍ଦୁଦା ବଲଲ, 'କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜୀନବାସୁ ତୀକେ ହତାଶ କରିବେଳ କେବେ ? ଉନି ତୁ

ইলেক্ট্রনিক্স মেশ—'

'ইলেক্ট্রনিক্স'—শক্তরূপ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'ও কি আপনাকে শাই দলেছে নাকি ?'

'ইলেক্ট্রনিক্স' মনে সংজ্ঞ ওরকোনো সম্পর্ক নেই ।

শক্তরূপ সশাস্ত্র হেসে উঠলেন। 'হাঁ, হাঁর : ইভেন্টিলান ; প্রাণীন একটা সদৃশনি ; আপিস সাধারণ চাকুবি ঠৰে । সেটা ও ওর স্বতন্ত্রের সুপারিশে প্রাণ্যা । প্রাণীন ছিলে অশোক নয়, কিন্তু অতীত ইম্প্রাকটিকাল আৰ আবৰ্যোগী । এককালে সাধিত্তা-তাহিত কৰতে চেষ্টা কৰেছ, কিন্তু সেও খুব মানুলি । ওৱে শ্রী দণ্ডলোক বাপোৰ একমাত্ৰ বেঁয়ো । ও যে গার্ডটা কৰে এসেছে সেটা ও ওৱে স্বতন্ত্রে । আপিস থেকে দুটি পাঞ্জিল না, এই অসংকে দেৰী হয়েছে ।'

এবাব আমাদেৱ অকাশ থেকে শুড়াৰ পালা ।

'তবে ওৱে পার্বিব লেশাটা বৈটি' বললেন শক্তরূপ, 'ওতে কোনো ফাঁকি নেই ।'

'ফেণ্টু' বলন, 'আৱেকটি প্ৰৱ আছে ।'

'বলুন ।'

'মেলিন বাঁড়িগাঁথায় যে শেখযাখাখীটিৰ সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন, তিনিই কি পৈতৃকু ?'

হঠাৎ এ রকম একটা প্ৰৱ তনে শক্তরূপ পতনত বেলেও, মনে হল চট্ট কৰে শৰলৈ নিলেন । কিন্তু উওৱ দেটা দিলেন সেটা সোজা নয় ।

'আপনাৰ যা বৃক্ষ, আমাৰ মনে হয় ত্বকে আপনি সব কিছুই জানতে পাৰলৈন ।'

'এটা জিগোস কৰাৰ একটা কাৰণ আছে,' বলল ফেলুদা । 'যাবি তিনি বীৱেন হন, তাহলৈ মহেশবৰুৱ শেখ ইচ্ছা অনুমত্যী তোকে আমাৰ একটা জিনিস লিত্তে হৈবে । আপনি প্ৰয়োজন বীৱেনৰ সঙ্গে যোগাযোগ কৰিয়ে দিতে পাৰবেন কি ?'

শক্তরূপ বললেন, 'মহেশবুৰ শেখ ইচ্ছা ধাতে পূৰণ হয়, তাৰ চেষ্টা অমি কৰো । এটা অৰ্থি কথা দিচ্ছি । এও বেশি আৰ কিছু বলতে পাৰব না । আমায় মাপ কৰবেন ।'

কথাটা বলে শক্তরূপ যে পথে এসেছিলেন, আবাৰ সেই পথেই ফিরে গৈলেন ।

আমৰা যে ইটিতে ইটিতে বেশ অনেক খালি পথ চলে এসেছিলাম সেটা বুৰুজেই পাৰিনি । ফেলুদা টৈচেৱ আলোৱ ঘড়ি দেৱে বলল সাবে দশটা । আমৰা ফিরতি পথ ধৰলাম । কৈলাসে সব বাতি নিতে গেছে, চাঁদ দেকে গেছে বেঁধে, সাকাসেৱ বাজনাও আৱ শোনা যাচ্ছে না । এই থমথমে পৰিবেশে ফেলুদাৰ

‘বীদু’ বলে টেচিয়ে ওঠাটা এত অপ্রত্যাশিত যে লালমোহনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ‘কোথায়’ বলাতে কিছুই আশ্রয় হলাম না। আমি অবিশ্বাস কুকুচিলাম যে ফেলুন অহেশবাবুর ডায়রির বীদুরের কথা বলছে। ‘কী অস্তু মাঝ ভদ্রলোকের !’ বলল ফেলুন। ‘বীদুরেও যে বই লিখেছে সেটা তো যেয়ালই ছিল না।’

‘আপনি সিমপন ফ্র্যাকচারটাকে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচারে পরিণত করছেন কেন বলুনতো মশাই ? শুধু বীদুরে শানাতেই না, তার উপর আবায় বই-লিখিত্য বীদুর ?’

‘গিবন ! গিবন ! গিবন !’ বলে উঠল ফেলুন।

আরেববাস ! সত্যাইতো ! গিবন তো একবক্তুর বীদুর বটেই !

কিন্তু ফেলুন ইঠাই কেন জানি মুড়ে পড়ল, বাড়ির ফটকের কাচাকাচি এখন পৌছেছি তখন চাপা গলায় বলতে শুনলাম, ‘সাংঘাতিক নীও মেরেছে সোকটা, সাংঘাতিক !’

‘কে মশাই ?’ জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

‘স্ট্যাম্প-অ্যালবাম তোর বলল ফেলুন।

বাত বাবোটা পর্যন্ত আবাদের ঘরে পেকে লালমোহনবাবু ফেলুনার হেয়ালি সমাধান দেবলেন। একটা হেয়ালির উত্তরের জন্ম এগারেটার সময় কৈলালে ফোন করতে হল। ১৯৫১-র ১৮ই অক্টোবর অহেশবাবু লিখেছেন He passes away। কার মৃত্যু সংবাদ ডায়রিতে শেখা রয়েছে জনবার ডল অক্ষশবাবুকে জিগ্যেস করে জানা গেল ওই সিনে অক্ষশবাবুর মা মারা গিয়েছিলেন। মা-র নাম জিগ্যেস করাতে বললেন হিতগতী। তার মধ্যে বেরিয়ে গেল He হল ‘হি’।

১৯৫৮-তে কিছু সেখা পাওয়া গেল যেগুলো পড়লে মনে হয় ইংরিজি ‘হটো’। যেমন ‘Be foolish’, ‘Be stubborn’, ‘Be determined’। তারপর যখন এল ‘Be leaves for England’ তখন বোকা গেল Be হচ্ছে বী অর্থাৎ বীরেন।

১৯৬৫-এর পাতায় পাওয়া গেল ‘এ তিনের কথ’। কাম ক্রোধ সোভ মোহ মদ মাসর্য। তিন হল লোভ। ‘এ’ হচ্ছে A—অক্ষশবাবু।

শেব সেখা অহেশবাবুর জন্মদিনের আগের দিন। —‘ফিরে আসা। ফিরে আশা’—ব্যস—তারপর আব কিছু নেই।

ডায়রি দেখা যখন শেব হল তখন বাত একটা। ফেলুনার তখনও দুব আসেনি, কারণ আমি যখন সেপটা গায়ের উপর টানছি, তখন দেখলাম ও লালমোহনবাবুর দেওয়া সর্কাসের ধইটা খুলল। উনি কথাই সিয়েছিলেন ফৈর পড়া হলে ফেলুনাকে পড়তে দেবেন, আব ফেলুনার পড়া হলে আমি পড়ব।

থখন তার ভাব আসছে, তখন শুনলায় ফেলুন কথা বলছে, আর সেটা আমাকেই বলছে ।—

‘কোথাও খুন হলে পুলিসে গিয়ে খুনের আয়গার একটা নকশা করে লাপ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে একটা চিহ্ন দেয় । সে চিহ্নটা কী জিনিস ?’

‘এক্স মার্কস দ্য স্পট ?’ আমি জিগ্যেস করলাম ।

‘চিক বলেছিস । এক্স মার্কস দ্য স্পট ।’

এই এক্সটাই স্বপ্নে হয়ে গেল মু হাত তোলা পা যাক করা কালী মৃতি, যেটা অরূপবাদুর নিকে চোখ রাখিয়ে বলছে ‘তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ, তুই দুইয়ের বশ,’ আর অরূপবাদু চিন্কার করে বলছেন ‘আমি দেখছিলাম ! আমি দেখছিলাম !’ তারপরই কালীর মৃত্যু হয়ে গেল লালমোহনবাদুর মুখ, আর মেই সেই মৃত্যু বলেছে ‘এক মাসে তিন হাজার বিক্রি—৫, ৫—কালমোহন বেঙ্গলী !’—অমনি স্থপ্তি ভেঙে গেল একটা শব্দে ।

দ্বৰজ্জায় ধাক্কা লাগার শব্দ । আর তার সঙ্গে একটা শব্দাধিক্ষিণ শব্দ । বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এটাও বুঝতে পারলাম ।

আমরে হাতটা আপনা ধেনেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচটার দিকে চলে গেল । আলো ঝলল না । বিহারেও যে শোভশেডিং হয় এটা বেয়াল ছিল না ।

মেঝেতে ধৃপ্ত করে কী একটা পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ফেলুন্মার গলা—

‘টু বাল, তোপসে—আমারটা পড়ে গেছে !’

টেবিলের উপর হাতড়ে জলের গেলাসটাকে মাটিতে ফেলে ভেঙে তবে টিটা পেলাম । ফেলুন ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে । টর্চের আলোতে তার নিষ্পল ক্রোধটা চোখে মুখে ফুটে বেরোছে ।

‘কে ছিল ফেলুন ?’

‘দোর্ধনি, তবে অনুমান করতে পারি । সোকটা যাতা ।’

‘কী মতলবে এসেছিল, বলতো ?’

‘চূরি ।’

‘কিছু নেয়নি তো ?’

‘নেয়নি, তবে নির্ধারিত নির্ত—যদি আমার মৃত্যু এত পাতলা না হত ।’

‘কী নির্ত ?’

ফেলুন এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল বিজ্ঞিপ্তি করে বলল, ‘এখন দেখছি ফেলু মিস্তিরই একমাত্র সোক নয় যে মহেশ তৌরুরীর সংকেতের মানে বুঝতে পারে । যদিও এটা একটু লেটে বুঝেছে ।’—

প্রদিন সকালে লালমোহনবাবু সব উন্নে-টুনে বললেন, ‘আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম দুরজা বন্ধ করে থাকেন। এ সব জায়গায় চোর ভাকাতের উপভোক্তা হবেই।’

‘আপনি তো বাবের কথে দুরজা বন্ধ করেছিলেন।’

‘আব আপনি চোরের জন্য খোলা রেখেছিলেন! বন্ধ রাখলে দুটোর হাত খেকেই সেক। ওহে কুলাক্ষিপ্রসাদ, চটপটি ব্রেকফাস্টটা দাও ভাই।’

‘গুরু ভাজা কিসের,’ বলল ফেলুন।

‘বাব কোর দেখতে যাবেন না।’

‘কুরবে কে? কারাত্তিকার তো নিশ্চীৰ।’

‘নিশ্চীৰ হলৈ কী হবে? বাব মারার তাল হচ্ছে সে কথৰ কি আব কাছে পৌছয়নি?—ওঁ...কী প্রিলিং ব্যাপার হচ্ছাই। এ চাপ ছাড়া যায় না। আপনি ব্যাপারটা কী করে এত কামলি নিজেৰে জানি না।’

আটজি নাগাম ব্রেকফাস্ট সেতে ভায়ারি আব চিঠিৰ প্যাকেট নিয়ে কৈলাস ফাবার জন্য তৈরি হয়েছি, এমন সময় অবিলবাবু এলেন। বললেন তাৰ এক হোমিওপ্যাথ বন্ধ কাছেই থাকেন, তাৰ কাছেই যাচ্ছিলেন, আমাদেৱ বাড়ি পথে পড়ে বলে টু মেঝে যাচ্ছেন।

‘গুতকুমারীতে মহেশবাবুৰ ঘাঁথা ঠাণ্ডা হয়েছিল? ফেলুন প্রথ কৰল হ্যালকাভাবে।

‘ও বাবা! এত কথাও লিখেছে নাকি মহেশ ভায়ারিতে?’

‘আবও অনেক কথাই লিখেছেন।’

অবিলবাবু বললেন, ‘আমাৰ ওয়ুদেৱ চেয়েও অনেক বেশি কাছ লিয়েছিল ওৱা মনেৰ জোৱা। যাকে বলে উইল পাওয়াৰ। সে যে কীভাবে যদ ছাড়ল সেতো আমি নিজেৰ চোখে দেখেছি। সেতো আব গুতকুমারীতে হয়নি।’

‘উইলৰ কথাই যখন তুললোন,’ বলল ফেলুন, ‘তবম বলুন তো মহেশবাবুৰ উইল সহজে কিছু জানেন কিনা। আমি অবিল্পি পলিলেৰ কথা বলছি, মনেৰ জোয়েৰ কথা বলছি না।’

‘ডিট্রেল জানি না, তবে এটুকু জানি বে মহেশ একবাৰ উইল করে পৱে সেটা বাতিল করে আৱেকটা উইল করে।’

‘আমাৰ ধাৰণা এই বিজীয় উইল বীভোৱেৰ কোনো অংশ ছিল না।’

অবিলবাবু অবাক হয়ে বললেন, ‘এটা কি ভায়ারিতে পেলেন নাকি?’

না । এটা উনি মৃত্যুশ্বায় বলে গেছেন । সংকেতটা আপনার মনে আছে কিনা জানি না । অথবে দুটো আঙুল দেখালেন, তারপর উই উই বললেন, আর তারপর বুঝো আঙুলটা নাড়ালেন । দুই আঙুল যদি দূরি হয়, তাহলে ও ছাড়া আর কোনো মানে হয় না ।

‘আশ্চর্য সমাধান করেছেন আপনি,’ বললেন অবিলবাবু । ‘প্রথম উইলে বীরেনের অংশ ছিল । তার কাছ থেকে চিঠি আসা বজ্র হ্বার পর পাঁচ বছর অপেক্ষা করে হেলে আর আসবে না থেরে নিয়ে গভীর অভিমানে বীরেনকে বাস দিয়ে মহেশ নতুন উইল করে ।’

‘বীরেন ফিরে এসেছে জামলে কি আবার নতুন উইল করতেন ?’

‘আমার তো তাই বিশ্বাস ।’

এবার ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল—

‘বীরেন সম্মাপ্তি হয়ে যেতে পারে এমন কোনো সম্ভাবনা তার মধ্যে কখনো লক্ষ করছিলেন কি ?’

‘দেশুন, বীরেনের কুণ্ঠী আমিই করি । সে যে গৃহস্থাগী হবে সেটা আমি জানতাম । তাই এদি হয় তাহলে সম্মাপ্তি হ্বার সম্ভাবনাটা উভিয়ে দেওয়া যায় কি ?’

‘আরেকটা শেষ প্রশ্ন ।—সেদিন আপনি বললেন মহেশবাবুকে খুজতে যাচ্ছেন অথচ আপনি এলেন আমাদের পরে । আপনি কি পথ হারিয়েছিলেন ? জায়গাটা তেমন গোলকধীরা নয় কিছু ।’

‘এ প্রশ্ন আপনি করবেন সে আমি জানতাম ; মনু হেসে বললেন অবিলবাবু । ‘জায়গাটা গোলকধীরা নয় ঠিকই, তবে পথটা দুভাগ হয়ে গেছে সেটা আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই । মহেশকে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সহজই ছিল । কিন্তু বাপার কী জানেন, বুঝো বয়সে ছেলেবেলার শৃতি মাঝে মাঝে জেগে ওঠে মনে ; সেই একটা শৃতি আমাকে অন্য পথে নিয়ে যায় । সেটা আব কিছুই না ; পথাব বছব আগে এই দিকেই একটা পাথরে আমি আমার নামের আদাকর আর তারিখ খোদাই করে বেঁধেছিলাম । গিয়ে দেখি সে পাথর এখনো আছে, আর সে খোদাইও আছে—A. B. C.; 15.5.23—বিশ্বাস না হয় আপনি গিয়ে দেখতে পারেন ।’

কৈলাসে গিয়ে নূর মহম্মদের কাছে কুনলাম অরুণবাবু আকষ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন বাধের সকানে—‘ছোটাবাবা’ আছেন ।

প্রিতীনবাবু দোতলায় ছিলেন, ব্যবর দিতে নিচে নেমে এলেন । তাঁর হাতে চিঠি আর ডায়রির পাকেট তুলে দিয়ে চলে আসছি, এমন সময় বাধা পড়ল ।

শীলিমা দেবী। তিনি ঘরে চুক্তেই প্রিতীনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে সেটা লঙ্ঘ করলাম।

‘আপনাকে একটা কথা বলার ছিল, যিঃ যিতির। সেটা আমার খামীরই বলা উচিত ছিল, কিন্তু উনি বলতে চাইছেন না।’

প্রিতীনবাবু তাঁর ক্ষীর নিকে কাতরভাবে চেষ্টে আছেন, কিন্তু শীলিমা দেবী সেটা গ্রহণ করলেন না। তিনি বলে চললেন, ‘সেদিন বাবাকে ওই অবস্থায় দেখে আমার স্বামীর হৃত হেকে টেপ রেকর্ডিং পড়ে যাব। আমি সেটা তুলে আমার কাশে বেঁধে দিই। আমার মনে হয় এটা আপনার কাজে লাগবে। এই নিম।’

প্রিতীনবাবু আবার বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে চাপটা ক্যাসেট-রেকর্ডিং কোটের পক্ষে পূরে নিল।

প্রিতীনবাবুকে দেখে মনে হল তিনি একেবাবে ভেঙে পড়েছেন।

আমার মন বলছিল যে বাধ ধরার ব্যাপারে ফেলুদারও যথেষ্ট কৌতুহল আছে। গাড়িতে উঠে ও হরিপুরবাবুকে যা নির্দেশ দিল, তাতে বুঝলাম আমার অনুমান ঠিক।

লালমোহনবাবু যতটা সাহস নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তার কিছুটা বোধহ্য করছে, কাবণ যাবার প্রথ একবার ফেলুদাকে বললেন, ‘তমস্তোকেরতো অনেক বন্দুক ছিল মশাই—একটা চেয়ে নিলেন না কেন? আপনার কোণ্ট বগিচা এ ব্যাপারে কোনো কাজে লাগবে কি?’

তাতে ফেলুদা বলল, ‘বাবের গায়ে মাছি বসলে সেটা মারা চলবে।’

সাবা পথ ফেলুদা টেপ রেকর্ডিং চালিয়ে ডল্যাম কমিয়ে কানের কাজে ধরে রইল। কী সুন্দর ওই জ্বানে।

কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় অনেক জায়গাই ভিজে ছিল। বড় রাস্তা থেকে একটা মোড়ের কাছে এসে কাঁচা মাটিতে তায়াবের দাগ দেখে বুঝলাম কিছু গাড়ি মেল গোড় থেকে বেঁকে ওই দিকেই গেছে। আবরাণ বায়ের রাস্তা নিলাম, আর মাইল যানেক গিয়েই দেখলাম রাস্তার বী শারে একটা বটগাছের পাশে তিনটে তিনরকম গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—একটা বন বিভাগের জীপ, একটা অক্ষণবাবুর ফিয়াট আর একটা বাবের বাঁচাসমেত সার্কিসের ট্রাক। পাঁচজন লোক গাছটার তলায় বসে ছিল, তারা বলল আধুনিক হস্ত যাঘ খৌজার মল বনের ভিতর চলে গেছে। কোন্দিকে গেছে সেটাও দেখিয়ে দিল। লোকগুলোর মধ্যে একটাকে সেদিন সার্কিসের তাবুতে দেবোছি; ফেলুদা তাকেই জিগ্যেস করল ট্রেনারও এসেছে কিম। লোকটা বলল যে দ্বিতীয় ট্রেনার চন্দন এসেছে।

আমরা রওনা দিলাম। সামনে কী অভিজ্ঞতা আছে জানি না, তবে এইটুকু

জানি যে অক্ষণবাবুর হাতে বন্দুক আছে, হাতে বন বিভাগের শিকারীর হাতেও আছে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ নেই। লালমোহনবাবু মনে হল একটু মুঘড়ে পড়েছেন তার কারণ নিষ্ঠাই কার্যাতিকারের বদলে ৮জনের আসা।

ভিত্তে মাটিতে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট পায়ের ছাপ গাইড হিসেবে কাজ করছে। বন ঘন নয়, শৌকিলে আগজ্বার কম, তাই এগোতে কোনো অসুবিধে ইচ্ছিল না। এর মধ্যে দু একবার খবুর হেকে উঠেছে: সেটা যে বায়ের সংকেত হতে পারে সেটা আমরা সবাই জানি।

মিনিট দশক চলার পর শব্দটা পেলাম।

বায়ের ডাক, শব্দে গর্জন থলব না। ইংরিজিতে এটাকে গাউল বলে, বাঙ্গলায় হ্যাত গোঁড়ানি, কিংবা গরগরানি বা গজগজানি। ঘন ঘন ডাক, আর বিস্তৃত ডাক, বিজ্ঞমের নয়।

আরো কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দুটো গাছের ফৌক দিয়ে একটা অস্তুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। অস্তুত কেননা এ জিনিস সার্কাসের বাহিরে কখনো যে দেখতে পাব এটা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমাদের সামনে বৌয়ে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দুজনের হাতে বন্দুক। একটা বন্দুক অক্ষণবাবুর হাতে, সেটা উঠিয়ে তাগ করা আছে সামনের দিকে।

এই তিনজনের পিছনে একটা খোলা জায়গা, যেটাকে বলা যেতে পারে সার্কাসের রিং। এই রিং-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ডান হাতে চাবুক আর বী হাতে একটা গাছের ডাল বিয়ে একটা লোক। বী কৌধে বাল্কেজ দেখে বৃক্ষলায় ইনিই হলেন ট্রেনার চক্রন। আমার দিকে পিছন ফিরে হাতের চাবুকটা মাঝে মাঝে সপাং করে মাটিতে মেরে চপ্পন ফিরে এগিয়ে যাচ্ছে যার দিকে সে হল আমাদের কালকেব দেখা গেও মাজেস্টিক সার্কাস থেকে পালানো বাব সুলতান।

এ ছাড়া আরো চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বৌয়ে একটু দূরে, তাদের দুজনের হাতে যে শিকলটা রয়েছে সেটাই নিষ্ঠাই বাঘকে পরানো হবে, যদি সে ধরা দেয়।

সবচেয়ে অস্তুত লাগল সুলতানের হাবভাব। সে পালানোর কোনো চেষ্টা করছে না, অস্থচ ধরা দেবারও যেন বিল্মাত্ত ইচ্ছা নেই। শুধু তাই নয়, তার কোথে মুখে যে খাগ আর অবজ্ঞার ভাবটা ফুটে উঠেছে সেটা সে বাব বাব বুবিয়ে দিচ্ছে চাপা গর্জনে।

চক্রন যদিও এক পা এক পা করে এগোছে বাঘটার দিকে, তাকে দেখে মনে হয় না যে তার নিজের উপর সম্পূর্ণ আঙ্গ আছে। সে যে একবার জ্বর হয়েছে এই বায়েরই হাতে সেটা সে নিষ্ঠাই কুলতে পারছে না।



আমি আড়তোবে মাঝে মাঝে দেখছি অক্ষণবাবুর নিকে । তিনি মোচানে বন্দুক উঠিয়ে ছিল খজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বেশ বুরতে পারছি সুলতান বেসামারু কিন্তু কবলেই বন্দুক গঁজিয়ে উঠে তাকে ধোঁশালী করে দেবে । আমরা বী পাল দুপা সামনে ফেলুন। পাথরের মতো দীঢ়ানো ভাইনে লালমোহনবাবু, তাঁর মুখ এমনভাবে হী হয়ে দায়েছে যে মনে হয় না তোয়াল আর কোনোসিনও উঠবে । (ভুঁসেক পরে বাজেছিলেন যে তাঁর ছেলেবয়সে তিনি যত সর্কাসে যত বাঘের বেশা দেখেছিলেন, তার সমস্ত শৃঙ্খি নাকি মুছে গেছে আজকের হাজারিবাণ্ডের বনের মাঝে দেখা এই সার্কাসে) ।

চন্দন মাথন পাঁচ হাতের মধ্যে, তখন সুলতান হঠাৎ তার সমস্ত ঝাসেপেলী টান করে শরীরটা একটি নিচু করল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলুন। একটা নিখেক লাফে অক্ষণবাবুর ধারে পৌঁছে গিয়ে তাঁর বন্দুকের নলের উপর হাত রেখে স্থু চাপে স্টোকে নাখিয়ে দিল ।

‘সুলতান !’

গুরুগঙ্গীর ডাকটা এসেছে আমাদের ভাস দিক থেকে । যিনি ডাকটা নিয়েছেন, তাঁকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই যে ফেলুন। এই কাজটা করেছে তাতে কোনো সান্দেহ নেই ।

‘সুলতান ! সুলতান !’

গাঁওর শর্কটা নরম হয়ে এল । অবাক হয়ে দেখলাম রঙমকে অবর্ণিত হলেন রিং-মাস্টার কারাগারিকান ; এবং হাতে চাবুক, পরনে সাধারণ প্যাট আর শাট । গলা অনেকব্যানি নাখিয়ে নিয়ে পোষা কৃকুর বা বেড়ালকে যেমন ভাবে ডাকে, সেই ভাবে ডাকতে ডাকতে কারাগারিকার এগিয়ে গোলেন সুলতানের নিকে ।

চন্দন হততথ হয়ে পিছিয়ে গেল । অক্ষণবাবুর বন্দুক ধীরে ধীরে নেয়ে গেল । বন বিভাগের কর্তার মুখ লালমোহনবাবুর মুখের মতোই হী হয়ে গেল । বনের মধ্যে এগাঁও জন হতবাক দর্শক দেখল গ্রেট যাজেস্টিক সার্কাসের রিংস্টোর কী আচর্য কৌশলে পালানো বাঘকে বশ করে তার গলায় চেন পরিয়ে দিল, আর তারপর সেই চেন ধরে সুলতানকে জঙ্গলের মধ্যা থেকে ধরে করে নিয়ে এল একেবারে সার্কাসের বীচার কাছে । তারপর খীচার দরজা বুলে তার বাইরে টুল রেখে দিল সার্কাসের লোক, আর কারাগারিকার চাবুকের এক আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘আপ !’ বলত্তেই সেই বাঘ খীচবেগে ছুটে গিয়ে টুলে পা দিয়ে আবার সার্কাসের বীচায় বন্দী হয়ে গেল ।

আমরা একটি দূরে দাঁড়িয়ে বাপারটা দেখছিলাম ; বাঘ খীচায় বন্দী হওয়া আগ্র কারাগারিকার আমাদের দিকে ফিরে একটা সেসাম টুকর। তারপর সে একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল । এটা একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি, আগে ছিল না ।

একটা চলে বাবার পর অরুণবাবুকে বলতে কলমাম, 'ত্রিলিয়ার্ট'। তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'বাক্স'।

॥ ১১ ॥

কৈলাসে কিন্তু এসে ফেলুদা প্রথমে অরুণবাবুর অনুমতি নিয়ে একটা টেলিফোন করল, কাকে জানি না। তারপর বৈঠকখানায় এল, যেখানে অবসর সবাই বসেছি। মীলিমা দেবী চা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনজনে কাপই কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন। মহেশবাবুর শ্রান্ত কলকাতাতেই হবে। অবিলব্ধাবুকে বাঘের ঝুরটা দেওয়াতে তিনি ঘটনাটা দেখতে পেলেন না বলে খুব আপসোন করলেন।

'আমিও ভাবছি কালই বেরিয়ে পড়ব,' বললেন অরুণবাবু, 'অবিশ্বা যদি আপনার তদন্ত শেষ হয়ে থাকে।'

ফেলুদা জানাল সব শেষ।—'আপনার পিতৃদেবের শেষ ইচ্ছা পালনেও কোনো বাধা নেই। সে ব্যবহারও হয়ে গেছে।'

অরুণবাবু চায়ের কাপ থেকে দৃষ্টি তুললেন।

'সে কি, বীরেন্দ্রের কোভি পেয়ে গেছেন ?'

'আজে হী। আপনার বাবা ঠিকই অনুমতি করেছিলেন।'

'মানে ?'

'তিনি এখানেই আছেন।'

'হাজারিবাগে ?'

'হাজারিবাগে।'

'খুবই আস্তর্য লাগছে আপনার কথটা শনে।'

আস্তর্য লাগার সঙ্গে যে একটা অবিশ্বাসের ভাবও মিশে আছে সেটা অরুণবাবুর কথার সুরেই বোকা গেল। ফেলুদা বলল, 'আস্তর্য তো হবাবই কথা, কিন্তু আপনারও এ বকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, তাই নয় কি ?'

অরুণবাবু হাতের কাপটা নাযিয়ে সোজা ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'শুধু তাই নয়,' ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার মনে এমনও ভয় দৃকেছিল যে মহেশবাবু হ্যাত আবার নতুন উইল করে আপনাকে বাদ দিয়ে বীরেন্দ্রকে তাঁর সম্পত্তির ভাগ দেবেন।'

ঘরের মধ্যে একটা অস্তুত ধম্মটায়ে ভাব। লালমোহনবাবু আমার পাশে বসে সোফার একটা কুশন খামচে খরেছেন। শ্রীতীনবাবুর মাথায় হ্যাত। অরুণবাবু উঠে পাড়িয়েছেন—তাঁর ঢোক ল্যাল, তাঁর কপালের রংগ ফুলে উঠেছে।

‘শুনুন যিঃ মিতির।’ গজিয়ে উঠলেন অরুণবাবু, ‘আপনি নিজেকে যত বড়ই গোয়েন্দা ভাবুন না কেন, আপনার কাছ থেকে এমন যিথো, অমৃলক, ডিটিইন অভিযোগ আয়ি বরদান্ত কৰব না।—জগৎ সিং।’

পিছনের দরজা দিয়ে বেংগালা এসে দাঁড়াল।

‘আর একটি পা এগোবে না কুঁঠি।’—ফেলুন্দার হাতে রিতলভার, সেটাৰ শৰ্কাৰ অরুণবাবুৰ পিছনে জগৎ সিং-এর দিকে।—‘ওৱ মাথাৰ একগাছা চুল কাল বাবে আমাৰ হাতে উঠে এসেছিল। আমি জানি ও আপনারই আজ্ঞা পালন কৰতে এসেছিল আমাৰ ঘৰে। ওৱ মাথাৰ কুলি উড়ে বাবে যদি ও এক পা এগোব আমাৰ দিকে।’

জগৎ সিং পাথৰের অতো দাঁড়িয়ে বইল।

অরুণবাবু কৌপতে কৌপতে বসে পড়লেন সোকাতে।

‘আ-আপনি কী বলতে চাইছেন?’

‘শুনুন সেটা মন দিয়ে।’ বলল ফেলুন্দা, ‘আপনি উইল চেৱ কৰার রাস্তা বৰু কৰাৰ জন্য আপনার বাবাৰ চাবি কুকিৰে বেৰেছিলেন। বিবি মেৰেছিল মহেশবাবুকে চাবি বৰ্জন। মহেশবাবু হৈয়ালি কৰে তাৰ নাতনীকে বলেছিলেন তিনি কী হারিয়েছেন, কী বুজছেন। এই কী হল Key—অৰ্থাৎ চাবি। কিন্তু চাবি সবিয়েও আপনি নিশ্চিন্ত ইননি। তাহি আপনি সেদিন রাজুৱান্নায় সুযোগ পেয়ে আপনার মোক্ষম অন্তৰ্ভুত প্ৰয়োগ কৰেন আপনার বাবাৰ উপৰ। আপনি জানতেন সেই আত্মে মৃতা হতে পাৰে—এবং সেটা হলোই আপনার কাৰ্যপিণ্ডি হৰে—’

‘পাগলেৰ প্ৰলাপ ! পাগলেৰ প্ৰলাপ বকছেন আপনি !’

‘সাক্ষী আছে, অরুণবাবু—একজন নয়, তিনজন—যদিও তাৰা কেউই সাহস কৰে সেটা প্ৰকাশ কৰেননি। আপনাৰ তই সাক্ষী—অবিলব্ধ সাক্ষী—শক্তৰলাল সাক্ষী।’

‘সাক্ষী যেবাবে নিৰ্বাক, সেবাবে আপনার অভিযোগ প্ৰমাণ কৰছেন কী কৰে, যিঃ মিতিৰ ?’

‘উপায় আছে, অরুণবাবু। তিনজন ছাড়াও আৱেকজন আছে যে নিধিধান সমস্ত সত্য ঘটনা উদ্বৃত্তি কৰবে।’

কৈলাসেৰ বৈঠকখানায় পাৰ্থিৰ ডাক কেন ? জলপ্ৰপাতেৰ শব্দ কেন ?

অবাক হয়ে দেখলাম ফেলুন্দা তাৰ কোটিৰ পকেট থেকে শ্ৰীতীনবাবুৰ কাসেট বেকৰ্ডৰ বাব কৰেছে।

‘সেদিন একটি ঘটনা দেখে এবং কয়েকটি কথা শনে বিহুল হয়ে শ্ৰীতীনবাবু হাত থেকে এই যন্ত্ৰটা যেলো দেন। নীলিমা দেবী এটা কুড়িয়ে নেন। এই যন্ত্ৰতে পাৰ্থিৰ ডাক ছাড়াও আৱো অনেক কিছু বেকৰ্ড হয়ে গোছে, অরুণবাবু।’

এইবাবে দেখলাম অঙ্গবাবুর মূখ কর্তৃ লাল থেকে ফ্যাকাসের দিকে ৮লেছে । ফেলুদার জন্ম হাতে রিভলভার, বী হাতে টেপ রেকর্ডার ।

পাখির শব্দ হাপিয়ে শানুবের গলা শোনা যাচ্ছে । কর্তৃ এগিয়ে আসছে গলার স্বর, স্পষ্ট হয়ে আসছে ; অঙ্গবাবুর গলা—

‘বাবা, বীক কিন্তু এসেছে এ ধৰণ তোমার হল কী করে ?’

তারপর মহেশবাবুর উভয়—

‘বুড়ো বাপের যনি তেমন ধারণা হয়েই থাকে, তাতে তোমার কী ?’

‘তোমার এ বিশ্বাস মন থেকে মূল করতে হবে । আমি জনি সে আসন্নি, আসতে পাবে না । অস্বীকৃত !’

‘আমার বিশ্বাসেও তুমি হস্তক্ষেপ করবে ?’

‘হ্যাঁ, করব । কাবণ বিশ্বাসের বশে একটা অন্যায় কিছু ঘটে যায় সেটা অস্বীকৃত না ।’

‘কী অন্যায় ?’

‘আমার যা পাওনা তা থেকে বঞ্চিত করতে দেব না তোমাকে আমি ।’

‘কী বলছ তুমি !’

‘ঠিকই বলছি । একবার উইল বসন করেছ তুমি বীক আসবে না ভেবে । তারপর আবার—’

‘উইল আমি এমনিও চেষ্ট করতাম !—মহেশবাবুর গলার স্বর ৮৫ে গোছে ; তার পুরানো বাগ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে । তিনি বলে চলেছেন—

‘তুমি আমার সম্পত্তির ভাগ পাবার আশা কর কী করে ? তুমি অসং তুমি ভুয়াভী, তুমি তোব !—সজ্জা করে না ? আমার আলমারি থেকে শেরাবেঢ়ীর মেওয়া স্ট্যান্ল আলবাম—’

মহেশবাবুর বাকি কথা অঙ্গবাবুর কথায় জকা পড়ে গেল । তিনি উণ্মাদের মতো ঢেচিয়ে উঠেছেন—

‘আর তুমি ? আমি যদি তোর হই তবে তুমি কী ? তুমি কি ভেবেছ অস্বীকৃতি জনি না ? দীনদয়ালের কী হয়েছিল আমি জানি না ? তোমার চিকারে আমার মুখ দেখে গিয়েছিল । সব দেখেছিলাম আমি শর্পার ফৌক সিয়ে । প্যারাক্রিপ বছর আমি মুখ বন্ধ রেখেছি । তুমি দীনদয়ালের মাথার বাড়ি যেরেছিলে পিতলের বৃক্ষমৃতি দিয়ে । দীনদয়াল হয়ে যায় । তারপর মূল মহান্ধ আর জাহিভারকে নিয়ে গাড়িতে করে তার জপ—’

এর পরেই একটা ঝুঁপ শব্দ, আর কথা বন্ধ । তারপর শব্দ শব্দ পাখির ডাক আর জলের শব্দ ।

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে সেজ শ্রীতীনবাবুকে ফেরত দিয়ে মিল ফেলুদা ।

ଶିନିଟିଶାଖରେ ସକାଳେ ଚମ୍ପ, ଆବ ସକଳାରେ କାଠ, ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଛାଡା ।

যেভুল ডিলভার চালান নিজ প্রক্রিয়া। তাবশুর বলজ, আপনার বাবা পাইকু
কাজ করেছিলেন, সাংঘটিক অবাধ কর্তৃছিলেন, সেটা তিক, কিন্তু তার জন্ম
তিনি পৃথিবী বছৰ যুগ তোম করেছেন, যত বক্তুর পেরেজেন আয়তিক
করেছেন। উৎও তিনি শাস্তি করনি। যেবিন খেন্দু হটে, সেইসব খেকেই
তাঁর ধারণা হয়েছে যে, তাঁর জীবনটা অতিশয় তাঁর জন্মায়ের শাস্তি তাঁকে
একদিন না একদিন পেতেই হব। অবিশ্ব সেই শাস্তি এভাবে তাঁর নিকেতন
চোলের হাত ধেন্ত আসবে, সেটা তিনি ভেবেছিলেন কিম জানি না।

ଅରୁଣ୍ୟାତ୍ମକ ପାଥରେ ଘରୋ ବସେ ଆହୁମ ମେକେର ବାହୁଦୟୀର ଦିକ୍କେ ଏକମୁଣ୍ଡୀ
ଚେଯେ । ଏହାର କଷା ବଳଲେନ, ତଥାର ହଳ ତୌର ଗମର କ୍ଷମଟା ଆସନ୍ତେ, ଅନେକ ମୂର
ଫେରେ ।

‘একটা কুকুর ছিল। আইরিশ টেরিয়ার বাবুর কুর প্রিয়। দীনদয়ালকে দেখতে পারত না কুকুরটা। একসময় আমড়তে বায়। দীনদয়াল লাঠিন বাড়ি যাবে। কুকুরটা উৎসুক হয়। বাবু ফেরেন বাড়িরে—পাটি থেকে। কুকুরটা পুর ঘরেই অপেক্ষা করত। সেলিন ছিল বা। নূর ছহসন ঘোস্তা দলে। বায় দীনদয়ালকে ডেকে পঠান। বাগাল বাবা আবু মানুষ ধৰকেন্দেন বা....’

ফেনুনুর সঙ্গে আমরাও উজ্জ পড়লাম। অধিবিবাদুও উঠলেন মেঝে ফেনুনুর বলাম। আপনি একটি আধ্যাত্মিক সঙ্গে আমস্তে পানেন কি ? কাউ ছিল ।

‘চলন’, বসনেন ভদ্রালক, ‘ভদ্রেশ চলন গিয়ে আমার দেশ এখন অবস্থা

132

গভীর অস্থিমধ্য বলগেল— ‘আমার নাম দেখ পাখরটোর পাশে পৰিয়েই আমি
ওমের কথা শুনতে পাই । তাকে অনেক সময় ছিলেস করেছি সে ইঠাই
এত অনামনন্দ হয়ে পড়ে কেন । সে ঠাট্টা করে বলত—“কুমি ওমে বাবু কর,
এত অনামনন্দ হয়ে পড়ে কেন ।” আচর্য—তব ছীরনের এত বড় একটা ঘটনা—সেটা কৃষ্ণীতে
আমি বলব না ।’ আচর্য—তব ছীরনের এত বড় একটা ঘটনা—সেটা কৃষ্ণীতে

ଧରା ପଡ଼ିଲା ନା କେବେ ବୁଝାନ୍ତେ ପାରାଇଲା ! ହୃଦ ଆଖାରିହ ଅକୁଳା ।

বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন বুঝতে পারলাম ফেলুন কাকে হেল
কুরেছিল ।

স্বাক্ষর করিয়ে দেওয়ার আক্ষম অক্ষয়কাল মিত্র।

ফটকের বাহরে দাঢ়িরে আছেন প্রিমেয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী প্রিম প্রিয়া মুখোপাধি ।

‘ଆପନାର ମିଶନ ସାକଷେଷକୁଳ । ଗାଭ ହେଲା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

আমরা বৈষ্ণকবালার চুক্তি সেই গেক্যাথন্ডি সম্মাপ্তি সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে
উঠে নমস্কার করলেন। লম্বা চুল, কম্ফ লম্বা দাঢ়ি, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা।

উঠে নমস্কার করলেন। লম্বা চুল, কম্ফ লম্বা দাঢ়ি, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা।

‘বাপের দেশ ইঙ্গীয় কথা শুনে বীরেন আসতে রাজি হল।’ বললেন শঙ্খপাল,

‘বাপের দেশ ইঙ্গীয় কথা শুনে বীরেন আসতে রাজি হল।’

‘মহেন্দ্রবাবুর উপর কোনো আক্রমণ নেই ওর।’

‘মেমন আক্রমণ নেই, তেমনি অকর্ষণও নেই।’ বললেন বীরেন-সম্মাপ্তি।

‘শঙ্খ এবাব অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে। বলেছিল— ওদের
শঙ্খের এবাব অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে ফিরিয়ে আনতে। বলেছিল— ওদের
মেখলে তোমার টানটা হঘত কিরে আসবে। ওর কথাতেই আমি বাজুরায়াক
মেখলে তোমার টানটা হঘত কিরে আসবে। কিন্তু দূর থেকে দেখেই আমি বুবেছিলাম আমার আর্যায়দের
গিয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু দূর থেকে দেখেই আমি বুবেছিলাম আমার আর্যায়দের
উপর আমার কোমো টান নেই। বাবা তবু আমাকে কিছুটা বুবেছিলেন, তাই প্রথম
প্রথম ওকে চিঠিও লিখেছি। কিন্তু তারপর....’

‘কিন্তু সে চিঠি তো আপনি বিমেশ থেকে দেখেননি।’ বলল ফেলুন। ‘আমার
বিবাস আপনি দেশের বাইরে কোথাও যাননি কোমোদিন।’

বীরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে ফেললেন। আমি হতভুব, কী
যে হচ্ছে কিছুই বুবাতে পারছি না।

‘শঙ্খ আমাকে বলেছিল আপনার বুক্সির কথা,’ বললেন বীরেনবাবু, ‘তাই
আপনাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম।’

‘তাহলে আর কী। খুল ফেলুন আপনার অতিরিক্ত সাজ পোশাক।
হাজারিবাগের বাস্তার সোকের পক্ষে ওটা যথেষ্ট হলেও আমার পক্ষে নয়।’

বীরেনবাবু হাসতে তাঁর দাঢ়ি আর পরচুলা খুলে ফেললেন।
লালমোহনবাবু আমার পাশ থেকে চাপা গলাট ‘কান...কান...কান’ বলে থেবে
গেলেন। আমি জানি তিনি আবাব ভুল নাইটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এবাব
বললেও আর শব্দের পারতায় না, কারণ আমার মুখ দিয়েও কথা বেরোচ্ছে
না। কথা বললেন অবিলবাবু, ‘বীরেন যাইরে যায়নি মানে? ওর চিঠিগুপ্তে
তাহলে....?’

‘বাইরে না গিয়েও বিদেশ থেকে চিঠি লেখা যায় অবিলবাবু, যদি আপনার
ছেলের মতো একজন কেউ বক্ষ থাকে বিদেশে, সাহায্য করার জন।’

‘আমার ছেলে।’

‘চিকই বলেছেন মিস্টার মিস্টার,’ বললেন বীরেন কারাপ্তিকার, ‘অধীর খবর
ডুসেলডুর্ক, তখন ওকে চিঠি লিখে আমি বেশ কিছু ইউরোপীয় পোস্টকার্ড
আনিয়ে নিই। সেগুলোতে চিকানা আর যা কিছু লিখবার লিখে থামের মধ্যে ভবে
ওর কাছেই পাঠাতাম, আর ও টিকিট লাগিয়ে ডাকে ফেলে দিত। অবিশ্য অধীর
দেশে ফিরে আসার পর সে সুযোগটা বক্ষ হয়ে যায়।’

‘কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা হল কেন?’ জিগেস করলেন অবিলবাবু।

‘কারণ আছে’ বলল ফেলুন। ‘আমি বীরেনবাবুকে জিজেস করতে চাই আমার অনুমতি ঠিক কিনা।’

‘বলুন।’

‘বীরেনবাবু কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী পড়ে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং তাঁর মতো হতে তেয়েছিলেন। সুরেশ বিশ্বাস যে ঘর ছেড়ে থালাসী হয়ে বিদেশে গিয়ে শেষে ব্রেঙ্গিলে মুক্ত করে নাম করেছিলেন সেটা আমার মনে ছিল। যেটা অনে ছিল না। সেটা আমি কালে বাত্রে বাঙালীর সাক্ষিত বলে একটা বই থেকে জেনেছি। সেটা ছিল এই যে সুরেশ বিশ্বাস ছিলেন প্রথম বাঙালী যিনি বায সিংহ ট্রেন করে সাক্ষিত থেকে দেখিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে আন্তর্য খেলা ছিল সিংহের মুখ ফৌক করে তার মধ্যে মাথা চুকিয়ে দেওয়া।’

এখানে লালমোহনবাবু কেন জানি ভীকণ ছটফট করে উঠলেন।

‘ও মশাই ! ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ এই সেদিন পড়লুম, তাও খেয়াল হল না, ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ....’

‘আপনি ছ্যাছ্যাটা পরে করবেন, আগে আমাকে বলতে দিন।’

ফেলুন্দার ধরকে লালমোহনবাবু ঠাণ্ডা হলেন। ফেলুন্দা বলে চলল, ‘বীরেনবাবুর অ্যারিশন ছিল আসলে বায সিংহ নিয়ে খেলা দেখাসো। কিন্তু বাঙালী ভদ্রবরের ছেলে আজকের দিনে ওদিকে যেতে চাইছে শুনলে কেউ কি সেটা ভালো চোখে দেখত ? মহেশবাবুই কি খুশি মনে মন দিতেন ? তাই বীরেনবাবুকে কৌশলের আশ্রয নিতে হয়েছিল। তাই নয় কি ?’

‘সম্পূর্ণ ঠিক,’ বললেন বীরেনবাবু।

‘কিন্তু আন্তর্য এই যে, আদিন পরে ছেলেকে রিং-মাস্টার হিসেবে সেশেও মহেশবাবু তাকে চিনতে পেরেছিলেন, যদিও অঙ্গবাদু সামনে থেকে সেখেও চিনতে পারেননি। সেটার কারণ এই যে বীরেনবাবুর নাকে প্লাস্টিক সাজাবি করানো হয়েছিল, যে কারণে ছেলেবেলার ছবির সঙ্গেও নাকের ঘিল সামান্যই।’

‘তাই বলুন।’ বলে উঠলেন অধিলবাবু, ‘তাই তাৰছি সবাই বীরেন বীরেন কৰছে, অথচ আমি সঠিক চিনতে পাৰছি না কেন !’

‘যাক গো,’ বলল ফেলুন্দা, ‘এখন আসল কাজে আসি।’

ফেলুন্দা পকেট থেকে মুকুটামল্লীর ছবিটা বাব কৰল। তারপর বীরেনবাবুর দিকে ফিরে বলল, ‘আপনি বোধহয় জানেন না যে, আপনি আব ফিরবেন না ভেবে মহেশবাবু আপনাকে তাঁর উইল থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেই উইল আব বদল কৰার উপায ছিল না। অথচ আপনি একেবারে বঞ্চিত হন সেটাও উনি চাননি। তাই এই ছবিটা আপনাকে দিয়েছেন।’

ফেলুন্দা ছবিটা উলটে পিছনটা খুলে ফেলল। ভিতৰ থেকে বেরোল একটা

ভৌজ করা সেলোফেনের খাম, তার মধ্যে ছেট ছেট কড়গলো প্রতিম কাগজের টুকরো।

‘তিনটি মহাদেশের ন'টি দুর্ভাগ্য ডাকটিকিট আছে এখানে। আলবাম চুরি যেতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান স্ট্যাম্প ক'টি এইভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন। গিবন্স ক্যাটলগের হিসেবে প'চিশ বছর আগে এই লুকিয়ে রেখেছিলেন। আমার ধারণা আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার পাউন্ড। আমার ধারণা আজকের দিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা।’

বীরেন্দ্র কারাতিকার নামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন সেটার দিকে। তারপর বললেন, ‘সার্কাসের রিং-মাস্টারের হাতে এ জিনিস যে বড় বেমানান, মিঃ প্রেট ম্যাজেন্টিক সার্কাস, কিন্তু স্ট্যাম্প বাবসায়ীর সঙ্গে চেনা আছে আমার। এর জন্য যা মূল্য পাওয়া যায় সেটা আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আমার উপর বিশ্বাস আছেতো আপনার?’

‘সম্পূর্ণ।’

‘কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে আমাকে দিতে হবে?’

‘প্রেট ম্যাজেন্টিক সার্কাস,’ বললেন বীরেন্দ্রবাবু, ‘কুটি বুঝেছে যে আমাকে ছাড়া তার চলবে না। আমি এখনো কিছুদিন আছি এই সার্কাসের সঙ্গে। আজ রাতে সুলতানকে নিয়ে খেলা দেখাব। আসবেন।’

★ !

রাতে প্রেট ম্যাজেন্টিক সার্কাসে সুলতানের সঙ্গে কারাতিকারের আশ্চর্য খেলা দেবে বেরোবার আগে আমরা বীরেন্দ্রবাবুকে ধ্যাক ইউ আর গড বাই জানাতে তাঁর তীব্রতে গেলাম। আইডিয়াটা লালমোহনবাবুর, আর কারণটা বুঝতে পারলাম তাঁর কথায়।

‘আপনার নামটার মধ্যে একটা আশ্চর্য কাণ্ডকার খানা রয়েছে,’ বললেন জটায়, ‘ডু ইউ মাইন্ড যদি আমি নামটা আমার সামনের উপন্যাসে ব্যবহার করি। সার্কাস নিয়েই গল, রিং-মাস্টার একটা প্রধান চরিত্র।’

বীরেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, ‘নামটাকে আমার নিজের নয়। আপনি স্বাক্ষরে ব্যবহার করতে পারেন।’

ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার পর ফেলুন বললে, 'তাহলে
ইনজেকশন বাদ ?'

'বাদ কেন মশাই ? ইনজেকশন মিছে বাধকে । ভিলেন হচ্ছে সেকেন্ড
ট্রেনার । বাঘকে নিষ্ঠেজ করে কারাতিকারকে ডাউন করবে সর্বকদের সামনে ।'

'আর ট্র্যাপীজ ?'

'ট্র্যাপীজ ইজ নাথিং ' অবজ্ঞা আর বিরক্তি মেশানো সুনে বললেন লালমোহন
গান্দুলী ।

গোয়েন্দা ফেন্দুদার

রহস্য

আডভেঞ্চার

গোয়েন্দা

মহাজাহ দেয়



ডুংকুর কথা

ডুংকু পাশেই শিশির ভেজা ঘাসের উপর বাজনাটা রেখে শুধু-গলার গান ধরল। ওর কান ভাল, তাই দুদিন শুনেই তুলে নিয়েছে গানটা। ইনুমান ফটকের বাহিরে বসে রে ভিখিরি গানটা গায়, সে অবিশ্য সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও বাজায়। তাই ডুংকুর শখ হয়েছিল সেও বাজাবে। এই বাজনাটা সবজিওয়ালা শ্যাম গুরুকের। ডুংকু একবেগার জন্য জেরে এনে রেখে দিয়েছে তিনদিন। ছড় টেনে সুর বার করা যে এত শক্ত তা কি ও জানত?

ডুংকু গলা ছাড়ল। সামনে ঝুটো খেতের ওপরে দুটো মৌর আর কয়েকটা ছাগল ছাড়া কাছে-পিঠে কেউ নেই। ডুংকুর ঠিক পিছনেই খাড়া পাহাড়, তার নীচে একটা বাদাম গাছ, তারই ঠিক সামনে ডুংকুর বসার ঠিবি। ওই যে দূরে ইটের তৈরি টালির ছাতওয়ালা দোতলা বাড়ি, ওটা ডুংকুলের বাড়ি। ডুট্টার খেতটাও ওদের। উত্তরে কুয়াশায় আবছা পাহাড়ের পিছনে তিলটু করকে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে বেটার চুড়ো মাছের লেজের মতো দু ভাগ হয়ে গেছে, যেটির নাম মাছাপুছরে, সেটার ডগা এখন গোলাপি।

প্রথম দুটো লাইন গাইবার পর তিনের মাথায় যেখানে সুরটা চড়ে, সেখানে আসতেই আকাশ ভাঙল। শুড় শুড় শক্তা শুনেই ডুংকু এক লাফে পাঁচ হাত পাশে সরে পিয়েছিল, নইলে ওই হাতির মাথার মতো পাথরটা বাজনাটার সঙ্গে সঙ্গে ওকেও খেতলে দিত।

ওরে বাবু ! ওটা কী—বাদামগাছটার মাথা ফুঁড়ে সেটাকে তহমছ করে একবাশ ডালগালা খুবলে নিয়ে মাটিতে এসে মুখ খুবড়ে পড়ল ওটা কী ?

একটা মানুষ।

না, একটা বাবু।

মাথার রক্ত, থুকনিতে রক্ত, একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে দুঃখে আছে যেন অড়ের পুতুল। শোকটা মরে গেছে কি ?

না, ওই যে মাথাটা নড়ল।

ডুংকুর ধী করে মনে পড়ে গেল ওদের কথা। ওই পুরের গমের খেতটা পেরিয়ে বাজ্জার ওপারে পাহাড়ের গায়ে ঝরনার ধারে তাঁবু কেলে যে চারজন আছে—যাদের দাড়ির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ডুংকু, কারণ ওর নিজের বাপ খুড়ো দাদু আমা মেসো কাকু দাড়ি নেই—যদি কেউ কিছু করতে পারে তো ওয়াই পারবে। ওরা চেনে ডুংকুকে। ডুংকু ওদের গান শুনিয়েছে, খেত থেকে ঝুট্টা

নিয়ে নিয়ে দিয়েছে, ওরা ডুংরকে পয়সা দিয়েছে—এক টাকা, দু টাকা, একদিন পাঁচ টাকা।

ডুংক দিল ছুট।

‘হাই, হাই—কাম, জো, কাম।’

‘হোয়াটস আপ?’

ডুংক জিভ বাব করে মাথা চিত্তিয়ে চোখ উলটিয়ে দেখিয়ে দিল। এরা বুবল।
এ ভাষা সকলেই বোবে।

‘গো!—জিপ, জিপ!—গো!’

এদের জিপের গায়ে রামধনুর রং। এমন গাড়ি ডুংক দেখেনি কখনও। অনেক গাড়ি সে দেখেছে বড় বাস্তা দিয়ে পোথরার দিকে যেতে।

জো, মার্ক, ডেনিস আর বুস উঠে পড়ল জিপে। ডুংরকে তুলে নিল সংসে।
একটা কিছু হয়েছে; দেখা দরকার।

হ্যাঁ, হয়েছেই বটে।

জাম্পিং জেহোশাফ্যাটি! সর্বনাশের মাথায় বাড়ি!

চারজনে ঝুকে পড়ল লোকটার উপর। মার্ক মিনেসোটায় ভাস্তারি পড়া ছেড়ে
দিয়ে চলে এসেছে নেপালে।

বেইশ রক্তাক লোকটাকে ধরাধরি করে তুলল ওরা জিপে।

হাসপাতাল কাঠমাণুতে। এখান থেকে তেক্তিশ কিলোমিটার।

মানুষের হাতে যে রেখাটাকে বিলিতি মতে হেল্পাইন বা বুদ্ধির রেখা বলে, ফেলুদার যে সেটা আশ্চর্যরকম লহা আর স্পষ্ট, সেটা আমি জানি। ফেলুদাকে জিজেস করলে বলে ও পার্মিট্রিতে বিশ্বাস করে না, অথচ পার্মিট্রির বই ওর আছে, আর সে বই ওকে পড়তেও দেখেছি। একবার এটাও দেখেছি—ফেলুদা ওর মাকামারা একপেশে হালিটা হেসে লালমোহনবাবুকে ওর বুদ্ধির রেখাটা দেখাচ্ছে। লালমোহনবাবু অবিশ্য ঐ সব বোলো আন বিশ্বাস করেন। তাই ফেলুদার হেল্পাইনের বহুর দেখে দুবার চীম্বা গলায় 'অ্যামেজিং' কথাটা বলেছিলেন, আর মিনিটখানেক পরে কথার ফাঁকে নিজের ডান হাতের মুঠো খুলে ঢোখ নামিয়ে রেখাগুলোর দিকে দেখে একটা দীর্ঘস্থায় বেলেছিলেন।

হাত দেখে মোটামুটি অঙ্গীত-ভবিষ্যৎ বলতে আমার ছোট কাকাই পারেন। এমনকী মুখ দেখে ভাগ্য বলে দেবার ক্ষমতা ও কানুনের ক্ষমতা আছে বলে শুনেছি। কিন্তু কোনও লোকের কপালের ঠিক অধিক্ষানে কচ্ছে আঙুলের ডগা ঠেকিয়ে রেখে ঢোখ বুজে সেই লোকের ভাগ্য গণনার ক্ষমতা যে কসমুর ধাকতে পারে, সেটা এই পুরী এসে প্রথম শুনলাম।

কলকাতার লোডশেডিং-এ নাজেহাল অবস্থা, তার উপর একটানা শুরুম চলেছে একশো দশ ডিগ্রি। হাপাথানার লোডশেডিং-এর জন্য রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটাফুর নতুন উপন্যাস বৈশাখে বেরোতে পারেনি। ভৱশোকের আরও আপশোস এই জন্য যে, এটা ওর প্রথম ভৌতিক উপন্যাস। ফেলুদাই ওকে বলেছিল যে মোমবাতির আলোয় রহস্য-কাহিনীর চেয়ে ভূতের গল্প জমবে বেশি। সত্য বলতে কী, 'পিঠাপুরমের পিশাচ' গল্পের আইডিয়াটা ফেলুদাই জটাফুরকে দিয়েছিল। কিন্তু সে বই সময় মতো বেরোল না দেখে লালমোহনবাবু বীতিমতো খাপা হয়ে এক বোবারের সকালে আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, 'নাঃ, এ শহরে আর ধাকা চলবে না। আর শুনেচেন তো স্কাইল্যাবের ব্যাপার ?'

স্কাইল্যাব কলকাতার পড়বে এ খবর কোথাও বেরোয়নি, কিন্তু লালমোহনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস কলকাতার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে, তাই স্কাইল্যাবের একটা বড় অংশ এখানে না পড়ে যায় না।

ফেলুদাকে দেখেছি ও আর যে কোনও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে। ওয়েটিং রুমে জায়গা না পেলে প্র্যাটিকর্মে চাদর বিছিয়ে শুয়ে দিয়ি ঘুমিরে রাত কাটাতে দেখেছি কতবার। বালিশও লাগে না—হাত ভৌজ করে তার উপর

মাথা । কিন্তু বাড়িতে বিজ্ঞানী শয়ে হট্টোশানেক না পড়লে যার ঘূর আসে না, তার পক্ষে সেই অভ্যাসটা বক্ষ হয়ে গেলে আর কজনিন মাথা ঠিক রাখা যাব ? বই পড়া হেবড়ে কিছুদিন তাস নিয়ে হাত সাফাই অভ্যাস করল । তারপর কিছুদিন ঘূরে ঘূরে লিমেরিক বালাল, তার একটা লালমোহনবাবুকে নিয়ে—

বুরো দেখ জটায়ুর কলমের জোর
ঘূরে গেছে রহস্য কাহিনীর শোভ
থোভ বড়ি খাড়া
সিখে তড়াতড়া
এইবারে লিখেছেন খাড়া বড়ি থোভ ।

এটা অবিশ্বাস জটায়ুকে বলা হয়নি, আর এই লিমেরিক লেখাও বেশিদিন চলেনি । ডাবলে মনে হয়, শহরে রাঙ্গিরে বাতি না ধাকলে হুরতো বুন-বাহাজানি অনেক বাড়বে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় গত তিন মাসে ফেলুনোর কোনও কেস জোটেনি, আর ডাইমণ্ড যা হয়েছে, সেগুলোর কিনারা পুলিশেই করেছে ।

তাই বোধহয় কেলুদা লালমোহনবাবুর কথায় সাধ সিয়ের বলল, 'সত্তি, কলোলিনী তিলোকুমা বড় জুলাইজে ; শারীরিক অস্বাক্ষৰস্টো মেনে মেওয়া যায়, কিন্তু ত্রুটাগত কাজের ব্যাকাত, পড়াশুনার ব্যাবস্ত, যশোর কামড়ে চিনার ব্যাবাত—এগুলো বরদান্ত করা কঠিন ।'

'উড়িষ্যাতে তো একসেস তাই না ?'

লালমোহনবাবুর এই প্রশ্ন থেকে এল পূরীর কথা, আর পূরী থেকে এস সি-বিচের কাছে মতুন তৈরি নীলাচল হোটেলের কথা, যার মালিক শ্যামলাল বাবির লালমোহনবাবুর বাড়িওয়ালা সুধাকান্তবাবুর ক্লাস-ফ্লেন্ট ।

কিন্তু তা হলে কী হবে ? সুধাকান্তবাবু খৌজ নিয়ে জামদেন ভুনের মাধ্যমাবির আগে ঘর পাওয়া যাবে না ।

তাতেও অবিশ্বাস আমরা পেছপা হইনি । জুনের মধ্যে কলকাতার উচ্চতির কোনও আশা নেই । একুশে জুন আমরা পূরী একপ্রেসে দিয়ে দিলাই রণনি । একবার কথা হয়েছিল যে লালমোহনবাবুর আয়াসাজ্জে বাস্তু হবে, শেষে ভুলোক নিজেই 'এই সময়টার লং জার্নিতে মাকপথে বড়বাস্তু হলে ফ্যাসান হতে পারে মশই' বলে পিছিয়ে গেলেন । গাড়ি যাবে, তবে সেটা ড্রাইভার হারিপদবাবু নিয়ে যাবেন ; আমাদের একমিন পরে পৌঁছবে । পূরী ছাড়াও আরও দু-একটা জারগা ঘূরে দেখার ইচ্ছে আছে, সেটা নিজেদের গাড়ি ধাকলে সুবিধে হবে ।

ট্রেনের ঘটনার মধ্যে একটাই লেখাত হচ্ছে । আমাদের ফের-বার্ষ কামরার একটা আপার বার্ষে একজন ড্রাইভের ছিলেন যিনি সিগারেট খাচিলেন একটা হোস্টারে যেটা কেলুদা বলল ম্যানার । যে লাইটারে সিগারেট ধরেছিলেন সেটা নাকি গোল্ড-প্রেটেড, আর তার নাম নাকি তিন হাজার টাকা । যে কেস থেকে সিগারেট বার করলেন সেটা সোনার, চশমা সোনার, শাটের কাফ-লিংকস

সোনার। দুশ্মত মিলিয়ে তিনটে আংটি সোনার, তার ওপর থেকে পা ঝুলিয়ে নীচে নামতে গিয়ে লালমোহনবাবুর কাঁধে বুড়ো আঙুল জাগাতে যখন হেসে 'সরি' বললেন, তখন দেখলাম একটা দাঁত সোনার। পুরী স্টেশনে নেমে কুলির মাথায় জিনিস তুলে ভদ্রলোকটি যখন ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, তখন লালমোহনবাবু বললেন, 'ইস, এমন সোনায় মোড়া ভদ্রলোকটির নামটা জিজ্ঞেস করা হল না।' ফেলুদা বলল, 'সেটা জানার একটা সহজ উপায় ছিল। কামরার বাইরে নিজারতেশন চার্ট টাঙানো ছিল হাওড়া থেকেই। ভদ্রলোকের নাম এম. এল. হিসোরানি।'

নীলচৰ্ম হোটেলে একবেলো থেকেই সেটাকে সিৰ-স্টাৰ হোটেল বলে ঘোষণা কৰলেন লালমোহনবাবু । ফেলুদা বলল, 'হোটেলে সুইচিং পুল না থাকলে সেটা পাঁচ তাৰাৰ পৰ্যায়ে ওঠে না ; আৱ পাঁচেৰ উপৰ রেটিং নেই । আপনি কি দুশো গজ দুৰে ওই সমুদ্রটাকে নীলচৰ্মেৰ নিজস্ব সাঁতাৰেৰ চৌৰাচ্ছা বলে ধৰছেন ? তা হলে অবিশ্যা আপনাৰ রেটিং-এ ভুল নেই ।'

আসলে দুপুৰে খাওয়াটা বেশ ভাল হৈছিল । লালমোহনবাবুকে লোভী বলা চলে না, তবে তিনি যদি থাইলো আতে সন্দেহ নেই । বললেন, 'কাঁচকস্তাৱ কোফতা এত উপাদেৱ হয় জানা কিম ব্য মশাই । এদেৱ কুকিং-এৰ ভৰাৰ নেই । তা ছাড়া তকতকে বেডকম-বাথকম, সলালাপী ম্যানেজাৰ, ইনস্ট্যুট পাৰা-বাতি, সমুদ্ৰৰ নৈকট্য—সিৱ-স্টাৰ বলৰ না কেন মশাই ?'

পুৰনো হলে কী হবে জানি না, নতুন অবস্থায় হোটেলটা সভিই বেশ ভাল । ফেলুদা আৱ আমি দোকলায় একটা ভাবলুম্বে আছি, পাশেৰ ভাবল কুম্বটা লালমোহনবাবু গড়িয়াহাটোৱ এক কাপড়েৰ দোকানেৰ মালিকেৰ সঙ্গে শেয়াৱ কৰে আছেন । ম্যানেজাৰ শ্যামলাল বারিকেৰ সঙ্গে আলাপ হৈয়েছে, বললহেন সন্ধ্যাবেলা একটু কাক পেলেই আমাদেৱ ঘৰে আসবেন ।

হোটেলোৱ গেট থেকে বেয়িয়ে ভানদিকে মিনিটখানেক গেলেই পাবেৱ তলায় বালি শুল হয়ে যায় । আমি শেষ পুৱী এসেছি যখন আমাৰ বয়স পাঁচ বছৰ । ফেলুদা বছৰ দুৰেক আগে বাড়িৰকেঠা এসেছিল একটা কেসে, তখন উড়িয়াৰ অনেক জায়গাই দেখে গেছে, পুৱী তো বটেই । কেবল লালমোহনবাবু বললে বিশ্বাস কৰা কঠিন—এই প্ৰথম নাকি পুৱী এলেন । আমৱা অবাক ভাৱ দেখানোয় উনি বললেন, 'আৱে মশাই, কলকাতাৰ ভেড়াৰেই কল কী আছে এখনও দেখলুম না, আৱ পুৱী ! ভাৰতে পাৱেন, আমাৰ বাড়িৰ তিন মাইলৰ মধ্যে জৈন টেম্পল ; জন্মে অবধি নাম শনৈ আসছি, এখনও চোখে দেখিনি ।'

সমুদ্ৰ দেখে লালমোহনবাবু যে কবিতাটা আবৃত্তি কৰলেন সেটা আমি কল্পনা কৰিনি । জিজ্ঞাসা কৰতে বললেন সেটা বৈকুণ্ঠনাথ মলিকেৰ লেখা । তিনি নাকি এখেনিয়াম ইনসিটিউশনেৰ বাখলাৰ মাস্টাৰ ছিলেন । লালমোহনবাবু হখন ক্লাস সেভেনে পড়েন, তখন নাকি এই কবিতাটা আবৃত্তি কৰে প্রাইজ পেৱেছিলেন । বললেন শেষেৰ দুটো লাইন নাকি পার্টিকুলাৰলি ভাল—'আৱেকষাৰ মন দিয়ে শোনো তপেশ, তা হলেই বিউটিটা ধৰতে পাৰবে—



‘অসীমের ভাক শুনি কলোল মর্মরে
এক পায়ে আড়া ধাকি একা বালুচরে ।’

কেলুদা মন্তব্য করল, ‘কবি নিশ্চয়ই এখনে নিজেকে সারসের সঙ্গে
আইডেটিফাই করছেন, কারণ এই বোঝো বাতাসে বালির উপর অনুবের পক্ষে এক
পায়ে আড়া ধাকা চাটিখানি কথা নয়। বাই হোক, এবার বলুন তো বালির উপর
ওই ছাপগুলোর কোনও বিশেষ তাংপর্য আছে কি না।’

বালির উপর দিয়ে কেউ হেঁটে গোছে শুরু থেকে পশ্চিমে। জুড়োর ছাপের সঙ্গে
সঙ্গে আরেকটা ছাপ চলেছে, সেটা নিশ্চয়ই লাঠি। লালমোহনবাবু বেশ কিছুক্ষণ
ছাপগুলোর সিকে তেরে থেকে বললেন, ‘জুড়ো অ্যান্ড লাঠি সেটা তো বোধাই
যাচ্ছে, তবে বিশেষ তাংপর্য...’

‘তোসে, তোর কী মনে হয় ?’

আমি বললাম, ‘লোকে তো সাধারণত ডান হাতে লাঠি ধরে। এখনে মেখছি
ছাপটা বাঁদিকে ।’

কেলুদা আমার পিঠে একটা চাপড় খেঁড়ে দিল, ঘার মনে সাবাস। তারপর

বলল, 'ভদ্রলোক ন্যাটা হলে আশ্চর্য হব না ।'

আমরা যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে লোক বশতে তিনটে মুলিয়ার বাচ্চা, তার মধ্যে একটা কাঁকড়া ধুরছে, আর দুটো বিনুক কুড়োছে । তিড়টা আবজ্ঞ হয় আবও এগিয়ে গিয়ে, যেখানে কাছাকাছির মধ্যে বেশ কয়েকটা বাঙালি হোটেল রয়েছে । আমরা আবও এগিয়ে যাব যাব করছি, এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল ।

'মিস্টার গাস্টুলী !'

যুরে দেখি জটায়ুর কুমুরেট, সেই দোকানের মালিক । গোলগাল হাসিখুশি মিশকে লোক, আলাপ হতে জানলায় নাম শ্রীনিবাস সোম, দোকানের নাম হেমাপ্রিনী স্টোর্স, হেমাপ্রিনী ভদ্রসোকের মায়ের নাম ।

'যাইবেন না ?' ভদ্রলোক লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন । 'হয়টায় টাইম দিসে কিন্তু ।'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখছিলেন ; এখন কারণটা বুঝলাম । কিন্তু-কিন্তু তাব করে ফেলুন্দার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি তো বোধহয় নট ইন্টারেস্টেড তাই আপনাকে জোর করব না ।'

'ব্যাপারটা কী ?'

'ইয়ে, ইনি এক আশ্চর্য গণকের কথা বলছিলেন । কপালে আঙুল রেখে ভাগ্য বলে দেন ।'

'কার কপালে ?'

'যার ভাগ্য বলছেন তার, ন্যাচারেলি ।'

'কপালের লিখন পড়তে পারেন বলছেন ?'

'শুনে তো তাই মনে হচ্ছে ।'

ফেলুন্দা অবিশ্যি কপালের সেখা পড়াতে রাজি হল না । তাও আমরা দুজনে গণৎকারের বাড়ি অবধি গেলায় ঠেন্ডের সঙ্গে । গণৎকারের বাড়ি-বসাটা অবিশ্যি ঠিক হল না ; একটা তিনতলা বাড়ির একতলার দুটো ঘর নিয়ে থাকেন ভদ্রসোক । সমুদ্রের ধার দিয়ে সোজা পুবদিকে মুলিয়া বন্তি লক্ষ রেখে গিয়ে যেখানে চেঞ্চারদের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে বাঁয়ো বালির চড়াই উঠে ত্রিশ চারিশ গজ গেলে বালিতে বসা একটা পোড়ো বাড়ির কিছুটা দূরেই এই তিনতলা বাড়িটা । গেটের একদিকে খেত পাথরের ফলকে লেখা 'সাগরিকা,' অন্যদিকে 'ডি. জি. সেন' । পুরনো ধাঁচের হসেও, বেশ বাহারের বাড়ি । গেট দিয়ে চুকে একটা মাঝারি বাগানও আছে ।

'মালিক থাকেন ওই তিনতলার 'ঘরে,' বললেন শ্রীনিবাস সোম, 'আর একতলার বারান্দার পিছনে এই যে দরজা, ওইটা ইল লক্ষণ ভট্টাচার্যের ঘর ।'

গণৎকারের নামটা এই প্রথম শুনলাম । বারান্দায় যে আটি-সপ্তজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারাও যে গণৎকারের বাছেই এসেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই ।

লালমোহনবাবু 'জয় গুরু' বলে সোম মশাইয়ের সঙ্গে গেট দিয়ে চুকে গেলেন ।

* * *

‘কপাল কী বলছে?’ হেলুদা জিজ্ঞেস করল। শালমোহনবাবু ভীমণ
উত্তীর্ণিতভাবে এইরাত্র চুকেছেন আমাদের ঘরে।—‘অবিষ্কাসা, অলৌকিক,
অসামান্য।’ বললেন ভদ্রলোক,—‘সাড়ে সাতে হাপিং কফ, আঠারোয় আজাড়ে
পড়ে মালাই চাকি ডিসপ্লায়েশন, প্রথম উপস্থাপ, স্পেকট্যাকুলার পপুলারিটি,
সামনের বই কটা এভিশন হবে—সব গড় গড় করে বলে দিলেন।’

‘আইল্যাব মাথায় পড়বে কি না বলেছে?’

‘ট্যাট্রাই করুন আর যাই করুন মশাই, আপনাকে একবারটি ধরে নিয়ে দাবই।
আর, ইয়ে, বলেছেন আমার বক্সভাগ্য ভাস। শুধু তাই নয়, বক্সের চেহারার
ডেসক্রিপশনও দিলেন।’

‘আর বক্সের পোশা?’

‘বলেছেন বক্স মেধাবী, কর্ম, অনুসংবিধি, গভীর পর্ববেক্ষণ-শক্তিসম্পর
ব্যক্তি। মিলছে? আর কী চাই?’

‘মে আই কাম ইন?’

হোটেলের যানেজার শ্যামলাল বারিক ঘরে চুক্তেই সুগরি জনরি গুৰে ঘৰ
ভৰে গেল।—‘আসুন।’ পানের ডিবে খুলে এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে।
আমরা ইত্তেজ করছি দেখে আপনে দিলেন যে এ পানে জর্ম মেই।

হেলুদা একটা পান মুখে পুরে চারমিন্টনের প্লাকেটটা পরেতি ধেকে বার করে
বলল, ‘আজ্ঞা, এই ডি. জি. সেন ভদ্রলোকটির পুরো সামটা কী?’

‘দেখেছেন।’ বলে উঠলেন শালমোহনবাবু, ‘ওর কাছি ধেকেই পুরে এলুম, অধিক
ওর পুরো নামটা জেনে এলুম না। দোলগোবিন্দ নৰ জে?’

আমি জানি, ভদ্রলোকের ‘পিঠাপুরমের পিশাচ’ বইতে একটা জাধপাগলা চরিত্র
আছে বার নাম দোলগোবিন্দ দণ্ড বায়।

শ্যামলালবাবু হেসে বললেন, ‘আপ করবেন মশাই, ওর পুরো নাম আমারও^১
জানা নেই। কেউই জানেন কি না সমেছে। সবাই ডি. জি. সেন বলেই বলেন।
এমনকী ‘ডিজিবাবু’^২ বলতে শুনেছি কাউকে কাউকে।’

‘বেশি মেশেন-টেশেন না বুঝি?’

‘গোড়ায় করু এখানে সেখানে দেখা যেত। গত বছর সিকিম না ভুটান কোথায়
যেন গিযেছিলেন; মাস ছয়েক হল ফিরে একেবারে শটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে।’

‘কেন, সেটা জানেন?’

শ্যামলালবাবু মাথা নাড়লেন।

‘বাড়িটা কি ওরই তৈরি?’ হেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘না। ওর বাপের। বাপের পরিচয় দিলে হৱতো চিনতে পারেন। সেন
পারফিউমারস-এর নাম শনেছেন তো?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু সে ব্যবসা তো উচ্চে গেছে অনেককাল। ‘এস, এন, সেন’স
সেনসেশন্যাল এসেনসেজ—সেই সেন তো?’

‘ঠিক বলেছেন। ইনি ওই এস. এন. সেনের ছেলে। জোর ব্যবসা ছিল। কলকাতায় তিনটে বাড়ি, মধুপুরে একটা, পূরীতে একটা। ভদ্রলোক মারা যাবার পর ব্যবসা আর বেশিনি টেকেনি। দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি জাগ করে দেন উইল করে। ডি. কি. সেন বোধহয় ছেট ছেলে; তিনি এই বাড়িটা পান। দুই ছেলের কেউই ব্যবসায় যায়নি। ইনি এককালে ঢাকরি-টাকরি করে থাকতে পারেন, এখন আর্ট নিয়ে আছেন।’

‘আর্ট?’ ফেলুদার হঠাতে কী যেন মনে পড়েছে। ‘এনারই কি পুঁথির কালেকশন?’

আমাদের সিধু জ্যাঠার কাছে পুঁথি দেখেছি আমি। তিনশো বছরের পুরনো তিনটে পুঁথি আছে ওর কাছে। ছাপাখনার আগের যুগে বই লেখা হত হাতে; তাকেই বলে পুঁথি। সবচেয়ে পুরনো কালে একরকম গাছের ছাল সরু লস্তা করে কেটে তাতে লেখা হত, তাকে বলত ভুক্তিপুর, তাবপরে তালপাতা আর কাগজে লেখা হত। সিধু জ্যাঠা বলে পুঁথি জিনিসটা যে আমাদের আর্টের একটা বড় অঙ্গ, সেটা অনেকেই মনে রাখে না।

শ্যামলালবাবু বললেন, ‘পুঁথি নিয়েই তো আছেন। দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে ওর পুঁথি দেখে যাব।’

‘ভদ্রলোকের ছেলেপিলে নেই?’

‘একটি ছেলে তো আবো মাঝে আসত, বউকে নিয়ে। অনেককাল দেখিনি। ভদ্রলোক নিজেই এসেছেন বছর তিনেক হজ। নিজে থাকেন তিনতলায়; একাই থাকেন। বিপরীক। এক তলায় কিছুক্ষণ থেকে এক পার্মাণেট বাসিন্দা এসে রয়েছেন, এক গণকার; দোতলায় সিজনে জড়া দেন। এখন রয়েছে সন্তুষ্য এক রিটার্ন জজ সাহেব।’

‘ই...’

ফেলুদা ফুরিয়ে যাওয়া চারমিনারটা আশ্ট্রেতে ফেলে দিল।

‘আপনার কি আলাপ করার ইচ্ছে?’ শ্যামলালবাবু জিজ্ঞেস করলেন। —‘ভাবী পিকিউসিয়ার লোক কিন্তু; ক্ষস করে কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাল না। অবিশ্ব আপনার বাড়ি পুঁথিতে ইন্টারেন্ট থাকে, তা হলে—’

‘ইন্টারেন্ট কেন থাকবে না; সেই সঙ্গে কিছুটা আনও তো থাকা চাই। একটু হোমওয়ার্ক না করে এসব স্নোকের সঙ্গে দেখা করার কোনও মানে হয় না।’

‘কোনও চিন্তা নেই,’ বললেন শ্যামলালবাবু, ‘বাটীশ কানুনগোর বাড়ি আমার এই হোটেল থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। র্যাভেনশ কলেজের প্রোফেসর ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন। জানেন না এমন বিষয় নেই। ওর সঙ্গে দেখা করুন, আপনার হোমওয়ার্ক হয়ে যাবে।’

ফেলুদা যে সত্ত্বাই পরদিন ভোরে উঠে টেলিফোনে আপয়েন্টমেন্ট করে তঙ্গুনি শোকেসর কানুনগোর সঙ্গে দেখা করতে চলে যাবে, সেটা আমি ভাবিনি । আমার ইচ্ছা ছিল আজ সমুদ্রে স্নান করব ; তা থাকলে একজন সঙ্গী ঝুটুত, কারণ লালমোহনবাবুকে বলতে উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'দেখো তপেশ, তোমাদের বয়সে বেঙ্গলুর সাঁতার কেটেছি । আমার বাটারফ্লাই ট্রোক দেখে সোকে ক্ল্যাপ পর্যন্ত দিলেছে । কিন্তু হেদো আর বে অফ বেঙ্গল এক জিনিস নয় ভাই । আর পুরীর টেউ বড় ট্রেচারস । বোফাই-এর সমুদ্র হলে দিখা করতুম না ।'

সত্ত্ব বলতে কী, আজকের দিনটা জ্বানের পক্ষে খুব সুবিধের নয় । সারা রাত টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েছে, এখনও ঘেঁষলা আর গুমোটি হয়ে রয়েছে । তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল জ্বানটা না হয় ফেলুদার সঙ্গেই করা যাবে, আজ শুধু একটু বিচে হেঁটে আসব । সাতটার মধ্যেই চা-ডিম-রুটি খেয়ে আমরা দুজন বেঁধিয়ে পড়লাম । লালমোহনবাবুর কাল রাত থেকেই বেশ খুশি-খুশি ভাব ; মনে হয় লক্ষণ গণ্ডকারই তার জন্য দায়ী ।

বিচে এসে দেখি খাঁ খাঁ । এই দিনে এত সকালে কে আর আসবে ? দূরে জলে দু-তিনটে নুলিয়াদের নৌকো দেখা যাচ্ছে । তবে কালকের সেই নুলিয়া বাচ্চাগুলো নেই । তার বদলে কয়েকটা কাক রয়েছে, টেউ-এর জল সরে সেসেই তিড়িং তিড়িং করে এগিয়ে গিয়ে ফেনায় ঠোকর দিয়ে কী ঘোন যাচ্ছে, আবার টেউ এলেই তিড়িং তিড়িং করে গিছিয়ে আসছে ।

দুজনে ভিজে বালির উপর দিয়ে হাটছি, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'সি-বিচে শুয়ে রোদ পোয়ানোর বাতিক আছে সাহেব-মেমদের এটা শুনিচি, কিন্তু মেৰ-পোয়ানোর কথা তো শুনিনি !'

আমি জানি কথাটা কেন বললেন ভজলোক । একজন শোক চিত হয়ে শুরে আছে বালির উপর, হাত পঞ্চাশেক দূরে । বাঁয়ে যেখানে বিচ শেষ হয়ে পাড় উঠে গেছে, সেই দিকটায় । আরেকটু বাঁয়ে শুলেই শোকটা একটা ঝোপড়ার আড়ালে পড়ে বেত ।

'কেমন ইয়ে মনে হচ্ছে না ?'

আমি জবাব না দিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম । খটিকা লেগেছে আমারও ।

দশ হাত দূর থেকেও মনে হয় শোকটা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু আরেকটু এগোতেই বুরুলাম তার চোখ দুটো খোলা আর মাথার কোকড়ানো ঘন চুলের পাশে বালির



উপর চাপ-বাঁধা রক্ত ।

পুরু গোক, ঘন ভুক, রং বেশ ফরসা, গায়ে ছাইরঙের সুতির কেটি, সাদা পান্তি
আৰ মীল স্টুইপ্পড শাটি । জুতো আছে, মোজা নেই । ডান হাতের কড়ে আঙুলে
একটা মীল পাথর-বসানো আংটি, হাতের মৰ কাটি ইয়নি অস্তুত এক রাস ।
কোটের দুক পকেট কুলে উঁচু হার আছে ; মনে হয় কাগজপত্র আছে । ভীষণ
ইছে হচ্ছিল কাগজগুলো বার করে দেখাতে, কারণ পুলিশ তাই করবে, আৰ তা
হলে ইয়তো শোকটা কে তা জানা বাবে ।

‘ডেট টাচ,’ বললেন লালমোহনবাবু, যদিও সেটা কলার কোনও প্রোজেক্ট ছিল
না । ফেলুদার সঙ্গে থেকে এসব আমাৰ জানা আছে ।

‘আমৰাই তো ফার্স্ট ?’ বললেন লালমোহনবাবু । ভদ্রলোক পকেটে শুন্দ
চুকিয়ে রেখেছেন, যেন কিছুই ইয়নি এমন ভাৰ, কিংক গুৱার পৰে বোৰা বায় ওৰ
তলু শুকিয়ে গেছে ।

আমি বললাম, ‘তাই তো মনে হচ্ছে ।’

ভদ্রলোক আবাৰ বিজ্ঞিপ্তি কৰে বললেন, ‘ষাক, তা হলে আমৰাই ডিসকাউন্ট
কৰলুম ।’

আমি খ ভাৰটা কাটিয়ে নিতে বললাম, ‘চলুন, রিপোর্ট কৰতে হবে ।’

‘ইয়েস ইয়েস—রিপোর্ট ।’

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেলে কিমে এশায় । ইতিমধ্যে ফেলুদা
হাজিৰ । —‘পাপোশে বখন পা না মুছেই চুকলেন, এবং ঘৰের মেৰেতে ছটাক
খানেক বালি ছড়ালেন, তখন বেশ বুঝতে পাৰছি আপনি সবিশেষ উত্তেজিত,’ কফি
হাতে খাটে বসে ফেলুদা লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ কৰে বলল ।

লালমোহনবাবু ঘটনায় রং চড়াতে গিয়ে দেৱি কৰে ফেলবেন বলে আমি
দু-কথায় ব্যাপোৰটা বলে মিলাম । এক মিনিটের মধ্যে ফেলুদা নিতেই কোন কৰে
খানার খবৰটা দিয়ে দিল । ওই ভাৰে সংক্ষেপে ওছিয়ে আমি কলতে পাৰতাম না,
লালমোহনবাবু তো নয়ই ।

খুন সম্পর্কে ফেলুদা শুধু একটাই প্ৰশ্ন কৰল—

‘লোকটাৰ পাশে কোনও অজ্ঞ পড়ে থাকতে দেখেছিলি, পিন্টু-চিন্তু ?’

‘না, ফেলুদা ।’

‘তবে বাঙালি নয়, এ বিষয়ে আমি ডেফিনিট,’ বললেন লালমোহনবাবু ।

‘কেন কলহেন ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস কৰল ।

‘জোড়া ভুক, ভৰংকৰ কন্ট্ৰিভেন্সেৰ সঙ্গে বললেন জটিল—বাঙালিৰে হয়
না । আৰ ওৱেকৰ চোয়াগু হয় না । বাজৰীৰ কুটি আৰ গোপ্ত খাওয়া চোৱাল ।
যন্দুৰ মনে হয় বুদ্দেশ্যমন্দেৰ লোক ।’

ফেলুদা হে ইতিমধ্যে ডি. জি. সেনেৰ সঙ্গে আপোনেটমেন্ট কৰে ফেলেছে সে
কথা একক্ষণ বলেনি । সাড়ে অটটাৰ টাইম দিয়েছেন তাৰ সেকেটাৰি, আৰ
বলেছেন পনেৱো মিনিটের বেশি ধাকা চলবে না । আমৰা পনেৱো মিনিট হাতে
নিয়ে বেৱিয়ে পড়লাম ।

এবাবে বিচে পৌছে নূর খেকেই বুজ্জলাম বে লাশের পাশে কেল ভিড়। খবর একক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে, পুরীর সমুদ্রতটে এভাবে এর আগে খুন হয়েছে কি না সন্দেহ।

আমি ভালভাব বে এখানকার ধানের কিছু অফিসারের সঙ্গে বাইরকেরায় কেসটোর সময় ফেলুন্নার আলাপ হয়েছিল। যিনি ফেলুন্নাকে দেখে হেসে হাতি বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন তিনি কুনগাম সাব-ইনস্পেক্টর মুকুজ্জম মহাপাত্র।

‘এবাব কী, ছুটি ভোগ?’ মহাপাত্র জিজ্ঞেস করলেন।

‘সেই রকমই তো বাসনা,’ বলল ফেলুন্না। ‘কে খুন হল?’

‘স্থানীয় লোক নয় বলেই তো মনে হচ্ছে। ন্যাম দেখছি কুপচার্স সিং।’

‘কীসে পেলেন?’

‘ড্রাইভিং লাইসেন্স।’

‘কোথাকার?’

‘নেপাল।’

পুরু চশমা পরা একজন বাঙালি ভদ্রলোক পুলিশের যেষটোপ্রাকারকে টেলে সরিবে এগিয়ে এসে বললেন, ‘আমি লোকটাকে দেখেছি। কাজ বিকেন্দে স্বর্গদ্বার রোডে একটা চাহের মেলকারের বাইরে বসে ছে আছিল। আমি পান কিনছিলাম পাশের দোকান থেকে; লোকটা আমার কাছ থেকে মেলালাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট করার।’

‘মরল কীভাবে?’ ফেলুন্না মঞ্জুপ্রজ্ঞকে জিজ্ঞেস করল।

‘মিভপ্রজ্ঞার বলেই তো মনে হচ্ছে। ক'বে ওরেপন পাওয়া যায়নি। এইটো দেখতে পারেন, লাইসেন্সের ভিত্তি গেঁজা ছিল।’

ভদ্রলোক একটা মাঝারি সাইজের ভিজিটিং কার্ড ফেলুন্নার দিকে এগিয়ে দিলেন। একদিকে কাঠমান্ডুর একটা সরকারি শেক্ষণের নাম-ঠিকানা, অন্যদিকে বেশ কাঁচা হাতে ইংরিজিতে লেখা—‘এ. কে. সরকার, ১৪ মেহের আলি রোড, ক্যালকাটা।’ বানান ভুলওলোর কথা আর বললাম না।

ফেলুন্না কাঁচটা ক্রেতে দিয়ে বলল, ‘ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টু যদি বেরোয় তো জানাবেন। আমরা নীলাচল হোটেলে আছি।’

আমরা জাশ পিছলে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

কাল বে বাড়িটাকে দেখে আমরা ভারিক ন্য করে পারিনি, আজ মেঘলা দিনে সেটা যেন মেদা মেরে গেছে, ক্ষেত্রে যাবার জন্য আর হাতছানি দিয়ে ভাকেছে না।

গেটের বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে, বহুস পঁচিশের বেশি না, দেখলে মনে হয় চাকুর, সে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, ‘মিত্রবাবু?’

ফেলুন্না এগিয়ে গেলে। —‘আমিই মিত্রবাবু?’

‘আসুন ভিতরে।’

বাগানটাকে দৃঢ়গে চিরে একটা নুড়ি-ফেলা পথ বারান্দার দিকে চলে গেছে। মেঘলাম সেটা আমাদের পথ নয়। ভিনতলাক যেতে হলে বাড়ির বী পাশ দিয়ে

গলির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, কারণ তিনি তলার দরজা আর সিডি কাড়ির পিছন দিকে। গলির মাঝামাঝি এসে লালমোহনবাবু হঠাৎ 'হিক' শব্দ করে তিনি ছাত পিছিয়ে গিয়েছিলেন, তার কারণ মাটিতে পড়ে থাকা একটা সরু লম্বা সাদা কাগজের ফালি। লালমোহনবাবু সেটাকে সাপ মনে করেছিলেন।

সিডির সামনে গিয়ে চাকর আমাদের ছেড়ে দিল, কারণ ওপর থেকে একটি ভদ্রলোক নেমে এসেছেন।

'মিস্টার মিত্র ? আসুন আমার সঙ্গে।'

ফেলুদাকে চিনেছেন নাকি ? মুখের হাসি তো ভাই বলছে। ভদ্রলোকের চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা, গায়ের চামড়া বলছে বয়স পৰ্যাপ্তির বেশি নয়, কিন্তু মাথার চুল এর মধ্যেই বেশ পাতলা হয়ে গেছে।

'আপনার পরিচয়টা ?' সিডি উঠতে উঠতে জিজ্ঞাস করল ফেলুদা।

'আমার নাম নিশ্চিয় বোস। আমি দুর্গাবাবুর সেক্রেটারি।'

'দুর্গাবাবু ? তুম নাম তা হলে—'

'দুর্গাবাবি সেন। এখানে স্বাই ডি. জি. সেনই বলে।'

সিডি দিয়ে উঠে ভাইনে একটা ঘর, বোধহ্য সেটাতেই সেক্রেটারি থাকেন, কারণ একটা তরুণপোশের পাশে একটা ছোট্ট টেবিলের উপর একটা টাইপোয়ার্টার চোখে পড়ল। বাঁয়ে একটা প্যাসেজের দুটো ঘর, শেষ মাথায় ছাত। সেই ছাতেই যেতে হল আমাদের।

মাঝারি ছাত, একপাশে একটা কাচের ঘরের মধ্যে কিছু অর্কিড। ছাতের মাঝখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন একটি বছর ধাটেকের ভদ্রলোক। লালমোহনবাবু পরে যে বলেছিলেন 'ব্যক্তিত্ব উইথ এ ক্যাপিটাল বি', সেটা বুব ভুল বলেননি। টকটকে রং, ভাসা ভাসা চোখ, কাঁচা-পাকা মেলানো ফ্রেঞ্জকাট সাড়ি আর মুণ্ডুভাঁজা চওড়া কাঁধ। চেয়ারে বসেই নমস্কার করছেন দেখে প্রথমে একটু কেমন-কেমন লাগছিল, তারপর কারণটা বুঝলাম। নীল প্যান্টের তলা দিয়ে ভদ্রলোকের বৰ্ণ পায়ের ঘেটুকু দেখে যাচ্ছে, সবটুকুই ব্যাসেজে ঢাকা।

আমাদের জন্য আরও তিনটে চেয়ার বার করে রাখা হয়েছে; আমরা বসলে পর ফেলুদা বলল, 'আপনি যে আমাদের সময় দিয়েছেন তার জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। আপনি পুরনো পুঁথি সংগ্রহ করেন তানে আসার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

'ওটা আমার অনেকদিনের শব্দ।'—আমাদের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কথাটা বললেন ভদ্রলোক। চেহারার সঙ্গে মাননিপন্থি গলার স্বর।

ফেলুদা বলল, 'আমার এক জ্যাঠোমশাই আছেন, নাম সিঙ্গেৰ বোস, তাঁর তিনটে পুঁথি আছে। আপনি বোধহ্য একবার সেগুলো দেখতে গিয়েছিলেন।'

'কী পুঁথি ?'

'তিনটেই বাংলা। দুটো অম্বায়সল, আর একটা গোরক্ষবিজয়।'

'তা গিয়ে থাকতে পারি। পুঁথির পেছনে ঘুরেছি অনেক।'

‘আপনার কি সব বাংলা পুঁথি ?’

‘অন্য ভাষাও আছে । যেটা বেস্ট সেটা সংস্কৃত ।’

‘কবেকার পুঁথি ?’

‘ট্রেলফ্রন্স সেখুলি ।’

আমি মনে মনে বলপাই, জিনিসটা যদি আমাদের দেখার ইচ্ছেও থাকে, বলে কোনও সাভ হবে না । ভদ্রলোকের মর্জিহলে দেখাবেন, না তো নয় ।

‘লোকনাথ !’

বুকলাই চাকরের নাম লোকনাথ । কিন্তু তাকে ইঠাই ডাকা কেন ?

চাকরের বদলে শুভুর্তের ঘরে চলে এলেন নিশ্চীথবাবু । পর্ন বাইরেই দাঢ়িয়েছিলেন কি ?

‘লোকনাথ নেই, শ্যাম । বেরিয়েছে । কিন্তু কলকাতা কি ?’

মিঃ সেন ডান হাতটা বাঢ়িয়ে দিলেন । নিশ্চীথবাবু সেটা ধরে ভদ্রলোককে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলেন ।

‘আসুন ।’

ভদ্রলোকের পিছন পিছন আমরা ছাত থেকে প্যাসেজ ও প্যাসেজ থেকে শোবার ঘরে গিয়ে দুকলাই ।

বেশ বড় ঘর, বায়ে একটা প্রকাণ্ড পাটি, যাকে ইংরিজিতে বলে ফের-পোস্টার । খাটের পাশে একটা কাশীরি টেবিলে একটা ল্যাম্প, দুটো ওষুধের শিশি আর একটা কাচের গেলাস । ডাইনে একটা মাফারি সাইজের বোলটপ ডেস্ট, একটা চেয়ার, আর দেয়ালে লাগানো পাশাপাশি দুটো গোদকেজের আলমারি ।

‘থোলো ।’

হকুমটা হল সেক্রেটারিকে । নিশ্চীথবাবু খাটের উপর রাখা বালিশের তলা হাতড়িয়ে একটা চাবির গোল্প বাব করে ডেস্টের ঠিক পাশের আলমারিটা খুললেন ।

ভিতরে চারটে শেল্ফ । তার প্রত্যেকটাতে পাশাপাশি থারে থারে সাজানো শালুতে মোড়া সম্বা প্যাকেট । সব মিলিয়ে আন্দাজ চাইশ-পৈয়তাপ্লিষটা ।

‘এতেও আছে কিন্তু, অন্য আলমারিটা দেখিয়ে বললেন দুর্গাগতি সেন । —‘তবে আসলটা—’

আসলটি বেরোল শেল্ফ থেকে নয়, মীচের দিকের একটা দেরাজ থেকে । সক্ষ করলাম তার নীচে আবেকটা পুঁথি রাখেছে ।

নিশ্চীথবাবু হকুম পেয়ে শালুর উপর ফিতের বাঁধনটা খুলে ফেললেন । ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুদিকে কাঠের পাটার মধ্যখানে স্যান্ডউইচ করা দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুঁথি ।

‘অষ্টাদশপাহিজিকা প্রজ্ঞাপ্তারমিতা’, বললেন দুর্গাগতি সেন,—‘অন্নটা কলস্কৃত ।’

কাঠের পাটার উপরে আকর্ষ সুন্দর রঙিন ছবি, এতদিনের পুরনো হওয়া সত্ত্বেও অঙ্গের জৌলুস করেনি । পুঁথিটা কাগজের নয়, তাসপাতার । হাতের লেখা যে এত পরিপাট আর এত সুন্দর হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না ।



লালমোহনরাম চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, 'ধনি ছেলের অধ্যাবসায়।'

ফেলুদা বলল, 'এটা কোথায় পেলেন জানতে পারি কি ?'

'ধরমশালা', বললেন ভদ্রলোক।

'তার মানে কি এ জিনিস তিক্কত থেকে দাসাই লাভার সঙ্গে এসেছিল ?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক পুঁথিটা ফেলুদার হাত থেকে নিয়ে নিশীথবাবুকে দিয়ে দিলেন। সেটা আবার কিন্তে বৌধা অবস্থায় যেখানে ছিল সেখানে চলে গেল।

'আপনি কি আপনার জ্যাঠার হয়ে সুপারিশ করতে এসেছেন ?'

প্রথম শুনে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ফেলুদা কিন্তু নানান বেয়াড়া প্রশ্নের সামনে পড়েও নিজেকে দিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে পারে। বলল, 'আজ্জে না।'

'আমি এসব জিনিস নিয়ে ব্যবসা করি না,' বললেন মিঃ সেন, 'কেউ যদি দেখতে চায় তো দেখাতে পারি—এই পর্যন্ত।'

'আমার জ্যাঠার সামর্থ্য নেই এ জিনিস কেনার,' হেসে বলল ফেলুদা। 'অবিশ্য আমার কোনও ধারণা নেই এর কত দাম হতে পারে।'

'অমুলা।'

'কিন্তু এসবতো তো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে ?'

‘চামার ! যারা বিজি করে তারা চামার !’

‘আপনার ছেলের এ সবে ইন্টারেন্স নেই ?’

দুর্গাপতিবাবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন প্রথটা শনে। খাটের পাশের টেবিলটির দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, ‘ছেলেকে আমি চিনি না।’

‘স্যার, ইনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা, স্যার !’

নিশীথবাবু হঠাৎ এই সময় এই কথাটা কেন বললেন বুরলাম না। দুর্গাপতিবাবু একবার ফেলুদার মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘তাতে তারের কী ? আমি কি খুন করেছি ?’

শ্যামলালবাবু তিকই বলেছিলেন। ড্রলোকের হাবড়াব কথাবার্তা সত্ত্বাই পিকিউলিয়ার। অবিশ্য এর পরের কথাটা আরও তাঙ্গব, প্রায় একেবারে হৈয়ালির মতো। —

‘যা হারিয়েছে, তা কিরিয়ে আনা গোয়েন্দা কষ্টো নয়। যে পারে সেই করছে চেষ্টা, বন্ধ দরজা খুলাছে একে একে। গোয়েন্দা কিছু করার নেই।’

পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, তাই ফেলুদা দরজার দিকে ফিরল। নিশীথবাবু যেন একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘আসুন।’ আমরা পুঁথির মালিককে ধন্যবাদ জানিয়ে নীচে রান্না দিলাম।

‘ড্রলোকের পায়ে কী ব্যাপার ?’ ফেলুদা নীচে নামতে নামতে প্রশ্ন করল।

‘ওঁকে গাউটে ধরেছে। গেটে বাত,’ বললেন নিশীথবাবু, ‘খুব শক্ত-সমর্থ লোক ছিসেন আগে। এই মাস ডিনেক হস কাহিল হয়ে পড়েছেন।’

‘যে এমুখগুলো দেখলাম সে কি গাউটের ?’

‘আজ্জে হাঁ। কেবল একটা ঘুমের ওষুধ। লক্ষ্মণবাবুর দেওয়া।’

‘গণ্ডকার লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য ?’ প্রশ্ন করসেন জাপামোহনবাবু।

‘আজ্জে হাঁ। উনি আলোপ্যাথি আযুর্বেদ দুটোই বেশ ভাল জানেন। বেশ কোয়ালিফায়েড লোক। অনেক কিছু জানেন।’

‘বটে ?’

‘কর্তৃর সঙ্গে মাঝে মাঝে পুঁথি নিয়েও কথাবার্তা বলতে শনিটি।’

‘আশ্চর্য লোক !’ বললেন জটায়ু।

ফেলুদার ভুরুটা যে কেন কুচকে রয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম না।

লালমোহনবাবুর ইচ্ছে ছিস লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফেলুদার আলাপ করিয়ে দেবেন, কিন্তু সেটা আর হল না, কারণ গণৎকারের দরজায় তালা। আমরা সাগরিকা থেকে বেরিয়ে হোটেলমুখো হলাম। সমুদ্রের ধারে ভিড় হয়ে গেছে এই পনেরো হিন্দিটের মধ্যেই, কারণ যেখ পাতলা হয়ে গিয়ে সূর্যটা উকি মারব মারব করছে। তাইমে রেলওয়ে হোটেলটা দেখা যাচ্ছে, ফেলুদা বলল এই ভিড়ের বেশির ভাগ লোকই নাকি ওই হোটেলের। আমরা ভিড় ছাড়িয়ে কয়েক পা যেতেই পিছন থেকে অচেনা গলায় ডাক এল।

‘মিস্টার মিস্টির !’

অন্যদের থেকে একটু আলগা হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে একজন জবা ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে হাসছেন। বোধা যাচ্ছে ইনি বেশ কয়েকদিন সমুদ্রতটে ঘোরাফেরা করেছেন, কারণ সানগ্লাসটা খুলতেই চোখ থেকে কান আবধি একটা ফিকে লাইন দেখা গোল যেখানে চশমার ডাঁটিটা চামড়ায় রোদ লাগতে দেয়নি।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। প্রায় ফেলুদার মতোই লম্বা, সুপুরুষ বলা চলে, কালো চাপ দাঢ়ি আর গোঁফটা বেশ হিসেব করে ছাটা, কালো ট্রাউজারের ওপর চিঞ্চলুথের শাটুটা হাওয়ায় সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে।

‘আপনার নাম কৰ্মেছি’ বললেন ভদ্রলোক। ‘এসেই ব্যক্তি হয়ে পড়েছেন নাকি ?’

‘কেন বলুন তো ?’

‘একটা খুন হয়েছে কুনলাম যে। তাই ভাবলাম আপনি আবার জড়িয়ে পড়লেন কি না।’

ফেলুদা হেসে বলল, ‘খুন হলেই জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় ঠিকই, কিন্তু কেউ না ডাকলে আর কী করে যাই বলুন।’

‘আপনি তো নীলাচলে উঠেছেন ?’

‘আজ্জে হ্যাঁ।’

‘হোটেলে ফিরছেন ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ইয়ে—’

ভদ্রলোক কী যেন বলতে গিয়ে ইতন্তত করছেন। ফেলুদা বলল, ‘আপনাকে শুধি আংটি সামলাতে হচ্ছে ?’

এটা আমি আগেই লক্ষ করছি। ভদ্রলোক ভান হাতের তেলোয় তিনটে সোনার আংটি নিয়ে রয়েছেন, ফলে বেশ বোকা বোকা দেখাচ্ছে:

‘আর বলবেন না,’ বললেন ভদ্রলোক, ‘আমাদের হোটেলের এক বাসিন্দা, কালই আলাপ হয়েছে, কালে নামবেন, তা বললেন এন্টেলো নাকি আঙুল থেকে খুলে আসে। কলুন তো কী বলি।’

আংটির মালিক থেকে সে আর ধলতে হবে না। ওই যে, নুলিয়ার হাত ধরে ইপ ইপ করে এগিয়ে আসছেন তিনি। সোনার মোড়া মিঃ হিসেবানি। কেলুদকে দেখে ভদ্রলোক ‘গুড় মরিং’ বলুন একটা ঝাঁক দিলেন, তারপর আরও এগিয়ে এসে ‘ঘ্যাস্ক ইউ’ বলে আংটিগুলো ফেরত নিয়ে আঙুলে পরে জানিয়ে দিলেন যে গোয়া, ওয়াইলিকি, মায়ামি, আকাপুলকো, নিস ইন্ডিয়ানি অনেক জায়গার সম্প্রস্তরের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর, কিন্তু পুরীর মাঙ্গা বিচ নাকি কোথাও নেই।

নতুন ভদ্রলোকটি এবার হিসেবানির কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের সঙ্গ নিলেন। কেলুদা বলল, ‘আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হুলি।’

ভদ্রলোক ব্যবহৃত হলে কলেন, ‘আমার নাম কল্যাণ হয়তো চিনবেন না, একটা বিশেষ লাইনে আমার কিছুটা কল্ট্রিভিউশন আছে, তবে সেটা সকলের জ্ঞানের কথা নয়। আমার নাম বিলাস মজুমদার।’

কেলুদা তুরু কুচকে ভদ্রলোকের দিকে চাইল :—‘আপনার কি পাহাড়-টাহাড়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে?’

ভদ্রলোক অবাক।—‘বাবা, আপনার জ্ঞানের পরিধি দেখছি—’

‘না, না,’ কেলুদা বিলাসবাবুর কথা শেষ করতে সিল না—‘তেমন কিছু নয়। গত মাসখানেকের মধ্যে কোথায় যেন বিলাস মজুমদার নামটা দেখেছি—বোধহয় কোনও পত্রিকায় বা খবরের কাগজে। মনে হচ্ছে তাকে মাউন্টেনিয়ারিং বা কোই জাতীয় কিছুর উদ্দেশ ছিল।’

‘ঠিকই দেখেছেন। আমি মাউন্টেনিয়ারিং শিখেছিলাম দার্জিলিং-এর ইনসিটিউটে। আমার আসল কাজ হচ্ছে ওয়াইল্ড-লাইফ কেন্টোগ্রাফি। একটা জাপানি দলের সঙ্গে স্রো-লেপার্ডের ছবি তুলতে যাবার কথা ছিল। জানেন বোধহয়—হিমালয়ের হাই অলটিচিউডে স্রো-লেপার্ডের আস্তানা। দেখেছে অনেকেই, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ছবি তোলা সম্ভব হয়নি জানোয়ারটার।’

পথে আর কোমও কথা হল না। লালমোহনবাবু বার বার সপ্রশংসে দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে দেখছেন সেটা লক্ষ করেছি।

হোটেলে ক্রিয়ে এসেই কেলুদা চারের অর্ডার দিল। ভদ্রলোক চেয়ারে বসে প্রথমেই পকেট থেকে একটা ঝুঁটি বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

‘দেখুন তো একে চেনেন কি না।’

পোস্টকার্ড সাইজের ছবি। মাটিতে উবু হয়ে বসা চ্যাপ্টা টুপি পরা একটা লোক একটা অঙুত্ত জানোয়ারকে জাপটে ধরে আছে, আর আট-দশজন লোক সেই জানোয়ারটাকে দেখছে। মিঃ মজুমদার যে লোকটির সিকে আঙুল দেখাচ্ছেন তাকে আমরা চিনি।



‘এর কাছ থেকেই তো আসছি আমরা,’ বলল ফেলুন, ‘আমিও চিনতে একটু সবর লাগে, ক্ষমতা উত্তোলক মাড়ি রেখেছেন।’

যিঃ মঙ্গলদার ছবিটা ফেরত নিরে বললেন, ‘এইটেই আমরা দরকার ছিল। মাড়ির গেটে ‘ডি. জি. সেন’ নাম দেখলাম, কিন্তু তিনি এই জাহির ডি. জি. সেন কি না সে বিষয়ে শিশুর হতে পারছিলাম না।’

‘জানোহারতি প্যাসেলিন বলে মনে হচ্ছে ?’ বলল ফেলুন।

ঠিক তো !—ওই প্যাসেলিন নামটা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। একবুকম পিপলিকাত্তুক। দেখে মনে হয় গায়ে বর্ম পরে রয়েছে।

বিলাসবাবু বললেন, ‘প্যাসেলিনই খটে। নেপালে পাওয়া যায়। কাঠমান্ডুর এক হোটেলের বাইরে তোলা। ডি. জি. সেন ছিলেন তখন ওই হোটেলে। আমিও ছিলাম।’

‘এটা কবেকার স্টোনা ?’

‘গত অক্টোবরে। আমি গেছি সেই জাপানি টিম আসবে বলে। জাপানির কাগজেও আমার তোলা ছবি-টিরি খোরিয়েছে। জাপানি স্লটা আমার সঙে যোগাযোগ করে। বড়াবড়ই আমি খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ি। কিন্তু শেষ অবধি আর যাওয়া হয়নি।’

‘কেন, কেন ?’ ব্যক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন জটানু। বুকলাই লেপার্ড-টেপার্ড কনে উত্তোলক একটা রোমান্সের গান্ধি পেয়েছেন।

‘কলাম !’ বললেন মিঃ অজুমদার। ‘একটা আঞ্চিতেন্টে জন্ম হয়ে হাসপাতালে
পড়ে ছিলাম তিনি মাস।’

‘আপনার বী পা কি সাধারণ পা ?’ হাতাং প্রশ্ন করল ফেলুদা।

‘কেন বলুন তো ? বী পায়ের শিল্ বোন্টা ভেঙেছিল বটে ; কিন্তু আমার হাতা
দেখলে কি বোবা যায় ?’

‘তা যায় না,’ বলল ফেলুদা, ‘কাল একটা পায়ের হাপ দেখেছিলাম
বালিতে—জুঙ্গি-পরা পা, সঙ্গে-সঙ্গে বী পাশে জাঠির ছাপ। তাবলাম, হয় ন্যাটা,
না হয় বী পায়ে জন্ম। তা আপনি জাঠি ব্যবহার করেন না মেখছি।’

‘হায়ে মাঝে করি,’ বললেন বিলাস অজুমদার, ‘কারণ বালিতে হাটিতে কষ্ট হয়।
কিন্তু উনচলিষ্ঠ বছর বয়সে হাতে জাঠি ধরতে ইচ্ছে করে না।’

‘তা হলে আমি কেউ হবো।’

‘আবিশ্য শিল্ বোন ভাঙ্গাই একমাত্র ইনজুরি নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে পাঁচশো
ফুট গড়িয়ে পড়লিলাম। একটা গাছের উপর পড়ি তাই জন্মটা তবু কর হয়।
এক চাহার ছেলে কয়েকজনে হিপিকে খবর দেয়, তারাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে
যায়। শিল্ বোন ছাড়া সাতটা পাঁজরার হাড় আর কলার বোন ভেঙেছিল। দুটি
খেতে পিয়েছিল ; দাঢ়ি খেয়েছিল কৃতিত্ব ঢাকবার জন্য। দুলিন পরে জ্বান হত।
স্মৃতিশক্তি তহনহ হয়ে পিয়েছিল। জ্বরের থেকে নাম ঠিকানা বার করে কলকাতার
বাড়িতে খবর দেয়। এক ভাইপো জলে আসে। তাকে চিনতে পারিনি।
হাসপাতালে থাকতেই কিছুটা স্মৃতি ফিরে আসে। চিকিৎসার ফলে আরও ধানিকটা
ইঞ্চুত করেছে, কিন্তু আঞ্চিতেন্টের টিক অঞ্চলের ঘটনা এখনও টিক ঘনে
পড়েনি। থেমন, ডি. জি. সেন বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে অলাপ হয়েছিল, সেটা
আমার ভাসরিতে পাওছি কিন্তু তার চেহারাটা মনে পড়েছে আপ্ত দুদিন আগে।’

‘ডি. জি. সেন কেন গিয়েছিল কাঠমান্ডু, সেটা মনে পড়ছে ?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস
করল—‘পুঁথি সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার কি ?’

‘পুঁথি ?’ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। —‘যা দিয়ে মালা
গাঁথে ?’

‘না,’ ফেলুদা হেসে বলল। —‘পুঁথি বা পুঁথি। পুঁথিকা। হাতে লেখা প্রাচীন
বই। ভদ্রলোকের খুব ভাল কালেকশন আছে পুঁথির।’

‘ও, তাই বলুন !’

ভদ্রলোক চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘কী রকম মেখতে
হয় বলুন তো এই পুঁথি ?’

‘সর, লম্বা, চাপ্টা,’ বলল ফেলুদা। —‘ধরল স্টেট এক্সপ্রেসের একটা কার্টনের
সাইজ। তার চেয়ে একটু ছোট বা বড়ও হতে পারে। সাধারণত শালুতে ঘোড়া
পাকে।’

ভদ্রলোক আবার কিছুক্ষণ চুপ। একদুটে চেয়ে আছেন টেবিল ল্যাম্পটার ডিকে,
আর আবার চেয়ে আছি ভদ্রলোকের দিকে।

বেশ মিনিটখনেক পরে বিলাস অজুমদার বললেন, ‘তা হলে বলি শনুন।

..

কাঠমাণুতে যে হোটেলে ছিলাম, বিক্রম হোটেল, সেখানে ভারী এক অঙ্কুর ব্যাপরে ছিল, দুএকটা ঘর ছিল যার চাবি অন্য ঘরের লেগে যেত—যেটা হোটেলে কখনওই হ্যার কৰা না। একনিমি আমি আমার ঘরের চাবি নিয়ে ভুল করে আবার পাশের ঘরের দরজায় দাপিরে ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। সেটা ছিল ডি. ডি. সেন-এর ঘর। প্রথমে ঠিক ধরতে পারিনি। ভাবছি আমার ঘরে এরা কারা, দুকল কী করে। অসল ব্যাপারটা বুঝতেই স্বারি বলে বেরিয়ে আসি, কিন্তু ততক্ষণে একটা ঘটনা আমি দেখে ফেলেছি। খাটে বাসে আছেন মি: সেন, আর চেয়ারে দুটি অচেনা লোক, তাদের একজন একটা কার্ডবোর্ডের বাল্ল থেকে একটি প্যাকেট বার করছে। ঘতনুর মনে পড়ে প্যাকেটটা ছিল লাল, তবে সেটা কাগজ কি কাপড় তা মনে নেই।'

'তারপর ?' ফেলুন্দা প্রশ্ন করল।

'তারপর ব্রাহ্ম। অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। এর পরের হেমরি হচ্ছে হাসপাতালে জ্বান হওয়া।'

লালমোহনবাবু হঠাৎ জীবন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—'আরে অশাই, এমন ভাল গম্ভীর রঘেছেন এই পুরীতে, আপনি তাঁর কাছে যান না একবারটি। যা ভুলে গেছেন, সব ডিটেলে বলে দেবেন।'

'কার কথা বলছেন ?'

'লক্ষণ ভট্টাচার্য দি গ্রেট। এই ডি. ডি. সেনেরই বাড়ির এক তলার ভাড়াটে। যদি দ্বিদ্বা হচ্ছে তো বলুন, আমি আপনের প্রত্যেক করে আমিই আপনাকে নিয়ে যাব। আপনি একটিরার ট্রায়াল দিয়ে দেখুন।'

'বলছেন ?'

ভদ্রলোকের যেন আইডিয়টি ভালই লেগেছে।

'একশোবার !' বললেন লালমোহনবাবু—'আপনার কপালে ওই আঁচিপটির উপর আঙুল রেখে সব গড়গড় করে বলে দেবেন।'

এটা এতক্ষণ বলা হয়নি—বিলাসবাবুর কপালের ঠিক মাঝখালে একটা আঁচিল, হঠাৎ দেখলে মনে হবে ভদ্রলোক বুঝি টিপ পরেছেন।

'ভদ্রলোক কি ডিজিটির আলাউ করেন ?' ফেলুন্দা প্রশ্ন করল।

'হোয়াই নট ?' বললেন লালমোহনবাবু। 'আপনি আর তপেশ যাকেন তো ? সে আমি ওঁকে বলে রাখব, কোনও চিন্তা নেই।'

ঠিক হল, আজই সক্ষা ছটায় আপনেন্টহেন্ট করা হবে। ভদ্রলোকের খি পাঁচ টাকা পোচাতের শুনে বিলাসবাবু হেসেই ফেলেছিলেন কিন্তু ফেলুন্দা হিসেব করে দেখিয়ে দিল দশজন খন্দের হলোও ভদ্রলোকের আসিক আয় হয়ে যায় প্রায় দু হাজার টাকা।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে নিজের ভাগ্য গুণমা করাবার ইচ্ছে না থাকলেও, বিলাস মজুমদারের স্মৃতি উক্তার হয় কি না দেখার জন্য ফেলুন্দার যথেষ্ট কৌতুহল রয়েছে।

আজ ঠিকই করে রেখেছিলাম যে বিকেলে একটু মন্দিরের দিকটায় যাব। মন্দিরের চেয়েও রথটা দেখার ইচ্ছে বেশি। ফেলুদার কাছেই শুনলাম যে এই বিশাল রথ নাকি প্রতিবারই রথযাত্রার পর ভেঙে ফেলা হয় আর তার কাঠ দিয়ে খেলনা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করা হয়। পরের বছর আবার ঠিক একই রূকম নতুন রথ তৈরি হয়।

যাবার পথে ফেলুদাকে কেন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল। হয়তো এই দুদিনে নতুন আলাপীদের সঙ্গে হে সব কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলো ওর মাথায় ফুরছিল। একটা কথা ওকে না বলে পারলাম না—

‘আচ্ছা ফেলুদা, নেপালটা কীরকম বারবার এসে পড়ছে, তাই না ? যে লোকটা খুন হল সে নেপালের লোক, বিলাসবাবু কাঠমান্ডু গিয়েছিলেন, দুর্গাগতিবাবু ঠিক সেই সময় কাঠমান্ডুতে ছিলেন...’

‘তুই কি এতে কোনও তাৎপর্য দুঁজে পেলি ?’

‘না। তবে—’

‘সম্পাত মানে জানিস ?’

‘না তো।’

‘সম্পাত হল ইংরিজিতে যাকে বলে কোইনসিডেন্স। যতক্ষণ না আরও এভিডেন্স পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কাঠমান্ডুর ব্যাপারটা একটা কোইনসিডেন্স বলে ধরতে হবে—বুঝলি ?’

‘বুঝেছি।’

পুরীর বিখ্যাত রথ দেখে মন্দিরের সামনে বিশাল চওড়া রাস্তার একপাশে দোকানগুলোর ঘুরে ঘুরে পাথরের তৈরি খুদে খুদে মূর্তি, কোনারকের চাকা, এইসব দেখছি, এমন সময় সাব-ইনস্পেক্টর মৃত্যুজ্ঞয় মহাপাত্রের আবিভাবি। হঠাৎ চিনতে পারিনি, কারণ এই ফাঁকে কখন জানি চুল ছেঁটে এসেছেন। আমাদের এক দূর সম্পর্কের কাকা আছেন, যিনি হেয়ার কাটিং সেলুনে চেয়ারে বসলেই ঘুমিয়ে পড়েন; ফলে নাপিত বেহিসাবি কিছু করলেও টের পান না। ঘুম ভাঙার পর অবিশ্য প্রতিবারই কুরক্ষেত্র বেঁধে যায়। মহাপাত্রকে দেখে মনে হল এনারও সে বাতিক আছে।

ফেলুদা ভদ্রলোককে দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘তদন্ত এগোল ? মেহেরালি রোডের মিস্টার সরকার কী বলেন ?’

‘ইনফরমেশন এসেছে আজ আড়ইটেয়,’ বলেনেন মহাপাত্র। ‘চোস্দো নম্বৰ
মেহেরালি রোড হল একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। সবসূক্ষ আটটা ফ্ল্যাট, সরকার থাকেন তিন
নম্বরে। দিন সাতেক হল ওঁর ঘর শোভাবন্ধ। আয়ই নাকি বাইরে যান।’

‘এবার কোথায় গেছেন জানতে পারলেন?’

‘পুরী।’

‘বটে? কে বলল?’

‘চার নম্বরের বাসিন্দা। তাকে নাকি বলেছে চেঙে যাচ্ছে।’

‘চেহারা কেমন জানতে পারলেন?’

‘লম্বা, হাঁড়ির রং, দাঢ়ি-গোফ নেই, বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে তিলিশ। এ ধরনের
বর্ণনার অবিশ্বিত কোনও মূল্য নেই।’

‘পেশা?’

‘বলে ট্রাভেলিং সেলসম্যান। কী সেল করে তা কেউ জানে না। বছর
খনেক হল ওই ফ্ল্যাটে এসেছে।’

‘আর কৃপচার সিং?’

‘সে এখানে এসেছে গতকাল সকালে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা হোটেলে
ছিল। ভাড়া চুকেননি। কাল রাত্রে নাকি একটা ফোন বাস্তুতে চেমেছিল হোটেল
থেকে, ফোন খালাপ ছিল। শোব একটা ডাঙুরি দেখান থেকে কাজ সারে।
কম্পাউন্ডের পাশেই দাঢ়িয়েছিল, কিন্তু খন্দের ছিল বলে কী কৃপা হয়েছে তা
শোনেনি। এগারোটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরোল। আর ফেরেনি। ঘরে একটা
সৃটকেস পাওয়া গেছে, তাতে জাহা-কাপড় রয়েছে কিছু। দুটো টেরিলিনের শার্ট
দেখে মনে হয় সোকটা বেশ সৌন্দর্য ছিল।’

‘সেটা কিছুই আশ্চর্য না,’ বলল ফেলুনা, ‘আজকাল ভ্রাইভারের মাইনে আপিসের
কেরানির চেয়ে অনেক বেশি।’

কথাই ছিল রেসওয়ে হোটেল থেকে বিলাসবাবুকে আমরা তাম নেব; ছটা
বাজাতে পনেরো মিনিটে আমরা হোটেলে গিয়ে হাজির হলাম। ব্রিটিশ আমলের
হোটেল, এখন রং ফেরানো হলেও চেহারায় পুরনো শুগের ছাপটা রয়ে গেছে।
সামনে বাগান, সেখানে রঙিন ছাতার তলায় বেতের চেয়ারে বসে হোটেলের
বাসিন্দারা চা খাচ্ছে। তারই একটা থেকে উঠে পাশের চেয়ারে বসা দুজন
সাহেবকে ‘এক্সাক্টিউজ টি’ বলে বিলাসবাবু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

‘চলুন, কৃপালু কী আছে দেখা যাব।’

আজ লালমোহনবাবু আমাদের গাইড, তাই তাঁর হাবড়াব একেবারে পালটে
গেছে। দিবি গটগটিয়ে সাগরিকার গেট দিয়ে চুকে বাগানের মধ্যাখানের লুড়ি
ফেলা পঁত দিয়ে সটান গিয়ে বারান্দায় উঠে কাউকে না দেখে একটু খতরাত হেয়ে
তৎক্ষণাত আবার নিজেকে সামনে নিয়ে সাহেবি মেজাজে ‘কোই হ্যাম’ বলতেই
বাদিকে একটা দরজা খুলে গেল।

‘স্বাগতম।’

বুরুলাম ইনিই লক্ষণ ভট্টাচার্য। পরনে সিল্কের লুকি আর চিকণের কাজ করা

সাদা আদির পাঞ্জাবি। মাঝারি হাইটের চেহারার বিশেষত হল সরু গৌঁফটা, যেটা ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি নেমে এসেছে নীচের দিকে।

লালমোহনবাবু আলাপ করতে যাচ্ছিলেন, ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, 'ওটা ভিতরে গিয়ে হবে। আসুন।'

লক্ষণ ভট্টাচার্যের বৈঠকখানার বেশির ভাগটা দখল করে আছে একটা তত্ত্বপোশ ; বুলাম ওটার উপরে বসেই ভাগ্যগণনা হয়। এ ছাড়া আছে দুটো কাঠের চেয়ার, একটা মোড়া, একটা নিচু টেবিলের উপর ওডিশা হ্যান্ডক্রাফ্টসের একটা অ্যাশট্রে, আর পিছনে একটা দেয়ালের আলমারিতে দুটো কাঠের বাল্ক, কিছু বই, কিছু শিশি-বোতল-বয়াম ইত্যাদি ও মুখ রাখার পাত্র, আর একটা ওয়েস্ট এড অ্যালার্ম ঘড়ি।

'আপনি বসুন এইখেনটায়'—তত্ত্বপোশের একটা অংশ দেখিয়ে বিলাসবাবুকে বললেন গণেক্ষণ। —'আব আপনারা এইখনে।'

চেয়ার আর মোড়া দখল হয়ে গেল।

লালমোহনবাবু এইবাবে আমাদের সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিলেন। ফেলুদার বিষয় বললেন, 'ইনিই আমারি সেই বন্ধু,' আর বিলাস মজুমদারের নামটা বলে 'ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ওয়াই—বলেই জিজ কেটে চুপ করে গেলেন। আমি জানি উনি বলতে গিয়েছিলেন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার ; নিজের বুকিতেই যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন সেটা আশ্চর্য বলতে হবে।

ফেলুদা বোধহ্য কেলেক্টরিটা ঢাপা দেবার জন্যই বলল, 'আমরা দুজন অতিরিক্ত লোক এসে পড়েছি বসে আশা করি আপনি বিরুদ্ধ হননি।'

'মেটেই না,' বললেন লক্ষণ ভট্টাচার্য। —'আমার আপত্তি যেটাতে সেটা হচ্ছে স্টেজে উঠে ডিমনস্ট্রেশন দেওয়ায়। সে অনুরোধ অনেকেই করেছে। আমি যে যাদুকর মই সেটা অনেকেই বিষ্ণব করতে চায় না। এই ধেঘন—'

ভদ্রলোকের কথা থেমে গেল। তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে বিলাস মজুমদারের দিকে। —'কী আশ্চর্য !' বললেন লক্ষণ ভট্টাচার্য—'আপনার কপালে ঠিক থার্ড আই-এর জায়গায় দেখছি একটি উপমাংস !'

উপমাংস মানে যে আঁচিল সেটা জানতাম না।

'ঠিক ওইখালে খুলির আবরণের তলায় কী থাকে জানেন তো ?' ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলেন।

'পিনিয়াল ম্যান্ডের কথা বলছেন ?' ফেলুদা বলল।

'হ্যাঁ—পিনিয়াল ম্যান্ড। মানুষের মগজের সবচেয়ে রহস্যময় অংশ। অন্তত পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকরা তাই বলেন। আমরা যদিও জানি যে ওটা আসলে প্রমাণ করে যে আদিম যুগে প্রাণীদের তিনটি করে চোখ ছিল, দুটি নয়। শুই থার্ড আইটাই এখন হয়ে গেছে পিনিয়াল ম্যান্ড। নিউগিনিতে একরকম সরীসৃপ আছে, নাম টারাটুঝা, যার মধ্যে এবনও এই থার্ড আই দেখতে পাওয়া যায়।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার কপালে আঙুল রাখার উদ্দেশ্য কি এই পিনিয়াল ম্যান্ডের সঙ্গে যোগস্থাপন করা ?'

‘তা একদ্রুকম তাই বলতে পারেন,’ বললেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য। —‘অবিশ্য যখন প্রথম শুরু করি তখন পিনিয়াল প্ল্যান্ডের নামও শুনিনি। জগৎকু ইনসিটিউশনে ক্লাস দেতেনে পড়ি তখন। এক রবিবার আমার জ্যাঠাফাট্টায়ের মাথা ধৰল। বললেন, ‘লখনা, আমার মাথাটা একটু টিপে দিবি? আমি তোকে আইসক্রিমের পদমা দেব।’ কপাল টুনটুন করছে, কপালের মধ্যখানে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে টিপছি, এমন সময় অঙুত্ত একটা ব্যাপার হল। চোখের সামনে বায়স্কোপের ছবির মতো পরপর দেখতে লাগলাম—জ্যাঠার পৈতে হচ্ছে, জ্যাঠা পুলিশের ভানে উঠছেন—মুখে বন্দেমান্তরম মোগান, জ্যাঠার বিয়ে, জেঠিমার মৃত্যু, এমনকী জ্যাঠার নিজের মৃত্যু পর্যন্ত, কীসে মরছেন, কোন খাটো কয়ে মরছেন, খাটের পাশে কে কে রয়েছেন, সব। ...তখন কিন্তু বলিনি, কিন্তু এই মৃত্যুর ব্যাপারটা যখন অন্তরে অন্তরে ফলে গেল, তখন...বুঝতেই পারছেন—’

লালমোহনবাবুকে দেখে বেশ বুঝিপ্পাম যে ওর গায়ের সোম খাড়া হয়ে উঠেছে। বিলাসবাবু দেখলাম একদৃষ্টি চেয়ে রয়েছেন গণৎকারের দিকে।

ফেন্দু বলল, ‘আপনি তো শুনেছি ডাঙুরিও করেন, আর তার চিহ্নও দেখছি যারে। নিজেকে কী বলেন—ডাঙুর, না গণৎকার?’

‘দেখুন, গণনার ব্যাপারটা আমি শিখিনি। আযুর্বেদটা শিখেছি। অ্যালোপ্যাথিও যে একেবারে জানি না তা নয়। পেশা কী জিজ্ঞেস করলে ডাঙুরিই বলব। আসুন, এগিয়ে আসুন, কাছে এসে বসুন।’

শেহের কথাগুলো অবিশ্য বিলাসবাবুকে বলা হল। ভদ্রসোক এগিয়ে এসে তত্ত্বপোশে পা তুলে বাবু হয়ে বসে বললেন, ‘দেখুন, কপালের ব্ল্যাক স্পটটি যদি ইনফরমেশনের সহায়ক হয়।’

লক্ষ্মণবাবুর পাশেই যে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়ামের বাটি জাঁকা ছিল সেটা এতক্ষণ সক্ষ করিনি। তার মধ্যে তরল পদার্থটা যে কী তা জানি না, কিন্তু দেখলাম লক্ষ্মণবাবু তাতে ডান হাতের কড়ে আঙুলের ডগাটা তিনবার চুবিয়ে নিশেন। তারপর একটা ধৰ্মবে পরিষ্কার ঝুমালে আঙুলটা মুছে নিয়ে চোখ বুঝে মাথা হেঁটে করে আঙুলের ডগাটা মোক্ষ আন্দাজে ঠিক বিলাসবাবুর কপালের আঁচিলের উপর বসিয়ে দিলেন।

তারপর মিনিটখানেক সব চুপ। সবাই চুপ। কেবল ঘড়ির টিকটিক আর—এই প্রথম খেয়াল হল—বাইরে থেকে আসা একটান ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ।

‘তেক্সি—তেক্সি—উনিশ শো তেক্সি—তুলা জগ, সিংহ রাশি—পিতামাতার প্রথম সন্তান...’

লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য চোখ বঙ্গ করেই বলতে শুরু করেছেন।

‘সাড়ে আটে টনসিল অ্যাডিনয়েডস— পরীক্ষায় বৃত্তি— স্বর্ণপদক...বিজ্ঞান— পদার্থ বিজ্ঞান— উনিশে শ্যাঙ্গুয়েট— তেইশে উপার্জন শুরু— চাক...না, চাকরি না— ফ্রিলাস— ফটোগ্রাফার— স্ট্রাগল...স্ট্রাগল দেখছি, স্ট্রাগল— উদ্যম, একাগ্রতা, অধ্যবসায়— পর্বতারোহণে পটুতা— বন্যপশুপক্ষী-প্রীতি— বেপরোয়া জীবন— ভায়ম্যাণ— অকৃতদার...’



ভদ্রলোক একটু ঘামলেন। যেন্মুদি গভীর অনোন্ধোগের সঙ্গে ওড়িশা হাতিক্রাফ্টসের অ্যাশট্রেটা দেখছে। শাসমোহনবাবু হাতদুটো মুঠো করে টান হয়ে বসেছেন। আমার বুক টিপ টিপ করছে। বিলাসবাবুর মুখ দেখলে কিছু বোঝাৰ উপায় নেই, তবে ত্বর চোখ যে গণৎকারের দিক থেকে একবারও সরেনি, সেটা আমি সক্ষ করোছি।

‘সেভেনটি এইট—সেভেনটি এইট...’

আবার কথা শুরু হয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বেশ ট্রৈন হচ্ছে ভদ্রলোকের সেটা বোঝা যায়।

‘বন দেৰছি, বন—হিমালয়—অপঘাত—অপ—না—’

পাঁচ সেকেন্ড চুপ থেকে ভদ্রলোক হঠাত বিলাসবাবুর কপাল থেকে আঙুল নামিয়ে নিয়ে চোখ খুললেন। তারপর সটান বিলাসবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, ‘আপনার বৈচে ধাকার কথা নয়, কিন্তু রাখে ইরি মারে কে ?’

‘আঞ্জিডেট নয় ?’ বিলাসবাবু ধূরা গলায় প্রশ্ন করলেন।

সম্ভুগ ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে একটা পান মুখে পুরে বললেন, ‘যতদূর দেৰছি, নট অ্যাঞ্জিডেট। আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল পাহাড়ের প্রান্ত থেকে। অৰ্থাৎ ভেলিবারেট অ্যাটেম্প্ট অ্যাট হার্ডির। মৰেননি সেটা আপনার পৱন ভাগ্য।’

‘কিন্তু কে টেলপ সেটা— ?’

প্রশ্নটা করেছেন শাসমোহনবাবু। সম্ভুগ ভট্টাচার্য মাথা নাড়লেন। —‘স্বারি।

‘আ দেখেছি তার বাইরে বলতে পারব না । বললে মিথ্যে বলা হবে । দেবতা কষ্ট
হবেন ।’

‘দিন আপনার হাতটা ।’

বিলাসবাবু কর্মদনের জন্য তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মণ ভট্টাচার্যের
পিকে ।

‘এটাকে কী বলবেন ? ফাইভ স্টার না সিঙ্গ স্টার ?’ লালমোহনবাবুকে প্রশ্নটা করল ফেলুন্দা।

আমরা বেলওয়ে হোটেলে এসেছি ডিনার খেতে। বিলাসবাবু সাগরিকা থেকে বেরিয়েই আমাদের নেমন্তন্ত্র করলেন। বললেন, ‘আপনারা আমার অশেষ উপকার করেছেন ; আমার এই অনুরোধটা রাখতেই হবে।’

রেলওয়ে হোটেলের খাওয়া যে অপূর্ব তাতে কোনও সন্দেহ নেই আর সেটা লালমোহনবাবুও না স্বীকার করে পারলেন না। বললেন, ‘রেলের খাওয়ার যা ছিরি হয়েছে আজকাল মশাই, আমি ভাবলুম রেলওয়ে হোটেলের খাওয়াও বুঝি সেই স্ট্যান্ডার্ডের হবে। সে ভুল ভেঙে গেছে—থ্যাঙ্কস টু ইউ।’

বিলাসবাবু হেসে বললেন, ‘এবার সুফ্লেটা খেয়ে দেখুন।’

‘কী খাব সুপ প্রেটে ? সুপ তো গোড়াতেই খেলুম।’

‘সুপ প্রেট নয়। সুফ্লে—মিষ্টি।’

এই সুফ্লে খেতেই বিলাসবাবু লক্ষণ ভট্টাচার্যের দৌলতে মনে পড়ে যাওয়া ঘটনাটা বললেন।—

‘মিস্টার সেনের ঘরে দেখা সেই ঘটনাটা আমার মনে কোনওরকম খটকার সৃষ্টি করেনি। পরদিন ভদ্রলোক পোখরা যাচ্ছিলেন ; আমাকে সঙ্গে যাবার জন্য ইনভাইট করলেন। জাপানি দল আসতে আরও তিনদিন দেরি, তাই রাজি হয়ে গেলুম। পোখরা কাঠমাণু থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার। পথে একটা জঙ্গল পড়ল, ভদ্রলোক সেখানে গাড়ি থামাতে বললেন। বললেন নাকি ভাল অর্কিড পাওয়া যায় ওই জঙ্গলে। আমিও ক্যামেরা নিয়ে নামঙ্গুম। আর কিছু না হোক, এক-আধটা ভাল পাখিও যদি পাই, তা হলেই বা মন্দ কী ?—আমি পাখি খুঁজছি, উনি অর্কিড। দুজনে ভাগ হয়ে গেছি, কথা আছে আধ ঘণ্টা বাদে দুজনেই গাড়িতে ফিরব। ওপরে গাছের দিকে চোখ রেখে এগোছি, এমন সময় পিছন থেকে মাথায় একটা বাড়ি, আর তারপরেই অঙ্ককার।’

ভদ্রলোক থামলেন। আর কিছু বলার নেই, কারণ বাকি ঘটনা উনি আগেই বলেছেন। ফেলুন্দা বলল, ‘আঘাতটা কে মেরেছিল সেটা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত নন ?’

বিলাসবাবু মাথা নাড়লেন।—‘একেবারেই না, তবে এটা বলতে পারি যে সেই জঙ্গলে ত্রিসীমানার মধ্যে আর কোনও মানুষ চোখে পড়েনি। গাড়িটা ছিল মেন

রোডে, প্রায় কিলোমিটার খানেক দূরে ।

‘তা হলে আগ্রেডেড মার্টরটা যে মিঃ সেনের কীর্তি, আদালতে সেটা প্রমাণ করার কোনও উপায় নেই ?’

‘আজ্জে না, তা নেই ।’

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উশাখুশ করছিলেন, এবার বুঝলাম কেন। ভদ্রলোক বললেন, ‘আপনি একবারাটি সেনগুপ্তাইয়ের সামনে গিয়ে হাজির হন না। উনিষ যদি কাজপ্রিট হন, তা হলে আপনাকে দেখে বেশ একটা ভুত দেখার মতো ব্যাপার হতে পারে। সেটা মন্দ হবে কী ?’

‘সে কথা আমি ভেবেছি, কিন্তু সেখানে একটা মুশকিল আছে। উনি আমাকে নাও চিনতে পারেন। ক্ষমতা আমার তখন দাঢ়ি ছিল না। এটা রেখেছি পুতনির ক্ষতিচিহ্নটা ঢাকবার জন্য ।’

আরও মিনিট পাঁচক থেকে বিলাসবাবুকে ধনবাস দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক আমাদের গেট অবধি পৌছে দিলেন। মেঝ কেটে গেছে, গুমেট জাবটাও আর নেই। ফেলুদার পাকেটে একটা ছেষ্টা জোরালো টর্চ আছে জানি, কিন্তু ফিকে চাঁদের আলো থাকার দরকন সেটা আর জ্বালাবার দরকার হবে না।

রাস্তা পেরিয়ে সমুদ্রের ধার অবধি বাঁধানো পর্টটা দিয়ে চলতে চলতে লালমোহনবাবু বললেন, ‘এবার ফ্র্যাঙ্কলি বলুন তো মশাই, কী রকম দেখশেন সকল ভট্টাচার্যকে। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি ?’

‘হতে পারে তাজ্জব,’ বলল ফেলুদা, ‘কিন্তু অত জেনেও গোয়েন্দার ভাত মারতে পারবে না। বিসাস মজুমদারকে দুর্গাংগতি সেনই হত্যা করার চেষ্টা করেছিল কি না সেটা জানতে হলে ফেলু মিঞ্চির ছাড়া গতি নেই।’

‘আপনি তদন্ত করছেন তা হলে ?’

চাঁদের আলোতেই বুঝলাম লালমোহনবাবুর চোখ যিলিক দিয়ে উঠেছে।

ফেলুদা কী উত্তর দিত জানি না, কারণ ঠিক তখনই সামনে একজন চেনা লোককে দেখে আমাদের কথা থেমে গেল। মাটির দিকে চেয়ে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ব্যক্তভাবে এগিয়ে আসছেন আমাদেরই পথ ধরে মিঃ হিস্পেরানি।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন; তাঁরপর ফেলুদার দিকে আঙুল লেড়ে বেশ বাঁজের সঙ্গে বললেন, ‘ইউ বেঙ্গলিজ আর ভেরি স্টীবন, ভেরি স্টীবন !’

‘হঠাৎ এই আক্রমণ কেন ?’ ফেলুদা হালকা হেসে ইংরিজিতে থপ্প করল। ভদ্রলোক বললেন, ‘আই অফাৰড হিম টোয়েল্টি ফাইভ থাউজ্যান্ড, অ্যান্ড হি সিল সেড মো !’

‘পাঁচশ হ্যাজারের লোড সাফলাতে পারে এমন লোক তা হলে আছে বিষ্ণুসংসারে ?’

‘আরে মশাই, ভদ্রলোক যে পুঁষি সংগ্রহ করেন সেটা আগে জানতাম। তাই অ্যাপ্লেন্টমেন্ট করে দেখা করতে গেলাম। বললাম তোমার সবচেয়ে ভ্যালুয়েবল



পিস কী আছে সেটা দেখাও। তৎক্ষণাৎ আজমারি খুলে দেখালেন—ঢাকশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুঁথি। অসাধারণ জিনিস। চোরাই মাল কি না জানি না। আমার তো মনে হয় গত বছর ভাতগৌওয়ের প্যালেস মিউজিয়ম থেকে তিনটে পুঁথি চুরি গিয়েছিল, এটা তারই একটা। দুটো উক্কার হয়েছিল, একটা হয়নি। আর সেটাও ছিল প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি।

‘হোয়ার ইঞ্জ ভাতগৌও ?’ জিজ্ঞেস করলেন শালমোহনবাবু। জায়গাটাৰ নাম আমিও শনিনি।

‘কাঠমানু থেকে দশ বিলোমিটাৰ। প্রাচীন শহুৰ, আগে নাম ছিল ভক্তপুর।’

‘কিন্তু চোরাই মাল কি কেউ চট করে দেখায় ?’ কেলুদা জিজ্ঞেস কৰল—‘আর

আমি বলছুন ক্ষমা প্রত্যাপারমিতার পূর্বি একটা নয়, বিস্তর আছে।'

'আই নো, আই মো,' অসহিষ্ণুতাবে বললেন মিঃ হিসেরানি। 'উনি বললেন এটা পজাই শাহুর সঙ্গে এসেছিস, তিনি আরু ধরমশাহু গিয়ে কিনে এসেছিসেন। কত বিহু বিমেছিলেন জানেন? পাঁচশো টাকা। আর আমি দিছি পঁচিশ টাকার—ভেবে দেখুন।'

'তার মানে কি বলছেন পুরী আসাটা আপনার পক্ষে বার্ষ হল!'

'ওয়েল, আই ডোট গিড আপ সো ইঞ্জিনি। মহেশ হিসেরানিকে তো জেনেন মা কিম্বা সেন! ওর আরেকটা ভাল পুরি আছে, যিষটিন্থ সেনচুরি। আমাকে দেখালেন। আরও দুটো দিন সময় আছে হাতে। দেখ যাক কদিন ওর গোটেকে।'

ভদ্রলোক সংক্ষেপে গুডনাইট জানিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন হোটেলের দিকে।

'একটু সাসপিশাস জাগছে না?' সাপমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন। ফেরুনা বলল, 'কান বা কীসের কথা বলছেন সেটা না জানলে বলা সঙ্গে নয়।'

'পাঁচশ টাকা দিয়ে কেনা জিনিস পঁচিশ হাজারে ছাড়ছে না?'

'কেন, মানুষ মিলেভি হতে পারে এটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? সিদ্ধুজ্যাঠা দুর্গাগতিবাবুকে পুরি বিক্রি করতে রিফিউজ করেছেন সেটা আপনি জানেন?'

'কই, সেটা তো মিঃ সেন বললেন নয়।'

'সেটা তো আমার কাছে আরও সাসপিশাস। ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র এক বছর আগে।'

আমার মনে হল দুর্গাগতিবাবু শুধু পিকিউলিয়ার মন, বেশ রহস্যাজনক চরিত্র। আর বিলাসবাবু যা বলছেন তা যদি সত্ত্ব হয়...

'সাসপিশন কিন্তু এজনের উপর পড়ে নেই,' বলল ফেরুনা, 'নিউক্লিয়ার ফল-আভিটের হতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কাকে বাস সেবনে কলুন। আপনার গণব্রাতার যে কৃতীয়-চক্র-সম্পর সরীসূপের কথা বললেন, সেটা নই টাকাটুয়া নয়, টুয়াটুয়া। আর তার বাসস্থান নিউ গিনি নয়, নিউজিল্যান্ড। এ অবনের কুল জটায়ুর পক্ষে অব্যাভাবিক নয়, কিন্তু সক্ষণ ভট্টাচার্য ইদি তার জানের পরিচয় দিয়ে সোককে ইমপ্রেস করতে চান, তা হলে তাকে আরও অ্যাকুরেট হতে হবে। তারপর ধূরন নিশ্চি ধূরন। আভিপাতার অভ্যাস আছে ভদ্রলোকের; সেটা মোটেই ভাল নয়। তারপর দুর্গাগতিবাবু বললেন ওর গাউট হয়েছে কিন্তু ওর টেবিলের ওয়েবগুলো গাউটের নয়।'

'তবে কীসের?'

'একটা ওয়ুধ তো সবে গত বছর বেরিয়েছে, টাইম ম্যাগাজিনে পড়ছিলাম ওটাৰ কথা। কীসের ওয়ুধ ঠিক মনে পড়ছে না, বিষ্ণু গাউটের নয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আছা, ভদ্রলোককে এত অন্যদনখ কেন মনে হয় বলো তো? আর তা ছাড়া বললেন, ওর ছেলেকে জেনেন না...'

'সেটাৰও তো কারণ ঠিক বুবতে পারছি না।'

লালমোহনবাবু বললেন, ‘ধরুন যদি উনি সত্যিই বিলাস মজুমদারকে খুন করার চেষ্টা করে থাকেন, তা হলে সেটাই একটা অন্যমনস্থতার কারণ হতে পারে। এখানে অবিশ্ব অন্যমনস্থতা ইঙ্গ ইকুয়াল টু নার্সিনেস।’

এখানে আমাদের কথা থেমে গেল। শুধু কথা না, হাঁটাও।

বালির উপরে জুতোর ছাপ, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পাশে লাঠির ছাপ।

ছাপটা হয়েছে গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে বিলাসবাবু লক্ষণ ডট্টাচার্ফের বাড়ি থেকে সোজা হোটেলে ফিরে গিয়ে স্নান-ঢান সেরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এর মধ্যে আর নীচে আসেননি।

তা হলে এ ছাপ কার ?

আর কে বাঁ হাতে লাঠি নিয়ে হেঁটে বেড়ায় পুরীর বিচে ?

পরদিন সকালে আমরা চা খেয়ে বেরোব বেরোব ভাবছি, এমন সময় লালমোহনবাবুর গাড়ি চলে এল। ভাইভার হরিপদবাবু বললেন যে যদিও সকাল সকাল রওনা হয়েছিলেন, বালাসোরের ৩০ কিলোমিটার আগে নাকি প্রচণ্ড বৃষ্টি নামে, ফলে তাঁকে ঘণ্টা চারেক বালাসোরেই থাকতে হয়েছিল। গাড়ি নাকি দীর্ঘ এসেছে, কোনও ট্রাবল দেয়নি।

হরিপদবাবুর জন্য আমাদের হোটেলের কাছেই নিউ হোটেলে একটা ঘর বুক করে রাখা হয়েছিল, কারণ নীলাচলে জায়গা ছিল না। গাড়িটা নীলাচলে রেখে ভদ্রলোক চলে গেলেন নিজের হোটেলে। আমরা বলে দিলাম দিন ভাল থাকলে দুপুরের দিকে ভুবনেশ্বরটা সেরে আসতে পারি। একটার মধ্যে মন্দির-টাঙ্গির সব দেখে ঘুরে আসা যায়।

ফেলুদা বলেই রেখেছিল সকালে একবার স্টেশনে যাবে। ওর আবার স্টেটস্ম্যান না পড়লে চলে না, হোটেলে দেয় শুধু বাংলা কাগজ।

হাঁটা পথে হোটেল থেকে স্টেশনে যেতে লাগে আধ ঘণ্টা। আমরা যখন পৌছলাম তখন পৌনে নটা। কলকাতা থেকে জগন্নাথ এক্সপ্রেস এসে গেছে সাতটায় ; পুরী এক্সপ্রেস এক ঘণ্টা লেট, এই এল বলে। কোথাও যাবার না থাকলেও স্টেশনে আসতে দারুণ লাগে। বিশেষ করে কোনও বড় ট্রেন আসামাঞ্চ ঠাণ্ডা স্টেশন কী রকম টগবগিয়ে ফুটে ওঠে, সে জিনিস দেখে দেখেও পুরনো হয় না।

বুক-স্টলে গিয়ে লালমোহনবাবু প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন বিখ্যাত রহস্যরোমান্ত উপন্যাসিক জটায়ুর কোনও বই আছে কি না। এটা করার কোনও মানে হয় না, কারণ ওই সিরিজের গোটা দশেক বই সামনেই রাখা রয়েছে, আর তার মধ্যে তিনটে যে জটায়ুর সেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ফেলুদা ঘবরের কাগজ কিনে অন্য বই ঘাঁটছে, এমন সময় একটা গলা পেলাম।

‘জৈজ্ঞেষ্ঠের রহস্য মাসিকটা এসেছে?’

পাশ ফিরে দেখি নিশীথবাবু। ভদ্রলোক প্রথমে আমাদের দেখেননি ; চেখ পড়তেই কান অবধি হেসে ফেললেন।

‘দেখুন। পাশে গোয়েন্দা দাঢ়িয়ে, আর আমি কিনছি রহস্য মাসিক।’

‘আপনার বস্তি-এর কী খবর?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘আর বলবেন না’, বললেন নিশীথবাবু, ‘আপচেষ্টহেন্ট না করে লোক চলে আসে, আর দেখা করার জন্য বুলোয়ুনি করে। পুরির এত সহজেদার আছে জানতুন না মশাই।’

‘আবার কে এল ?’

‘সন্দা, চাপ দাড়ি, চোখে কালো চশমা। নাম জানতে চাইলে বললেন নাম বললে তিনবেন না তোমার অনিব। বলো ভাল পুরির ক্ষবর আছে। বলশুম কর্তাকে, বললেন নিয়ে এসো। হাতে নিয়ে গিয়ে বসলুম। আবও কিছু চিঠি টাইপ করার হিস, ঘরে চলে গেছি, এ মা, তিম মিনিটের মধ্যেই হাঁকডাক। গিয়ে দেবি কর্তার দুখ ফ্যাকাশে, এই বুঝি হাঁট ফেল করবেন। বললেন একে নিয়ে যাও। ভদ্রলোককে তৎক্ষণাত নিয়ে চলে এসুৰ। সে আবার যাবার সময় বলে কী, তোমার অনিবের হাঁটের ব্যামো আছে নিষ্ঠয়ই, ডাঙ্গার দেখাও।’

‘এখন কেমন আছেন উনি ?’

‘এখন অনেকটা ভাল।’ ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্মের ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি দিয়েই আতকে উঠেছেন—‘আত যে সেট হয়ে গেছে সেটা খে়ালই করিনি। শুনুন মশাই আছেন তো কমিন ? একদিন সব বদৰ। সে অনেক ব্যাপার। আ—জ্বা !’

ইতিমধ্যে পুরী এগাপ্রেস এসে পড়েছিস, গার্ডের ছাইসেলের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল, আর নিশীথবাবুও ডিভের মধ্যে মিসিয়ে গেলেন।

ফেন্দুনা একটা চাটি বই রেখে রেখেছিস, সেটা কিনে নিল। দাম সততেরো পঞ্চাশ। নাম—এ গাইড টু মেপার্স।

ফেন্দুনা পথে ফেন্দুনা বলল, ‘আপমারা করং আজই ভুবনেশ্বরটা দেখে আসুন। একটা ফিলিং হচ্ছে, আমার এখানে খাবা দরকার। এখুনি কিছু হবে বলে মনে হয় না, তবে আবহাওয়া সুবিধের ময়। তা ছাড়া আমার কিছু কাজও আছে। কাঠমান্ডুতে একটা ফোন করা দরকার। তথ্যগুলো অট পাকিয়ে যাবার আগে একটু গুহিয়ে ফেলা দরকার।’

আমি যেন্দুনার এই মুড়টা ভাল করে জানি। ও এখন গুটিয়ে নেবে নিজেকে, শৌনী হয়ে যাবে। খাটে চিত হয়ে শুয়ে শুন্যে চেয়ে থাকবে। আমি সক্ষ করেছি এই অবস্থায় ওর প্রায় তিন-চার মিনিট ধরে চোখের পাতা পড়ে না। আমরা যদি এ সময়ে ঘরে থাকি তো ফিস্ম ফিস্ম করে কথা বলি। সবচেয়ে ভাল হয় ঘরে না থাকলে। আর যেন্দুনার সঙ্গই যদি না পাই তো ভুবনেশ্বরে যেতে ক্ষতি কী ?

আমি লালমোহনবাবুকে ইশারায় বুঝিয়ে হিলাম যে আমাদের যাওয়াই উচিত।

হোটেলের কাছাকাছি যখন পৌছেছি তখন দেবি একজন চেনা লোক গেট দিয়ে বেয়েছেন।

‘দেখেছেন, আর এক মিনিট এদিক-ওদিক হসেই আর দেখা হত না,’ বললেন বিলাস মজুমদার।

‘চলুন ওপরে !’

বিলাসবাবু আমাদের ঘরে এসে চেয়ারে বসে কপালের ঘাম মুছলেন।

‘আপনি তো আমার আজভাইস নিয়েছেন শুনলাম,’ একগাল হেসে বললেন

লালমোহনবাবু ।

‘শুধু তাই না,’ বললেন উত্তোলক, ‘আপনি ঠিক যেমনটি বলেছিলেন একেবারে অবহ তাই : যাকে বলে ভূত দেখা । আমি তো অপ্রস্তুতেই পড়ে গেস্লাম কৰাই । দাঢ়ি সঁজেও লোকটা চিনে পেলুল ।’

ফেলুদা বলল, ‘আপনি বোধহয় খেয়াল করেননি যে আপনার চেহারার একটি বিশেষত্ব আছে যেটা চুট করে ভোলবার নয় ।’

বিলাসবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, ‘কী কল্পন তো ?’

‘আপনার কপালে ধার্ড আছি,’ বলল ফেলুদা ।

‘ঠিক বলেছেন । ওটা আমার খেয়ালই হচ্ছিল । যাকগে, একটা আশ্চর্য ব্যাপারে হচ্ছ, জানেন । লোকটার দশা দেখে ওর ওপর ধায়া হল । আর, ওই ঘটনাটার ফলেই বোধহয়, ওকে কাঠমানুড়তে যেমন দেখেছিলাম তেমন আর উনি নেই । এই ছয়-সাত মাসে বড়স যেন বেড়ে গেছে সশ বছৰ । আজ দেখা করে শুধু ভাল হল । এবার ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে কোনও অসুবিধা হবে না ।’

‘এটা সুব্রহ্মণ্য !’ বলল ফেলুদা—‘শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে আপনি বেশি দুর এগোড়েও পারতেন না ।’

উত্তোলক উঠে পড়লেন ।

‘আপনাদের প্ল্যান কী ?’

ফেলুদা বলল, ‘এরা দুজন যাচ্ছেন ভুবনেশ্বর, সক্ষায় যিন্দ্রবেন । আমি এখানেই আছি ।’

‘আমি ভবছি কালই বেরিয়ে পড়ব । উড়িষ্যার ফরেন্টগোলে দেখা হয়নি ।...’ যদি পারি যাবার আগে গুড়বাই করে কান ।’

আবাদের বেরোতে বেরোতে সাড়ে বারেটা হলেও, খিলটা ভাল খালায়, আর চমৎকার রান্নায় হুরিপদবাবু স্পিন্ডলিটারের কাঁচা ৮০ খিলোমিটারের নীচে নাখতে না বেওয়ার সুন্দর আম্বা ঠিক বেয়ালিশ মিনিটে ভুবনেশ্বর পৌছে গেলাম ।

আম্বা প্রথমে চলে গেলার বাজারানী মন্দির দেখতে, কারণ এইই গায়ের একটা যক্ষীর মাথা চুরি হয়ে গিয়েছিস, আর ফেলুদা তার আশ্চর্য গোয়েশাগিরিঃ হলে সেটা উঞ্চার করে দিয়েছিল । সেটাকে মন্দিরের গায়ে চিমতে পেরে পিরদাঁড়াক এমন একটা শিহরন হেলে গেল যে বলতে পারি না ।

অবিশ্বি মন্দির তো শুধু ওই একটাই নয়—সিন্দুরাজ, কেদারগীরী, মুক্তেশ্বর, ভুবনেশ্বর, ভাস্করেশ্বর আর আরও কত যে ইঞ্চির তা মনেও নেই । শালমোহনবাবুর আবার সবওলো দেখা চাই, কারণ এখিনিয়াম ইনসিটিউশনের সেই কবি-শিক্ষক বৈকুঠন্দে মালিকের নাকি চার সাইনের একটা ছেট পোয়েম আছে ভুবনেশ্বর নিয়ে, যেটা ওকে হট করে । মুক্তেশ্বরের চাতাসে দাঢ়িয়ে প্রায় চারিশ তন দেশি-বিদেশি টুরিস্টের সামনে উনি সেটা গলা ছেড়ে আবৃষ্টি করলেন—

‘কত শত অজ্ঞাত মাইকেল এঙ্গেলো
একদা এই ভারতবর্ষে হেসো—



১৩৮

নীরবে ঘোষিষ্ঠে তাহা ভাস্কর্যে ভাস্বর
ভুবনেশ্বর !

ভদ্রসোক যাতে কষ্ট না পান তাই আমি মুখে 'বাঃ' বললাম, যদিও এঞ্জেলোর
সঙ্গে মিল দেবার জন্য 'ছিল'কে 'ছেলো' করাটা আমার মোটেই প্রেট পোয়েটের
সংক্ষণ বলে মনে হল না। কথাটা নরম করে ওকে বলাতে ভদ্রলোক রেগেই
গেলেন।

'পোয়েটের ব্যাকগ্রাউন্ড না জেনে ভার্স ডিটিসাইজ করার বদ আভ্যাসটা কোথায়
পেলে, তপেশ ? বৈকুণ্ঠ মল্লিক চুচড়োর সোক ছিলেন। ওখানে ছিলকে ছেলেই
বলে। ওতে ভুল নেই।'

ভুবনেশ্বর ছিমছ্যম শহর তাতে সদেহ নেই, কিন্তু আমার মতে, সমুদ্র না থাকায়
পুরীর পাশে দাঁড়াতে পারে না। কাজেই সাতটা নাগাদ আবার নীলাচল হোটেলে
ফিরে আসতে দিবি ভাস সাগল।

তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে হোটেলের বারান্দায় উঠতেই ম্যানেজার শ্যামলাল বারিক
তাঁর হৰ থেকে হাক দিলেন।

'ও মশাই, মেসেজ আছে।'

আমরা হস্তদণ্ড হয়ে চুকলাঘ তাঁর ঘরে।

'মিতির মশাই এই দশ মিনিট হল বেরোলেন। বললেন আপনারা যেন যরেই

ঢাকেন । ’

‘কী ব্যাপার ? কোথায় গেলেন ?’

‘ঘানা থেকে ফোন করেছিল ওঁকে । ডি. জি. সেনের বাড়িতে চুরি হয়েছে ।
একটি মহামূল্য পুঁথি । ’

আশ্চর্য ! ফেন্সুদার মন বলছিল কিছু একটা হবে, আর সত্যিই হয়ে গেল ।

জ্ঞান করে চা খেয়ে শরীরের ক্রান্তি দূর হল ঠিকই। কিন্তু মন ছটফট, বুকের ভিতর চিপ চিপ। ফেলুদা তদন্তে লেগে গেছে। পুরী আমাদের হতাশ করেনি।

কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে, এতে ফেলুদার ট্যাকে কিছু আসবে কি? অবিশ্য কেস তেমন জমাটি হলে রোজগার হল কি না হল সেটা ফেলুদা ভুলে যায়। অনেক সময় রোজগার যেগুলোতে হয়—মানে, যেখানে মক্কেল ঘরে এসে ফেলুদাকে তদন্তের ভার দেয়, সেখানে পকেট ভরলেও মন ভরে না, কারণ রহস্যটা হয় মামুলি। আবার এমন অনেকবার হয়েছে যে ফেলুদা শখ করে তদন্ত করেছে, পয়সা হয়তো কিছুই আসেনি, অথচ রহস্য জটিল হওয়াতে সমাধান করে মন মেজাজ মগজ সব একসঙ্গে চাইয়ে উঠেছে।

‘কাকে সাসপেক্ট করছ, তপেশ?’ আটটা নাগাত প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু। উনি এতক্ষণ হাত দুটোকে পিছনে জড়ো করে আমাদের ঘরে পায়চারি করেছেন।

আমি বলসাম, ‘চুরি করার সুযোগ সবচেয়ে বেশি নিশ্চীথবাবুর, কিন্তু সেইজন্মেই উনি করবেন বলে মনে হয় না। এ ছাড়া হিসোরানির তো লোভ ছিলই ওই পুরুষের ওপর। বিসাস মজুমদারও টাকা আর প্রতিশোধের জন্য করতে পারেন। তারপর লক্ষণ ভট—’

‘না না না,’ ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠলেন লালমোহনবাবু। ‘এমন একজন লোককে এর মধ্যে টেনো না—প্রিজ। কী অলৌকিক ক্ষমতা ভেবে দেখো তো ভদ্রলোকের।’

‘আপনার কী মনে হয়?’ আমি পালটা প্রশ্ন করলাম।

‘আমার মনে হয় তুমি আসল লোকটাকেই বাদ দিয়ে গেলে।’

‘কে?’

‘সেন মশাই হিমসেলফ।’

‘সে কী? উনি নিজের জিনিস চুরি করতে যাবেন কেন?’

‘চুরি নয়, চুরি নয়, পাচার। চোরাই মাল পাচার করলেন অ্যাদিনে। হিসোরানি হাইয়ার প্রাইস অফার করেছেন, আর উনি বেচে দিয়েছেন। লোককে বলছেন চুরি।’

আমি ভেবে দেখছিলাম লালমোহনবাবুর কথা ঠিক হতে পারে কি না, এমন সময় কুম বয় এসে খবর দিল যে, আমার টেলিফোন আছে। ফেলুদা।

রুক্ষখাসে নীচে গিয়ে ফোন ধরলাম।

‘কী ব্যাপার ?’

‘শ্যামলালবাবু বলেছেন ?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে ?’

‘নিশ্চীপবাবু হাওয়া।’

‘তাই বুঝি ? পুলিশে কবর দিল কে ?’

‘সে সব গিয়ে বলব। আমি আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরছি। ভুবনেশ্বর কেমন লাগল ?’

‘ভাল। ইয়ে—’

ফেলুদা কেবল রেখে দিয়েছে।

লালমোহনবাবুকে বললাম। ভদ্রলোক মাথা চুলকে বললেন, ‘সিন অফ ক্রাইম একবার গিয়ে পড়তে পারলে ভালই হত, তবে তোমার মাদা বোধহয় চাইছেন না।’

আবও এক ঘন্টা অপেক্ষা করেও যখন ফেলুদা এসে না, তখন সত্যিই চিন্তা হতে শুরু করল। কুম-বয়কে বলে আরেক দফা তা আনিয়ে নিলাম। দুর্জনে পালা করে পায়চারি করছি। ইতিমধ্যে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু না করে পারলাম না। ফেলুদার খাতটা খাটের উপরই ছিল, তাতে আজ দুপুরে ও কী লিখেছে সেটা দেখে যেলেছি, যদিও মাথামুক্ত কিছুই বুঝিনি। ওর ধূমী ব্যবসায়ী মঙ্গেস হৱিহর জরিওয়ালার দেওয়া ‘ক্লাস’ মার্ক ডট পেনে একটা পাতায় ছড়িয়ে দেখা রয়েছে—

ডায়াবিড ?—গাউট—সাপ ?—কী কিরে আসলে ? ছেলেকে চেনে না কেন ?—কালোভাক ? কাকে ? কেন ?—সাতি হাতে কে হাঁটে ?...

নটা নাগাত ধৈর্য ফুরিয়ে গেল। যা থাকে কপালে বলে দুর্জন বেরিয়ে পড়লাম। সাগরিকা থেকে ফিরতে হলে ফেলুদা সম্মুছের ধার দিয়ে শটকাটই নেবে। আমরা তাই হোটেল থেকে বেরিয়ে ভাইনেই ঘূরলাম।

কালও রাতে রেলওয়ে হোটেল থেকে সম্মুছের ধার ধরে ফিরবার সময় মনে হয়েছে, দিনে আব রাতে কত তফাত। টেক্ট-এর গর্জন যেমন দিনে তেমনি বাতিরেও চসে, কিন্তু রাত্রে সমস্ত ব্যাপারটা আবছা অঙ্ককারে ঘটে বলে গা ছমছম করে অনেক খেশি। প্রকৃতির কী অসুস্থ খেয়াল। জলের ফসফরাস না খাকলে এমন মেঘলা রাতিরে কি টেক্টগুলো দেখা যেত ?

দূরে বাঁয়ে আকাশটা যে ফিকে হয়ে আছে, সেটা শহরের আলোর জন্য। সামনে দূরের টিমাটিমে আলোর বিন্দুগুলো নিশ্চয় নুলিয়া বস্তির।

আমরা দুর্জনে যতটা পারা যায় অঙ্গ দূরে রেখে বাঁদিক ধন্ডে চলতে লাগলাম। টেক্টয়ের ফেনা আমাদের বিশ-পাঁচিশ হাত সূর অবধি গড়িয়ে এসে থেমে যাচ্ছে। লালমোহনবাবুর সঙ্গে টর্চ আছে, কিন্তু অপ্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করার কোনও মানে হয় না।

আজ সারাদিন বৃষ্টি না হওয়ায় বালি শুকনো কিন্তু তাও পা বদে যায়। এ বালি দিঘার মতো জমাট নয় যে পেন স্যান্ড করবে। লালমোহনবাবু কেড়স পরেছেন, আব আমি চপল। এই চপলেই হাঁটাঁ আনি কীসের সঙ্গে ঠোকর খেলাম, আব

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ধূবড়ে বালিতে। লালমোহনবাবুও 'কী হল, কী হল' করে এগিয়ে এসে কীসে জানি বাধা পেতে হতভুকিয়ে পড়ে দুবার 'হেল্প হেল্প' বলে বিকট চিৎকার করে উঠলেন। আমি ধরা গলার বললাম, 'আমার পেটের নীচে দুটো ঠাঁঁঁঁঁ।'

'বলো কী!'

আমরা দুজনেই কোনওবকমে উঠে পড়েছি, লালমোহনবাবু টর্টো ভালাতে টেষ্টা করে পারছেন না বলে সেটার পিছনে থাবড়া মারছেন।

একটা গোঙানির শব্দ, আর তারপর একটা মানুষের শরীর বালি থেকে উঠে বসল। চোখে যত না দেখছি, তার চেয়ে বেশি আন্দাজে বুঝছি।

'হাতটা দে—'

ফেলুদা!

আমি ডান হাতটা বাড়লাম। ফেলুদা সেটা ধরে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আমার পিঠে হাত রেখে টেলন।

টর্চ ছলেছে। লালমোহনবাবু কাঁপা হাতে আলোটা ফেলুদার মুখে ফেললেন। ফেলুদা নিজের ডান হাতটা সাবধানে মাথার উপর রেখে যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে হাতটা নামিয়ে নিল।

টর্চের আলোতে দেখলাম হাতের তেলোয় রক্ত।

'ফে ফ—ফেটে গেছে?' ফটা গলায় প্রশ্ন করলেন জাটায়।

কিন্তু ফেলুদার চোখে ঝুকুটি। —'কী রকম হল?'—

ফেলুদাকে এত ইত্তেজ হতে দেখিনি কখনও। ও নিজের পকেট থেকে ছোট টর্চটা কার করে এদিক ওদিক ফেলল। এক জোড়া জুতো পরা পায়ের ছাপ ফেলুদা যেখানে পড়েছিল তার পাশ থেকে চলে গেছে উচু পাড়টার দিকে, যেখানে বালি শেষ হয়ে গেছে।

আমরা এগিয়ে গেলাম পায়ের ছাপ ধরে। পাড় এখানে দুক অবধি উচু। উপরে ঘাস আর কোপড়া। কাছাকাছির মধ্যে বাড়ি-টাড়ি নেই। যেখানে লোকটা ওপরে উঠে গেছে, সেখানে বালিতে কিছু ঘাসের চাবড়া পড়ে থাকতে দেখে বুবলাম, লোকটাকে বেশ কসরত করে উঠতে হয়েছে।

ফেলুদা হোটেলমুখ্যে ঘূরল, আমরা তার পিছনে।

'আপনি কল্পকল এই ভাবে পড়ে ছিলেন বলুন তো?' লালমোহনবাবুর গলার স্বর এখনও স্বাভাবিক হয়নি। ফেলুদা রিস্টওয়ার্চের ওপর টর্চ ফেলে বলল, 'প্রায় আধ ঘণ্টা।'

'মাথায় তো স্থিত দিতে হবে মনে হচ্ছে।'

'না,' বলল ফেলুদা। —'আমার মাথায় শুধু বাড়ি সেগেছে, জখম হয়নি।'

'তা হলে রক্ত—?'

ফেলুদা কোনও জবাব দিল না।

হোটেলে এসে আধ্যায় বরফ দিয়ে ফেলুদার ব্যাথটা কমল। এই কীর্তির জন্য কে দায়ী সে সংজ্ঞে ফেলুদার কোনও ধারণা নেই। সাগরিকা থেকে ফেরার পথে জনমানবশূন্য বিচে হঠাতে চোখের উপর আচমকা টর্চের আলো, আর তারপরেই মাথায় বাড়ি। ফেলুদা কোন করে মহাপাত্রকে ঘটনাটা বলায় ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি একটু বুঝে-সুবো চলুন মশাই। কিছু অজ্ঞত বেপরোয়া লোক যে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আপনি চুপচাপ থেকে পুরো ব্যাপারটা আমাদের হ্যান্ডস করতে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়। ফেলুদা উত্তরে বলে যে এই ঘটনাটা ঘটবার আগে সেটা বললে ও ইয়তো ভেবে দেখতে পারত, এখন টু সেট।

রাত্রে খাওয়া সেরে ঘরে এসেছি, ঘড়িতে বলছে পৌনে এগারোটা, এমন সময় শ্যামলাল বারিক একটি ভদ্রলোককে নিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। বছর চারিশেক বয়স, ফরসা ফিটফাট চেহারা, চোখে পুরু কালো ক্রেমের চশমা। শ্যামলালবাবু বললেন, 'ইনি আধ ঘট্টা হজল অপেক্ষা করছেন। আপনারা থাহিলেন, তাই আর ডিপটাৰ্ব কৱিনি।'

ভদ্রলোককে বসিয়ে শ্যামলালবাবু বিদায় নিলেন।

আগজ্ঞক ফেলুদার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'আমি আপনার নাম শনেছি। ইন ফ্যান্ট, আপনার কীর্তিকলাপ পড়ার দর্শন এইদের দুজনকেও চিনতে পারছি। আমার নাম মহিম সেন।'

ফেলুদার ভূরু কুচকে গোল। 'তার মানে— ?'

'দুর্গাগতি সেন আমার বাবা।'

আমরা তিনজনেই চুপ। ভদ্রলোকই কথা বলে চললেন।

'আমি এসেছি আজই দুপুরে। মোটৰে। আমাদের কোম্পানির একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে উঠেছি।'

'আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করেননি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ফেন করেছিলাম এসেই। ওর সেক্রেটারি ধরেছিলেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। উনি বাবার সঙ্গে কথা বলে জন্মালেন বাবা ফেনে আসতে চাইছেন না।'

'কারণ ?'

'জানি না।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে, তিনি আপনার প্রতি খুব অসম্ম মন। কেন, সেটা আপনি অনুমান করতে পারছেন না ?'

তত্ত্বজ্ঞেক ফেলুদার অফার করা চারমিনার প্রত্যাখ্যান করে নিজের একটা রথম্যান ধরিয়ে বললেন, 'দেখুন, বাবার সঙ্গে আমার খুব একটা মেলামেশা কোনওদিনও ছিল না ; তাই বলে অসম্ভাবও ছিল না। আমি তাঁর হৃবি সম্বন্ধে কোনওদিন বিশেষ ইন্টারেস্ট দেখাইনি ; আর্টের চোখ আমার নেই। আমি থাকি কলকাতায় ; কোম্পানির কাজে বছরে বাবু-দুয়েক বিদেশে যেতে হয়। চিঠি লিখে সব সময়ই উত্তর পেয়েছি, তা পোস্টকার্ডে দুটো লাইনই হোক। বাবা এখানে আসবার পর দুবার আমি আর আমার স্ত্রী তুইহুই বাড়ির দোতলায় হল্পা-দুয়েক করে থেকে গেছি। আমার একটি বছর আটকের ছেলে আছে, তাকে উনি অজ্ঞ স্নেহ করেন। কিন্তু এবার যেটা করলেন সেটা আমার কাছে একেবারে রহস্য। বাবার মতো শক্ত লোকের বাষ্পটি বছরে ভীমরতি ধরবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এর জন্য সাহী কি না তাও জানি না। তাই যখন শুনলাম আপনি এসে রয়েছেন পুরীতে, তাবলাম এবাবার দেখা করে যাই।'

'আপনার বাবার সেক্রেটারিটি কদিন রয়েছেন ?'

'তা বছর চারেক হবে। আমি সেক্রেটারি সিরে এসে তাঁকে দেখেছি।'

'কী রকম লোক বলে মনে হয়েছে আপনার ?'

'আমার পক্ষে বলা শক্ত। এক্ষুক বলতে পারি যে চিঠি টাইপ করা ইত্যাদি মোটামুটি জনলেও, বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চয়ই আনন্দ পেতেন না।'

'তা হলে আপনাকে যবর দিই—আপনার বাবার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁথিটি আজ চুরি হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সেক্রেটারিও উধাও।'

মহিমবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'বলেন কী ! আপনি গিয়েছিলেন ওখানে ?'

'আজ্জে হ্যাঁ।'

'কী রকম দেখলেন বাবাকে ?'

'হত্তাবতই মুহূর্মান। তাঁর মুগুরে ওখে দুমোনোর অভ্যাস হয়েছে আজকাল ; আগে ছিল কি না জানি না। আজ বিকেলে সাড়ে ছটায় নাকি একজন আমেরিকান তত্ত্বজ্ঞেকের আসবার কথা ছিল। নিশ্চীথবাবুই অ্যাপয়েটেইন্সের ব্যাপারটা দেখেন, কেউ এলে উনিই সঙ্গে করে নিয়ে যান। আজ উনি ছিলেন না। চাকর ছিল, সে-ই সাহেবকে নিয়ে যায় ওপরে। আপনার বাবা সাধারণত সাড়ে চারটের মধ্যে উঠে পড়েন, কিন্তু আজ উঠতে হয়ে গেছিল প্রায় ছাটা। যাই হোক, সাহেব পুঁথি দেখতে চায়। মিঃ সেন আলমারির দেরাজ খুলে দেখেন শালুর মোড়ক ঠিকই আছে, কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে দুটো কাঠের মাঝখানে ফালি করে কাটা এক গোছা সাদা কাগজ। আপনার বাবা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন, শেষটায় ওই আমেরিকানই পুলিশে ফোন করেন।'

'কিন্তু তার মানে নিশ্চীথবাবুই কি— ?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। তত্ত্বজ্ঞেকের সঙ্গে সকালে স্টেশনে দেখা হয়েছিল।

এখন মনে হচ্ছে টিকিট কিনতে গিয়েছিলেন ; কারণ তাঁর ঘরে সুটকেস-বেড়ি
নেই। স্টেশনে গিয়েছিল পুরিশ, কিন্তু ততক্ষণে পূরী এক্সপ্রেস, হাওড়া প্যাসেজার
দুটোই চলে গেছে। অবিশ্বাস ওরা পরের স্টেশনত্ত্বাতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে।'

আমরা তিনজনেই চূপে। এর মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেছে শুনে মাথা ভৌঁ ভৌঁ
করছে।

'আপনার বাবা গত বছর মেপালে গিয়েছিলেন সে খবর জানেন ?'

মহিমবাবু বললেন, 'অগস্টের পর গিয়ে থাকলে জানার কথা নয়, কারণ আমি
তখন থেকে সাত মাস দেশের বাইরে। বাবা পুরিশ থেঁজে অনেক জায়গায়
যেতেন। কেন, মেপালে কী হয়েছিল ?'

ফেলুদা এ প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনার বাবার গাউট হয়েছে
এটাও কি আপনার কাছে নতুন খবর ?'

মহিমবাবু যেন আকৃশ থেকে পড়লেন।

'গাউট ? বাবার গাউট ?'

'বিশ্বাস করা কঠিন ?'

'খুবই। গত বছর যে মাসেও দেখেছি বাবা তোরে আর সঙ্গায় সমুদ্রের ধারে
বালির উপর দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে চলেছেন। ওলার খাওয়া-দাওয়া ছিল পরিমিত,
ড্রিন্ক করতেন না, কোনওরকম অনিয়ন্ত্র করতেন না। স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর একটা
অহংকার ছিল। বাবার গাউট হলে খুবই আশ্চর্য হব, এবং খুবই ট্র্যান্সিক ব্যাপার
হবে।'

'এটাই কি তাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থার কারণ হতে পারে ?'

'তা তো পারেই,' বেশ জোরের সঙ্গে বললেন মহিমবাবু। 'নিজেকে পক্ষ বলে
মেনে নেওয়াটা বাবার পক্ষে খুবই কঠিন হবে।'

ফেলুদা বলল, 'আমি রয়েছি আরও কয়েকদিন। দেখি যদি কিছু করতে পারি।
আমার কাছে অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত খোয়াটে।'

মহিমবাবু উঠে পড়ে বললেন, 'আমি এসেছি বাবার সঙ্গে আগদের পুরনো
ব্যবসা সংক্ষেপ কিছু জরুরি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে। সেটা যদিন না সম্ভব
হচ্ছে, তদিন আমাকেও থাকতে হবে।'

ভবলোক চলে যাবার পর শুভে শুভে প্রায় বারোটা হল।

পাশের ঘর থেকে লালমোহনবাবু শুভনাইট করতে এলেন, যেমন যোজনা
আসেন। তাঁর কমরেট আজ সকালে চলে গেছেন, তাঁনি এখন একা। বললেন,
'ভাল কখন, আপনি তো আজ কাঠমানুড়ে যোন করেছিলেন।'

'তা করেছিলাম।'

'কী ব্যাপার ঘটেছিল ?'

'বীর হাসপাতালের ডাঃ তার্বিকে জিজ্ঞেস করলাম, গত অক্টোবরে বিলাস
মজুমদার নামে কোনও ব্যক্তি হেভি ইনজুরি নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল কি
না।'

'কী ফললেন ?'

‘বললেন, হ্যাঁ। শিন্বোন, কলারবোন, পৌজুরার হাড়, ধূতনি—সব বললেন।’

‘আপনার বুঝি মজুমদারের কথা বিশ্বাস হয়নি ?’

‘সন্দেহ জিনিসটা গোয়েন্দাগিরির একটা অপরিহার্য অঙ্গ লালমোহনবাবু। কেন, আপনার পরের গোয়েন্দা প্রথর কুন্দ কি ওই বাতিক থেকে মুক্ত ?’

‘না না, তা তো নয়—মোটেই নয়...’ বিড়বিড় করতে করতে ভদ্রলোক ফিরে গেলেন ওর ঘরে।

বেশি রাত হলেই সমুদ্রের পর্জন শোনা শায় আমাদের ঘর থেকে। আমি জানি ফেলুদার মনের মধ্যেও চেউয়ের শুষ্ঠা-নামা চলেছে, যদিও বাইরে দেখছি শাস্তি গাঞ্জীর্য। এটাও অবিশ্য সমুদ্রেরই একটা রূপ। এই রূপটা নুলিয়ারা দেখতে পায় মাছের নৌকো করে ত্রেকারস পেরিয়ে গেলে পর।

‘ওটা কী ফেলুদা ?’

বেজসাইড ল্যাম্পটা নেভাতে গিয়ে দেখি ফেলুদা প্রকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা টৌকো ভ্রাউন রঙের জিনিস বার করে দেখছে।

ভাল করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা মানিব্যাগ।

ব্যাগটার ভিতর থেকে কয়েকটা দশ টাকার নেট বার করে অন্যমনক ভাবে দেখে সেগুলো আবার ভিতরে পুরে দিয়ে ফেলুদা বলল, ‘এটা নিশ্চীথবাবুর দেরাজে কিছু কাগজপত্রের তলায় ছিল। আশ্চর্য। লোকটা বাক্স বিছানা নিয়েছে, অথচ পার্সটাই ভুলে গেছে।’

চোখ শুল্পতেই যখন দেখলাম ফেলুদা যোগ ব্যায়াম করছে, তখন বুঝলাম সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি । অথচ এটা জানি যে ও অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাম্প জ্বালিয়ে কাজ করেছে ।

একটা শব্দ শুনে বারান্দার দিকের জানালাটির দিকে চাইতে দেখি, লালমোহনবাবুও এরই মধ্যে উঠে পড়ে টুথব্রাশে ওর প্রিয় লাল সাদা ডোরাকটা সিগন্যাল টুথপেস্ট সাগাচ্ছেন । বুঝলাম, আমাদের দুজনের মনের একই অবস্থা ।

ফেলুদা ব্যায়াম শেষ করে বলল, 'চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব ।'

'কোথাও যাবার আছে বুঝি ?'

'মাথাটা পরিষ্কার করা দরকার । বিশালত্বের সামনে পড়লে স্টো সময় সহজ হও । ভোরের সমুদ্রের দিকে চাইলেই একটা টনিকের কাজ দেয় ।'

বেরোবার আগে শ্যামলাঙ্গ বারিকের ঘরে গিয়ে ফেলুদা বলল, 'শুনুন, কয়েকটা ব্যাপার আছে । বেপালে একটা কল বুক করতে হবে, এই নিন নস্তুর । আর মহাপাত্রের কাছ থেকে কোনও মেসেজ এসে রেখে দেবেন । আর, হ্যাঁ—এখানে ধূৰ ভাল আসোপ্যাদিক ভাস্তার কে আছে ?'

'কটা চাই ? আপনি কি ভাবছেন অজ পাড়াগাঁয়ে এসে পড়েছেন ?'

'বুঝো হ্যাঁড়া হলে চলবে না । ইয়াং টৌকস ভাস্তার চাই ।'

'বেশ তো, ভাঃ সেনাপতি আছেন । আ্যান্ড রোডে উৎকল কেমিস্টে চেম্বার আছে । সকালে দশটার পর গেলেই দেখা পাবেন ।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম ।

সমুদ্রের ধারে মানের লোক এখনও কেউ আসেনি, শুধু নুলিয়া ছাড়া আর কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না । পুরের আকাশ ফিকে লাল, ছাই বাতের মেঘের চুকরোগলোর নীচের দিকটা গোলাপি হয়ে আসছে । সমুদ্র কালচে নীল, শুধু তীরে এসে ভাস্তা চেউয়ের মাধ্যাগলো সাদা ।

প্রথমদিন এসে যে তিনটে নুলিয়া ছেলেকে তীরে বনে খেলতে দেখেছিলাম, কাঁকড়া সবক্ষে তাদের ভীষণ কৌতুহল । ওই কাঁকড়াই হল লালমোহনবাবুর মতে পুরীর সমুদ্রতটের একমাত্র মাইনাস পয়েন্ট ।

'কী নাম রে তোর ?'

তিনটে নুলিয়া ছেলের একটার মাধ্যম পাগড়ির মতো করে বাঁধা লাল কাপড় ; সে ফেলুদার প্রশ্নে দাঁত বার করে হেসে বলল, 'রামাই, বাবু ।'

আমরা এগিয়ে চললাম। সালমেহলবাবুর কবিতাভাব জেগে উঠেছে, বললেন, 'এই উদ্ধৃতি উদার পরিবেশে রাখপাত ! ভাবা যাই না মশাই !'

'ই—ব্রান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট...' অন্যমনস্তভাবে বলল ফেলুন। আমি জানি অন্ত দিয়ে খুনটা সাধারণত তিনি রকমের হয়। এক হল আগ্রহীজ দিয়ে—যেমন রিভলভার পিস্টল ; দুই : শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট, যেমন ছেরা-ছুরি-চাকু ইত্যাদি ; তিনি হল ব্রান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট বা ভোঁটা হাতিঘাঁট, যেমন ভাঙা জাতীয় কিছু। বেশ বুঝতে পারলাম ফেলুন কাল রাতে ওর মাথায় বাড়ি লাগাব কথাটা ভাবছে। সত্যি, ভাবলে রাজ্ঞ জল হয়ে যায়। ভাগ্যে আঘাতটা মোক্ষ হয়নি।

'ফুটপ্রিস্টস...' ফেলুন বলে উঠলেন।

একটু এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেলাম টাটকা পায়ের ছাপ। জুতো, আর সেই সঙ্গে বী হাতে ধরা খাটি।

'বিলাসবাবু খুব আলি রাইজার বলে মনে হচ্ছে, মন্তব্য করলেন সালমেহলবাবু।

'বিলাসবাবু ? বিলাসবাবু বলে মনে হচ্ছে কি ? দেখুন তো ভাল করে—দূরে সামনের দিকে দেখিয়ে বলল ফেলুন।

এত দূর থেকেও বুঝতে পারলাম, যিনি বালিতে দাগ ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলেছেন তিনি মোটেই বিলাসবাবু নন।

'তাই তো !' বললেন সালমেহলবাবু, 'ইনি তো দেখছি আমাদের সেমসেশন্যাল সেন সাহেব !'

'ঠিক ধরেছেন। দুর্গাগতি সেন।'

'কিন্তু তা হলো গোটে বাত ?'

'সেইখানেই তো ভেজকি। লক্ষণ ভট্টাচার্যের ওয়ুধের গুণ বোধহয় !'

মনে ধীরাটো ভাব নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। রহস্যের পর রহস্য মেন চেউয়ের পর চেউ।

বাঁয়ে রেলওয়ে হোটেল দেখা যাচ্ছে। তাইনে গোটা পাঁচক নুলিয়া আর সুইমিং ট্রাইস পরা তিনজন সাহেব। তার মধ্যে একজন ফেলুন্দার দিকে হাত তুললেন।

'গুড মর্নিং !'

আল্বারে বুঝলাম ইনিই কালকের সেই পুঁজিশকে ফোন করা আছেরিকান।

আমরা এগিয়ে গেলাম। ওই যে হিঙ্গোরানি আসছেন, কাঁধে তোয়ালে। ভারী অপসর মনে হচ্ছে তপ্রলোককে। আমাদের দিকে দেখলেনই না।

আমার মন কেন জানি বলছে ফেলুন সাগরিকায় যাজ্ঞ, কারণ ও সমুদ্রের ধারের বালি ছেড়ে বাঁয়ে চড়াইয়ে উঠতে শুরু করেছে। সুর্যের আধ্যাত্মা কিন্তু এর মধ্যেই উঠে বলে আছে। ফেলুন্দার মাথা বিশালত্বের সাথে পড়ে পরিষ্কার হয়েছে কি ?

'প্রাতঃপ্রেগাম !'

গণৎকার মশাই এগিয়ে আসেছেন বালির উপর দিয়ে, লুঙ্গিটা খাটো করে পরা,

কাঁধে তোয়ালে, হাতে নিমের দাঁতন ।

‘কাল কোথায় ছিলেন ?’ ফেলুনা জিজ্ঞেস করল ।

‘কখন ?’

‘সঙ্কেতেলা ; আপনার শৌক করেছিলাম ।’

‘ওহো ! কাল গেসলাম কের্নে শুনতে । মংগলাঘাট রোডে একটা কের্নের দল আছে ; মাঝে-মধ্যে যাই ।’

‘কখন গিয়েছিলেন ?’

‘আমার তো ছাটার আগে ছুটি মেই । তারপরেই গেসলাম ।’

‘আপনি তো ও বাড়ির বাসিন্দা, তাই ভাবছিলাম চুরির ব্যাপারে যদি কোনও আলোকপাত করতে পারেন । আপনার ঘর থেকে পশ্চিমের গলিটা তো দেখা যাই ।’

‘তা তো যাইছি, তবে পশ্চিমের গলিতে যা দেখেছি তাতে খুব অবাক হইনি,’
বললেন লক্ষণ ভট্টাচার্য । ‘নিশ্চীথবাবুকে দেখলাম তাঁরতরা নিয়ে বেঙ্গতে । তা উনি যে কলকাতায় যাবেন সেটা তো কদিন থেকেই ঠিক ছিল ।’

‘তাই মুখি ?’

‘ওর মা-র যে এখন-তখন অবস্থা । টেলিফোম এসেছিল কদিন আগে ।’

‘বটে ? আপনি দেখেছিসেন সে টেলিফোম ?’

‘শুধু আমি কেন ? সেন মশাইও দেখেছিসেন ।’

ফেলুনা অবাক ।

‘আশ্চর্য ! সেন মশাই তো সে কথা বললেন না ।’

‘সে আর কী বলের বলুন ! উনি মানুষটা কী রকম সেটা তো আপনায়ও দেখলেন । দুর্ভোগ আছে আর কী । কপালের লিখন খন্দাল কার সাধি বলুন ?’

‘আপনি যিঃ সেনেরও ভাগ্য গণনা করেছেন নাকি ?’ ভারী ব্যক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু ।

‘এ তাঁরটো কার করিনি ? কিন্তু করলে কী হবে ? সবাইকে তো আর স্বত্ব কথা বলা যায় না । অবিশ্যি ব্যারাম-ট্যারামের লক্ষণ দেখলে বলি ; তাই বলে, আপনি খুন করবেন, আপনার জেল হবে, ফাঁসি হবে, অপঘাতে মৃত্যু আছে আপনার—এ সব কি বলা যায় ? তা হলে আর কেউ আসবে না মশাই । আসলে লোকে ভালটোই শুনতে চায় । তাই অনেক হিসেব করে ঢেকে-চুকে বলতে হয় ।’

লক্ষণ ভট্টাচার্য বিদায় জানিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন । আমরা এগিয়ে চললাম সাগরিকার দিকে । সকালের মৌসুম পড়ে বাড়িটাকে সত্ত্বাই সুন্দর দেখাচ্ছে ।

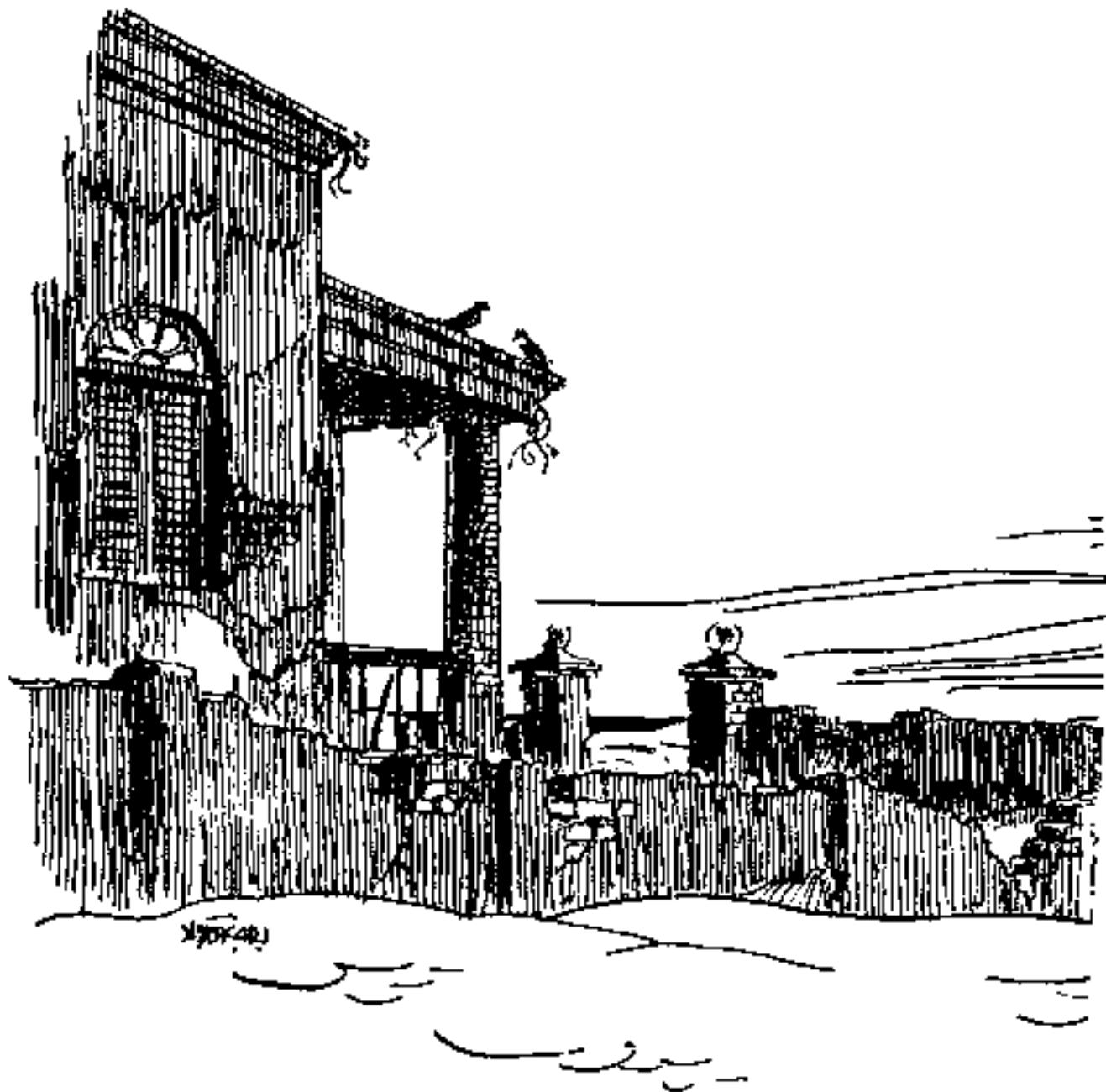
‘হত্যাপুরী’, বললেন লালমোহনবাবু ।

‘সে কী মশাই ?’ প্রতিবাদের সুরে বলল ফেলুনা, ‘হত্যা কোথায় ইল যে হত্যাপুরী বলছেন ? বরং চুরিপুরী বলতে পারেন ।’

‘নট সাগরিকা,’ বললেন লালমোহনবাবু । —‘আমি এ দিকের বাড়িটার কথা বলছি ।’

সাগরিকা থেকে আন্দাজ ত্রিশ গজ এই দিকে বালিতে বসে যাওয়া এই বাড়িটার কথা আগেই বলেছি। লালমোহনবাবু খুব ভুল বলেননি। এমনিতেই পোড়া নোনাধরা বাড়ি দেখলে কেমন গা ছমছম করে, এটার আবার তসার দিকের হাত-পাঁচেক বালিতে বসে যাওয়াতে, আর কাহাকাহি অন্য কোনও বাড়ি না থাকাতে সত্যিই বেশ ভুতুড়ে মনে হচ্ছিল। সিনের ক্ষেত্রেই এই, রাত্রে না জানি কী রূক্ষম হবে।

অন্যান্য দিন বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে যাই, আজ একটু কাছ থেকে দেখার লোভ সামলাতে পাইল না বোধহয় ফেল্দুদা। ফটকের ধামগুলো এখনও রয়েছে, তার একটার গায়ে কালসিটে মেঝে যাওয়া ক্ষেতপাথরের ফলকে সেখা 'ভুজঙ্গ নিবাস'। বালি আর এক হাত উঠলেই ফলকটা ঢাকা পড়ে যাবে। ফটক পেরিয়ে বোধহয়



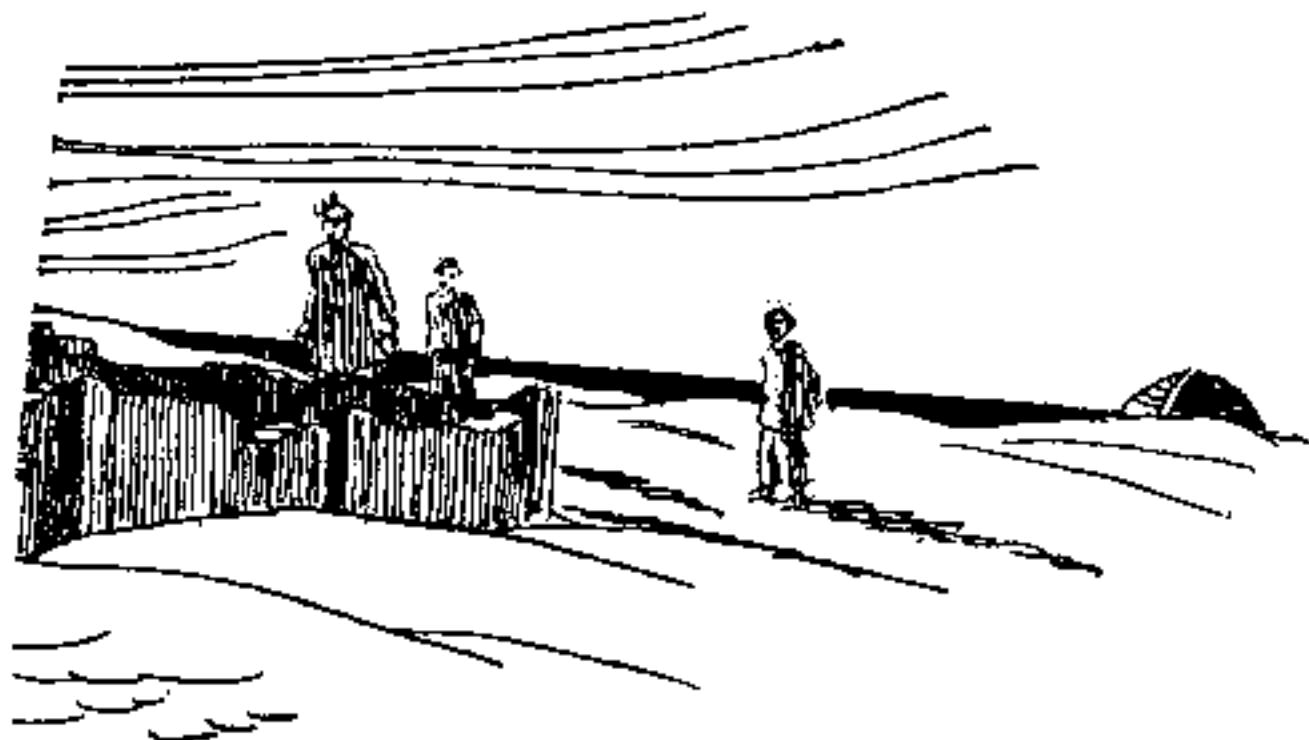
এককালে একটা ছোট্ট ধাগান ছিল, তাত্পরেই সিডি উঠে গিয়ে বারান্দা। সিডির শুধু উপরের দুটো ধাপ বেরিয়ে আছে, বাকিগুলো বাস্তির নীচে। বারান্দার রেসিং ক্যে গেছে, ছাত যে কেন ধসে পড়েনি জানি না। বারান্দার পরে যে ঘর, সেটা নিশ্চয়ই বৈঠকখানা ছিল।

‘একেবারে পরিত্যক্ত বলে তো মনে হচ্ছে না,’ ফেলুদা মন্তব্য করল। করার কারণটা স্পষ্ট। লোকের যাতায়াত আছে, সেটা বারান্দার বাস্তির উপর পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যায়।

‘আর দেশলাইনের কাঠি, ফেলুদা।’

একটা নয়, তিন-চারটে। সিডি উঠেই বারান্দার বাঁদিকের ধামটার পাশে।

‘সমুদ্রের হাতওয়ায় লিগারেট ধরাতে গেলে কাঠি খরচ একটু বেশি হবেই।’



আমরা ফটকের মধ্যে চুক্কাম। সাধারিত ফৌজহল হচ্ছে বাড়িটার ভিতরে চোকার। মরজা নিষ্ঠাই খেলা যায়, কারণ দমকা বাতাসে সেটা খটখট করে নড়ছে; একেবারে যে ঝুলছে না, সেটা ঘরের মেঝেতে জমে থাকা বালিতে বাধা পাওয়ার জন্য।

পায়ের ছাপগুলো ফেলুন খুব মন দিয়ে দেখল। আয় দেখা যায় না বললেই চলে, কারণ ফ্রাগতই হাওয়ার সঙ্গে বালি এসে তার উপর জমা হচ্ছে।

কিন্তু জুতোর ছাপ তাতে সন্দেহ নেই।

এ ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে সেটা পা দিয়ে থানিকটা বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল।

আমার মনে হল পানের পিক, যদিও সালমোহনবাবুর মতে নিঃসন্দেহে খাব।

বালমোহনবাবু একবার মনুষের 'ক্রেকফাস্ট' কপাটা বলাতে দুবালাম ওঁর আর এগেতে সাহস হচ্ছে না। আমারও বুক টিপটিপ করছে, কিন্তু ফেলুন নির্বিকার।

'তা হলে হত্যাপুরীতে একবার প্রবেশ করতে হয়।'

এটা জানাই ছিল। এতদূর এসে পায়ের ছাপটাপ দেখে ফেলুন চট করে পিছিয়ে যাবে না।

কাঁচ শব্দে দরজার দুটো পালাই খুলে গেল ফেলুনার দু হাতের চাপে।

বাসুড়ে গঞ্জ। বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না, কারণ ভিতরে জানালা থেকে থাকলেও তা নিশ্চয়ই বন। আর মরজা দিয়ে যে আলো চুক্কবে তার পথ আপাতত আমরাই বন্ধ করে রেখেছি।

ফেলুন চৌকাঠ পেরোল। আমি জানি খুটখুট বাণিজ হলেও ও বিধা ক্ষত না, তক্ষণ হত এই যে ওর সঙ্গে তখন ইয়াতো ওর কোট রিভলভারটা ধাক্কত।

'আসুন ভিতরে।'

আমি চুকে গেছি, কিন্তু সালমোহনবাবু এখনও চৌকাঠের বাইরে। —'জল ক্লিয়ার কি?' অস্বাভাবিক ব্যক্তি চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'ক্লিয়ার তো বটেই। আরও ক্লিয়ার হবে ক্রমে ক্রমে। এসে দেখুন না কী আছে ঘরের মধ্যে।'

আমি অবিশ্য এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি।

প্রথমেই চোখে পড়েছে একটা ঢিনের ট্রাক আর শতরঞ্জিতে মোড়া একটা বেড়ি। ঘরের এক পাশে মেরালের সামনে যেমন-তেমন করে ফেলে থাকা হয়েছে সে দুটো।

'পুলিশের পাণ্ডুলি,' বলল ফেলুন, 'নিশ্চিত্যাবৃ যামনি'।

'তবে কোথায় গেলেন ভদ্রলোক?' লাস্যমোহনবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ফেলুন কথাটা প্রাণ্য করল না।

'ই—ভেবি ইটারেসিং।'

ঘরের এক কোণে স্কুপ করে রাখা রয়েছে সরু আর সর্থা-করে কাটা কাঠ, আর পাশেই ফিতেয় মোড়া দিস্তা দিস্তা যিকে হলদে রঙের সন্তা কাগজ।

'বলুন তো এ থেকে কী বোঝ যায়,' ফেলুন জিজ্ঞেস করল।



৪/১৫৯

‘ও তো পুঁথির কাঠ বলে মনে হচ্ছে । আর ওই, ইয়ে—’

লালমোহনবাবু এত সময় নিষেন কেন জানি না । অমি বললাম, ‘মনে হচ্ছে নিশ্চীথবাবু একেবারে ব্যবসা খুলে বসেছিলেন—তামি পুঁথি তৈরি করার । সাইজমাফিক কাগজ কেটে দুদিকে কাঠ ঢাপা দিয়ে শালুতে মুড়ে দিলে বাইরে থেকে ঠিক পুঁথি ।’

‘এগজ্যাস্টিলি,’ বলল ফেলুদা—‘আমার বিশ্বাস, সেন মশাইদের সব পুঁথিগুলো বার করে খুললে দেখা যাবে তার অনেকগুলোই কেবল সাদা কাগজ । আসলগুলো পাচার হয়ে গেছে হিস্তোরানি সম্প্রদায়ের সোকদের কাছে ।’

‘ও হো হো !’—লালমোহনবাবু টেঁচিয়ে উঠলেন—‘সাপ, সাপ ! সেদিন একটা কাগজের ফালি দেখেছিলাম সাগরিকার গলিতে—সে তা হলে এই কাগজ !’

‘নিঃসন্দেহে’ বলল ফেলুন।

এর পরে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা সিয়তে আমার হাত না কাঁপলেও, কুক কাঁপছে।

বৈঠকখানায় চুকেই ডাইনে-বায়ে মুখোমুখি দুটো দরজা রয়েছে পাশের দুটো ঘরে যাবার জন্য। লালমোহনবাবু ডানদিকের দরজাটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা সামনের দরজা খুলে ঢোকাতে সেটা দিয়ে শৌ শৌ শব্দে সমুদ্রের বাতাস চুকছিল। একটা নমকা হাওয়ার ফলে হঠাৎ ডাইনের দরজাটি প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল, লালমোহনবাবু চমকে উঠে খোলা দরজাটির দিকে চাইলেন, আর চাইতেই তাঁর চোখ কপালে উঠে গেল। ভদ্রলোক পড়েই বেডেন যদি না ফেলুন এক লাফে গিয়ে ওঁকে জাপটে ধরে ফেলত।

এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা লোক চোখ উলটে ঘরে পড়ে আছে পাশের ঘরের মেঝেতে। তার মাথা থেকে বেরোনো রক্ত চাপ বেঁধে আছে মেঝের উপর।

লোকটাকে চিনতে কোনওই অসুবিধা হল না।

ইনি দুর্গাপ্রতি সেনের সেক্রেটারি নিশীথ বোস।

ফেলুদার আর ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল না ।

রেলওয়ে হোটেল থেকে টেলিফোনে পুলিশ থবর দিয়ে আমরা আমাদের হোটেলে চলে এলাম । ফেলুদা বলল যে ওর দু-একটা কাজ আছে, বিশেষ করে নুলিয়া বস্তিতে একবার যাওয়া দরকার, কাজেই ও একটু পরে ফিরবে । লাশ ছৌরাছুয়ি না করেই ও বলল যে, বোঝাই যাচ্ছে সোকটাকে মারা হয়েছে একটা ক্লাস্ট ইন্স্ট্রুমেন্ট দিয়ে—যদিও সে ধরনের কোনও হাতিয়ার কাছাকাছির মধ্যে পেলাম না ।

লালমোহনবাবু না জেনে মোক্ষম নাম দিয়েছিলেন বাড়িটার এটা স্বীকার করতেই হবে, যদিও পরে বলেছিলেন যে পুরী কথাটা বাড়ি অর্থে ব্যবহার করেননি । উনি মিন করেছিলেন পুরী শহর । ‘তিনি দিনের মধ্যে দু-দুটো খুন, হত্যাপুরী ছাড়া আর কী ?’

একটা সুখবর দিয়ে রাখি । দুর্গাগতিবাবুর সঙ্গে তাঁর ছেলের মিটমাট হয়ে গেছে । অস্তত দেখে তাই মনে হল । আমরা যখন ভুজঙ্গ নিবাস থেকে বেরোচ্ছ তখন সাগরিকার দিকে চোখ পড়তে দেখি ছাতে দুজন সোক । বাপ আর ছেলে । শুধু তাই নয়, ছেলে আমাদের দিকে হাত নাড়লেন, কাজেই বুবলাম খোশ মেজাজে আছেন । এটাও আমার কাছে কম রহস্য নয় ।

ফেলুদা যখন ঘরে এসে চুকল তখন পৌনে এগারোটা । আমার মনে পড়ে গেল নেপালে টেলিফোনের কথাটা । বললাম, ‘কলটা পেয়েছিলে ?’

‘এই তো কথা বলে আসছি ।’

‘কলটা কি কাঠমাণুতে করেছিলে ?’

‘উহ, পাটন । কাঠমাণুর কাছেই বাঘমতী নদী পেরিয়ে একটা পূরনো শহর ।’

লালমোহনবাবু বলসেন, ‘যাই বলুন, লাশের কাছে ভূত কিছুই না । এখনও ভাবলে শিকারিং হচ্ছে ।’

‘সব শিকারিং খরচ করে ফেলবেন না, রাস্তিরের জন্য কিছু হাতে রাখবেন ।’

‘রাস্তিরে ?’

আমরা দুজনেই ফেলুদার দিকে চাইলাম । ও একটা ওমলেটের আধখানা মুখে পুরে দিয়ে বলল, ‘এক পায়ে না হলেও, খাড়া থাকতে হবে আজ রাস্তিরে ।’

‘কেথায় ?’ লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন ।

‘দেখতেই পাবেন ।’

‘কারণটা কী ?’

‘আমতেই পাবেন।’

লালমোহনবাবু চুপ্সে গেছেন। অবিশ্বিত এটা ওঁর কাছে নতুন কিছু না।

‘সেনাপতি দিকি স্ট্রাট ডাক্টর,’ বলল ফেলুদা।

‘তুমি এর মধ্যে ডিস্পেনসারি ঘুরে এলে ?’

‘তত্ত্বাবক দুর্গা দেনের ট্রিটমেন্ট করেছেন সেটা জানলাম। এপ্রিলে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। ওশুধটা ওরই আনা।’

‘ডায়াপিড ?’—নামটা মনে ছিল তাই জিজ্ঞেস করলাম।

‘তোর প্রথ শুনে বুঝতে পারছি ওশুধটা তোর কোনও কাজে সাগবে না।’

খানা থেকে ফোন এল পৌনে বারোটায়। ডাক্তারের রিপোর্ট বলছে, নিশ্চী ধৰাবু খুন হয়েছেন গতকাল সঙ্গ্য ছটা থেকে রাত আটটার মধ্যে, আর তাঁকে হারা হয়েছে কোনও ইন্সুলিন ইনসুলিন দিয়ে। হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া যায়নি। তুজঙ্গ নিবাসের বাইরে গেটের ধারেই মনে হয় খুনটা হয়েছে, তারপর মৃতদেহ টেনে নিয়ে ওই ঘরে ফেলে দেওয়া হয়, কারণ বারান্দার বালির নীচে রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।

আমি একটা জিনিস আনাজ করছি, যদিও ফেলুদাকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি এখনও। যে লোক নিশ্চী ধৰাবুকে খুন করেছিল, সে সোকই ফেলুদার মাথায় বাড়ি মেরেছে, আর একই অঙ্গ দিয়ে। তাই ফেলুদার মাথায় রক্ত লেগে ছিল।

সাড়ে বারোটা নাগাত ভাবছি লাখটা দেরে নেওয়া যায় কি না, কারণ লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই বলছেন রামাঘর থেকে টেলিফিক পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ পাচ্ছেন, এমন সময় বিলাস মজুমদার এসে হাজির।

‘কী মশাই, যাবেন নাকি ?’ ঘরে চুক্তেই ভদ্রমোকের প্রশ্ন।

‘কোথায় ?’—ফেলুদা বিছানায় কাত হয়ে শয়ে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ওর খাতায় কী যেন লিখেছিল।

‘চুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের এয়ার-কন্ডিশন লিমুজিন। হ্যাজের জাহাঙ্গা, মাত্র দুজন যাচ্ছি। আমি, আর একটি অ্যামেরিকান—নাম স্টেডম্যান। ভাবতে পারেন—এও ওয়াইস্ট লাইফ ! কেওনবারগড় যাচ্ছে। খুব মিশুকে। ভাল খাগত আপনার।’

‘কখন বেরোচ্ছেন ?’

‘লাখ থেরেই।’

‘না, থ্যাক ইউ,’ বলল ফেলুদা, ‘আমার একটু কাজ আছে। বরং আপনি যদি থেকে যেতেন তো পুরীর ওয়াইস্ট লাইফের কিছুটা নমুনা দেখে যেতে পারতেন।’

‘মো, থ্যাক ইউ,’ হেসে বললেন বিলাস মজুমদার।

তত্ত্বাবক ঘর থেকে বেরোনোর মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা ভাবী অ্যামেরিকান গাড়ির শব্দ পেলাম। বুরুলাম গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল।

শেব কবে যে চাপা উন্তেজনার মধ্যে একটা সময় কাটাতে হয়েছে তা ভেবে মনে করতে পারলাম না ।

বাস্তিরের খাওয়া সারার প্রায় ঘণ্টা খানেক পর দুটা নাগাত ফেলুনো বলল যে যাবার সময় হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দিল যে যদিও ওর মন বলছে যে একটা কিছু ঘটতে পারে, প্রত্যন্ত যে হবে না এমন কোনও গ্যারান্টি নেই । —‘ফিটফট স্মার্ট হয়ে নে । ওসব কৃত্তি পাহাজামা চলবে না । সাদা জামা চলবে না । অঙ্ককারে গাঁচাকা দেখার জন্য কী পরতে হয় সেটা আশা করি আর বলে দিতে হবে না ।’

না : তার দরকার নেই । পার্ক ট্রিটের গোরস্থানেও আমাদের ঠিক এই কাজই করতে হয়েছিল ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম তারা দেখা যাচ্ছে না । লাঙমোহনবাবু এমনিতেই ঘন ঘন আকাশের দিকে দেখেন, তবে সেটা তারা দেখার জন্য নথ, স্কাইল্যাবের চিহ্ন দেখার জন্য । আজ সমুদ্রের দিক থেকে প্রচণ্ড হাওয়া বইছে দেখে বললেন, ‘হাওয়া উলটোমুখো হলে টুকরোগুলো তাও সমুদ্রে পড়ার চাপ ছিল । এখন কিসু বলা যাব না ।’

ভুজঙ্গ নিখাসের জাগিদিকে যদিও বয়সি, বিচটা কিন্তু বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট গজ পূর্বে । যেখানে বিচ শুরু হয়েছে সেখানে রেলওয়ে হোটেল থেকে যাবা নান করতে আসে তাদের জন্য বাশের খুঁটির ওপর হোগলা দেওয়া কয়েকটি ছাউনি রয়েছে । তারই একটার পাশে এসে ফেলুনো থামল ।

পঞ্চিম নিকের আকাশটা শহরের আলোর জন্য খালিকটা ফিকে, আমাদের পিছনে সমুদ্রের দিকে গাঢ় অঙ্ককার । সামনের দিকে লোক হেটে গেলে তাকে হায়ার্টির মতো দেখা যবে, কিন্তু চেমা যবে না । সে লোক কিন্তু আমাদের দেখতেই পাবে না ।

মনে মনে বঙ্গাম, মোক্ষম জয়গা বেছেছে ফেলুনো, যদিও কেন বেছেছে জানি না, জিঞ্জেসে করলেও কোনও উত্তর পাব না । ওর এই অভ্যন্তরীন জন্ম লালমোহনবাবু একবার বলেছিলেন, ‘আপনি মশাই সাসপেশ ফিলিম তৈরি কৰুন । শোকে দেখে নম ফেলতে পারবে না । কোথায় সাগে হচকিক্ষ ।’

সাগরিকার তিনতলায় দুগাগতিবাবুর ঘরে এখনও আলো জ্বলছে ; দোতলার আলো এইমাত্র নিভল । পাঁচিলের উপর দিয়ে সম্মুখ ডট্টাচার্যের একতলার ঘরের জানলার একটি ফালি দেখা যাচ্ছে ; বুরতে পারছি সে ঘরে এখনও আলো জ্বলছে ।

আমরা তিনজনেই ছাউনির তলায় বালির উপর বসেছি । কথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই না, আর বলতে হলেও গলা না তুললে হাওয়ায় আর সমুদ্রের গর্জনে কথা হারিয়ে যবে । চোখ খালিকটা সবে এসেছে অঙ্ককারে ; ডাইনে চাইলে বেশ বুরতে পারছি ডট্টাচার্যের কানের পাশের চুলগুলো বাতাসে মোরগের ঝুঁটির মতো খাড়া হয়ে উঠেছে । বাঁয়ে ফেলুনো ; ও এইমত্তে বী কব্জিটা চোখের কাছে এনে ওর রেভিয়াম-ডায়াল ঘড়িটাতে সময় দেখল । তারপর বুকলাম বেলাতে হাত চুকিয়ে

একটা জিনিস ব্যব করে শুরু চোখের সামনে ধরল ।

ওর জাপানি বাইনোকুলার ।

ফেলুদা কী দেখছে জানি ।

দৃশ্যমাত্র সেনকে দেখা যাচ্ছে খর শোবার ঘরের জানালায়, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দু পা বাঁয়ে সরে ভান হ্যাত বাড়িয়ে কী জানি একটা তুলসেন ।

গেলাস ।

কী খেলেন ভদ্রলোক গেলাস থেকে ?

একজনার ঘরে বাতি এইমাত্র নিডে গেছে, এবাতি তিনজনার বাতি নিডল, আর নিডতেই আমাদের আশেপাশের অস্তিকার হেন হঠাৎ আরও গাঢ় হয়ে গেল ।

কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে কেউ নড়াচড়া করলে খেশ বুবুতে পারছি ।

যেমন লালমোহনবাবু তাঁর পকেট থেকে টর্চটা বার করলেন ।

কিন্তু কেন ? কী মতলব ভদ্রলোকের ?

আমি ঝুকে পড়ে ওর কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বললাম, 'জ্বালাবেন না, খবরদার !' ভদ্রলোক উন্নরে আমার কানে মুখ এনে বললেন, 'ব্রাউ ইনস্টুমেন্ট, হাতে থাক ।'

উনি মুখ সরিয়ে নেওয়ার প্রীয় সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস দেখে আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে চলে এল ।

ডাইনে হ্যাত দশেক দূরে আরেকটা হোগলার ছাউনি ।

তাঁর পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ।

কখন এসেছে জানি না ।

লালমোহনবাবুও দেখেছেন, কারণ খর কাঁপা হ্যাত থেকে টর্চটা ঝুপ শব্দ করে বালির উপর পড়ে গেল ।

আর ফেলুদা ?

ও দেখেনি ।

ওর দৃষ্টি সোজা সাগরিকার দিকে ।

আমিও জোর করে চোখ সেই দিকেই ঘোরালাম ।

আর তাই বোধহয় ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটাকে দেখতে পেলাম ।

সাগরিকার দিক থেকে লোকটা আসছে আমাদের দিকে ।

না, এই দিকে না । তুজন্ম নিবাসের দিকে ।

লোকটাকে চেনার কোনও উপায় নেই ।

এগিয়ে এল । এই তো তুজন্ম নিবাসের গেটের পাস ।

গেটের কাছাকাছি পৌছে লোকটা হাঁটার গতি কমাল, তারপর হাঁটা থামল ।

এবারে আরেকটা লোক । এতক্ষণ দেখিনি । বোধহয় বাড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ।

ধিতীয় লোকটা প্রথম লোকটার দিকে এগিয়ে গেল ।

গেটের সামনে এখন দুজন লোক ।

এবার দুজনে ভাগ হল । যে সাগরিকার দিক থেকে এসেছিল সে আবার



ফিরে—

সর্বনাশ ! লালমোহনবাবুর অসাবধান আঙুলের চাপে উঁর পাগলা টু ক্লে উঠেছে !

ফেনুদা এক থামড়ে টেটা বালিতে ফেলে দিল, আর সেই মুহূর্তে লালমোহনবাবুর চার ইঞ্জি ডাইনের বাঁশের খুটিটাতে কান-ফটানো শব্দের সঙ্গে একটা গুসি এসে লাগলো ।

‘তুই ওটাকে ধর !’

ফেনুদা হাউইয়ের মতো শাফিয়ে উঠে ছুটে গেছে দ্বিতীয় লোকটাকে লক্ষ্য করে ।

আশ্চর্য এই যে ওই একটা কথাতেই দেখলাম যে বিপদের তোয়াক্তা না করে আমিও মিশন্সে তীরবেগে ছুটতে শুরু করেছি বালির উপর দিয়ে প্রথম লোকটাকে লক্ষ্য করে ।

ফেনুদার আর আমার পথ ভাগ হয়ে গেল ।

রাগবি খেলায় যেমন ফ্লাইং ট্যাক্স করে একজন খেলোয়াড় আরেকজনের উপর বাপিয়ে পড়ে তাকে আপটে ধরে, আমিও ঠিক সেই ভাবে অব্যর্থ লক্ষ্য লোকটার পা দুটোকে জাপটে ধরলাম ।

লোকটা হৃষি খেয়ে পড়ল বালির উপর। আমি লোকটার পিঠে, আমার দৃষ্টি ঘুরে গেছে ফেলুদার দিকে।

একটা হাড়ে-হাড়ে সংঘর্ষের শব্দের সঙ্গে ফিকে আকাশের সামনে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি আরেকটা ছায়ামূর্তিকে ঘুসি মেরে ধরাশায়ী করল।

ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু এসে পড়েছেন, এবং এসেই মহা বিক্রমে আমার হাতে বন্দি লোকটার সাথা সঙ্গে করে তাঁর হাতের ব্রাটে ইনস্ট্রুমেন্টটা নিষ্কেপ করেছেন। একটা ডোঁতা শব্দে বোৰা গেজ হাতিয়ার জন্মজ্ঞান হয়ে এখন বালিতে শুটোপুটি আছে।

‘ওকে নিয়ে আয় এদিকে !’

আমরা দুজনে লোকটার দুই পা ধরে বালির উপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলাম যেখানে রয়েছে ওরা দুজন। ফেলুদা দাঁড়ানো, অন্য লোকটি চিত, ফেলুদার একটা পা তার পেটের উপর, আর অন্যটা ডান হাতের তেলোর উপর—যে হাত থেকে রিভলভারটা আলগা হয়ে পড়ে আছে বালিতে।

‘আপনার খুতনিতে ক্ষতিহ্ব ছিল না, কিন্তু আজ থেকে থাকবে।’

আমার শ্বয়াইশ্বর সাইফ কথাটা মনে পড়ল। অন্তত হিংস্র চেহারা নিয়ে টর্চের তীব্র আলোতে কপাল কুচকে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন বিলাস মজুমদার, তাঁর বাঁ হাতে আঁকড়ানো রয়েছে লাল শালু দিয়ে মোড়া একটা পুরি।

ফেলুদা ঘুঁকে পড়ে এক ঝটকায় পুরিটা ছিনিয়ে নিরে নিজের বোলার মধ্যে রেখে দিল।

তারপর ওর টর্চ ঘুরে গেল আমাদের বন্দির দিকে।

‘আপনার থার্ড আই কী বলছে জন্মণবাবু ? শেষটায় এই ছিল আপনার কপাসে ?’

অঙ্ককার থেকে আরও লোক বেরিয়ে এসেছে।

‘আসুন মিঃ মহাপাত্র,’ ফেলুদা হাঁক দিল। —‘ঁদের দুজনকে তুলে দিছি আপনাদের হাতে, তবে কাজ ফুরোয়ানি। আমরা হত্যাপূর্ণীর বৈঠকখানায় একটু বসব। এঁরা দুজনও থাকবেন।’

চারজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে বিলাসবাবু আর জন্মণবাবুকে তুলে নিল।

‘মহিমবাবু আছেন তো !’ ফেলুদা পিছনের অঙ্ককারের দিকে ফিরে থপ্প করল।

‘আছি বইকী !’

অঙ্ককার থেকে সেই রহস্যজনক চতুর্থ ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। —‘বাবাও এসে পড়লেন বলে। ওই যে টর্চের আলো।’

‘কোনও চিন্তা নেই’ বললেন, মিঃ মহাপাত্র, ‘মোড়া এনে রাখা হয়েছে ঘরে—সবাই বসতে পারবেন।’

লালমোহনবাবুর ‘বইয়েই তো বেশ—’ কথাটা কারুর কানে গেল কি না জানি না, কারণ সবাই গুণ্ডা দিয়েছে ভুজঙ্গ নিবাসের দিকে।

‘আসুন, মিঃ সেন, আপনার জন্যই ওয়েট করছি।’

ফেলুনা এগিয়ে গেছে দরজার দিকে।

মহিমবাবু তাঁর খাবাকে নিয়ে ঢুকলেন। তিনটে লঠন ঘুলছে ঘরের ভিতর।
পুলিশের লোক খাড়পোছ করে ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

দুর্গাগতিবাবু আবু মহিমবাবু দুটো পাশাপাশি মোড়ায় বললেন।

‘এই নিন আপনার কলসুত্র।’

ফেলুনা সদ্য-পাওয়া পুঁথিটা দুর্গাগতিবাবুর হাতে দিলেন। ভদ্রলোক একটা
স্থিতির নিষ্পাস ফেঁজে তক্ষুনি আবার গঞ্জীর হয়ে গিয়ে উৎকষ্টার সুরে বললেন, ‘আবু
অন্যটা।’

‘সেটার কথায় আসছি’ বলল ফেলুনা। —‘আপনি একটু বৈর্য ধরুন। আপনি
আবু আবার ঘুমের ওষুধ খাননি তো?’

‘পাগল। ঘুমের ওষুধই তো আমার সর্বনাশ করল। কাল কী মিলিয়ে দিয়েছিল
জলের সঙ্গে কে জানে?’

দুর্গাগতিবাবু গভীর বিরক্তির ডাব করে পুলিশের হাতে বলি লক্ষণ ভট্টাচার্যের
দিকে চাইলেন।

ফেলুনা বলল, ‘এত ভাল একজন আংশোপ্যাথ থাকতে আপনি এই হাতুড়ে
জ্বরাগাটিকে প্রশংস দিচ্ছিলেন কেন বলুন তো?’

‘কী করব বলুন। লোক যাচাই করার ক্ষমতা কি আব ছিল? সবাই এত সুধ্যাত
কামলে, যেচে এল আমার কাছে, বললে নিজের গরজে আমাকে সারিয়ে দেবে।
আরও বললে, ওর সম্মানে ভাল পুঁথি আছে—জ্যোতিষশাস্ত্রের পুঁথি...’

‘ওই তো মুশ্কিল। পুঁথির কথা বললেই আপনার মন গলে যায়। যাই হোক
জ্বরাগাটিকে কাজ দিয়েছে তো? কুণ্ড স্মৃতি ফিরিয়ে আনার পক্ষে ওটাই তো
সবচেয়ে নতুন আব সবচেয়ে ভাল ওষুধ বলে।’

‘আচর্য ওষুধ,’ বললেন মিঃ সেন, ‘মুহূর্তে মুহূর্তে যেন স্মৃতির এক-একটা দরজা
খুলে যাবে। সেনাপতি নিজে এসে ওষুধটা দিল বলেই তো হল। সেই যে
আমার ডাক্তার সে কথাও তো ভুলে গিয়েছিলাম।’

‘তা হলে বলুন তো, এই ভদ্রলোককে চেনেন কি না।’

ফেলুনা তাঁর টর্চ ফেলল বিলাস মজুমদারের মুখে। দুর্গাগতিবাবু তাঁর দিকে
কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, ‘কালকেই চিনেছিলাম গলার ছবি আব চাহনি

থেকে। কেন যে তবু ঘটকা সাগরিল জানি না।'

'এইর নামটা মনে পড়ছে?'—

'পরিষ্কার—যদি না উনি নাম ভাঙিয়ে থাকেন।'

'সরকার কি?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'সরকার,' সাই দিয়ে বললেন দুর্গাপতিবাবু। 'পুরো নামটা কোনওদিন জানিনি।'

'শায়ার।' চোখমুখ লাল করে চিংকার করে উঠলেন অভিধৃষ্ট ভদ্রলোক। 'পাসপোর্ট দেখতে চান আমার?'

'না, চাই না—বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল ফেলুদা।—'আপনার মতো ধূর্ত লোকের পাসপোর্টের কী মূল্য? কী আছে পাসপোর্টে? বিলাস মজুমদার নাম আছে তো? আর চেহারার বিশেষত্ব মধ্যে কপালের আঁচিলের কথা দলেছে?—'ডিসটিংগুইশিং মার্ক—মোল অন ফেরহেড'—এই তো? তবে দেখুন—'

কথাটা বলেই ফেলুদা ভদ্রলোকের দিকে হলহনিয়ে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে এক ঘটকায় একটা কুমাল বার করে সেটা দিয়ে একটা চাপড় মারল ভদ্রলোকের কপালে, আর তার কলে কৃত্রিম আঁচিল কপাল থেকে খুলে ছিটকে গিয়ে পড়ল অঞ্জকারে মেঝেতে।

'আপনি বিলাস মজুমদার সমষ্টে অনেক খবর নিয়েছিলেন,' ফেলুদা বলল দৃশ্টিকষ্টে, 'রো সেপ্টেম্বরে ছবি তুলতে গিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া, কোন হাসপাতালে গিয়েছিল, কী কী হাড় ভেঙেছিল, গত হাস অবধি সে হাসপাতালে ছিল—এ সবই আপনি জানতেন। কিন্তু একটি সংবাদ আপনার কানে পৌঁছালি। খবরের কাগজে সেই সংবাদটাই আমি পড়েছিলাম, কিন্তু তেমন মন নিয়ে পড়িনি। খবরটা কাসকে আমি পেয়েছি কাঠমান্ডুর বীর হাসপাতালের ডাঃ ভার্গবের কাছ থেকে। সেটা হল এই—বিলাস মজুমদারের সবচেয়ে হারাকৃত ইনজুরি হয়েছিল অনে। তিনি সংশ্লাহ আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

লঠনের আসোতেও বুঝতে পারছি লোকটার মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

'শুনুন মি: সরকার,' ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার পেশা পাসপোর্ট সেখা ধাই না। আপনার পেশা স্নাগসিং। নিজে সব সময় চুরি না করলেও, চোরাই মাল পাচার করেন আপনি। ভাতগীওয়ের প্যালেস মিউজিয়াম থেকে চুরি করা পুঁথি আপনার হাতে আসে কাঠমান্ডুতে। তার পরের ঘটনা যে কী, সেটা শুনুন মিস্টার সেনের মুখে।'

দুর্গাপতি সেনের চাহনিতে এমন কঠিন গাঞ্জীর্যের ভাব এর আগে দেখিনি। ভদ্রলোক বললেন :

'কাঠমান্ডুতে একই হোটেলে ছিলাম এই ভদ্রলোক আর আমি। পাশাপাশি কর—একদিন ভুল করে আমার চাবি ওর ঘরে লাগিয়ে দেবি দরজা খুলে গেছে। ভেতরে উনি ছাড়া দুজন সোক, তাদের একজন বাজ থেকে একটা লাল মোড়ক

বর করে উকে দিছে। দেখেই বুঝলাম পুঁথি। ষটকা লাগল। আপ চেয়ে বেরিয়ে এলাখ ঘর থেকে। সেই বাতে ঘুমের মধ্যে কী হল জানি না, আন হল হাসপাতালে। মাথা ঝ্যাক। এই ঘটনার আগের সব স্মৃতি মন থেকে মুছে গেছে। হোটেলে খোজ করে আমার নাম-ঠিকানা পায়, এখানে খবর দেয়, নিশ্চিথ শিয়ে আমাকে নিয়ে আসে। সাড়ে তিনি মাস ছিলাম হাসপাতালে।'

'আপনার না-জ্ঞান অংশ আমি বলছি' বলল ফেলুদা, 'ভুল হলে মিঃ সরকার যেন শুধরে দেন।—আপনাকে সেই বাতে অজ্ঞান করে গাড়িতে নিয়ে তুলে শহরের বাহিরে শিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে পাঁচশো ফুট নীচে ফেলে দেওয়া হয়। মিঃ সরকারের ধারণা ছিল আপনার মৃত্যু হয়েছে। ন মাস পরে হয়তো চোরাই মাল পাচার করতেই পুরীতে এসে ডি. জি. সেন নাম দেখে ষটকা লাগে। আমার ধারণা আপনার বাড়ির এককলার বাসিন্দা গণকুর লক্ষণ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আপনার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় ইনফরমেশন পান মিঃ সরকার। তাই নয় কি?'

ঝিমিয়ে পড়া লক্ষণ ভট্টাচার্য হঠাৎ যেন চাক্ষ হয়ে উঠলেন—'এ সব কী বলছেন মশাই—জুন তো আপনাদের সঙ্গে প্রথম এসেন আমার বাড়িতে!'

'বটে?'—ফেলুদা এগিয়ে গেছে লক্ষণ ভট্টাচার্যের দিকে। 'তা হলে বলুন তো কান্ধকার মশাই, পরিচয় হবার আগেই আপনি কেন ভদ্রলোককে তত্ত্বপোশে বসাতে বললেন আর আমাদের চেয়ার সেখানে দিলেন? উনিই যে বিলাস মজুমদার, আমি নই, সেটা আপনি কী করে জানলেন?'

এই এক প্রথম লক্ষণ ভট্টাচার্য আশ্চর্যস্বাভাবে কুকড়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে চলস, 'আমার বিশ্বাস দুর্গাগতিবাবুর স্মৃতি শোপ পাবার কথাটা জেনে, এবং লক্ষণ ভট্টাচার্যের সাহচর্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে, সরকার মশাইয়ের মনে পুঁথি চুরিয়ে আইডিয়াটা আসে। তাল বন্দেরও রয়েছে একই হোটেলে—মিঃ হিসেবানি। কিন্তু এই ব্যাপারে তিনটে মুশকিল দেখা দেয়। প্রথমটা হল—একজন অবাধিত লোক মিঃ সরকারকে ধাওয়া করে এখানে এসে হাজির হয়। সে হল কপচাদ সিং। ভারী মুশকিল, না, মিঃ সরকার? যে গাড়িতে করে আপনি বেঙ্গল মিস্টার সেনকে নিয়ে গেছিলেন পাহাড় থেকে ফেলে হত্যা করতে, তার জ্বাইভার—শাকে হয়তো আপনি ভাসরকম ঘূষ দিয়েছিলেন—সে যদি হঠাৎ আরও লোভী হয়ে পড়ে, এবং আপনাকে ঝ্যাকমেল করে হমকি দিয়ে আরও টাকা আদায় করতে চায়? ভারী মুশকিল। তখন তাকে খতম করা ছাড়া আর বাস্তা থাকে কি?'

'মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে!—মরিয়া হয়ে চিংকার করে উঠলেন মিঃ সরকার।

'কিন্তু যদি প্রয়োগ হত যে তার মাথায় যে শুলিটা সেগেছিল সেটা আপনার এই রিভলভারটা থেকেই বেরিয়েছে, তা হলে?'

মিঃ সরকার আবার নেতিয়ে পড়লেন। বেশ দেখতে পাইছি যে ভদ্রলোকের সমস্ত শরীর ঘায়ে ভিজে গেছে। আমিও ঘামছি, তবে সেটা স্বাসরোধ করা উদ্দেশ্যনাম। ফেলুদার খাতার দেখা ছিল 'কালোভাক'। এখন বুঝতে পারছি সেটা হল ঝ্যাকমেল। আমার পাশে লালমোহনবাবু যেন ফেনসিং ম্যাচ দেখছেন।

কথার তলোয়ার খেলায় ফেলুন্দার জুড়ি নেই সেটা শীকার করতেই হবে। আর সে খেলা এখনও শেষ হয়নি।

‘অতএব ক্লিচার্স সিং হল মার্ডির নামার ওয়ান,’ ফেলুন্দা বলে চলল। —‘এখন হিতীয় মুশকিলে আসা যাক। সেটা হল শ্রীক্ষেত্রে পোড়েন্দার আগমন। ফেলুন্দা মিহিরকে ধোকা না দিয়ে সরকার ঘশাইয়ের কার্যসূচি ছিল অসম্ভব। সেখানে বলব যে, বিজ্ঞাস মজুমদারের ভূমিকায় নিজেকে এস্টাব্লিশ করতে, এবং নিজের অপরাধ একজন স্মৃতিশৃষ্টি অসহায় প্রোটেনে স্বজ্ঞে চাপাতে, তিনি বেশ কিছুটা সফসোফ হয়েছিলেন। এই সাফসাই তাঁর মনে একটা বেপরোয়া ভাব এনে দেয়। পরিকল্পনা খুবই সহজ। পুঁথি এমে দিতে পারলে হিসেবানি কিনবেন; সরাসরি মাসিকের কাছ থেকে কেনার উপায় নেই, কারণ দুর্গাগতিবাবুর টাকার লোড নেই এবং পুঁথিগুলি তাঁর প্রাণবন্ধন। সুন্দরাং আলমারি থেকে পুঁথি বাব করতে হবে। উপায় কী? অতি সহজ। কাঙ্গাটা করবেন লক্ষণ ভট্টাচার্য, কারণ এ কাঙ্গ তিনি বেশ কিছুদিন থেকেই করে আসছেন। আগে পুরো টাকাটাই তিনি নিজে পকেটে করেছেন; এখানে টাকার অক্টো অনেক বেশি, কাজেই সেটা অন্যের সঙ্গে শেয়ার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে একজনের কথা একটু ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে নিশ্চীথ বোস।’

* ফেলুন্দা খামল: তারপর লক্ষণ ভট্টাচার্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘মংগলা রোডে কীর্তনের কথা বলেছিলেন না আপনি?’

লক্ষণ ভট্টাচার্য একটা বেপরোয়া ভাব আনবার চেষ্টা করে বললেন, ‘মিথ্যে বলেছি?’

‘না, মিথ্যে বলেননি,’ বলল ফেলুন্দা, ‘প্রতি সোমবার সেখানে কীর্তন হয় সেটা ঠিকই! কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন আপনি সেখানে যান, সেটা ঠিক না। আপনি কোনওদিন যাননি। আমি থোঁজ নিয়েছি। তবে এ বাড়ি থেকে একজন যেতেন। নিশ্চীথ বোস। সোমবার বিকেসে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা নিশ্চীথবাবু বাড়ি থাকতেন না। চাকর থাকত। এই সোমবার অর্ধেৎ গত কালও নিশ্চীথবাবু ছিলেন না। চাকরটা অপদার্থ। তাকে ঘূর দিয়ে হাত করা কিছুই না। আপনি দুপুরে মিঃ সেনের ঘূরের ওয়ুধের মাঝা বাড়িয়ে দিয়ে সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ঘরে ঢুকে, বালিশের নীচ থেকে চাবি বাব করে নিয়ে আলমারি থেকে পুঁথি বাব করে নিয়ে যান। সেটা মিঃ সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। তাঁর জন্য আপয়েন্টমেন্ট হয় ভুজঙ্গ নিরামের বালান্দায়। আপনি অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। আপনার জুতোর ছাপ, আপনার দেশলাইয়ের কাঠি ও আপনার পানের পিক তাঁর সাক্ষ্য দিছে। কিন্তু এই সময় একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যায়।’

আমরা সবাই কাঠ। লক্ষণ ভট্টাচার্য ধৰ ধৰ করে কাঁপছেন, কারণ মিঃ সরকার ছাড়া ঘরের সবাইয়ের দৃষ্টি এখন তাঁর দিকে।

ফেলুন্দা আবার শুরু করল—‘একজন আমেরিকান ভদ্রলোক সাড়ে ছটায় আসবেন মিঃ সেনের পুঁথি দেখতে। তাই ছটার মধ্যে নিশ্চীথবাবু ফিরে আসেন। হ্যাতো কর্তাকে তখনও ঘূর্যাতে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। আলমারি খুলে দেখেন

পুরুষ হস্তে সাদা কাগজ। আপনি বাড়ি নেই। সন্দেহটা নিশ্চয়ই বাড়ে। বাইরে এসে দেখেন বালিতে পায়ের ছাপ। চলে আসেন ভুজঙ্গ নিবাসে। বলুন তো কলম্বাস, এই অবস্থায় তাকে কি বাঁচতে দেওয়া চলে? একটি ভৌতা হাতিয়ার তো কিনা আপনার সঙ্গে, তাই না? তাই দিয়ে তাকে যেরে, লাশ সরিয়ে, সাগরিকায় কিন্তু গিয়ে নিশ্চীধবাবুর বাজ্জ বিছানা ভুজঙ্গ নিবাসে রেখে হঠাতে খেয়াল হয় হাতিয়ারে রস্ত লেগে আছে। তখন সেটা সমুদ্রের জলে যেপ্তে গিয়ে পথে আমায় দেখে সেটা দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মেরে, তারপর সেটাকে জলে ফেলে দেন—তাই তো!'

ফেনুদা জানে যে এ-প্রদেশের কোনও উত্তর নেই, কিন্তু তাও সে থামল, কারণ পরের প্রদাটায় জেল দেবার জন্য। আদিকালের পোড়ো বৈঠকখানার চার দেয়াল ফাঁপিয়ে প্রশ্টা করল সে—

‘কিন্তু তাতেও কি আপনার ক্ষয়সিদ্ধি হয়েছিল?’

উত্তরটাও ফেনুদাই দিল, কারণ লক্ষণ ভট্টাচার্যকে দেখে মনে হয়, তিনি বাক্যবাণে আধমরা।

‘না, তাতেও হয়নি। সে পুর্থি হিসেবানি পায়নি। যিঃ সরকারও পাননি। তাই অন্য পুরিটিকে সরাবার দরকার হয়েছিল আজকে। তব আগে, হয়তো কাল জায়োই, আপনি নিশ্চীধবাবুর মাঝের অসুখের গঁজাটি ফেঁদেছেন। কিন্তু প্রথম দিন এত করেও আপনার পরিশ্রম ব্যর্থ হল কেন সেটা এদের একটু বুঝিয়ে বলবেন? বলবেন না? তা হলে আমিই বলি—কারণ এত আশ্চর্য একটি ঘটনা বর্তমান অবস্থায় আপনার পক্ষে গুরুত্ব বলা সম্ভব না। আমি অনেক রহস্যের সমাধান করেছি কিন্তু বর্তমান রহস্যটি এতই অসুস্থ ও অসামান্য যে, আমাকে বোকা বালিয়ে দিয়েছিল। ভৌতা হাতিয়ারের কথা বলছিলাম, কিন্তু সেই ভৌতা হাতিয়ার যে অস্তাপারমিতার পুর্থি, তা আমি কী করে বুঝব? আপনার হাতে যে আর কিছুই ছিল না, তা আমি কী করে বুঝব! নিজের মাথায় কাঠের পাটার বাড়ি সম্মেও আমি বুঝিনি। সেই রক্ত লাগা পুর্থি কেমন করে আপনি সরকারের হাতে তুলে দেবেন, আর সরকারই যা হিসেবানিকে দেবেন কেমন করে?’

‘হায়, হায়, হায়!—দুর্গাগতি সেন দু হাত মাথায় দিয়ে উপুড় হচ্ছে পড়েছেন।—‘আমার এত সাধের পুর্থি শেষটায়—’

‘আপনাকে একটা কথা বলি মিস্টার সেন’—ফেনুদা দুর্গাগতিবাবুর দিকে এগিয়ে এসেছে—‘আপনি কি জানেন যে সমুদ্র মাঝে মাঝে দান গ্রহণ করে না, ফিরিয়ে দেয়? এমনকী তৎক্ষণাত ফিরিয়ে দেয়?’

এবার ফেনুদা তার খোলার ভিতর হাত চুকিয়ে টেনে থার করল আরেকটা শালুতে মোড়া পুর্থি।

‘এই নিন আপনার অষ্টসাহপ্রিকা প্রজ্ঞপারমিতা। এটাকে “নাই মায়া” বলতে পারেন। শালু যেমন ছিল তেমনই আছে। পাটার রং কিন্তু হয়ে গেছে, তবে লেখা যে খুব বেশি নষ্ট হয়েছে তা বলব না। কাপড় আর কাঠ কেদ করে জল বেশি চুক্তে পারেনি।’